বর্ষ ৩২ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

## সূচিপত্র



সম্পাদক: দিলীপকুমার গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক: সুধাংশু ঘোষ

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০। প্রতি সংখ্যা ১.৫০। আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড,
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ৩২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭

## সূচিপত্র



সম্পাদক : দিলীপকুমার গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

# ;CONOMIC
# ;ULTIPLIER

## ;hlights of Hindustan Steel's role
## a multiplier of economic activity
## ;he development of India.

**;STRIES**

;stan Steel has so ;upplied over 20 n tonnes of steel 7.7 million tonnes ig iron to Indian ;try. This has initia- the growth of

al engineering and other industries which on and steel. The equipment and machinery ;ced by these engineering industries have ; the growth of various other industries ;ble. With this rapid industrial development, ady and increased supply of raw materials became essential. To meet this demand, other industries sprang up—industries en- d in mining, transportation, production of ;trial raw materials, etc. Together, these added to the nation's wealth and contribut- ;veral million rupees to the exchequer in the of taxes and duties.
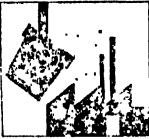
**;ICULTURE**

;ustan Steel not only provides the steel f; building dams, power houses, tube wells, silos and farm equipment but has also supplied so far 1.5 million tonnes of nitrogenous fert- lizers to help improve ;ultural yields. Many of Hindustan Steel's ;nical by-products are also important ingre- ;ts in the manufacture of pesticides and ;cticides commonly used for crop protection,

March, 1970 to Central and State revenues exceeds Rs. 762.5 crores—over Rs. 250 crores as excise duty, over Rs. 75 crores as customs duty, over Rs. 30 crores as sales tax, over Rs. 185 crores as out- ward railway freight, over Rs. 190 crores as interest on loan capital and Rs. 32.5 crores as return of loan capital.

**SAVING AND EARNING FOREIGN EXCHANGE**

To date Hindustan Steel has sold Rs. 1600 crores worth of iron and steel and chemical by- products, all of which the nation would have otherwise had to import by spending foreign ex- change. Such massive savings apart, Hindustan Steel has over the years earned over Rs. 140 crores in foreign ex- change from its exports of iron and steel and by-products.
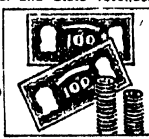
**EMPLOYMENT**

Hindustan Steel em- ploys over 120,000 people. For every man employed by Hindustan Steel several times as many find employment in the industries which serve steel-making or use steel. The increase in steel production has led to the expansion of the nation's employment potential.
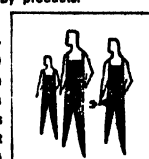
products and steel-making processes. With the establishment and expansion of Hindustan Steel the nation has gained new experience, developed new skills and competent consultancy services. A cadre of over 4,000 engineers and techni- cians essential for the future growth of the steel industry in India has been trained and developed by Hindustan Steel.

Steel, we thus see, is crucial to economic development. It was this appreciation of steel's role as the mother industry that prompted our planners to lay deep emphasis on expanding India's steel-making capabilities. Starting with three new million-tonne steel plants at Rourkela, Bhilai and Durgapur, Hindustan Steel's present annual production rate is 4.25 million tonnes, constituting over 60% of India's total annual steel-making potential. Further expansion is already under way. The bulk of the country's requirements of highly specialized alloy and tool steels too are being met by Hindustan Steel's Alloy Steels Plant at Durgapur.
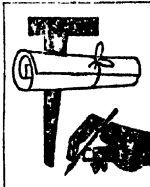
Regd. Office : Ranchi
Plants : Rourkela · Bhilai · Durgapur

বর্ষ ৩২ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

## সূচিপত্র



সম্পাদক: দিলীপকুমার গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক: সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

# DEVELOPMENT CONSULTANTS in SYRIA

**Development Consultants now engaged in complete engineering service for three Dry Process Cement Plants producing 1,000 tonnes per day.**

Development Consultants are equipped with all the modern expertise and are now engaged in rendering consultancy services to Indian industries, such as power generation—electrical and nuclear—aluminium, paper and pulp, cement and other mining and metallurgical projects.

Development Consultants have already made spectacular success in export of Indian expertise and know-how. As consultants to the Government of Syria for the cement project—one of the biggest development projects in that country—Development Consultants will gain for India the largest foreign exchange earnings for any consultancy work done abroad by Indian consultants.

**DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED**
**24-B Park Street, Calcutta-16**

বর্ষ ৩২ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭

## সূচিপত্র



সম্পাদক: দিলীপকুমার গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক: সুধাংশু ঘোষ

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

বর্ষ ৩২ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

# রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাকপ্রতিমা

**অমলেন্দু বসু**

ইংরেজী imagery কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কী হবে? আমার প্রস্তাব, প্রতিশব্দ হওয়া উচিত বাক্‌প্রতিমা, এই প্রতিশব্দই আমার আলোচনায় সর্বত্র ব্যবহার করব। আধুনিক বাংলা সমালোচনায় অন্য একটি শব্দ বহুল প্রচলিত—চিত্রকল্প। কী কারণে আমি এই 'চিত্রকল্প' শব্দটির তুলনায় আমার প্রস্তাবিত 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটি অধিকতর গ্রাহ্য মনে করি সে এক স্বতন্ত্র দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আমি শুধু দুটি কথা এ-প্রসঙ্গে বলব। প্রথমত সাহিত্যালোচনায় ইমেজ-বিচার আধুনিক সমালোচনারই বিশিষ্ট লক্ষণ যদিচ প্রাচীন আলোচনা থেকে নিতান্তই অনুপস্থিত ছিল না। আধুনিক সমালোচনার লক্ষণ বটে, সে-সমালোচনা আবার পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এসেছে, আধুনিক সেমান্‌টিক্‌স মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মানব-সমাজে পৌরাণিক কল্পনার মৌল আদিরূপ-আলোচনা প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে। পাশ্চাত্যের এই নবীন সমালোচনা-পদ্ধতি অবশ্য বাংলা সমালোচনায় নবীনতর। এর নবীনতার দরুনই এর নামকরণ এতাবৎ সুস্পষ্ট হয়নি অথচ এর বাংলা নাম ইংরেজি নামের নিকটতম প্রতিশব্দ হওয়া একান্ত সংগত। দ্বিতীয়ত, চিত্রকল্প শব্দটিতে কেবল একশ্রেণীর ইমেজ-ই সূচিত হয়, যে-ইমেজ visual imagination (দর্শনপন্থী কল্পনাশক্তি) দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলে কাব্যানুভূতির বাঙ্ময়রূপটি শুধু চিত্রধর্মী বলে মনে করা হয়েছে। অথচ কবি-কল্পনার বাহন যে ভাষা, যে বাক্‌মালা, তাতে দৃশ্যানুভূতি যেমন সম্ভব, শ্রবণানুভূতি, ঘ্রাণানুভূতি, স্পর্শানুভূতি, স্বাদানুভূতি তেমনি সম্ভব। অর্থাৎ কুশলী ভাষাপ্রয়োগে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই উদ্বুদ্ধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রযুক্ত ইমেজ যে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যঞ্জনাদ্যোতক, কিছু দৃষ্টান্ত সহকারে সে বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি বলে ("সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র : রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা"—রবীন্দ্রায়ণ, প্রথম খণ্ড) এখানে পুনরাবৃত্তি থেকে নিরস্ত হলাম। এখানে আমার বলার কথা হচ্ছে যে ভাষামাধ্যমে চিত্রানুভূতি সৃষ্টি করা ভাষার একটিমাত্রই নিপুণতা। তাছাড়া অন্যবিধ নিপুণতাও কবির সাধ্য। অতএব ইমেজ অর্থে চিত্রকল্প শব্দটির প্রয়োগে ইমেজ-ভাবনার প্রসারতা ও জটিলতা সঙ্কীর্ণ ও পঙ্গু করে ফেলা হবে। অপরপক্ষে প্রতিম, প্রতিমা, প্রতিমান

ইত্যাদি শব্দনিহিত সাদৃশ্য জ্ঞাপনায় ইমেজ শব্দটির মূল লাতিন অভিধায় অনুরূপ সাদৃশ্য ভাবনা পাওয়া যায়। প্রতিমা শব্দটিতে পূজাঘরের ঠাকুর বা কুমোরের মূর্তি, এহেন সঙ্কীর্ণ অর্থ না দেখে যদি কিছুটা মূল অভিধায় চলে যাই, যদি বুঝি যে সাদৃশ্যবোধের প্রতি-রূপায়ণ (সে প্রতিরূপ অঙ্গভঙ্গীতে ও অভিনয়ে সাধিত হোক, মূর্তিরচনায়, চিত্ররচনায়, ধ্বনিবিস্তারে সাধিত হোক, সর্বক্ষেত্রেই পরিণামে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিরূপ) তাহলেই দেখব যে বাক্‌প্রতিমা শব্দটি verbal image অর্থে একান্ত সুষ্ঠু। এখানে আরেকটি কথাও বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইমেজ অর্থে প্রতিমা শব্দটি ব্যবহার করেছেন "রোগশয্যায়" গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায়: অবসন্ন আলোকের শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা।

## ২

বাক্‌প্রতিমা-বিচারের পদ্ধতি যে বিভিন্ন হতে পারে, শৈল্পিক প্রয়োজন অনুসারে বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগ এবং তন্মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে, এবিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে। এ বিষয়টিও সুসংবদ্ধ প্রভূতদৃষ্টান্তসমৃদ্ধ দীর্ঘ আলোচনার বিষয় (বস্তুত কোন সাহিত্যালোচনাই বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় মনষ্ক্রিয়া নয়, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ যুক্তি নয়, বরং নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ সাহিত্যকৃতির, সাহিত্যিক দৃষ্টান্তের আলোকে উদ্ভাসিত)। সুতরাং সে আলোচনা আমি বর্জন করছি আমার বক্ষ্যমান বিষয়ের তাগিদে। তবুও বাক্‌প্রতিমা বিচারের কয়েকটি বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে কিছু দ্রুত চিন্তা (যাকে কোনো কোনো সমকালীন বাঙালী লেখক বলেছেন বিহঙ্গদৃষ্টি, বিয়ৎচারী দৃষ্টি—bird's-eye view-এর তর্জমা) নিরর্থক হবে না।

বাক্‌প্রতিমা বিচারের এক পন্থায় দেখতে হবে বাক্‌সমন্বয়ে যে প্রতিমা রচিত হল তার প্রণিধানে আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয়জ শক্তি উদ্বুদ্ধ হল? কবিতায় (অথবা নাটকে, উপন্যাসে, সাহিত্যের যে কোনও অপর ক্ষেত্রে) যে ইমেজটি পেলাম, যে-একটি বা একাধিক শব্দের উদ্বোধনী শক্তির সাহায্যে আমাদের মনে হল যে কিছু যেন দেখলাম বা শুনলাম বা স্পর্শ করলাম অথবা কিছুর ঘ্রাণ বা স্বাদ পেলাম, অর্থাৎ যেন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি অর্জন করলাম (যদিচ বাস্তবিক কিছুই দেখলাম না, শুনলাম না, স্পর্শ করলাম না বা কিছুরই স্বাদ বা ঘ্রাণ পেলাম না), অতএব আমাদের অনুভূতিটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়, অনুভূতির প্রতিমামাত্র, সেই ইমেজটিকে কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার পর্যায়ে ফেলব? —ইমেজটি, বাক্‌প্রতিমাটি কি চিত্ররূপময়, ধ্বনিরূপময়, স্বাদরূপময়, স্পর্শরূপময় অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, রসনেন্দ্রিয়ের, ত্বগেন্দ্রিয়ের আওতায় পড়ছে? বাক্‌-প্রতিমাগুলিকে আমরা তাদের সংশিলষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতির শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করতে পারি, এবং এই শ্রেণীবিশ্লেষণ থেকে জানতে পারি আমাদের লেখকের সৃজনী-চেতনা কোন্ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অধিক অনুরক্ত।

বাক্‌প্রতিমার অপর এক চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনাযোগ্য। এবারে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুপস্থিত নয় (থাকতে পারে না) তবে বিচার্য বিষয়ও নয়। এবারে আমরা লক্ষ্য করছি যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিমার চূড়ান্তে একই ভাবজগৎ, তারা সবাই মিলে এক ভাবনারই ইশারা দিচ্ছে। এবিষয়ে আমি অন্য দুটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছি: "ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ" উত্তরসূরী; "হে কালবৈশাখী", পূর্বপত্র। সমর সেনের কবিতা বিষয়ে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায়

প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে তাঁর কাব্যে বিদ্রোহসূচক কয়েকটি প্রতিমার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়; পোড়ামাটি, মুহূর্তের খড়্গ, ফণিমনসার ঝাড়, লাল ধ্বংস, বিপ্লবের ধাত্রী, ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন, ইত্যাদি। এহেন তুল্য ভাবনাসূচক পুনরাবৃত্ত বাক্‌-প্রতিমাকে ইংরেজ ও জার্মান লেখকগণ বলেন image cluster, আমার প্রস্তাব আমরা বলব, প্রতিমাপুঞ্জ। রবীন্দ্রনাথে প্রতিমাপুঞ্জ অগণিত। সচরাচর বাক্‌প্রতিমা স্বসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, অর্থাৎ কবিতার ভাবনাটি বিধৃত হয়েছে একটি বিশেষ প্রতিমায়। যখন কবি বলেন, "এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে", তখন ধেনুবেশী আলোকের প্রতিমা এই বিশেষ গানটির বিশেষ ভাবনা থেকে উৎসারিত হয়েছে, যেখানে উৎস সেখানেই পরিণতি, উপমাটি উপমেয়র সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে। কিন্তু প্রতিমাপুঞ্জে একটি বিলম্বিত ভাবনা নানা কবিতায় নানা উপমানে বিস্তারলাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জনতা-চিন্তা বহুবার পাওয়া যায়। তাঁর জনতা-ভাবনায় লক্ষ্য করি এক নাটকীয় ambivalence, অর্থাৎ বিপরীতের সংশ্লেষ। তিনি কখনো জনতার সম্মুখে ভীত সঙ্কুচিত হয়ে জনতা থেকে সরে গিয়ে আপন সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বকে নিভৃত একক লীলার সুযোগ দিতে চান, পক্ষান্তরে কখনো বা জনতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জনতায় আপন ক্ষুদ্র সত্তাকে ভূমালীন করেই সত্তার ব্যাপ্তি, মহতীকরণ মুক্তি কামনা করেন। একদিকে যেমন কবি বলেন তাঁর চিত্ত "সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা", অন্যত্র তেমনি বলেন "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,/দুঃখ-বিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে"। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১। সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
　আমাকে আনল ডেকে
　বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। ('পঁচিশে বৈশাখ', "শেষ সপ্তক")

২। যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীতকোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল। ('মঙ্গলগীতি', "কড়ি ও কোমল")

৩। খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
　চলো পৃথিবীর মাঝে। ('আহ্বানগীত', "কড়ি ও কোমল")

৪। কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে
জগৎ-মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ
কেউ-বা মরে একলা ঘরের শোকে
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ। ('কবির বয়স', "ক্ষণিকা")

কবির দোটানা-দোলার ভাবনায় জনতা কখনো সমুদ্রের মতো, কখনো যেন অরণ্য, কখনো কারাগার থেকে মুক্তি, কখনো বা সঙ্গীতমুখর মিছিল। বাক্‌প্রতিমার শরীর রূপ বদলাচ্ছে, কিন্তু তাদের মর্মমূলে একই ভাবনা নিহিত। একেই বলে প্রতিমাপুঞ্জ।

৩

অন্য এক শ্রেণীর প্রতিমারও উল্লেখ করা দরকার: chain imagery। আমার প্রস্তাব

এহেন প্রতিমাকে আমরা বলব প্রতিমাশৃঙ্খল, যে ক্ষেত্রে এক প্রতিমার বিশেষ ইন্দ্রিয়সংবেদনা থেকে পরক্ষণেই পাঠকচিত্ত অপর প্রতিমার অন্য ইন্দ্রিয়সংবেদনার পানে ধাবিত হয়, এমনকি একইসঙ্গে তিন-চারটি অথবা তদধিক প্রতিমায় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সংবেদনার সমন্বয় হয়ে যায়। (এবিষয়ে আমি 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ড, "সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র : রবীন্দ্রনাথের বাক্-প্রতিমা"-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।) একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন :

বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত। ('শিশুতীর্থ', "পুনশ্চ")

বস্তুগুলো হচ্ছে উপমেয়। ছয়টি ছত্রে ছয়টি বিভিন্ন উপমান প্রযুক্ত হয়েছে। বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলির তুচ্ছতা, ব্যর্থতা, বিকৃতি সূচিত হয়েছে উপমান কয়টিতে : ব্যাধিগ্রস্তের প্রলাপ; জীবলীলার উচ্ছিষ্ট; ভগ্ন তোরণ; জীর্ণ সেতু; সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী; অসমাপ্ত সোপান-পঙ্‌ক্তি। একটিমাত্র উপমায় কবি আবদ্ধ থাকেন নি, তাঁর উচ্চগ্রামে বাঁধা বেগচঞ্চল কল্পনা গড়িয়ে চলেছে এক উপমা থেকে অন্যে, এক ধ্বনিময় প্রতিমা ও পাঁচটি চিত্রময় প্রতিমার সমন্বিত সংশ্লেষে ভাবনাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও একটি স্তবক লক্ষ্য করা যাক :

এ সত্যের মুখোশ পরে সত্যকে আড়ালে রাখে;
মৃত্যুর কাদামাটিতেই গড়ে আপনার পুতুল,
তবু তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস পেলেই
নালিশ করে আর্তকণ্ঠে।
খেলা করে নিজেকে ভোলাতে,
কেবলই ভুলতে চায় যে সেটা খেলা।
প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য;
স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্‌বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ্য ভেদ করে ও হাউয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার। ("পত্রপুট", ১০)

মুখোশ পরা, কাদামাটিতে পুতুল গড়া, নালিশ করা, খেলা করে নিজেকে ভোলানো, অর্ঘ্য-রচনার সঞ্চয়, বাষ্পবুদ্বুদের ফেনিল হাওয়া, আবর্তের পাক খাওয়া, হাউইয়ের আগুন ছোটা, ছাই স্তূপীকরণ—নয়টি বাক্‌প্রতিমা বারোটি ছত্রে সংহত হয়ে আবরণের আবিলতা ও অন্তরাত্মার মুক্তরূপ—এ-দুয়ের বৈপরীত্য সূচিত হয়েছে। প্রতিমাশৃঙ্খলের এ-ও এক উজ্জ্বল কারুকৃতি। আরেকটি দৃষ্টান্ত :

প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক
চিরপুরাতনের বেদিতলে।
মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়

ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে। ("আরোগ্য", ২)

প্রভাতে নূতন দিনের শুরু, সে এক নিত্য পুনরাবৃত্ত ঘটনা। নূতন দিন চিরনূতনের প্রতীক, নবীনতার প্রতীক, নবীন প্রাণের সেই প্রতীক পরিস্ফুট হয়েছে প্রকৃতির চারটি অভিব্যক্তিতে, অভিব্যক্তিগুলি বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে পাঠকের কাছে। প্রভাতের আলোছায়াসংমিশ্রণ যেন ধরণীর উত্তরীয় বুনে চলেছে, আন্দোলিত তরুপল্লব-গুলিতে যেন আকাশের হৃৎস্পন্দন; দূরদূরান্তপ্রসারী আলোকের আভা যেন মণিহারের ঝিলিমিলি; পাখিরা যেন বৈতালিক; তারা জীবনলক্ষ্মীর স্তুতিগান করছে। বাক্‌চিত্রগুলি বদলাচ্ছে বটে কিন্তু তারা সবাই যেন একটি সর্বসম্মিত ট্যাপেস্ট্রিতে অঙ্গাঙ্গিরূপে মিলে গিয়ে একই সব-ছোঁওয়া ভাবনার দিকে আমাদের কল্পনাকে নিয়ে যাচ্ছে—নবজীবনের দিকে। পুঞ্জীকৃত প্রতিমার ধর্ম হচ্ছে বহুর মধ্যে একের অধিষ্ঠান প্রকট করা, বহুর উল্লেখে উপমেয় বিষয়টির বৈচিত্র্য ও প্রসার প্রতিষ্ঠিত করা।

৪

বাক্‌প্রতিমা যে কেবল কাব্যেই প্রযুক্ত তা নয়, যে কোন সাহিত্য-জাতিতেই (literary genre) প্রযুক্ত হতে পারে, হয়ও। বস্তুত, যে কোনো ভাষাব্যবহারেই ইমেজ্‌ বা বাক্‌প্রতিমা পাওয়া যেতে পারে। যাবতীয় কাব্যিপনা এড়িয়ে গিয়েও আপনি হয়ত বলে বসলেন : আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হল, মাথায় যেন বাজ পড়ল; দারোগাসাহেব মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন: লোকটা টাকার কুমির, ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক এমনও বলেন যে ভাষা মানে নিহিত বাক্‌-প্রতিমা, submerged imagery। এসব থেকে যে সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার সেটি হচ্ছে যে ভাষায় বাক্‌প্রতিমা বস্তুটি কিছু অপ্রচুর নয়, বরঞ্চ ভাষা প্রয়োগের দুই স্তরেই—মামুলি প্রয়োগে যেমন শৈল্পিক প্রয়োগেও তেমনি—নিয়তাবৃত্ত। অতএব, বলা বাহুল্য যে এই নিয়তাবৃত্ত প্রতিমাগুলি কোনো বিশেষ কবির নিজস্ব শিল্প-সম্পদ নয়, এই গতানুগতিক প্রতিমার প্রয়োগ থেকে কবির সৃজনীশক্তির অনন্যতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, বড়জোর বোঝা যেতে পারে সাধারণ বাক্‌বিধির সঙ্গে এবং তাঁর নিজ কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে কবির পরিচয় কতটা গভীর। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন "হৃদয়শতদল করিছে টলমল" অথবা "কর্মজীবন মনে হয় মরু সাহারা", তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন না, তিনি নেহাতই যে কোন শাদামাটা বাঙালী পদ্য-লিখিয়ে। অথচ যখন তিনি লেখেন :

১। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে ('শাপমোচন', "পুনশ্চ")

২। আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তাপসী তমস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

('শাপমোচন', "পুনশ্চ")

৩। কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ। ('কালো ঘোড়া', "বিচিত্রিতা")

৪। ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে। ("শেষ সপ্তক", ১৯)

৫। চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান। ("শেষ সপ্তক", ৩৩)

এহেন বাক্‌প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা কাব্যে দেখা যায়নি (আমি যতদূর জানি, অন্য কোনো ভাষার কাব্যেও দেখা যায়নি), এগুলি রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। সৎ কাব্য-পাঠককে সতর্কভাবে বিচার করতে হবে কোন্ বাক্‌প্রতিমাটি নিষ্প্রাণ, গতানুগতিক, অভ্যাস-জীর্ণ, মামুলি, আর কোন্‌টি নিজস্ব, প্রাণোচ্ছল, নবীন।

প্রাণোচ্ছল নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায় (আধুনিক মনোবিদ্যা অনুসারে) কবির গূঢ়তম সত্তা মুকুরিত হয়। কত অভিজ্ঞতা, কত চিন্তা, কত বাঁধনহারা অনুভূতি তরঙ্গায়িত হয়েছে কবির চেতনায়, চেতনার প্রথম মুহূর্ত থেকে আজ অবধি; কত অভিজ্ঞতা নিমজ্জিত হয়ে গেল চেতনার উপরিতল থেকে গহীনতলে নেমে, অবচেতনার স্তরে! কিন্তু সৃজনীশক্তির অবিশ্লেষ্য শক্তিতে সেইসব হারিয়ে যাওয়া আবেগ ও চিন্তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাক্‌-প্রতিমার শরীরসীমায়, অতএব এই বাক্‌প্রতিমার মাধ্যমে আমরা কবির অন্তরতম সত্তার নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছুই। সামাজিক মানুষসত্তার কত অসংখ্য তুচ্ছ (শিল্পের উপাদান হিসেবে তুচ্ছ) পরিচয়গুলি শিল্পায়িত হয়নি বাক্‌প্রতিমায়, হয়েছে বিস্মৃতিবিলগ্ন কত অনুভাবনা, কেননা তারা কবিসত্তার একান্ত সত্য উপকরণ। নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায় কবির আসল সত্তা বিধৃত বলে জানব।

যখন মামুলি ও নিজস্ব, এই দুই শ্রেণীতে বাক্‌প্রতিমা ভাগ করলাম, যখন জানলাম যে নিজস্ব বাক্‌প্রতিমা প্রয়োগেই শিল্পীর শিল্পীত্ব সপ্রমাণ, তখন আরো একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে অবচেতনার যে সম্পর্কের কথা বলেছি সেটি কোনো অলঙ্ঘনীয় গাণিতিক নিয়ম নয়, এ সম্পর্ক কেবল আত্মাশ্রয়ী সাহিত্যেই প্রযুজ্য। যখন কাব্যের বিষয় হচ্ছে কবির নিজ আত্মচেতনা, যখন জেনেশুনেই কৃতসংকল্প হয়েই কবি কিছু নিজ আবেগ ও উপলব্ধি আশ্রয় করে কাব্যরচনা করেন, অথবা যখন তিনি জ্ঞাতসংকল্প নন অথচ চেতনার গভীরতম প্রদেশ থেকে কতকগুলি ভাবনা ও আবেগ যেন এক দুর্বার স্বসমুখ বেগে উৎসারিত হচ্ছে, তখনও এই সবজেক্‌টিভ্ লিরিক কাব্যে এমন বাক্‌প্রতিমা প্রযুক্ত হয় যেগুলি কবির নিভৃত জীবনের অন্তরঙ্গতম প্রতিচ্ছবি। কবিরে পাবে না খুঁজে জীবনচরিতে, কিন্তু পাওয়া যাবে তাঁর আত্মাশ্রয়ী সবজেক্‌টিভ্ কাব্যের বাক্‌প্রতিমায়।

কিন্তু সৎপাঠককে জানতে হবে যে বাক্‌প্রতিমায়ও কবির নিভৃত জীবনের এই একান্ত সম্পর্ক সর্বদা গ্রাহ্য নয়। আত্মাশ্রয়ী কাব্যে অবচেতনা প্রবল হওয়া সম্ভব, সদাসচেতন সমীক্ষাপরায়ণ মননশক্তি সেখানে পাহারাদার নয় অথবা পাহারাদার হলেও এমন সতত উৎকর্ণ পাহারাদার নয় যে কোনোরকম নিভৃত বা গোপন বা সমাজশাসন-ভাঙা চিন্তা বা আবেগকেই কাব্যে প্রবেশ করতে দেবে না। সমীক্ষাপরায়ণ মননশক্তির শাসনশৈথিল্যের জন্যই বাক্‌-প্রতিমায় অবচেতনা প্রবেশ করে। কিন্তু মূলত আত্মাশ্রয়ী নয় এমন সব কাব্যে বাক্‌প্রতিমা স্বতোৎসারিত নয় বরং মননশক্তি দ্বারা নির্বাচিত, সেখানে কবির চেতনা সদা সতর্ক থাকে

ও কাব্যের ভাবনারূপ-প্রকরণ মিলিয়ে নেয় কাব্যের সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে। এ কাব্যে কোনো শব্দ, কোনো ছন্দ, কোনো বাক্যবন্ধ, কোনো বাক্‌প্রতিমা শিথিল নয়, স্বতোৎসার নয় (যদিচ এহেন কাব্যেও, যেমন মিল্‌টনের প্যারাডাইস্‌ লস্‌ট্‌ নামক মহাকাব্যে, conscious intent এবং unconscious intent, অবহিত প্রয়াস ও সুপ্ত প্রয়াস, দুইয়ের পরস্পর-বিরোধিতা থাকতে পারে)। এ কাব্যে বাক্‌প্রতিমা সাবধানে নির্বাচিত হয়, নির্বাচিত হয় সাহিত্যজাতির—literary genre-এর—চরিত্রগত শৈল্পিক প্রয়োজনে। প্রত্যেক genre-এর, সাহিত্যজাতির, শৈল্পিক প্রয়োজন স্বতন্ত্র। শুধু কাব্যের কথাই ধরা যাক। লিরিক কাব্য, নাটকীয় লিরিক, মহাকাব্য, ব্যঙ্গকাব্য, কাহিনীকাব্য, তাত্ত্বিক কাব্য প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র চরিত্র প্রয়োজন, এই প্রয়োজন অনুসারে বাক্‌প্রতিমার ধরনও বদলায়। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', 'এবার ফিরাও মোরে', 'পুরস্কার', 'উৎসর্গ' (আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে), 'দুঃসময়', 'দেবতার গ্রাস', 'চঞ্চলা', 'শিশুতীর্থ', 'পৃথিবী', কবিতাগুলির বাক্‌প্রতিমা-প্রয়োগে সাহিত্য-জাতিগত প্রভেদ সুস্পষ্ট।

চার নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছি যে একটি দুটি ছত্রের অতিসীমিত আয়তনেও রবীন্দ্র-নাথের অনন্য বাক্‌প্রতিমাসৃষ্টি প্রকাশ পায়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, সব কয়টিই একই গ্রন্থ "পলাতকা" থেকে উদ্ধৃত :

১। তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে। ('মুক্তি')

২। ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ারঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো ('মুক্তি')

৩। এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি ('মায়ের সম্মান')

৪। যেখানে ওই শজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবারাতি। ('নিষ্কৃতি')

৫। মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণি-ধুলার মতো। ('মালা')

৬। তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি। ('মালা')

৭। আজ যত তার দস্যুপনা, যা কিছু হাঁকডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক। ('ভোলা')

৮। এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো। ('ছিন্নপত্র')

৯। ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনাকাজে নৌকাখানি ঠেকা। ('কালো মেয়ে')

১০। দুপুর বেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে। ('আসল')

উদাহরণ কয়টিতে দৃশ্যপ্রতিমার সংখ্যাই বেশি। ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯ সংখ্যক উদাহরণে স্বল্পায়তনে কয়েকটি স্বসম্পূর্ণ চিত্র পাচ্ছি, কবি যেন vignette আঁকছেন, যেন ছোট্ট একটি পাত্রের গায়ে মিনাকারি করছেন, যেন এক কল্পনাসমৃদ্ধ অঙ্গুলিচতুর চিত্রী দু-তিনটি রেখার আঁচড়ে একটা দৃশ্যের দ্যোতনা সঞ্চার করলেন। ২-সংখ্যক ছত্র কয়টিতে পাচ্ছি : অতল সমুদ্রে যেমন ডুবে যায় একটুখানি ফেনা, জন্মমৃত্যুর অকূল বিরাট মোহানায় তেমনি অনস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রিনীর অবরুদ্ধ গৃহকর্মচেতনা। ৩-সংখ্যক ছত্র দুটিতে বেঁচে থাকার দাবি নেমে গেল নিতান্ত তলায়, ক্রমে ক্রমে প্রতিটি ক্রম-অবনতি যেন ভাঁটার অবনয়ন। অতি সুন্দর চিত্র চতুর্থ উদ্ধৃতিতে, অতি সচরাচরিক দৃশ্য, আমাদের আশেপাশেই দেখা যায়, অবশ্য যদি আমাদের দেখার চোখ থাকে : সজনে গাছ থেকে রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়ছে বেড়ায় গায়ে, দৃশ্যবস্তু মাত্র এইটুকুই, কিন্তু কবির প্রতিমায় সে দৃশ্যে অনুভূতির প্রাণসঞ্চার হয়েছে, আমরা দেখছি ঝরে-যাওয়া ফুলগুলি, অনুভব করছি তারা যেন ফুলের অধিক, তারা যেন হাসি, তারা সজনে গাছ থেকে উচ্ছ্রিত হাসি, সে-হাসিরও বেশি তারা যেন যৌবনের প্রতীক বসন্তেরই হাসি, সে হাসির উচ্চকিত আঘাতে আজ আকাশ পাগল হয়েছে। আমি কল্পনা করতে পারি যে কোনো চিত্রী যদি এই ছত্র কয়টিকে চিত্রায়িত করতেন তাহলে কয়েকটি ঈষৎ বঙ্কিম ঊর্ধ্বমুখী রেখার টানে ফুলের হাসির প্রমত্ত গতিশীলতা প্রতীকিত করতেন। সপ্তম চিত্রে সূচিত হয়েছে গতিচাঞ্চল্যের আকস্মিক ক্ষান্তি। যে ছেলের দস্যুপনায় কবির রচনাকর্ম ব্যাহত হত, সে ছেলে আজ নেই; যে মৌচাকের চারপাশে নিয়ত গুঞ্জিত হত অনলস ঘূর্ণ্যমান মধুমক্ষিকার বাহিনী, আজ সেই মৌচাকটি পরিত্যক্ত—কবির চিত্রে বিগত গতিশীলতা ও সাম্প্রত গতিক্ষান্তি এক অদ্ভুত সংশ্লেষ বা juxtaposition লক্ষ্যণীয়। অপরপক্ষে ৫-সংখ্যক প্রতিমায় প্রচণ্ড গতিবোধ বিধৃত হয়েছে, এই প্রতিমার দ্রুত চংক্রমিত ধূলিঘূর্ণি হয়তো রেখাঙ্কিত হতে পারত অবনী ঠাকুরের তুলির বা পেন্সিলের টানে, সে হত এক অদ্ভুত বৃত্তপুঞ্জ। এই প্রতিমা কয়টির বিপরীতে পাচ্ছি ৬, ৮, ৯নং প্রতিমা, সে কয়টিতে বিধৃত হয়েছে গতিহীনতার ধারণা : তরুশ্রেণী হয়েছে ধ্যানস্তব্ধ; একফোঁটা অশ্রু লেপে আছে চোখের পাতায়; একটি নৌকা ঠেকে আছে শুকনো নদীর ঘাটে। কালি ও কলমের সূক্ষ্ম সংক্ষিপ্ত সংহত রেখা। দশম উদাহরণটিতে সমন্বিত হয়েছে চিত্র ও ধ্বনি, এবং সে সমন্বয়ে উজ্জ্বল হয়েছে বায়সকণ্ঠের তাৎপর্য চিন্তায়—"কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে।"

স্বল্পায়তন বাক্‌প্রতিমা কত মহৎ হতে পারে তার দু-চারটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক :

১। চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ('বলাকা' ৬)

২। সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী। ('বলাকা')

৩। বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা ('বলাকা')

৪। কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ('বলাকা' ৭)

৫। তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিল কঠিন বন্ধনে ('বলাকা' ৭)

৬। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ('বলাকা' ৩৬)

৭। ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধো জাগা নয়নের মতো। ('বলাকা' ৪১)

সব কয়টি উদাহরণই বলাকা থেকে নেওয়া। সেটা স্বাভাবিক কেননা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থেই বাক্‌প্রতিমার ঐশ্বর্য অনন্যতম। আমার কাব্যপাঠে 'বলাকা'র পরেই 'শেষ সপ্তক'-এর স্থান, বাক্‌প্রতিমার বিচারে। শেষ সপ্তক থেকে নিতান্ত এলোমেলোভাবে কয়েকটি স্মরণীয় প্রতিমা উদ্ধৃত করছি :

১। খালি হয়ে যায়
উপড়ে করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ। (একত্রিশ)

২। কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে। (একত্রিশ)

৩। খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর। (পঁয়ত্রিশ)

৪। সোনা মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে। (ছত্রিশ)

৫। রথে চড়ে চলেছে কাল। (তেতাল্লিশ)

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়েছে এসব বাক্‌প্রতিমা, সেসব অভিজ্ঞতায় কত গভীর জীবনবোধ এবং মূল্যবোধ, প্রতিটি প্রতিমায় বিধৃত হয়েছে আবেগান্বিত ইন্দ্রিয়-চেতনা। এমন বাক্‌প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ছড়িয়ে আছে অজস্র এবং তার মধ্য দিয়েই কবি তাঁর লিরিক অনুভূতি, মরমী ভাবনা, কাহিনীচেতনা, নিটোল প্রজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

## ৬

স্বল্পায়তন প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পনিপুণতা অপরিসীম কিন্তু তাঁর সৃজনী শক্তির মহত্ত্বের চূড়ান্ত পরিচয় পেতে হলে আমাদের যেতে হবে দীর্ঘতর ও বিস্তৃততর প্রতিমায়। ইংরেজি কাব্যশাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে বলি sublime, সেই মহৎ উত্তুঙ্গ কাব্য-শক্তির বিচ্ছুরণের জন্য বাক্‌সংযোজনার বিস্তৃতি আবশ্যক। স্বল্পায়তনে প্রতিমার উদ্বোধন সরলরেখ, সীমিত, একটিমাত্র সংবেদনায় সম্পূর্ণ। বিস্তৃত আয়তনে জটিল, গভীর, পরস্পর-সম্পৃক্ত বহু ভাব ও সংবেদনায় সমৃদ্ধ প্রতিমা—বিলম্বিত লয়ে চলা একটি দীর্ঘ প্রতিমা অথবা একাধিক গড়ানো প্রতিমার সংমিশ্রণ—কবির উদাত্ত সৃষ্টিক্রিয়ার পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক্-প্রতিমাগুলি জটিল ও গভীর।

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,

এই স্তব্ধতায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। ('স্তব্ধতা', "নৈবেদ্য")

এই আশ্চর্য বাক্‌প্রতিমার সম্মুখীন হয়ে চতুরতম কাব্যপাঠকেরও বিশ্লেষণশক্তি নতশির হয়ে যায়। কবির যে কল্পনা পরিব্যাপ্ত হয়েছে সর্ববিশ্বে, সর্বকালে, স্থান ও সময়ের মানবিক পরিধি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে নিত্যকালে এবং অনন্তলোকে, সে কল্পনা উদ্‌ভাসিত হয়েছে এক জটিল প্রতিমায় যেখানে ধ্বনিচেতনা, দৃশ্যচেতনা ও স্পর্শচেতনা নিটোলভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে। এখানে মহৎ ভাবের ও মহৎ ভাষার অপূর্ব সংযোজনা। আর একটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক:

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী॥
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর—
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার॥ ('বৈশাখ', "কল্পনা")

সমগ্র কবিতাটিতে একটিই মূল প্রতিমা—বৈশাখ যেন রুদ্রমূর্তি কোনো ভৈরব—কিন্তু সেই একটি প্রতিমা গড়ে তোলা হয়েছে কত যত্নে, কত সূক্ষ্ম অভিনিবেশে, কত বিভিন্ন সূত্রের সুনিপুণ সংযোজনায়! নিরলস তপস্যাশীর্ণ সন্ন্যাসী বসে আছেন পদ্মাসনে, তাঁর চোখ জ্বলজ্বলে, এ মুহূর্তে তিনি ঊর্ধ্বনেত্র, তিনি আসন পেতেছেন শ্মশানের লেলিহশিখ চিতার সম্মুখে, শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি জলহীন নদীর বালুশয্যা আর তারও ওপারে দেখা যায় শস্যহীন ফাটলধরা মাঠ। এমন চিত্ররচনা খুব কম চিত্রশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব, হয়তো নন্দলাল বসু, হয়তো ক্লোদ লোরেন্‌ তাঁদের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে এই বহুবর্ণরঞ্জিত বহুবস্তুপুঞ্জিত দীর্ঘায়িত রুদ্র চিত্র অঙ্কন করার শক্তিধারী ছিলেন কিন্তু ক্লোদ লোরেন্‌ও পারতেন না কেননা তিনি এ দৃশ্য দেখেননি। এমন চিত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব, কিন্তু তা-ও আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে যে-রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জলসিক্ত জলপ্লাবিত ঘনশ্যাম নদীতটে বাস করতেন, যিনি 'সোনারতরী' রচনা করেছিলেন, তিনি পারতেন না এই রুদ্রভৈরব বৈশাখের মূর্তি গড়তে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিতে সম-সময়েই চিত্রী ও ভাস্কর। এ অন্য রবীন্দ্রনাথ যিনি তন্দ্র-অধ্যুষিত রৌদ্রকর-দীর্ণ বীরভূমকে জানতেন। কাব্যের যত্নবান পাঠক দেখে থাকবেন রবীন্দ্রকাব্যের বাক্‌-প্রতিমা প্রায় সময়ই বাস্তব পৃথিবীর অসংখ্য বিচিত্র বস্তুর উল্লেখে ও সমাবেশে গড়ে উঠেছে। এই বস্তুময়তার বিষয় আমরা যেন কখনো না ভুলি, কেননা বাক্‌-প্রতিমা রচিত হয়, বাক্‌-প্রতিমার আকৃতি সঞ্চালিত হয় (যেমন আমি উপরে দ্বিতীয় অনুধ্যায়ে আলোচনা

করেছি), ইন্দ্রিয়-চেতনাসম্বন্ধ অভিজ্ঞতার নির্ভরে, এবং যে কোন মানবিক ইন্দ্রিয়চেতনার ভিত্তি হচ্ছে বস্তুময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রকৃতিবর্ণনা ও বাক্-প্রতিমার ধরন বদলেছে তাঁর পরিবেশের পরিবর্তনের সমতালে, এ-বিষয়টি রবীন্দ্র-পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য অভিজ্ঞতা।

সেই বস্তুময়তার অভিঘাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে রুদ্রভৈরব বৈশাখের এই নির্মম সর্ব-বিধ্বংসী ভয়াল মূর্তি রচনা, সে-মূর্তির সম্মুখে আমরা শিউরে উঠি। কিন্তু শিউরে যে উঠি তার কারণ তো কেবল এই নয় যে এ মূর্তি ভারি রিয়ালিস্টিক। রিয়ালিস্টিক নিশ্চয়, এই চিত্রের প্রচণ্ড বস্তুময়তার উল্লেখ করেছি, কিন্তু বস্তু-পরিবেশের সঙ্গে ভাব-মণ্ডল সংযুক্ত না হলে শিল্পায়িত কল্পনার পূর্ণ সিদ্ধি সম্ভব হয় না। এই মহৎ বাক্-প্রতিমাটিতে রবীন্দ্রনাথ বস্তু ও ভাবের মিলন সাধন করেছেন, তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিমা যতটা বস্তুময় ততটাই বস্তু-উত্তীর্ণ। 'বৈশাখ' কবিতাটির বস্তুময়তার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, একথা উপরে বলেছি। অন্য দুই ধরনের বস্তুধর্মী বাক্-প্রতিমা দেখা যাক :

সুদুর্গম দূরদেশ—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নির্দয়। ('বসুন্ধরা', "সোনার তরী")

এই ছত্র কয়টিতে এক আশ্চর্য চিত্র বর্ণিত হয়েছে, এমন চিত্র যাতে পাঠকের স্পর্শচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় দৃশ্যচেতনার সঙ্গে সমভাবে: কবি যখন বলছেন, চোখে সূঁচ বেঁধে, বসুন্ধরা যেন জ্বরাতুরা, তপ্তদেহে লুটে পড়েছে বসুন্ধরা, তার শ্বাস উষ্ণ; জ্বালাময়, তার কণ্ঠ শুষ্ক, তখন প্রতিটি বর্ণনায় আমাদের ত্বগেন্দ্রিয়-অনুভূতি উজ্জীবিত হয়। অথচ, রবীন্দ্রনাথ (অন্তত এই কবিতার রচনাকাল অবধি) মরুভূমি দেখেছিলেন বলে আমি জানিনে। (বড়-জোর বিলেতে যাতায়াত কালে জাহাজে লোহিত সাগর বেয়ে চলার সময় নিশ্চিন্ত দূরত্ব থেকে আরবের সুদূর মরুভূমি অবলোকন হয়তো করেছিলেন।)। এই ছত্র কয়টির বাক্-প্রতিমাও পাঠকচিত্তে ভাবসম্বন্ধ বস্তুচেতনা এনে দেয় কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বস্তুজ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, বরং পুস্তকাশ্রিত অথবা শ্রুতিনির্ভর।

'বৈশাখ' কবিতার বাক্-প্রতিমায় বস্তুচেতনা প্রত্যক্ষ, 'বসুন্ধরা' কবিতায় পরোক্ষ, কিন্তু উভয় কবিতারই বাক্-প্রতিমায় বিশেষ স্থান ও দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। স্থানবর্ণী অন্য এক শ্রেণীর বাক-প্রতিমা রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় যাতে চিত্রলতা ঐশ্বর্যময় কিন্তু সেই চিত্রের কোনো বিশেষ অবস্থান বা locale পাওয়া যায় না। এহেন চিত্র-প্রতিমার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই 'পৃথিবী' নামক কবিতায়।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

একদিকে আপক্ক ধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
আমি আনন্দিত।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

এখানে ছত্রে ছত্রে বাক্-প্রতিমার বিষয় বদলাচ্ছে কেননা কবি কোনো একটিমাত্র বিশেষ স্থানের বা দৃশ্যের বর্ণনা করছেন না, যে কোনো বর্ণিত স্থান পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলেই দৃষ্টিসাধ্য। কবির কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর ভাবনায়, কোন বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল দ্বারা নয়। এখানে বর্ণনার মহত্ত্ব বহুর সমন্বয়ে বাক্-সংযোজনার ট্যাপেস্ট্রি-শিল্পে।

৭

ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেইক বড়ো সুন্দর একটি স্তবক লিখেছিলেন:

To see the world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower;
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

সেই বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের সুযোগ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম বাক্-প্রতিমাগুলিতে। সে-সব বাক্-প্রতিমা এ-প্রবন্ধে একত্র করার মানে হয় না, শুধুই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হবে, সে-সব প্রতিমার এক পঞ্জীকৃত গ্রন্থ-নির্দেশিকা প্রস্তুত করাও নিরর্থক কেননা আমি গবেষণা সংক্রান্ত প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত নির্মাণের অভিলাষী নই, এ-প্রবন্ধে এ তাবৎ আমি আলোচনা করেছি বাক্-প্রতিমার সাধারণ গুণাবলী এবং ৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বাক্-প্রতিমার যে বিশ্লেষণ করেছি তা থেকে রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক বুঝতে পারবেন মহৎ বাক্-প্রতিমার প্রকৃতি কতটা বহুগুণসম্ভব, কত গভীর, কত বিস্তীর্ণ, কত নিত্যদ্যোতনাসমৃদ্ধ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক্-প্রতিমার কোন সর্বদৃষ্টান্তসম্মত সংজ্ঞা নেই, একটিমাত্র অনড় শিল্পকরণ দ্বারা যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বাক্-প্রতিমা রচিত হয় না। বস্তুত মহৎ কাব্য চিরকালই অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অভূতপূর্ব, মহৎ কাব্যের এই অদ্বৈতবাদী ধর্ম মহৎ বাক্-প্রতিমায়ও বর্তায়। প্রতিটি মহৎ কাব্য এমন একটি আশ্চর্য নূতন সৃষ্টি যার প্রতিরূপ 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। মহৎ বাক্-প্রতিমার দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।
অসাধ্যের সাধনায় ছুটে যাবে বলে
দুর্গমেরে দ্রুত পায়ে দলে
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী,
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি।
ও যেন রে যুগান্তের কালো অগ্নিশিখা,

কালো কুজ্ঝটিকা। ('কালোঘোড়া', "বিচিত্রিতা")

অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রির ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
* * *
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো। ('শিশুতীর্থ', "পুনশ্চ")

বিভীষিকার, দুঃস্বপ্নের, অমঙ্গলের এমন অবিস্মরণীয় বাক্‌-প্রতিমা বাংলা কাব্যে অন্যত্র নেই (অন্য ভাষার কাব্যেও আছে বলেও আমি জানিনে)। ইদানীং রবীন্দ্রকাব্যে মঙ্গল-অমঙ্গল বোধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বোদলেয়ারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনার আয়োজন হয়েছে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে ভয়াল মূর্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে এই ভয় (আধুনিক মনোবিশ্লেষণবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে) চিত্রীর নিজ চিত্তের অবদমিত কামনার ও ভাবনার বহিশ্চরণ মাত্র, কিন্তু বিদ্বজ্জন তেমন লক্ষ্য করেননি যে চিত্রাবলীতে ও কাব্যে একই বিভীষিকা-জগৎ বিদ্যমান (অতএব শিল্পৈষণা হিসাবে—শিল্পকর্ম হিসাবে নয় —রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প ও কাব্যশিল্পে তারতম্য করা অসমীচীন) এবং উপরের প্রথম উদ্ধৃতি থেকে (এরকম আরো অনেক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা আদৌ কঠিন নয়) নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিধৃত বিভীষিকা কোনো অ্যাবনর্মাল সাইকলজির বিবরাশ্রিত বিসর্পিল ভঙ্গী নয়, শুধু হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর জমাট বিপন্নতা, যাকে তিনি বলেছিলেন crisis in civilization।

বস্তুত অজস্র বাক্‌-প্রতিমায় এই কথারই প্রমাণ পাই যে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বচ্ছন্দতম গতি নয় ডস্টইয়েভ্‌স্‌কি-বর্ণিত বঙ্কিম বিবরে, বরং তার স্বতঃস্ফূর্ত বেগের পথ সূর্যের পানে। তাঁর শেষ কাব্যে বারংবার মন্দ্রিত হয়েছে পূষণের স্তব: হে সূর্য, অপাবৃত করো তোমার আলোক-আবরণ, তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে আমি দেখব আপনার আত্মার স্বরূপ। মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

পক্ষে বহিয়া অসীম কালের বার্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা
কালের রাত্রি ভেদি
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি
পথে পথে রচি আলিম্পনের লেখা।
পাখার কাঁপনে গগনে গগনে
উজ্জ্বলি উঠে দিক্‌-প্রাঙ্গণে
অগ্নিচক্ররেখা। ('বাণী', "রবীন্দ্ররচনাবলী", ৩)

এই নিয়ত-উৎপাতিষ্ণু প্রমত্ত বেগবান প্রতিভারই পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বাক্-প্রতিমাগুলিতে। বস্তুময়তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, কোনো কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মতো (তথা বাক্-প্রতিমার মতো) এমন সূক্ষ্মচেতন সম্বোধ নেই, কিন্তু এ-ও লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কদাচ বস্তুময়তার স্থূলে জড়রূপে আবন্ধ থাকেনি, বরঞ্চ নিয়ত বস্তুকে উচ্চালিত করেছে পরাবস্তুর পানে। তিনটি উদাহরণ :

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্যে নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে"।

এর চেয়ে মহত্তের বাক্-প্রতিমা কি সম্ভব? এর চেয়ে উদাত্ততর প্রতিভাসিদ্ধি আমরা আর দেখব? লক্ষ্য করি যে কয়েক ছত্র পূর্বে 'বাণী' কবিতার যে কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করেছি সেখানে এবং এখানে প্রতিমার ভাবোৎসার ভিন্ন, কিন্তু দুই উদ্ধৃতিতেই একই পাখি-প্রতিমা (পাখি—বাণীসাযুজ্যের প্রতিমা) প্রযুক্ত হয়েছে। কবিচিত্ত উর্ধ্বে ধাবিত হয়েছে নির্ভীক সুপর্ণের মতো যেখানে আলো-অন্ধকারের ওপারে বিরাজ করেন সর্ববরেণ্য সবিতা, যিনি হিরণ্যপাণি, সপ্তাশ্বযোজিত রথী বিবস্বান। রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ পাখি-প্রতিমাতেই সম্ভবত উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন:

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরও নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরও বড় বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কি এক গভীর সুসময়।

রবীন্দ্র-কল্পনার উত্তুঙ্গ উর্ধ্বায়নের প্রতীকে ভাস্বর আরো দুটি প্রতিমা:

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি:
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।
মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,

অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথী। ("বলাকা", ১৬)

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে:
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে:
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো। ("বলাকা", ৮)

আমার শেষ তিনটি উদাহরণই "বলাকা" থেকে নেওয়া, না নিয়ে উপায় নেই কেননা (অন্য কাব্যপাঠকের ধারণা কেমন জানিনে) আমার চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের (তথা বাংলা কাব্যের) মহত্তম বাক্‌-প্রতিমা "বলাকা"তেই সবচেয়ে অধিকসংখ্যক, তার পরেই "শেষ সপ্তকে"। এসব বাক্‌-প্রতিমার সম্মুখীন হয়ে বিশ্লেষণ-বিচারে প্রবৃত্ত হবেন কোন্ সমালোচক? সমালোচনার শক্তি সীমিত। সৎ সমালোচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সম্বোধি, এহেন বাক্‌-প্রতিমার সম্মুখে সমালোচনা রূপান্তরিত হয় সম্বোধিতে, সম্বোধির তুরীয়মণ্ডলে। কবি-কল্পনা আর আবদ্ধ নেই জড় পৃথিবীর ব্যাহত বস্তুপুঞ্জে, বস্তুপুঞ্জই যেন রূপায়িত হচ্ছে অবস্তুতে আর সেই মহতী রূপায়ণের অবর্ণনীয় সংঘাতে একটা বিপুল অট্টহাস্য, একটা বজ্রমন্দ্রিত সার্বিক ক্রন্দন, অথবা কখনো একটা অনতিস্ফুট তীক্ষ্ণ আর্ত বেদনাধ্বনি ছড়িয়ে যায় চরাচরে কিন্তু সেই হাস্য-ক্রন্দন অবরুদ্ধ ধ্বনির কোনো বহিশ্চর্যা নেই, নেই কোন সার-ময় সত্তা. সে-সব ধ্বনি শোনা যায় না স্থূল শ্রবণেন্দ্রিয়ে, সে দৃশ্য দেখা যায় না স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ে, সে শিহরণ অনুভূত হয় না দেহজ ত্বগেন্দ্রিয়ে, শোনা যায় দেখা যায় স্পর্শ করা যায় দেহাতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতনায়। বস্তু ও অবস্তুর সমন্বয়ে, অধরাকে ধরার শক্তিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার পরম প্রকাশ, সেই শক্তি তাঁর শ্রেষ্ঠ বাক্‌-প্রতিমায় প্রতিভাত।

# রূপান্তর চাই

রাম বসু

রূপান্তর চাই

চায়
অণু, পরমাণু, চায় দৃশ্য ও অদৃশ্য
কুঁড়ি থেকে ঘ্রাণ
ঘ্রাণ থেকে বীজ
মর্মরিত আশা
পিঠের বাঁকানো ধনুকে, ঘামে ও রোদে
সঞ্চারিত দগ্ধ চোখে শ্রাবণের মেঘে
রূপে, রূপান্তরে।

ঘৃণার বংশের শেষে
আসে প্রেম, পরম্পরা, স্নিগ্ধ সুকুমার।

জাতীয় সড়ক ধরে একটি স্ফুলিঙ্গ হেঁটে যায়
দিগন্তের দিকে একমনে
যেখানে ধীমান বৃক্ষ হুমড়ি খেয়ে স্থির ও উদগ্রীব
নিষিদ্ধ সভায় যেন
যেন শিক্ষিত গেরিলা
মাটিতে বিছিয়ে ম্যাপ লক্ষ্য ধ্রুব করে
হাতে তার অব্যর্থ গ্রানেড।

আমরাও আবিষ্কার করি আমাদের
সমুদ্রের তীক্ষ্ণধার নগ্নতায়
সবিতা-ফলের বৃন্তে
নুনে ও গোলাপে
আবিষ্কার করি মাটির দর্পণে।

দুই কাঁধে হাত রাখে সহৃদয় শাখা
দরাজ হাসির ঢেউ চূর্ণ করে ভয়ের প্রাসাদ
ছাই আর জং-ধরা দেশে।
আমরা দখল করি আলোর নির্জন

গুণীর কৌশলী হাতে অকস্মাৎ সুরের মোচড়ে
হয়ে উঠি একটি, অমোঘ
দর্পিত মানুষ
সময়ের সুমেরুশিখরে স্থির
যে মানুষ
চিরকাল অসমাপ্ত মহাকাব্য, চিরকাল স্বপ্ন, শ্রম, রূপ

চাই সেই রূপান্তর
নিমেষের জন্যে হয় হোক।

# ফেরা

**কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত**

মনে পড়ছে নেশার ঘোরে গিয়েছিলাম ভিনগাঁয়ে একবার
সেইখানে এক পোড়ো বাড়ির কাছে যেতেই শুনি হঠাৎ
এখন থেকে এখানে ঘোর অমাবস্যা নিরন্ত রাত,
রৌদ্র গোঙায়, দিনদুপুরে ভৌতিক এক অন্ধকার।

ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলাম, স্বপ্ন ইচ্ছা তোমরা কোথায়?
প্রাণপণে ডাক দিলাম তবু কেউ এলো না, ধ্বনি হারায়
প্রতিধ্বনির জন্য পারে
অন্ধকারে।

ছুটতে ছুটতে চলে এলাম, কাটল নেশা, বাড়ির কাছে
চলে এলাম, পুরনো সেই বাগান তেমনি নতুন আছে,
রোদের স্বরোদ বাজে তেমনি ভোরের সবুজ শিশির ঘাসে
ফুলের গন্ধ কত্থক নীল রেশমি হাওয়ার অনুপ্রাসে।

আরশিনগর বসত আমার, বাড়ি আসার পথও সোজা,
আপনি সহজ হলে পরে
মেলে সে পথ রৌদ্রে-ঝড়ে,
চিরদিনের আলেক মানুষ খোলেন আলোর মুল দরোজা॥

# কোথায় পালাবে

## শান্তি লাহিড়ী

এমন সহজে কি ক'রে পালাবে তুমি?
স্নায়ুতে শিরাতে বাসা বেঁধেছো বলে কি
আমার নিশ্বাস থেকে অনায়াসে আত্মরক্ষা ভেবেছ সহজ?
কতদূরে যেতে পার? কতদূরে যেতে পারা যায়?
ভেবেছ বুকের কাছে থেকে বুকের গভীরে থাকা যায়?
দূরে চলে গেলে সেই দূরের গোপনে বাঁধা উজ্জ্বল সড়কে
ঝড়ের মতন জীপ ছুটে যায়—কে আছ কোথায়?
কত দূরে যেতে পারা যায়?

কে আছ কোথায়—সেই ডাকবাংলোর
খাঁ-খাঁ শূন্য—বাইরে বৃষ্টি—কাচের জানালা
তোমার শাড়ির প্রান্তে লেগে থাকে।
আচমকা সন্ধ্যার সিঁড়ি বেয়ে আসে একে একে
সপ্তর্ষির সবক'টি তারা

শিরায় শিরায় তুমি আছ, তুমি আছ—আমি স্থির জানি
রক্তের আলোয় নীল শিরা ফুলে ওঠে—যেন জোয়ারে বালাম..
কোথায় পালাবে তুমি,
তোমাকে পাহারা দেবে কুল-পরিচয়হীন একা সত্যকাম।

# ঘরের বিষয় ঘর

ফণিভূষণ আচার্য

ঘরের বিষয় ঘর নীলাভে ঈথারে প্রতিষ্ঠিত
দৃশ্যত প্রাসাদোপম
স্বেচ্ছাচারী তুই তার ধর্ষিত গোলাপ
নিরীহ শব্দের বুকে পদতল সহজ বিকৃতি
এবং মুদ্রার হাটে নিষিদ্ধ ফুলের মাংস
বেনামী দোকান

তোমার দ্বিতীয় স্বর প্রসারিত নীলে ও সবুজে
করকোষ্ঠী চিরে চিরে প্রসারিত জাতীয় সড়ক
শহরের স্মরণীয় মাতালের বিষয়ের কাছে
অনেক বিখ্যাত ছায়া চরিত্রহননে দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়

অনেক তরুণ শব্দ ব্যবহৃত ব্যর্থ কবিতায় নষ্ট হয়ে যায়
ধূসর শহরে দাঙ্গা গার্হস্থ্য ভূগোল থেকে অরণ্য পদবী
রুপোর কৌটোয় থাক ঈথার থাকে না করতলে
চিরকাল কবিতায় বৈকালিক চালাকি অচল

অবশ্য শোবার ঘরে রাখিস সন্তুষ্ট বট
এবং গোড়ায় বাসিজল
ছায়ার প্রাসাদ দ্যাখ ঘরের বিষয় ঘর
দৃশ্যত প্রাসাদোপম
বাহিরে ব্যাখ্যায়
নিমগ্ন দেবদারু পুড়ছে উন্নাসিক সিংহের জলন্ত কেশরে

# সেই এক রাজার নন্দন

দিব্যেন্দু পালিত

সেই এক রাজার নন্দন
বৃক্ষ ফুল রাখে পরিপাটি।
ছিন্নবাস ফেলে দিয়ে দূরে,
চৈত্রে কিংবা শীতের দুপুরে
নির্দ্বিধায় জড়ো করে মাটি—
ভয় নেই, দুয়ারে শমন।

তারই মুখে শুনি রাজনীতি—
স্বাস্থ্যের দ্যোতক; শুনি গান।
মাদুর বিছিয়ে জ্যোৎস্নায়
তারই চোখ সম্বিৎ ছড়ায়।
বান রুখে, সেই বোনে ধান;
মাঠে বাটে ছড়ায় প্রতীতি।

# বাঁচাকাহিনী

**মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

এমন বিপন্ন দিন জাহাজডোবার কালে ইঁদুরও দ্যাখেনি।
ভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে ভেসে যায় স্তুতি ও বিলাপ:
কে বাঁচে, কে সাড়া দেয়, কোথায় আশ্রয়, কোন্‌খানে?
সময়—প্রাচীন ঢেউ—যখন উল্লাসে দেয় লাফ!

এমন বিপন্ন ভাষা কোনো তরঙ্গেই বুঝি বলেনি বাদুড়।
কে শোনে, কে সাড়া দেয়, ঠিক নেই। উত্তর মেলে না।
অন্বয় বিরুদ্ধে যায়; শব্দ থেকে অর্থ খ'শে পড়ে-
জলের লাফের মধ্যে ভেসে যায় ছেলেদের সমস্ত খেলেনা।

এমন বিপন্ন বোধ বস্তুকে ছেড়েনি কোনোদিনও।
খ'শে পড়ে বাস্তবতা; ছবি থেকে ঝ'রে যায় রেখা
যখন শরীর থেকে অন্যদূরে ছুটে যায় ছায়া—
কে আছো, কে বেঁচে আছো?—আজও নেই আপনার দেখা!

# দিনশেষে, তোমার জীর্ণবাড়ি

মৃণাল দত্ত

দিনশেষে
তোমার জীর্ণ বাড়িটার চারপাশে একবার
ঘুরে আসি।
ঠোঁটে আঙুল রেখে স্থির হয়ে আছে নির্জনতা
ছবির মতো সমস্ত বাড়িটা অনড়,
পলকহীন শার্সি, জানালা
এবং যাবতীয় গথিক শিল্প, গম্বুজ।
কেউ নেই,
নিঃসঙ্গ অলিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে ভগ্ন, হিমশীতল।
কিছু আগে, কেউ কি হেঁটে গিয়েছিল?
ঝাউ আর সারিবন্ধ দেবদারুর ভিতর দিয়ে
লাল রুক্ষ পথ পড়ে থাকে আপন খেয়ালে।

দিনশেষে, একবার
তবুও তোমার জীর্ণ বাড়িটার চারপাশে ঘুরে আসি।
শেষবারের মতো পড়ন্ত আলো
তোমার নিভৃত কক্ষের কাছে এসে দীর্ঘশ্বাসের মতো
দিগন্তে হারিয়ে যায়।
পাঁচিলঘেরা নিঃসঙ্গ তোমার বাগান
হলুদ বিবর্ণতায় করুণ হয়ে ওঠে রক্তকরবী ফুলগুলি
নিঃশব্দ সঙ্গীতের মতো স্থির দুঃখের রাগিণী ক্রমাগত বেজে যায়
বুকের ভিতর।

# টমি-কে

**মালিনী ভট্টাচার্য**

ঘরের কোণে গোপন ফিসফিস
সয় না ব'লে ডুকরে তুমি ওঠো,
রাত্রে ওঠে গন্ধ কীদৃশ
এদিক থেকে ওদিকে তাই ছোটো।
আমাকে যদি এতই ভালবাসা
ঘুমের থেকে নাড়িয়ে রোজ জানাও
তাহ'লে কেন মনুষ্যের ভাষা,
খেঁকিয়ে বলো, কখনও শিখবে না?
জানো না তুমি আরিস্টটলের
স্বভাব মানে নিরেট অভ্যাস?
কর্মকেই ভরততনয়ের
ধর্ম বলেছেন বেদব্যাস?
দেখোনি কণারকের নরনারী
কী চাতুরীতে লতায় পরিণত,
চর্যাপদে অক্ষরের সারি
শূন্যযানে পদ্মাসনরত?
এমনই ভাষা প্রখর। হে সরমা,
অথচ ঘুরে জানাও সন্দেহ!
চাতুর্যের তুমিও তো উপমা:
একদেহের মধ্যে আর দেহ
পোষণ করো। দিনের বড়ো ফাঁক
ভরে না তাও, খুঁজে বেড়াও খাবার,
ক্কচিৎ এসে নাভিতে ঘষো নাক,
নিজেরই কোলে ঢুকে ঘুমাও আবার।
এবং কাটে জেগেই শুধু রাত
কেবলই চোখ জানালা জুড়ে রাখা,
ভাষা-শেখা তো আমার অজুহাত—
অভাব থেকে নিয়ত দূরে-থাকা,
শূন্য দাঁড়ে নিরেট অভ্যাস।
শুধাও যদি, মৃত্যু কীরকম?
—যখুনি উবে যায় তলানি শ্বাস
নাভির থেকে টানতে গিয়ে দম।
রাত্রে তার সামনে বড়ো যাই,

অমনি তুমি খেঁকিয়ে ওঠো ঘুরে :
খুনের দায়ে কেউ হবে না দায়ী
সতেরতলা এ দরদস্তুরে !
কারণ হাতে সবাই রাখে তাস—
বোমারু প্লেন, দালাল, ছাপাখানা,
মন্ত্রিকুল; সব হবে না নাশ,
বৈঠকেও শান্তি যাবে আনা।
দাঁড়াবে ইতিহাসের দপ্তরে
কুশপুতুলি দুঃশাসন কেহ;
কিন্তু দেখি স্ত্রীপর্বের পরে
তবুও কিছু রয়েছে সন্দেহ।
বুঝেছ যেন, ইন্দ্র আর কারো
সামনে থেমে দেবে না রথে ডাক।
তাই কি চোখে তাকিয়ে লেজ নাড়ো?
তাই কি এসে নাভিতে ঘষো নাক?

# অক্ষদণ্ড

## মতি নন্দী

অমিত সবে ঘুম থেকে উঠেছে। ঘুমের রেশ কাটাতে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকার ইচ্ছে। এই ইচ্ছার শুরুতেই তার মনে পড়ল, আজ টিউশনিতে যেতে হবে না। তারপর বগলের ফাঁক দিয়ে জানলার শিকগুলোর মাঝ দিয়ে আকাশ দেখল। কোদালে মেঘ। কদিন ধরে আকাশটা নকল বর্ষার অভিনয় করছে। কোদালে মেঘ শব্দটা মনে পড়তেই তার মনে পড়ল রূপনারায়ণ নদী। অনেকদিন আগে কলেজ থেকে বীরেনের দেশের বাড়িতে তারা বেড়াতে গেছল। রূপনারায়ণের ধারে দাঁড়িয়ে কল্পনা বলেছিল আকাশে কেমন কোদালে মেঘ, ঠিক যেন মেঘটাকে কেউ কুপিয়েছে, আর তখনই কে যেন, কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, নদী কিসের প্রতীক?

—উল্লুক।

বিন্তি পা মাড়িয়ে ফেলেছে। বিন্তির কোন দোষ নেই। পানের ডাবরটাকে পেতে হলে অমিতকে ডিঙোতেই হয়। ও শিখেছে ঘুমন্ত মানুষকে ডিঙোতে নেই। তাই সাবধানে দেওয়াল ঘেঁষে যেতে গিয়ে পা মাড়িয়েছে। ওকে পান সাজতে দেখে অমিত বুঝল বাড়িতে সকালের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কেননা, চা খেয়ে পান খেয়ে গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরি যাবে খবরের কাগজ পড়তে। পান সেজে এবারও বিন্তি অমিতকে ডিঙিয়ে গেল। ডিঙোবার সময় ও নিশ্চয়ই চোখ বুজেছিল। অর্থাৎ দেখতে না পেয়েই যেন ডিঙিয়ে গেল। অজান্তে কোন দোষ হয় না। এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিতের মান্তুর কথাটা মনে পড়ল।—বড়দা আমার কি কোন দোষ হয়েছে?

দোষ নিশ্চয়ই ওর হয়েছিল। গৌরীশঙ্করের জুতোর শব্দ শুনতে শুনতে অমিত নিজের বোনের কথা ভাবতে শুরু করল। বখাটে ছোকরাকে ভালোবাসা নিশ্চয়ই দোষের। চিঠিসমেত এক সন্ধ্যায় মান্তু ধরা পড়ে গেল। রাত্রে গৌরীশঙ্কর তার সতেরো বছরের মেয়েকে গরুপেটা করল। ঊষাবতী দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল, পাছে ছেলেরা শাসনে কেউ বাধা দেয়। পরদিন মান্তু জিজ্ঞেস করেছিল তার কোন দোষ হয়েছে কিনা একটি ছেলেকে ভালোবাসায়। ভালোবাসা কেমন করে মনের মধ্যে জন্মায় তা কি কেউ বলতে পারে, জানতে পারে। অমিত সেদিন বলেছিল ভালোবাসাটা অন্যায় নয় তবে, নিদেনপক্ষে ইউ-ডি কেরানীও যদি হত। তার পরদিন থেকেই মান্তুর জন্য পাত্র খোঁজা শুরু হয়েছে। আজও খোঁজা হচ্ছে। মান্তু এখন জানলার ধারে পর্যন্ত যায় না।

নীচে একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। এই সময়ে রোজই হয়। ধাঙড় এসেছে। বারো আনা মাইনের ধাঙড়কে দিয়ে নর্দমা কলঘর এবং উঠোন সাফ করাতে ঊষাবতীকে রোজ সকালে এই পরিশ্রমটুকুকে স্বীকার করতে হয়। বালিশে মুখ গুঁজে অমিত ঊষাবতীর জল টানার, তারপর ময়লার গাড়িটার শব্দ শুনলো। হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করল অমিত। মান্তু ঘরে এসেছে। বিছানা তুলে ঘর পরিষ্কার করা ওর কাজ। অস্বস্তি ব্যাপারটা অমিতের কাছে নতুন নয়। কল্পনার কাকা যখন বলেছিলেন, এবার তো এম-এ পড়বে কিংবা বহুদূর-সম্পর্ক মেসোমশাই সার্টিফিকেট লিখতে লিখতে বলেছিলেন চাকরি করাটা আমি পছন্দ করি না,

তার চেয়ে ব্যাবসা কর।

তখনকার অস্বস্তির সঙ্গে এখনকার অস্বস্তি এক নয়। কেন নয় সেটা বোঝার চেষ্টা না করে মান্তুর জন্য বিছানা ছেড়ে দিল অমিত। বরাবরই এই নিয়ম, ধাঙড় চলে যাবার পর অমিত প্রথম কলঘরে যায়। আজ অরুণ গেছে। কাল থেকে ওর শরীর খারাপ। চা আনল বিন্তি। মুখে দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল অমিত।

—ডেকে চা দিতে পারিস না, দুবার গরম করা চা কি মুখে দেওয়া যায়?

বিন্তির মুখে তর্কের ইচ্ছা জমাট হয়ে উঠল। কিন্তু ভাঙল না। লক্ষ্য করল অমিত। যে কোন ছুতোয় ওর গালে একটা চড় কষাবার ইচ্ছা জাগল। রান্নাঘর থেকে বিন্তির গলা আসছে, অমিত সেখানে হাজির হল। বিন্তি চুপ করে গেল। ঊষাবতী বলল, অরুণ আজ বাজারে যেতে পারবে না। বছর দুই আগে অমিতই বাজার করত। এখন লায়েক হয়েছে। কলেজে ঢুকলেই কিছু হাতখরচ লাগে। অরুণ প্রথম দু-চারদিন শুধু আপত্তি তুলেছিল। বাজার না করাটা অমিতের দু-বছরের অভ্যাস। বিন্তি যখন ফর্দ লিখছিল, তখন অমিতের জামাকাপড় পরা শেষ হয়েছে। সেই সময়ই সদর দরজা খোলার শব্দ হল। জুতোর শব্দে বোঝা গেল গৌরীশঙ্কর। ঘরের কাছে তার গলা, জোরে বলল, টুকে আনলুম, আজকেই যেন অ্যাপ্লাই করে দেয়। মফঃস্বলে, তা হোক। শুধু টিউশনির থেকে ইস্কুলে ঢুকে পড়া ভালো।

জামার বোতাম লাগিয়ে তখুনি অমিত বাজার রওনা হল। পথে পড়ে রাজলক্ষ্মী লন্ড্রি।

অমিতের মনে পড়ল জামার কথা। ধোপারা মজুরি বাড়াবার দাবি তুলে কাপড় আটকেছে। আজ যদি জামাটা না পাওয়া যায় মালিকের সাথে ভীষণ ঝগড়া হয়ে যাবে। বাজার যাবার পথটুকু কাল্পনিক ঝগড়ার বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল অমিত।

ট্রামস্টপে ফোঁটা ফোঁটা মানুষ জমে আর ট্রামগুলো এসে মুছে দিয়ে যায়। ট্রামের দরকার নেই অমিতের। ইলেকট্রিক পোস্টের ছায়ায় শুধু মাথাটা বাঁচিয়ে সরকারী বাসের কর্তাদের জন্য খানকয়েক চার্জশীট সে তৈরি করে ফেলল। তবুও বাসের পাত্তা নেই। বিরক্ত হয়ে হাঁটা শুরু করল। দুটো মাত্র স্টপ। দুটো স্টপ পার হতেই বাস এল। উঠে পড়ল অমিত।

সিকিটা দিয়েছিল বোধহয় গুড়ওলা। উল্টেপাল্টে অমিত দেখল। কন্ডাক্টারের মুখও দেখল। যেন মুচকে হাসল, তার সঙ্গে সঙ্গে তার রগ টিপটিপ করে উঠল। বাজার সেরে ফেরার পথে মনে পড়ে ভেলিগুড় নেবার কথা। তাড়াহুড়োর মধ্যে গুড়ওলা সিকিটা গছিয়েছে। কন্ডাক্টরকে তো সে কথা বলা যাবে না।

চারটে স্টপ মাত্র বাকি ছিল, দরজার কাছে দাঁড়ালে, ভিতরের ভাড়া চাওয়া শেষ করে কন্ডাক্টার আসতে আসতেই টুপ করে নেমে যাওয়া যেত। এক স্টপ আগেও নামা যেত। তাহলে দশ পয়সা বাঁচত। কটা মাত্র স্টপের জন্য পয়সা দিতে হল বলে অমিত রাগল। আর রাগল বলেই দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে নামবার সময় ইচ্ছে করে ধাক্কা দিল।

—কানা, নাকি দেখতে পারেন না?

—উল্লুক।

বাস ছেড়ে দিয়েছে। জবাবে লোকটা কী বলল তা শোনা দরকার মনে করল না।

অমিত। ঝাঁঝালো হাওয়া বইছে। জোরে হেঁটে সে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। গলিটা তাদের গলির মতই। সেই ডাস্টবিন আছে, জানলার শিকে গরু বাঁধা আছে, রকে বাঘবন্দীর ছক কাটা আছে, রাস্তায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রির খোঁড়া ঢিপি আছে। তাছাড়া কর্পোরেশনের নিষ্কর্মা টিউবওয়েল আছে। বটের শিকড় জড়ানো বৃষ্টিজলের পাইপ আছে। বাড়তির মধ্যে শুধু মাঠকোঠার সামনের ঘরে তেলেভাজা দোকানের সঙ্গে একটা কার্বাইড গ্যাসবাতির কারখানা। এই গলিটায় ঢুকলে অমিত একটু অস্বস্তি বোধ করে না। রেফ-এর মত আর একটা সরু গলি, এই গলি থেকে বেরিয়েছে। সেই গলির মাঝের বাড়িটায় ছোট্ট আওয়াজ করে সে কড়া নাড়ল। দোতলার বারান্দায় উঁকি দিলেন এক মহিলা।

—অমিত। ওপরে তাকিয়ে অমিত হাসল।

—কল্পনা, অমিত এসেছে।

চলে গেলেন কল্পনার কাকীমা। এবার কল্পনা দরজা খুলবে। ছোট শরীরে একটা মিষ্টি মুখ। মুখে টোল। দরজার ধার ঘেঁষে পথ করে দেবে। দরজা বন্ধ করে পিছু পিছু আসবে। হলও তাই, একতলার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কিন্তু কিন্তু করল অমিত। ঘরের মধ্যে কল্পনার মা। পাশ কাটিয়ে কল্পনা ঘরে ঢুকল। ইশারা করল অমিতকে আসবার জন্য। মুখ তুলে যেন ব্যাজার হলেন বৃদ্ধা মহিলাটি। মুখ নামিয়ে আবার মোটা বইটায় ছেঁড়া পাতাগুলো নম্বর মিলিয়ে গুঁজে দিতে লাগলেন।

—উইয়ে কেটেছে।

কল্পনা অমিতকে কথাটা বলল। জবাব দেবার কিছু নেই। তবু মাথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, দেয়াল কড়িকাঠ, জানলাগুলো দেখে নিয়ে অমিত মন্তব্য করল, বড় ড্যাম্প।

বৃদ্ধা মুখ না তুলে যেন বই-এর পাতা থেকেই পড়লেন,—দয়া করে দু-বেলা দুমুঠো খেতে পরতে দেয়, তাই যথেষ্ট, আর কত ভাল ঘর দেবে।

স্বামী মারা যাবার পর তেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে দ্যাওরের সংসারে রয়েছেন। দ্যাওর ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। ভালো রোজগার করেন। আলমারিতে সোনারজলে বাঁধানো শরৎচন্দ্রের বই সাজিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি জমি কিনেছেন টালায়।

—মা, বইটা একদম গেছে। তার চেয়ে একটা কিনে নিলেই হয়।

মুখ তুলে একটুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখ ফিরিয়ে নিল কল্পনা, তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন। অমিত চোখে প্রশ্ন তুলে তাকাল, কল্পনা বুঝল, বুঝে বলল এখন গেলে কি দেবুবাবুর সঙ্গে দেখা হবে? দেবুবাবু কাউন্সিলার। কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষিকা চাই। কল্পনা দরখাস্ত করেছে। দেবুবাবু চেষ্টা করলে হয়তো চাকরি হয়ে যেতে পারে। অশোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে।

—এখনই বরং ওঁকে পাওয়া যাবে। অন্য সময় ভীষণ ব্যস্ত থাকেন।

—তাহলে গাটা ধুয়ে আসি।

অমিত চৌকিতে বসল। বৃদ্ধা মুখ তুলে তাকালেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কল্পনা ঘরে নেই।

—তুমি বলছ এঘরে খুব ড্যাম্প।

—বালি যেভাবে খসে পড়েছে তাতে।

—আজ তেরো বছর এঘরে আছি। কটা জানলা আছে দেখছ? চোত মাস থেকে বাইরের রকে শুই। কল্পনাকে শুতে দিই না, পাড়াটা খারাপ, ওপরে সারারাত পাখা চলে।

—আপনিও একটা পাখা রাখতে পারেন তো।

গরদের কাপড়কে যেন মুঠোয় পিষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধার মুখে এলো-মেলো ভাঁজ পড়লো, তাই চোখ দুটো আরও সরু হয়ে উঠল।

—টাকা দেবে কে? ওরা কেন টাকা খরচ করতে যাবে। ওদের কী দায়। কল্পনার বাবা যখন মারা গেলেন তখন ও ক্লাস ফাইভে পড়ে। দুতিন বছর পড়া নষ্ট হল। তারপর থেকে অ্যাদ্দিন তো ওরাই খরচ চালালো। টিউশনি তো ও সেদিন শুরু করেছে। এম.এ.-তে ভর্তি হবার খরচ তো ওরাই দিল। এখন একটা চাকরিবাকরি যদি পায় তাহলে আর পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।

—টাকা দিলে এ'রা কি নেবেন? কথাটার মধ্যে অমিত সন্দেহ মেশাল শুধু এই জন্যে যে কল্পনার কাকা বা কাকী অত্যন্ত ভদ্র ও অবস্থাপন্ন।

- টাকা দেব কেন? গলির মোড়ে যে স্যাকরা আছে ওর জামাইএর বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে, আমরা যাই তো আর কাউকে দেবে না।

শুনে আশ্চর্য হল অমিত। ওদের যে এমন পরিকল্পনা আছে কল্পনা তো কখনো জানায়নি।—

—আলাদা সংসার পেতে দুটো লোকের খরচ, পড়ার খরচ চালানো কি সম্ভব?

অমিত যতটা অবাক হল ঠিক ততটাই উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এই তো দুখানা বাড়ির পরেই একটি ছেলে থাকে, বলাই। সকালে টিউশনি, দুপুরে অপিস, রাতে কলেজ করে পাঁচটা পেট চালাচ্ছে। কল্পনা তো রাতে টিউশনি করেই, সকালে ইস্কুলের কাজটা হলে যা হোক করে দুজনের চলে যাবে।

অমিত ঘাড় হে'ট করে গম্ভীর হল। কল্পনার জল ঢালার শব্দ আসছে। ওপরের ঘরে কারা হুটোপুটি করছে। পাশের বাড়িতে জোরে কড়া নাড়ল। বাসনওলা কাঁসি বাজাচ্ছে। শব্দ আর শব্দ। মুখ তুলল অমিত। দেওয়ালে বালি খসে ঘোড়ার মুখ তৈরী হয়েছে। কল্পনার মায়ের মুখটাও লম্বাটে। কল্পনার চিবুকের আদলটা মেলানো যায় ওঁর সঙ্গে। অমিতের মনে হল কল্পনার মুখটাও ঘোড়ার মত।

—ও শুধু আমার মেয়ে নয়, ছেলেও। ওই আমার সব। সোজাসুজি উনি তাকালেন। জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। চোখ সরিয়ে অমিত তাকাল দেওয়ালের দিকে। কী বলতে চান উনি। ওই বুড়িটা কী বলতে চায়। চিরজীবন কি মেয়ে ওর ভরণপোষণ করবে। মেয়ে কি আলাদা সংসার পাতবে না? অন্যের সংসারে থাকাটা কি ওই বুড়ি অপমানের মনে করে। অপমানের কথায় অমিতের সেই বাসকন্ডাক্টারকে মনে পড়ল। নামবার স্টপ এসেছে। কন্ডাক্টার দূরে, ভাড়া দিতে গেলে বাস ছেড়ে দেবে, তাই ভাড়া না দিয়েই সে নেমে পড়েছিল। কন্ডাক্টার চে'চিয়ে বলেছিল, বাঃ দাদা, বেশ ফাঁকি দিলেন। বাসটা চলে গেল। বাসের লোকেরা ওকে দেখলেও কখনো চিনতে পারবে না। তবু ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল মাথাটা। মান অপমানবোধ বিচার বিবেচনা মানে না। ওটা বুদ্ধির সঙ্গেই থাকে, তবে কম বেশী এই যা। বৃদ্ধার সঙ্গে কোন একজায়গায় নিজের মিল খ‍ুঁজে পেয়ে অমিতের অস্বস্তি শুরু হল।

কল্পনা এল। শাড়ি বদলেছে। এখন চুল আর মুখটাকে গোছালো করলেই হাঙ্গামা শেষ। ওপর থেকে কাকিমা তাকে ডাকলো। চিরুনি হাতেই সে ওপরে গেল। নেমে এল চায়ের কাপ হাতে। চাকর দিয়েও চা পাঠানো যেত কিন্তু অমিতের বেলায় কাকীমা ইদানীং

কল্পনাকে দিয়ে চা জলখাবার পাঠান। তার দুই মেয়ে আর টালায় একটুকরো জমি, অর্থাৎ প্রায় হাজার তিরিশেক টাকার খরচ সামনে পড়ে। আর কল্পনা যখন একটা মানুষ এবং মেয়েমানুষ তখন বিয়ে হওয়া দরকার। বিয়ে মানেই খরচ। এ খরচের ঝক্কি নিশ্চয়ই ওর কাকাকেই পোয়াতে হবে। তাই এ বাড়িতে অমিত এলে তিনি খুশি হন।

—কাকিমা বললেন, নিমকি হচ্ছে।

—না থাক। বলেই অমিত বৃদ্ধার দিকে তাকাল, বিরক্ত হয়েছেন। থুতনিটা ঝুলে লম্বা হয়ে গেছে। অমিত কল্পনার মুখে তাকাল। থুতনির মিল আছে। চুলে চিরুনি টানছে কল্পনা। রাজলক্ষ্মী লন্ড্রির মালিক পশুপতি মড়মড়ে কাপড়গুলোকে ইস্ত্রী করার আগে অমনভাবে সমান করে। পশুপতিটা অশিক্ষিত, খচ্চর।

—আমিও যাব।

—আমিও যাব। ওরা দুজনেই চমকালো। প্রায় একসঙ্গেই বলল, কোথায়?

--চন্দর স্যাকরার মেয়ের বাড়ি।

—অন্য আর একদিন যেও।

--কেন? বৃদ্ধা যেন ধমকালেন। আর তাতেই ওদের জবাব দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। উনি উঠলেন। সেমিজটা ফর্সাই আছে। থান পালটাতে হবে। আলনা থেকে পরিষ্কার কাপড়টা টেনে পরলেন। অমিত মুখ ঘোরাল। এ ঘরেই উনি কাপড় বদলাবেন। কল্পনা আড়চোখে তাকাচ্ছে। আগে উনি সেমিজ পরতেন না। অমিতের সামনে একদিন কাঁধের কাপড় পড়ে গেছল। পরদিনই কল্পনা সেমিজ কিনে দিয়েছিল। আজ কল্পনা কী ভাবছে। একটা আলাদা ঘরের কথা কি?

—চলো।

উনি তালাচাবিটা পর্যন্ত হাতে নিয়েছেন। কল্পনা নিল ছোট্ট থলি। ওতে পয়সা আর মৌরীর কৌটো থাকে। দরজায় তালা এ'টে যখন উনি টেনে দেখছিলেন তখন গা ঘে'ষে দাঁড়ানো কল্পনার শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ পেল অমিত। চোখ তুলল সে। আকাশে জল ঢেলে কেউ যেন কোপানো মেঘগুলোকে সমান করার চেষ্টা করেছে।

কল্পনার সঙ্গে তার সম্পর্কটা এ পাড়ার অনেকেই জানে। আগে বারান্দায় দাঁড়ানো উঠতি-বয়সি মেয়েরা ওদের একসঙ্গে দেখলে ভিতর দিকে মুখ করে কী বলত, সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আরও দু-চারটে মুখ উ'কি দিত। কল্পনার থার্ড ইয়ার থেকে এখন ফিফথ্ ইয়ার। আর কেউ বারান্দা থেকে উ'কি দেয় না এখন। তবুও বাধো-বাধো ভাব এখনও কাটেনি অমিতের। নিজের মা আর বোনকে নিয়ে হাঁটছে এমনভাব করে সে গলির শেষ পর্যন্ত এল।

—কত দূরে আপনার চন্দর স্যাকরার বাড়ি?

—ওই তো রাজবল্লভপাড়ায়। একদিন গিয়ে দেখেও এসেছি। উনি দাঁড়ালেন। রাস্তাটা এখানে তিন ফালি হয়েছে। কল্পনা থলি থেকে মৌরী বের করল। হাঁ করে মুখে ছু'ড়ে দিল। দাঁতগুলো বড় বড়।

—চলো না, তোমরাও দেখে আসবে।

অমিত-কল্পনার চোখ মিলল। ওঁকে এড়াতে হলে সঙ্গে সঙ্গে যেতেই হবে। অমিত এগোল। কল্পনা যেন পা পা করে হাঁটছে। দৌড়ে চন্দর স্যাকরার মেয়ের বাড়িটা দেখে ওঁকে ছেড়ে দিলেই হয়। অমিত জোরে হাঁটতে শুরু করল। ওরাও গতি বাড়াল।

দু'হাত চওড়া গলি দিয়ে ঢুকে দুটি বাড়ির পরেরটি। উঠোনের ধারের ঘরটা ভাড়া দেবে। কল, পায়খানা সকলের। উঠোন থেকে একটা খাঁচার কোকিল, তারে ঝোলানো গামছা আর একটু আকাশ দেখা যায়। লীলাবতী ওদের দেখে ভীষণ খুশি। স্বামীকে বলে বাইশ থেকে কুড়িতে ভাড়া নামিয়ে দেবে। ছাদে যেতে দেবে। বলা মাত্র কল ছেড়ে দেবে। আর গর্ব করে এও বলল তার এক বোন এবারে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

অমিত শুনল, শুনতে শুনতে দেখল বৃদ্ধাকে। ভীষণ খুশি হয়েছে যেন। যেন এ বাড়িটা ওরই। লীলাবতী ভাড়া নিতে এসেছে। কোথায় উনুন পাতবেন, কোথায় হেঁসেল হবে, ঘরে কোথায় চৌকি থাকবে, ট্রাঙ্কটা বাঁহাতি জানলার ধারে, বাসনকোসন চৌকীর নীচে। মুখে মুখে উনি সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন। মাঝে কল্পনা একবার বলল, রান্নার জায়গাটা ঘেরা থাকলে ভালো হয়।

সকালের মাস্টারিটা যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অথচ ওরা যেন মাইনের টাকা হাতে পেয়ে গেছে। কিন্তু এই সংসার পাতাই বা কদিনের জন্য। মেয়ের তো বিয়ে দিতেই হবে। নাকি কল্পনা চিরকাল আইবুড়ো থাকবে।

—দেবুবাবুর সঙ্গে দেখা করলে আর দেরি করা উচিত নয়।

কথাটা বলেই অমিত এগোল। ওর চলা দেখে এরাও চলল। পথে কথা বলল শুধু ওরা দুজন : পরের সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন। বৃদ্ধা বারবার এই কথা বললেন। রাগে টনটনে মাথা নিয়ে অমিত হেঁটে চলল। একটা প্রচণ্ড ধাঁধা যেন তার আর কল্পনার মাঝে ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। খুশিতে হাঁটছে। সংসারের মোটা দাবিগুলোকে মিটোতে হবে, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সংসারের কাছেও মানুষের দাবি আছে, অমিত ভাবল। সংসারকে আমি খুশি করতে চাই। সে আমার খুশিতে বাধা দেয় কেন।

—এসে গেছি।

—হ্যাঁ, তোমরা দাঁড়াও এখানে, দেখে আসি।

ওদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে, অমিত খোলা বৈঠকখানায় ঢুকল। কেউ নেই। দরজায় টোকা দিতে চাকর এল।

—দেবুবাবু আছে?

—না, সিনেমা গেছে।

—একা?

—না মা-ও গেছে।

—কখন ফিরবে?

—ঠিক নেই।

আর জিজ্ঞাসা করার মানে হয় না।

—বাড়ি নেই।

—কেন?

—সিনেমা গেছে।

—তাহলে?

—নটা নাগাদ আর একবার আসতে হবে। কথা শেষ করে অমিত বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এবার কি বুড়িটা আমাদের রেহাই দেবে?

—এখান থেকে বাজার কত দূরে?

—খানিকটা।

—চলো একটা ছিটাকিনি কিনব। এবারও সেই স্বর। যা শুনলে জবাব দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

ওরা চলতে শুরু করল। আজ ছুটির দিন। এখন সিনেমা শুরুর সময়। আর একটু পরেই দক্ষিণ থেকে হাওয়া বইবে। কোলকাতার মানুষরা পরিষ্কার হয়ে পথে বেরিয়েছে। ওরা চুপ করে চলছে। অমিতের হঠাৎ মনে পড়ল, এমনি এক বিকেলেই অমিত তার বাবাকে দেখেছিল রেস্টুরেন্টে মাংস খেতে। রাত্রে বাবা বলেছিল, পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। নাতীর অন্নপ্রাশনে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিল। তারপর খুব বিরক্তি দেখিয়ে বলেছিল, দুটো টাকা খসল পুতুল কিনতে। কী দরকার ছিল বাবার এই মিথ্যে কথা বলার। একটু আরামের জন্য পরিবারকে বঞ্চিত করলে। তাই বিবেক বাধ্য করল তাকে মিথ্যা কথা বলাতে। বিবেক থাকার জন্যই মানুষ ক্ষতিস্বীকার করে। মিথ্যা বলে বাবা তার আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, কিন্তু আরাম কেন চাইবে না মানুষ? ইচ্ছা কেন করবে না। চাওয়ার ক্ষমতাটার জন্যই না মানুষ। এই ক্ষমতাটাকে পরিবার নামক কতকগুলো প্রাণীর সমষ্টি খুন করছে। বাবা আত্মসমর্পণ করেছে পরিবারের কাছে। এক্ষেত্রে বাবা কি মহত্ত্ব দেখিয়েছে না কাপুরুষতা প্রমাণ করেছে?

অমিত আড়চোখে কল্পনাকে দেখতে চাইল। ঝুলে-পড়া থুতনি। আর শুকনো আমের মত গাল। তার ওপাশে ব্যাগ ঝোলানো হাতে। আর গলায় চকলেট সুতোর মত দাগ। সুতোগুলো দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে অমিতের। এই বুড়ি যদি না থাকত তাহলে কি সত্যিই কল্পনার গলায় মুখ ঠেকাতে পারতুম! এক মুখ বিড়ির ধোঁয়ায় মুখ ডুবিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চলে গেল। সেই ধোঁয়ায় মুখ ডুবিয়ে অমিত হেঁটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের জন্য তার গলা শুকিয়ে উঠল। কিন্তু কল্পনার মা রয়েছে সঙ্গে। ঢোঁক গিলে অমিত ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, বুড়িটাকে ফেলে আমরা দুজন যদি এখন হারিয়ে যাই, তাহলে কেমন হয়।

গেরুয়া পর্দাটা হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। পাখা ঘুরছে তবু গেঞ্জি ঘামে চিট্‌চিট্‌ করছে। পিঠ থেকে গেঞ্জিটা টেনে ছাড়াতে ছাড়াতে অমিত বলল, ভেবেছিলুম দক্ষিণে যাব।

—দক্ষিণে কোথায়?

—বেহালা কি আলিপুর। চমৎকার বেড়াবার রাস্তা আছে।

—গেলে কি আর সাড়ে ন'টার মধ্যে ফেরা যাবে। অমিত মুখ ফেরাল সিগারেটে আগুন দেবার জন্য। কল্পনার কথার সুরে মমতা, ক্ষুব্ধতা। পর্দাটা হাওয়ায় ফুলে রয়েছে।

—চা খাবে তো?

কল্পনা চা খাওয়াবে। চেয়ারে পিঠ লাগিয়ে অমিত হাসল।

—হাসছো যে। চা কি খাওয়াই না?

—তাই বলেছি নাকি।

টোল পড়ল কল্পনার গালে। লম্বা টানের ধোঁয়া আটকে রাখল অমিত। এইবার আরাম।

—কিছু খাবে?

—না।

কল্পনা রেগেছে। ঠিক রাগ নয়, অভিমান। অতখানি অভিমান ওর ছোট্ট মুখটায় ধরে না, তাই শরীরের ভঙ্গিমায় ছড়িয়ে পড়েছে। থলির দড়িটা খুঁটতে খুঁটতে অন্যমনস্কের চেষ্টা করছে। অমিতের এখন ভালো লাগছে ওকে। তাই থলিটা কেড়ে নিল।

—মৌরী খাব।

—চাইলেই তো পারতে।

থলিটা টেনে ফিরিয়ে দিল অমিত। বেয়ারা এসেছে।

—দুটো চা, দুটো চিপস্।

ইচ্ছে করেই অমিত চিপস্ আনতে বলল। কল্পনা আলুভাজা খায় না।

মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল কল্পনা। ওর জুতোয় চাপ দিল অমিত। কল্পনা পা সরিয়ে নিল। টেবিল থেকে কনুই দুটোও তুলে নিল। অভিমান এবং তাই থেকে ও রাগে পৌঁছবে। এই রাগ ভাঙতে হবে। বেশ কিছুটা সময় মিষ্টি মিষ্টি আমেজের মধ্যে কাটবে। এর আগের বারে প্রায় চোখের জল ফেলে, কল্পনা রাগ ভাঙিয়েছিল। পুরুষের অভিমানের মত অশ্লীল জিনিস কল্পনা কি করে সহ্য করে। অমিত অ্যাশট্রে সরিয়ে বেয়ারাকে সাহায্য করতে করতে ভাবল আমিই বা কেন অশ্লীল হয়েছিলুম। হৃদয়চর্চা মানেই চিটে গুড়ের কারবার।

—চিপস্ খাবে না?

- না।

কল্পনা চায়ের কাপে মুখ নামাল। কাপের খুব কাছাকাছি এসে ঠোঁট ফাঁক করল। গরম ভাপ উঠছে। থরথর করে কাঁপা ঠোঁট জোড়া ছুচলো করল। পেন্সিল দাগের মত ফাটা দাগ ধরলো ঠোঁটে। কাপ ছুঁয়েই চমকে ঠোঁট সরিয়ে নিল।

—অন্য কিছু খাও তাহলে।

—থাক।

—কেন? জিজ্ঞেস করেই অমিতের চোখ ঘুরে গেল। কল্পনাও দেখল। হেনা আর বাসবী বসেছে ঝকমকে এক যুবকের সঙ্গে।

—ছেলেটা কে?

—চিনি না।

কল্পনা এখন আর হেনাকে দেখছে না। অমিতের সঙ্গে হেনা দিনকতক ঘোরাঘুরি করছিল। অমিত এখনও তাকিয়ে আছে।

—খাচ্ছ না যে!

—কেন?

—খিদে পাচ্ছে।

—রয়েছে তো তোমার জন্য।

একটা প্লেট অমিত এগিয়ে দিল। এককুচি ভাজা কল্পনা তুলে নিল। তাই দেখে অমিত হাসল। গম্ভীর হয়ে আলুভাজাটা প্লেটে রেখে দিল কল্পনা। গম্ভীর হলেই কল্পনার থুতনিটা লম্বা হয়ে যায়। হেনা কি কখনও গম্ভীর হয়? অমিত ভাবল হেনা কেন গম্ভীর হয় না। হৈ হৈ করে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিত। হাসতো, ভীষণ হাসতো। মাংস আর রুটি চিবোতে চিবোতে ছেলেদের অশ্লীল গল্প শুনতো। না খাওয়ালে ও

টেবিলে বসত না। খাওয়াটা ওর কাছে খুব দরকারী ব্যাপার। মধ্যমগ্রাম থেকে কলেজে আসত। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। অশ্লীল গল্পও নিরুপায় হয়ে শুনত। কেচ্ছা রটেছিল ওর নামে।

—বাসবীটাকে বখাচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিল অমিত। অল্প কিছুদিন আগে হেনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। চাকরি খুঁজছে। টাইপ শিখেছে। বলেছিল ওর বড়দার টি.বি. হয়েছে। তার দুটি ছেলেমেয়ে।

—দেখেছ কি রকম বেহায়ার মত হাসছে। সিগারেটের প্যাকেট খুলল অমিত। হেনা বলেছিল, বয়স্ক পাত্র দিতে পারেন, বড়দির বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। অন্য জাত হলেও আপত্তি নেই।

—সন্ধ্যে কখন পার হয়ে গেছে। ও বাড়ি ফিরবে কখন?

—বোধহয় বাসবীদের বাড়ি থাকবে।

আলুভাজা দাঁতে কেটে কল্পনা আবার বলল, বাসবীটাকে ও নষ্ট করেছে। এই ছেলেটাকে আগে দেখিনি কিন্তু।

কেমন থতমত হল কল্পনা। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন অমিত বলল, ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারল না হেনা, মিছিমিছি ক'মাস অনার্স পড়েছিল।

এবার অমিত বুঝতে চেষ্টা করল কল্পনার মনের ভাব। আলুভাজাগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে।

হেনা আসছে। সিধে হয়ে বসল অমিত। হাসিমুখে তাকাল কল্পনা।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছুই না।

অমিত চেয়ারে হেলান দিল। পিঠে ঠেকল হেনার আঙুল। আড়চোখে তাকাল সে, হেনা খাটো ঝুলের ব্লাউজ পরেছে। চর্বির চমৎকার একটা ভাঁজ, চোখ সরিয়ে অমিত তাকাল কল্পনার দিকে, পিঠে হেনার আঙুল ফুটছে।

—আপনার খবর কি?

—কিছু না।

—বারে, আপনাদের দুজনেরই কিছু না। হেনা হাসল। চোখ পাকিয়ে অবাক হল। শরীরের ভার এক পায়ের উপর রেখে হেলে দাঁড়াল।

—মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়।

—তার মানে আমাদের না-টাই হ্যাঁ?

—অঙ্ক তো তাই বলে। ভালো খবরটা যেন ঠিক সময়ে পাই, চলি। আবার হেসে হেনা চলে গেল। আবার সিধে হয়ে বসল অমিত। বিল এসেছে। ব্যস্ত হয়ে কল্পনা থলির দড়িটা খুলল। প্লেট থেকে মৌরী নিতে নিতে অমিত বেয়ারার সেলাম নিল। পাখার হাওয়ায় পর্দাটা এখনো তেমনি ফুলে রয়েছে। ঝটকা দিয়ে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল।

রাত হয়েছে। সাজগোজকরা যুবকেরা রাস্তার রেলিঙে কনুই রেখে গল্প করছে। সিনেমার সান্ধ্যপ্রদর্শনী শেষ হলে ওরা সিনেমা বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে বেড়াবে।

আজ ছুটির দিন। কিন্তু কাজের দিনের থেকে কোন তফাত নেই আজকের রাতে। সেই ট্রামবাসে ভিড়। ট্যাক্সির জন্য লোকের ছুটোছুটি। দোকানে দোকানে খদ্দের।

—মৌরী নাও।

—থাক ।

—কী করবে এখন, পার্কে যাবে?

—ওখানে চ্যাংড়াদের ভিড়।

পিছন থেকে অমিতের পাশে এসে কল্পনা বলল, হেনা আজকাল পেটকাটা ব্লাউজ পরছে।

—কই, দেখলুম না তো।

—বাঃ, তোমার গা ঘেঁষেই তো দাঁড়িয়েছিল।

—তুমিও পর না।

—পরা না পরাটা রুচির ব্যাপার।

আর কথা হল না ওদের। ভিড় সামলে, ছোটখাটো রাস্তাগুলো পার হয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো। এবার সিনেমা ভাঙবে। সিনেমাবাড়ির সামনে সার দিয়ে রিক্সা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ অমিত বলল, এসো রিক্সায় চাপি।

কল্পনা কিছু বলার আগেই অমিত হাতছানি দিয়ে রিক্সা ডাকলো।

—সে কী!

—এমনি বেশ লাগে আমার।

—আমার কুচ্ছিত লাগে।

রিক্সা এসেছে, কল্পনার কথায় ঠাণ্ডা সুরে অমিত বলল, কী হল?

—বললুম তো আমার কুচ্ছিত লাগে, রিক্সা চড়াটা অসভ্যতা।

—এত লোক চাপে, তারা কি সব অসভ্য!

—জানি না, আমার হাঁটতে ভালো লাগে।

সুর নীচু করে অমিত বলল, আমার অনুরোধেই না হয় একটু অসভ্যতা করলে।

—তার চেয়ে আমার অনুরোধেই নয় হাঁটলে।

কথা না বাড়িয়ে অমিত রিক্সায় উঠে বসল। কল্পনা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—দেবুবাবুর কাছে যেতে, দেরি কোরো না।

—আমি যাব না।

অমিত কী একটা বলতে যাচ্ছিল। চোখ পড়ল রিক্সাওলা উসখুশ করছে, নাইট শোয়ের লাইনটা এদিকেই তাকিয়ে। রিক্সাওলাকে টানবার ইশারা করল অমিত।

—তোমরা আমায় ফেলে কোথায় যে গেলে। উনি দরজার পাল্লা দুটো মেলে ধরলেন। ঘরের আলো নেভানো। বোধহয় শুয়ে ছিলেন। একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, আমার খুব ভয় করছিল। এত ভিড়, এত লোক, তোমরা যে কখন হারিয়ে গেলে।

—না, না কলকাতায় মানুষ হারালে ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়। এতে ভয় কিসের?

—কল্পনা কোথায়?

—দেবুবাবুর কাছে গেছে।

—তুমি গেলে না?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। শুধু একবার দেখতে এলুম আপনি ঠিকমত পৌঁছেছেন কিনা।

# বেকার সমস্যা প্রসঙ্গে

**সুশীল দে**

কিছুদিন আগে অবধি মনে হোত ব্যাপক খাদ্যসঙ্কটই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় বিপদ। সম্প্রতি দেখা যায় এ ভয় খানিকটা কেটেছে। যেসব দেশে খাদ্যের উৎপাদন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় পিছিয়ে পড়ছিল, সেখানে এখন ভাল জাতের ধান, গম, ভুট্টার চাষ ক্রমশ প্রসার হওয়ার ফলে উপযুক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা না হোক দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার আপাত উপশম ঘটেছে। তার জায়গায় নতুন যে সমস্যা বর্তমানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সে হোল বেকার সমস্যা। একদিক থেকে এটা আশার লক্ষণ। খাদ্যের অভাব হোল অর্থনৈতিক দুর্গতির অন্তিম রূপ, কিন্তু সবচেয়ে নিদারুণ ও অসহনীয় হলেও অন্যান্য অভাবের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক অচ্ছেদ্য, সেগুলির পূরণ না হলে স্থায়ীভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যদি চাষীদের প্রয়োজনীয় অন্য জিনিসের উৎপাদনও না বাড়ে তবে অন্য পণ্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দাম কমে গিয়ে চাষীকে ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে নিরস্ত করবে। আবার বহুধা উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় হোল সব ক্ষেত্রে অধিকতর লোক নিয়োগ, অর্থাৎ সাধারণভাবে উপার্জনের সুযোগ বিস্তার। তাই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের সাপক্ষে খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেকার নিবারণ বেশী উপযোগী লক্ষ্য। ইউনাইটেড্ নেশন্সের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রমজীবীদের স্বার্থসংরক্ষণ ও মঙ্গল-সাধনের দায়িত্ব যে সংগঠনের সে হোল আই-এল্-ও। সম্প্রতি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী অভিযান ঘোষণা করেছেন, আর যেন এবিষয়ের গুরুত্বের ওপর ঝোঁক দেওয়ার জন্যই আই-এল-ওকে এবছর শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের পথ কি? এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সবপ্রথম একটা কথা বোঝা দরকার। যেসব দেশ আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় অগ্রণী, ব্যাপকভাবে বেকারদের উদ্ভব সেখানেও অসম্ভব নয়, কিন্তু সেখানকার বেকার সমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশ তথা অন্য গরীব দেশের বেকার সমস্যার একটি মূলগত পার্থক্য আছে। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর পাশ্চাত্ত্য অথর্ববিদমহলে এ বিষয় অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের পর মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয় যে উৎপাদন-ব্যবস্থা পুরোদমে চালু রাখার উপায় হোল বাজারে পণ্যের চাহিদা বজায় রাখা, তাহলেই সমাজে অর্থকরী উপার্জনের বিভিন্ন পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত থাকবে। বাজার সক্রিয় রাখ্‌তে চাই ক্রেতাদের হাতে যথেষ্ট অর্থাগম। সুতরাং যদি দেখা যায় কোনো কারণে মুনাফা হ্রাসের আশঙ্কায় শিল্পপতিরা উৎপাদনসঙ্কোচ করছেন এবং পরিণামে রোজগারের অভাবে লোকে খরচ করছে কম, তখন রাষ্ট্রকর্তাদের কর্তব্য নানাবিধ জনহিতকর কাজে লোক নিয়োগ করা। অর্থাৎ বেসরকারী খাতে উৎপাদন ও ব্যয়সঙ্কোচ ঘটলে সরকারী খাতে উৎপাদন ও ব্যয়বৃদ্ধি করে চাহিদার অভাবটুকু পুরিয়ে দেওয়া দরকার। এইভাবে সমাজে মোট আয় ও ব্যয়ের মাত্রা ও তৎকারণে উপার্জনরত লোকের সংখ্যা উঁচু হারে বেঁধে রাখা সম্ভব। খুব সংক্ষেপে এই হোল সমৃদ্ধ দেশে বেকার নিয়ন্ত্রণের বিধি, আর এই নিয়ম পালনের ফলেই ১৯২৯ সনের পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দা ও তজ্জনিত বিরাট বেকার

সঙ্কটের পর শিল্পোন্নত দেশগুলি এ ধরনের আর্থিক লোকসান ও দুর্ভোগ এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল।

আমাদের দেশে মোটের ওপর এ নিয়ম খাটে না, কারণ বাজারে ক্রয়শক্তির অভাব আমাদের দৈন্যের মূল কারণ নয়, কারণ হোল আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার পত্তনের অভাব। আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা যে আদৌ হয়নি তা নয়, কিন্তু তা যৎসামান্য ও বিচ্ছিন্ন, আনুষঙ্গিক উপাদান ও প্রকরণের অভাবে বলহীন, পুরোপুরি কার্যকরী হতে অপারগ, তাতে আমাদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ বদলায়নি। এক কথায় বলা যায় আমাদের দুর্বলতা অর্থসংস্থার কাঠামোতে, তারই আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। বর্তমানে এই জীর্ণ কাঠামোর এক সঙ্কীর্ণ কোণে চেপে আছে যন্ত্রশিল্পের চকচকে সজ্জা, তাতে আমাদের অর্থজীবন হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। এই বিভক্ত জীবনের অত্যল্পপরিসর আধুনিক কোণে যে উৎপাদন-বন্টনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে, প্রগতিশীল দেশের বেকার নিয়ন্ত্রণের নিয়ম কেবল সেই জায়গাটুকুতেই ফলবতী হতে পারে। অবশিষ্ট যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এখনও হস্তকৌশলজাত ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানকার উৎপাদনশক্তির মান আধুনিক সমাজের সমকক্ষ করে তোলাই হচ্ছে আমাদের তথা অন্য পিছিয়ে-পড়া দেশের আসল সমস্যা। যতদিন অবধি আধুনিক কৌশল খাটিয়ে আমাদের ধনোৎপাদনশক্তির উৎকর্ষ করা না যায় ততদিন পর্যন্ত যে কোনো ভাবে রোজগারের প্রসার করে লোকের হাতে টাকা দিয়ে বাজারে চাহিদা বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে, কিন্তু দৈন্য ঘুচবে না।

উৎপাদিকাশক্তির মান শিল্পোন্নত দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হলে চাই আধুনিক কলকব্জার প্রবর্তন, তার জন্য বিস্তর মূলধনের প্রয়োজন। এককালীন দানই হোক বা অল্পসুদে ঋণই হোক, বৈদেশিক সাহায্য থেকে এ প্রয়োজনের যতটুকু মিটতে পারে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। যে দেশ যত গরীব, তার সঞ্চয় এবং সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে মূলধন সৃষ্টির ক্ষমতা তেমনি সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় মনে হতে পারে প্রভূত অর্থে সবচেয়ে আধুনিক ও শ্রেষ্ঠ যন্ত্রকৌশলের প্রয়োগ না করে অল্পব্যয়ে মাঝারী কর্মপদ্ধতির আমদানি করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এভাবে তৈরী যে মাল তা বাজারে উন্নত প্রথায় উৎপন্ন মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারে না। অন্যথায় যদি বা দেশনেতাদের আহ্বানে আপ্রাণ ব্যয়-সঙ্কোচ করে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে দু-একটি শিল্পের ক্ষেত্রে অতি-আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তো দেখা যায় টাকা বাঁচাতে গিয়ে খরচের সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে, বাজারে সে মালের ক্রেতা নেই। এই দোটানায় পড়ে গরীবদেশে আধুনিক শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান লোকসংখ্যা জীবিকার্জনের জন্য কৃষিনির্ভর হতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে মাথাপিছু জমির আয়তন ক্রমশ কমে গিয়ে কৃষিক্ষেত্রেও আধুনিক উৎপাদনপ্রথা প্রয়োগের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

এ অবস্থায় রাতারাতি উন্নয়নের আশা মিথ্যা। যেহেতু আমাদের সামর্থ্য ও সঙ্গতি নিতান্ত অল্প, সেই হেতু অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ খুব ছোট হতে বাধ্য। বুঝতে হবে, কৃষি ও শিল্প পরস্পরনির্ভর। শিল্প-উৎপাদনের কাঁচামাল আর শিল্পনির্ভর লোকের খাদ্যসংস্থান আসে কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে, শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করতে হয়। শিল্পজাত পণ্যের প্রধান চাহিদা ও বাজার চাষীদের মধ্যে ও সেই চাহিদার মূল্য ও পরিমাণ নির্ভর করে চাষীরা তাদের মোট উৎপাদনের কতটা অংশ চলতি দামে বিক্রি করতে সমর্থ বা প্রস্তুত, তার ওপর। আমাদের জনসঙ্কুল কৃষিক্ষেত্রে যেমন শ্রমসঙ্কোচকারী

যন্ত্র প্রয়োগের অবকাশ খুবই অল্প, তেমনি দৈন্যগ্রস্ত চাষীদের চাহিদামুখাপেক্ষী শিল্পের বেলায় বিশাল মূলধনসাপেক্ষ বহুলউৎপাদনক্ষম বিরাট প্রতিষ্ঠানের স্থানও সামান্য। তাড়িৎ উন্নয়নের ঝোঁকে দেশে যে অমন প্রতিষ্ঠানের পত্তন একেবারে হয়নি তা নয়, কিন্তু সময়ে বোঝা গেছে যে তার ফলে আমাদের পরিমিত সংগতির অপচয় ঘটেছে, ও কাটতির অভাবে এই অভাবগ্রস্ত দেশেও বারবার অতি-উৎপাদনের অভিযোগ শোনা গেছে।

আমাদের মত গরীব দেশে অগ্রগতির সুরুতে তাই ধীরে কৃষি ও শিল্পের একছন্দে পা মিলিয়ে চলাই বিধেয়। অর্থাৎ কৃষির ক্রমোন্নতির বেলায় যেমন তেমনি শিল্পোন্নতির বেলায়ও একলাফে শীর্ষে পেঁছান যাবে না। আবার প্রশ্ন উঠবে, প্রযুক্ত উৎপাদনপ্রথা যদি অতি-আধুনিকতা পরিহার করে নিম্ন বা মধ্য স্তরের ব্যবস্থা বেছে নেয়, তবে সেভাবে উৎপন্ন মাল বাজারে কাটবে কি করে, উৎপাদনকৌশলের শীর্ষে যারা পেঁছে গেছে সেই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা দাঁড়াবে কোথায়? এর উত্তর, নীচু স্তরের পণ্যের খুঁজে নিতে হবে উৎকৃষ্ট পণ্যের যে বাজার তার থেকে ভিন্ন নতুন এক বাজার, যেখানে সমস্তরের মধ্যকৌশলী অন্য শিল্পী বা কর্মীদের তৈরী পণ্যের বিনিময়ে এই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চল্‌তি বাজার-চাহিদার অতিরিক্ত যে উৎপাদন তার সদ্ব্যবহার ও সুরাহা হতে পারে। অবশ্য যারা এগিয়ে গেছে তাদের ওপর কর ধার্য করে বা সরকারী বৃত্তির সহায়তায় পশ্চাদ্‌বর্তী শিল্পীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাশক্তি বাড়িয়ে বর্তমান বাজারেই নিম্নস্তরের পণ্যের কাট্‌তির সুবিধা করে দেওয়া যায়, যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পকে এইভাবেই রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যে অভাবের দেশে সর্বতোভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন, উপরন্তু যেখানে উৎপাদনশক্তির যথাসাধ্য উৎকর্ষসাধন উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক সে স্থলে উন্নতের ক্ষতি করে অনুন্নতকে পোষণ করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। তাই উচিত বর্তমান বাজারে ভাগ না বসিয়ে নতুন বাজারের পত্তন। যারা বেকার তাদের উপস্থিত কর্মপটুতা বা শিল্পশক্তি যা উৎপন্ন করতে সক্ষম বর্তমান বাজারের মানদণ্ডে তা অগ্রাহ্য বলেই তাদের কাজের চাহিদার অভাব। কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রের বেকার কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে পরস্পরের প্রয়োজন মত এককালীন বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। তখন এই গোষ্ঠীর মধ্যে একের উৎপাদনের বিনিময়ে অন্যের উৎপাদন ক্রয় করা চলে।

দেখা যাবে, উৎপাদনশক্তি থেকেই ক্রয়শক্তির উদ্ভব। বেকার মানুষেরও কোনো না কোনো উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে সে ক্ষমতার বিকাশ নেই বলে সভ্য-বাজারে তার মর্যাদা নেই। কিন্তু এই ক্ষীণ ও অস্ফুট শক্তিকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্য তার উৎপাদন হবে বাজারে চল্‌তি মালের তুলনায় কিছু হীন ও মলিন। তবে অন্য যারা বেকার বলে চলতি বাজারে কিছু কিন্‌তে পারে না, অথচ অভাব যাদের অপূর্ণ, তাদের কাছে এই সভ্য-বাজারে অচল হীন উৎপাদনেরও আদর আছে। তাই এ মালেরও ক্রয়শক্তি আছে, যদিও সে শক্তি চলতি ক্রয়শক্তির তুলনায় অনেকটা দুর্বল। অর্থাৎ এ মালের কেন্‌বার পূর্ণসামর্থ্য শুধু অনুরূপ বেকার মানুষের অস্ফুট উৎপাদনশক্তির হীনসৃষ্টি। এইভাবে নিষ্কর্মাদের নানা কাজে লাগিয়ে নিম্নস্তরের নতুন উৎপাদনজাত নিম্নস্তরের ক্রয়শক্তির সৃষ্টি করে জনসাধারণের বাজারের বাইরে এক নিম্নস্তরের নতুন ঘরোয়া বাজার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাতে নতুন উৎপাদন যা হবে তা কিছু ম্লান, কিছু খেলো হলেও গরীব দেশের মোট সম্পদের ভাণ্ডার তাতে বাড়বে। ক্রমোন্নয়নের প্রারম্ভে অগণিত বেকারদের কার্যক্ষম করে তোলবার পক্ষে এটা কম কথা নয়।

চলতি বাজারে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত যে শ্রমশক্তি বা পণ্য তার সদ্ব্যবহার করার এ প্রস্তাব অবিশ্বাস্য বা অবাস্তব নয়। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুদিনের জন্য ঐ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অবসর সময়ে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন শিল্পীদের একত্র করে পরস্পরের অভাব মিটোবার জন্য কাজে প্রবৃত্ত করা। এই ছিল প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য। তার পিছনে আশা ছিল অনেক বেশী। এভাবে জীবনযাত্রার মোটা অভাব দূর করতে পারলে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস জন্মায়, আবার যে সামান্য টাকা দরিদ্র গ্রামবাসীরা তাদের নিত্য ব্যবহারের জিনিস কিনতে বাজারে খরচ করে তা' বাঁচান যায়। তখন সেই সামান্য সঞ্চয়ের ভিত্তিতে উৎপাদনপদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নতির প্রচেষ্টা সুরু করা সম্ভব। তার জন্যে সরকারের তরফ থেকে নানাভাবে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হোল উন্নতপ্রথায় শিল্পচালনার জন্য শিক্ষাদান। এ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে গিয়ে দেখা গেল যে ধাপে ধাপে যে ক্রমোন্নতির প্রয়োজন তার জন্য প্রচলিত উৎপাদনকৌশল অনেক ক্ষেত্রেই অচল, যে হেতু তা' গ্রামশিল্পীদের বর্তমান নাগালের অনেকটা ঊর্ধ্বে। তাই মাঝারী কৌশল আবিষ্কারের জন্য সন্ধান আরম্ভ হোল। এই সময় একটা বড় সত্য উপলব্ধি করা গেল যে, ক্রয়বিক্রয় বা বাণিজ্যের সম্বন্ধে জড়ানো নতুন ঘরোয়া বাজারের এই যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী তাদের প্রত্যেককেই সমান তালে এগিয়ে চলতে হবে, উন্নতির পথে এদের কেউ বেশী অগ্রসর হলে তার পণ্যের চাহিদা জুটবে না। এইজন্য যুগপৎ নানান শিল্পে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে সমতা বা উন্নতির প্রবর্তন দরকার। তার সঙ্গে দরকার সেইসব উন্নতপ্রথা প্রয়োগ করার উপযুক্ত মালমশলা ও হাতিয়ার এবং সেই সব সংগ্রহের জন্য মূলধন। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হোল ঐ ধরনের সচল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনার জন্য গ্রামবাসীদের সাহায্য ও ভরসা দেবার উপযুক্ত দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীবৃন্দের। কার্যত দেখা যায় আরম্ভের ন'মাসের মধ্যে সাড়ে আটশ' গ্রামের চার হাজারের ওপর বেকার বা অবসর-কর্মীদের মধ্যে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, নতুন উৎপাদন যা' হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারে এসেছিল তার দাম ছিল প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী অনুমান পনের হাজার টাকা। তারপর ১৯৫৫ সালের অক্টোবর থেকে এ কাজের পূর্ণ বিবরণ আর পাওয়া যায়নি। বোঝা যায়, গ্রামবাসীদের এ পরিকল্পনা সম্বন্ধে চেতনা ও পরিচালনার ক্ষমতা সুদৃঢ় হবার আগেই কর্মীদের উৎসাহ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু ঘটে।

এ অভাগা দেশ অচল হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গত সাত বছর ধরে এ ব্যবস্থা সার্থক রূপ পেয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস্ ও এফ্-এ-ও'র যুগ্ম প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে অন্ন পরিবেশনের জন্য এক নতুন সংস্থা গঠিত হয়েছে তার নাম ওয়ার্লড্ ফুড প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে ডব্লি-এফ্-পি। এই সংগঠনের মারফৎ সমৃদ্ধ দেশের উদ্বৃত্ত খাবার এনে গরীব দেশের নিরন্ন ও নিষ্কর্মা লোকদের যথাসম্ভব মূলধন সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত করা হচ্ছে ও তার ফলে যে-সব দেশের ধনোৎপাদনশক্তির উৎকর্ষের এক নতুন পথ খুলে গিয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে গম ও অন্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাজারের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী, সেখানকার রাষ্ট্রকর্তারা এই অতিরিক্ত পণ্য বাজার থেকে সরিয়ে রাখতে উদ্যোগী। অন্যান্য দেশে দুধ, মাছ, ডিম, মাংস, কফি, চা, কখন কখন মটর এবং পশুখাদ্যেরও অতি-উৎপাদন হয়। তাঁদের সবাইকে রাজী করান হয়েছে যে এই সব বাজার-চাহিদার অতিরিক্ত ভবিষ্যৎ উৎপাদন প্রচেষ্টার পক্ষে ক্ষতিকর

অন্নসামগ্রীর বিনিময়ে গরীব দেশের বাজার-চাহিদার অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব ও তাতে সকলেরই মঙ্গল। গরীব দেশের অর্থব্যবস্থার বনিয়াদ বহুস্থলে কাঁচা, তা' শক্ত করার অনেক কাজে বিশেষ দক্ষতা বা কর্মপটুতার প্রয়োজন হয় না, সে ধরনের অনেক অভাব কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যেই পূর্ণ করা যায়। দৃষ্টান্ত হোল চলাচলের ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার, জলনিষ্কাশন, বন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদী, সাধারণের হিতের এসব কাজে ঋণলব্ধ টাকা লাগানো যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদে-আসলে তা' আদায় হওয়া কঠিন। তাই সব গরীব দেশেই এসব কাজ অসম্পূর্ণ থেকে অর্থব্যবস্থার ভিত কাবু করে রেখেছে। কেবল খোরাকের ব্যবস্থা হলেই এইসব কাজের জন্য অনেক লোক এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। শুধু এক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে না এই অন্নসাহায্য চলতি বাজারে ছাড়া পেয়ে প্রাচুর্য ঘটিয়ে কৃষি-ব্যবসায়ীর ক্ষতি করে ভবিষ্যৎ উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তার জন্য এই অন্ন সরবরাহ করার বিধি নতুন বাজারে। সেখানকার ক্রেতাদের সম্বল তাদের কায়িক পরিশ্রমের ক্ষমতা মাত্র, তা' সাধারণ বাজারের ক্রয়শক্তির সমতুল্য নয়, তাই সেখানে তাদের প্রবেশের অধিকার নেই, সে বাজারের কারবার তাই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

এই অতিরিক্ত খাদ্য ও অকেজো মানুষ নিয়ে গত বছরের জুলাই মাসের মধ্যে ডব্লিউ-এফ্-পি ৭৬টি গরীব দেশে ৩৫৬টি গঠনমূলক কাজে ৫১৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যের কারবার করেছেন, অপরপক্ষে কত লোকের কত ঘন্টার পরিশ্রম যে ব্যয় হয়েছে তার হিসাব নেই। তবে একথা নিশ্চিত যে যদি ডব্লিউ-এফ্-পি কেবল খাদ্য নয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য অন্য প্রয়োজনগুলিও মেটাতে সমর্থ হোত, তবে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যার উপার্জনহীন লোককে এর চেয়ে অনেক বেশী কাজে নিয়োগ করা যেত। শিল্পোন্নত দেশে এখন নানারকম কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে পরিধেয় ও আবাসের উপকরণ উৎপাদন হতে পারে। সেই কারণে সামান্য খরচেই খাদ্যের সঙ্গে বস্ত্র ও গৃহ-নির্মাণের উপযোগী মাল সংযোগ করে ডব্লিউ-এফ্-পি'র সাহায্যের ঝুলি ভারী করা যায়, এবং এই ত্রিবিধ পণ্যসাহায্য সরবরাহ করে বেকার সমস্যার সমাধানের আশা অবাস্তব নয়।

কিন্তু তাতে সম্ভব আশু উপশম মাত্র, আমূল সমাধান নয়। তার কারণ, এভাবে বেকার নিয়োগ করে যেসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব সেগুলি কল্যাণকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' ফলপ্রসূ হতে দীর্ঘ সময় চাই। খাদ্যসাহায্য নিয়ে মাটি-কাটার কাজ ছাড়াও শিশু ও মাতৃকল্যাণকেন্দ্রে অন্ন বিতরণ করে অনেক দেশে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে। তেমনি সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য শিক্ষার্থীদের আহারের ব্যবস্থা করে ছাত্রসংখ্যার বহুগুণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়েছে। এইসব কর্মসূচির ফলে জাতির শারীরিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা পুষ্ট হয়ে ধনোৎপাদনশক্তির উৎকর্ষসাধন করলে নানা দিকে উপার্জনের সুযোগ বাড়বে এ নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ প্রতিক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলের বাঁধ সংগঠন, বৃক্ষরোপণ এবং জমিসংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ সমাধা করে বেকারের দল রোজগারের অন্য অবকাশ না পেয়ে আবার বেকার অবস্থায় ফিরে যাবে। এই প্রতিকারের একমাত্র উপায় এমন কার্যসূচীর উদ্বোধন যাতে আছে নিরবচ্ছিন্ন শিল্পপ্রসারের সূচনা। বর্তমান প্রবন্ধে আগেই সে প্রস্তাব করা হয়েছে। বেকারের ছোট ছোট দল গড়ে পরস্পরের নিত্য প্রয়োজন মেটাবার কাজে দলগত প্রত্যেকটি পুরুষ ও মেয়েকে প্রবৃত্ত করা যায়। বেকারদের নিষ্ক্রিয় শ্রমশক্তিকে এভাবে সক্রিয় করে নতুন সম্পদে

সৃষ্টি করা সম্ভব। এরই মধ্যে নিহিত আছে শিল্পপ্রসার তথা অর্থকরী কর্মবিস্তারের অবারিত সম্ভাবনা।

এ কাজের প্রথম অবস্থায় নতুন সম্পদে যে সৃষ্টি হবে তা হবে অকিঞ্চিৎকর, সাধু সমাজে তারিফ করার যোগ্য নয়। কিন্তু তারই ভিত্তিতে সামান্য করে মূলধন গড়ে কাজের হাতিয়ার, দক্ষতা ও পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য সে মূলধন নিয়োগ করা যায়। উন্নত হাতিয়ার ও কর্মকৌশল আমদানি করতে হবে দলের বাইরের চল্‌তি বাজার থেকে, তার জন্য প্রথম থেকেই সাধারণের বাজারের সঙ্গে এই নতুন ঘরোয়া বাজারের বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন হওয়া স্বাভাবিক। আদিতে দুই বাজারের উৎপাদন ও ক্রয়শক্তির পার্থক্য হবে দীর্ঘ, অর্থাৎ ঘরোয়া বাজারের বহু ঘণ্টার পরিশ্রমের কাজ চল্‌তি বাজারের একঘণ্টা কাজের সামিল বলে গণ্য হবে। সেইজন্য নিতান্ত নিরুপায় না হলে ঘরোয়া বাজারের মানুষদের বাইরের সঙ্গে কারবার করা ভুল, তাতে দুর্বলদের আরও শক্তিক্ষয় হতে বাধ্য। কিন্তু শ্রম-কৌশলের উন্নতির উপকরণ কেবল বাইরে থেকেই পাওয়া সম্ভব বলে কষ্টসাধ্য হলেও বহির্মুখী হওয়া দরকার। অনুরূপ সমস্যা দেখা যায় গরীব দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেলা। সেখানেও টাকার ক্রয়শক্তি ডলারের ক্রয়শক্তির থেকে কম বলে বৈদেশিক মুদ্রা খরচে এত আপত্তি, নিতান্ত প্রয়োজন নইলে বিদেশী মাল ক্রয় করা নিষেধ। কিন্তু উন্নয়নের পক্ষে একটা প্রয়োজন অনিবার্য, সে হোল উৎপাদনশক্তির উন্নতির উপাদান। সেই সংগ্রহের চেষ্টায় রপ্তানি বাড়িয়ে বেশী পরিশ্রম করেও আমদানির ব্যবস্থা করতে হয়।

নতুন বাজারের লোকদেরও অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই যথাসাধ্য তাদের বর্ধমান সম্পদ বাঁচিয়ে বাইরে রপ্তানি করে তার বদলে উন্নয়নের মালমশলা ও কৌশল আমদানি করতে হবে। একথা বোঝা সহজ যে অভীপ্সিত এই উন্নয়নের সুফল কেবল আগেকার বেকার দলই ভোগ করবে না, বাইরের লোকেরও তার থেকে লাভ অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবসায়েরও কাট্‌তি বাড়বে। সেইজন্য উন্নয়নের এই প্রাথমিক অবস্থায় বাইরের সাহায্যের যথার্থতা স্পষ্ট। কিন্তু আদিতে এ সাহায্যের প্রকার ও ধরন হওয়া চাই নিতান্ত সহজ ও সরল, কারণ দেখা গেছে ভারী কলকব্জা ও জটিল উৎপাদন-প্রণালী এ অবস্থায় অচল। সেই হেতু প্রস্তাবিত কর্মসূচীর জন্য বিরাট অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রশিল্পের উপরি-উৎপন্ন মাল দিয়ে ঐ চাহিদা মেটান চলে। সব সময়ে তার জন্য বিদেশী সাহায্যেরও দরকার হয় না, কারণ এ ধরনের অনেক শিল্পের কারখানা স্বদেশেই বিদ্যমান, আর তাদের মালিকরা প্রায়ই শোনা যায় অতি-উৎপাদনর ভয়ে শঙ্কিত। ক্রমশ এই পথে আদিতে নতুন কর্মীদের যে দলগুলি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ছিল তাদের একত্র ও শক্তিমান করে তাদের উৎপাদনের প্রসার করা সম্ভব। তারই সঙ্গে সঙ্গে বাইরের চল্‌তি অর্থব্যবস্থার সঙ্গে তাদের যে ব্যবধান তা' কমে আসতে বাধ্য। পরিশেষে ঘরোয়া ব্যবস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কারণ লোপ পাবে, অর্থসমাজ অখণ্ডিত অবস্থায় একতালে পা ফেলে চলতে সমর্থ হবে।

বেকার সমস্যার স্থায়ী প্রতীকারের জন্য যে পরিকল্পনার প্রয়োজন তার সামগ্রিক রূপ এতক্ষণে প্রতীয়মান হবে। এ পরিকল্পনা দুটি অধ্যায় বা ভাগে বিবেচনা করা দরকার। সমস্যার স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের উপায় প্রত্যেক দেশের বেকারদের অধুনা নিষ্ক্রিয় নিহিত কর্মক্ষমতাকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ক্রমে ক্রমে সক্রিয় করে তোলা। এইভাবে যে তাদের প্রথম থেকেই লাভজনক কাজে নিয়োগ করা যাবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধন উৎপাদনের ক্রমশ

প্রসার ঘটে ভবিষ্যৎ উপার্জনের ক্ষেত্রও অবারিত হয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের মত অনেক দেশেই বেকার সমস্যা আজ সবচেয়ে সঙ্গীন ও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর ও অপটু ছোট চাষী ও ভূমিহীন দিন-মজুরদের মধ্যে নয়, শহরবাসী মধ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও যন্ত্রশিল্পের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। একথা সত্য যে স্থায়ী উন্নতির যে দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-সূচীর নির্দেশ করা হয়েছে, শহরের অধিবাসীদেরও শেষ পরিণামে সেই পথ ব্যতীত অন্য কোনো গতি নেই। কিন্তু কার্যত সেই পরিকল্পনার মন্থরগতি রূপায়ণের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে বর্তমান অনেক রাষ্ট্রসংস্থাকেই প্রচণ্ড বৈপ্লবিক আলোড়নের সম্মুখীন হতে হবে, তখন কোনো পরিকল্পনার কোনো রূপ দেবার পথই আর থাকবে কি না সন্দেহ। তার জন্য আশু চিকিৎসা বা প্রাথমিক শুশ্রূষার মত আপাত ব্যবস্থারও প্রয়োজন। পরি-কল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রস্তাব তাই সমৃদ্ধ দেশগুলির উদ্বৃত্ত সম্পদ আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ গরীব দেশে সরবরাহ করা। যদি ডব্লিউ-এফ্-পি'র মতন কোনো প্রতিষ্ঠান কেবল অন্নসামগ্রী নয়, জীবনধারণের অন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীও এইভাবে পরিবেশন করতে পারেন তবে সব শ্রেণীর বেকারকেই তাদের উপযোগী অনেক জরুরী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব। এমন কি দেশের যেসব যন্ত্রশিল্প কাঁচামালের বা অন্য উপকরণের অভাবে কাজ বন্ধ করে শ্রমিক বিনিয়োগ করতে উদ্যত, তাদেরও চালু রাখার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তার জন্য চাই পণ্য দিয়ে সাহায্য, অর্থ দিয়ে নয়, আর সেই পণ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পোন্নত দেশের উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার থেকে অল্প খরচে দেওয়া চলে।

এ পর্যন্ত বেকার উদ্ধারের এ নির্দেশের ব্যাখ্যা হোল শুধু অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কিন্তু এ প্রস্তাবের সমর্থনে সামাজিক আর রাজনৈতিক যুক্তিও আছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশে সুসংহতভাবে উন্নতির পথই শ্রেয়, সেইজন্য হিংস্র বিপ্লবের সম্ভাবনা রোধ করা প্রয়োজন। সেই কারণে স্বল্পমেয়াদী আশু ফলপ্রসূ কার্যসূচীর প্রয়োজন। কিন্তু তারই সঙ্গে চাই দীর্ঘমেয়াদী এমন পরিকল্পনা যাতে দেশের জনসাধারণ নিজেদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল রেখে শিল্পব্যবস্থা ও অর্থসংস্থার উন্নয়ন, প্রসার ও জটিলতার মান উঁচু করতে পারে। অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিকাশ কেবল এইভাবেই সম্ভব। তার পরও কথা আছে। ধনোৎপাদনের কলাকৌশল যদি আপনার ঝোঁকে এগিয়ে চলে, সাধারণ মানুষ তার নিয়ন্তা না হতে পারে, তাহলে যেন ধনস্ফীতি ঘটে তা সমাজের উপকারে না এসে অপকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজদেহে তখন যেসব ব্যাধির সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্যের সবচেয়ে ধনাঢ্য দেশগুলি আজ তার তাড়নায় জর্জর। আমাদের তাই আর্থিক উন্নয়নের অন্য পথ অনুসরণ করা সমীচীন।

# ভাঙা আয়না

## সুধাংশু ঘোষ

এক ধরনের পোকা শালগাছের অরণ্যে ঝিঁঝির মতন ডেকে যায়। সেই ডাক অনেক চড়া এবং অনেক বেশী ধারাল। গান হয়ত, অথবা চিকন ডানার ক্ষিপ্র কম্পনের তীক্ষ্ণ ধ্বনি। মারাত্মক ধার শব্দটায়। ভাবনার পরত কেটেকেটে গভীরে নেমে যায়। সেই ধ্বনিতরঙ্গে একবার ডুবে গেলে খানিক পরে সে-বিষয়ে আর চেতনা থাকে না। সেই ধ্বনির বিরামহীনতাকে শব্দ-হীনতা মনে হয়। কখনো হাওয়া নতুন বাঁক নিলে অথবা কোনো কারণে পোকারা থামলে বোঝা যায়, শব্দটা ছিল।

সব দিকে শালের অরণ্য ছোটবড় পাহাড়ের ঢেউ ছেয়ে রয়েছে। দূর থেকে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু কোথাও ঘন সবুজের খাড়াই, কোথাও ঢাল। সবথেকে উঁচু পাহাড়টার পায়ের কাছে অনেকটা জায়গা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। বেশ কয়েকখানা ঘর তৈরি হয়েছে। কাঠের বেড়া, টিনের চাল, সিমেন্ট-করা মেঝে। স্নানের ঘরে জল এসেছে, ভেতরে-বাইরে বৈদ্যুতিক আলো। নাগরিক প্রাত্যহিকতার কিছু অত্যাবশ্যক উপকরণ অনেক দূর থেকে ছিটকে এসে পড়েছে এখানে।

একটা ডাকঘর দূর নগরের সঙ্গে সংযোগের সুতো ধরে রেখেছে। ডাকঘরটার ঠিক পেছন থেকে শালবন শুরু। ডাইনে বাঁয়ে, ওপর নিচে ছোটবড় ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। এখন বিশেষ কেউ ঘরের বাইরে নেই।

এক বস্তা সিমেন্ট কেমন করে যেন জমে গিয়েছিল। সেটা এখন ডাকঘরের সামনে পড়ে আছে একটা পাথরের চাঁইয়ের মতন। বেশ একটা গোলায়েম বসার জায়গা হয়েছে। তার ওপর এই উত্তীর্ণসন্ধ্যায় অমল একা বসে ছিল। শালবনের একটানা শব্দটা শুনছিল। সন্ধ্যের সময় শব্দটা বেড়ে যায়। পায়ের তলায় খুব শক্ত মাটি। দু ইঞ্চি খুঁড়লেই পাথরে ঘা লাগবে। মাটির ওপরেও পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ানো।

সন্ধ্যের পরে ঘরের বাইরে এমন একা বসে থাকা হয়ত পুরোপুরি নিরাপদ নয়। আলোর ভয়ে কোনো হিংস্র জন্তু হয়ত হাওয়া-কাঁপানো গর্জন করে এখানে লাফিয়ে পড়বে না, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে মৃদু শব্দ তুলে একটা বেপরোয়া ভালুক হয়ত সামনে এসে দাঁড়াবে না বিদূষকের মতন, কিন্তু কোনো উৎসাহী তরুণ ময়াল নিঃশব্দ সঞ্চরণে এগিয়ে এসে পা ছুঁতে পারে, একাধিক কুৎসিত কাঁকড়াবিছে বিষাক্ত হুল উঁচিয়ে এসে সিমেন্টের চাঁইটার তলায় ঢুকতে চাইতে পারে।

এমন কোনো অভিজ্ঞতার স্বাদ অমল এখনো পায়নি যার ফলে এইসব বিপদ বিষয়ে নিখাদ অনীহা এসে যাওয়া সঙ্গত। অবশ্য ব্যস্ততার কারণ নেই। তেমন অভিজ্ঞতার স্বাদ অমল পাবে, বেঁচে থাকলে পেতে হয়। তার তো জীবনের বড় অংশটাই এখনো সামনে। আসলে আজ যখন এখানে এসে বসেছিল তখনো ঠিক অন্ধকার হয়নি। তারপর অন্ধকার হলে, জায়গাটা ক্রমে নির্জন হয়ে এলে, উঠে ঘরে যাওয়ার কথা আর মনে আসেনি, কারণ এখানে বসে অন্য অনেক কথা মনে আসছিল।

কারো নদী থেকে দূরে এসে সবথেকে উঁচু পাহাড়টার পায়ের ওপর এই বেসক্যাম্প

তৈরি করার আগে সেই নদীর তীরেই প্রথম তাঁবু ফেলা হয়েছিল। সেখানে নাগরিক জীবনের প্রায় কোনো উপকরণ ছিল না। সেই তাঁবুতে ছমাস কাটিয়েছে অমলরা। এই শালের অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের শরীর থেকে লোহার চাঁই খুবলে নেবার আয়োজনে হাত মেলাতে এখন নতুন যারা আসছে, তারা কারো নদীর তীরের তাঁবুর দিনগুলোর ও বিশেষ করে রাত-গুলোর খবর রাখে না। বর্ষায় সেই নদীর হিংস্র দাপাদাপি তাদের তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুনতে হয়নি। খরার সময় সেই নদীর মাটি খুঁড়ে জল তুলতে হয়নি তাদের। কুড়ি-একুশ দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টি আর ঘনকুয়াশায় চরাচর নিশ্চিহ্ন হলে, দিনে এবং বিশেষ করে রাত্রিতে তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-বসে অজস্র অচেনা সুন্দর এবং কুৎসিত পোকা আর ছোটবড় সরীসৃপ তাদের দেখতে হয়নি।

তেমন পোকামাকড় এখনো বৃষ্টির সময় প্রচুর আসে। তবে এখানে ঘরের মেঝে সিমেন্ট-করা, বেড়া কাঠের, ওপরে টিন, বাইরে-ভেতরে বৈদ্যুতিক আলো।

সেটা উনষাট সালের ষষ্ঠ মাস। মাত্র দুমাস হল কারো নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হয়েছে। সন্ধ্যের পরে কেউ তাঁবুর বাইরে না গেলেও, ঠিক তাঁবুর সামনে অনেকে গোল হয়ে বসে রান্না চাপাতো। যে কোনো মুহূর্তে ভাঁড়ের মতন ভালুকের আবির্ভাবের জন্য তৈরি থাকতো। অমল বাইরে একটা খালি কাঠের বাক্সর ওপর অনেকক্ষণ বসে ছিল। একবার উঠে তাঁবুর মধ্যে গিয়েছিল কিছু আনতে। একটা অস্পষ্ট অচেনা শব্দ কানে এসেছিল। তাঁবুর ভেতরে তখন আলো ছিল না, আলো ছিল বাইরে, যেখানে কয়েকজন মিলে রান্না চাপিয়েছিল। সেই আলোর একটা চিলতে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল ভেতরে। তাঁবুর ঠিক মাঝখানের প্রধান খুঁটিটা জড়িয়ে একটা দীর্ঘ ময়াল পাকেপাকে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছিল। আলো চিকচিক করছিল তার মসৃণ শরীরে।

অমল ভয়ে চিৎকার করে লাফ মেরে বাইরে এলে, তাঁবুর সামনের কয়েকজন ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেছিল। তখনই বার্তা রটে গেলে সেখানে এসে জুটেছিল আর সবাই। প্রথমে ভয়ে ভয়ে, সাবধানে এগিয়েছিল তারা, তারপর ক্রমে হিংস্রতা বেড়ে গেলে তাদের সংখ্যাতীত আঘাতে সাপটা মরেছিল, মরার পর আগুনে পুড়েছিল।

মধ্যরাত পার হয়ে গেলে সেই তাঁবুতেই গিয়ে শুতে হয়েছিল অমলদের।

এসবের জন্য মনে কোনো খেদ ছিল না।

অমলের এই প্রথম চাকরি করতে আসা। এই চাকরি পেয়ে এখানে এসে পেঁছবার আগেই এখানকার জীবন কেমন হবে জানত। অস্পষ্ট হলেও আগে থেকেই একটা ধারণা ছিল। শহরবাসের নক্শার সঙ্গে এই আদিম অরণ্যে দিনরাত্রিযাপনের আদল মোটেই মিলবে না জানাই ছিল। প্রধানত সেই কারণে এখানকার কষ্ট ও বিপদের জন্য অমলের মনে কোনোই খেদ ছিল না। বরং এসবের জন্য প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, প্রায় কিশোরোচিত অহঙ্কার। অমলের বয়েসে, যদিও কৈশোর অনেকটাই পেছনে ফেলে এসেছে, এই কিশোরোচিত অহঙ্কার কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

ইদানীং অন্য কারণে তার মন তেতো হয়ে আসছিল।

চারপাশের ভূখণ্ড এবং অন্তঃসাগরীয় উৎসার থেকে এই বনাই-কিয়নঝড় পর্বতমালায় হাজার হাজার বছর ধরে যে-লোহার ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে, সবুজ অরণ্যে ঢাকা গাঢ় পিঙ্গল পাথর গুঁড়িয়ে সেই ঐশ্বর্য সংগ্রহের এমন আশ্চর্য আয়োজনে হাত মেলাতে পেরে অমল প্রথমে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছিল। ইংরেজরা কোনোদিন এদেশে এমন কিছু করেনি।

এই আয়োজন একেবারে নতুন, বিপুল। তার সঙ্গে আর যারা এসেছিল, এখনো আসছে, তাদের সবার প্রতি এক স্নিগ্ধ একাত্মতার অনুভবকে সানন্দে প্রশ্রয় দিয়েছিল অমল।

অথচ মাত্র এক বছরে এখানে নির্বাসিত লোকগুলোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নানাবিধ স্তরভেদের শক্ত দেয়ালে বারবার ঘা খেয়ে, কোনো কোনো মহলে নিঃশব্দচারী ময়ালের মতন গোপন মসৃণ লেনদেনের আঁচ পেয়ে, কখনো নেহাত আকস্মিকভাবে কারো মধুর হাসি মাখানো ঠোঁটের ফাঁকে স্বার্থের ধারাল দাঁত দেখতে পেয়ে অমলের মন ক্রমান্বয়ে তেতো হয়ে এসেছে। সেই স্নিগ্ধ একাত্মতার চেতনা ভোঁতা হয়ে গেছে। অরণ্যের এই নতুন বসতিতে বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় অন্য এক বিষ, অন্য এক হিংস্রতা দেখেছে অমল।

দু-মাস আগেও শালবন থেকে ছড়িয়ে পড়া শব্দটা শুনতে শুনতে প্রায়ই একটা মুণ্ডা মেয়ের বিলাপ মনে পড়ত। আজ এতক্ষণে এই প্রথম মেয়েটার কান্না মনে এল। প্রতিদিন নিস্পৃহতা বাড়ছে। সবারই হয়ত এমন হয়। এমন না হলে চলে না, বেঁচে থাকলে এমন হবেই। অমলের অনুভবের ধার মরে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় হয়ত কোনোই অনন্যতা নেই।

সেই রাত্তিরে খ্যাপা উল্লাসে ধাবিত কারোনদীর পাড়ে পাতলা অন্ধকারে ভিজে চুল, ভিজে কাপড়ে পা ছড়িয়ে বসে মুণ্ডা মেয়েটা শালবনের শব্দটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদছিল। কোনো সান্ত্বনার কথায় সে কান দেয়নি, উঠতে চায়নি সেখান থেকে। কয়েকজন মুণ্ডার সঙ্গে তাকে সেখানে রেখে অমলরা শেষ পর্যন্ত চলে এসেছিল।

সেই মেয়েটার নির্লিপ্ততাও এই ক'মাসে নিশ্চয়ই বেড়েছে। নির্লিপ্ততা প্রতিদিন না বাড়লে দিনযাপন অসম্ভব।

সেদিন অমল অকারণে মুখার্জিবাবুর সঙ্গে চাইবাসায় গিয়েছিল। তার যাবার কোনো কথা ছিল না। নিজের কাজ না থাকায় এমনিই গিয়েছিল। ক্যাশিয়ার মুখার্জিবাবু এখানকার প্রবীণতম কর্মীদের একজন। তাঁকে চাইবাসায় স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা আনতে যেতে হয়েছিল। এখানকার মজুররা সপ্তাহে একবার টাকা পায়। অমলদের মতন মাসে একবার মাইনে নিয়ে তারা কাজ করে না। আগের সপ্তাহে তাদের মজুরি আনতে দেরি হয়েছিল। দেখা গেল, ধৈর্য, সংযম ইত্যাদির নজির রাখবার অবস্থা তাদের নেই। খুব কম সময়ে অসন্তোষ বেড়ে উঠেছিল। চীফ কন্‌স্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার বড়বিলের এক চালের আড়তদারের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করলেন।

চীফ কন্‌স্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার টাকা ধার করতে কারোনদীর সেতুর ওপর দিয়ে জীপ চালিয়ে খনিশহর বড়বিলে গিয়েছিলেন এবং ফিরেছিলেন। পরের সপ্তাহে সেতুটা আর ছিল না, ভেঙে ভেসে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর স্রোতের সঙ্গে। অবশ্য তাতে বিশেষ দু-চার জন বরং খুশী। সেতু যতবার ভাঙে, কনট্রাক্‌টর কোম্পানি এবং এপক্ষের সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের তত বেশী লাভ। এখানে একবছর পূর্ণ হবার আগেই অমল এসব গোপন লেনদেনের কূটকৌশলের আঁচ পেয়েছিল।

খ্যাপা নদীটা হেঁটে পার হতে হবে জেনেও অমল মুখার্জিবাবুর সঙ্গ নিয়েছিল। অমল ছাড়া একজন সশস্ত্র পাহারাদার ছিল ক্যাশিয়ারের সঙ্গে।

চাইবাসায় বড় বেশী দেরি হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের লোকদের জন্য এত দেরি হল। প্রতি সপ্তাহে ব্যাঙ্ক থেকে এই লোহারখনির মজুরদের জন্য টাকা আসে। নেহাত নিয়মমাফিক কাজ। তবু কেন যে কয়েকখানা কাগজে হিসেব মেলাতে এত সময় লাগল! অমল চিরকাল দেখেছে, সভ্য শহরের অফিসে চেয়ার-টেবিলে যাঁরা বসেন তাঁদের নির্লিপ্ততার কোনো

তুলনা নেই। বাইরে থেকে কেউ হয়ত এসে প্রার্থীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারের লোকটি একটা কথা বলে দিলে অথবা আঙুল দিয়ে কাউকে দেখিয়ে দিলেই হয়ত প্রার্থী লোকটি কাজ শেষ করে চলে যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘ সময়েও একটা কথা মুখ থেকে খসে না। অথবা একটা আঙুল নড়ে না। নির্লিপ্ততা প্রাপ্তবয়স্কতার নজির হলে তাঁরাই সত্যিকার প্রাপ্তবয়স্ক, আর অধিকাংশ লোকই নাবালক।

চাইবাসা থেকে ফেরার সময় জীপে করে কারোনদীর তীরে পৌঁছেছিল। তখন সন্ধ্যে। নদীর এপারে আবার জীপ।

কয়েকটা মুণ্ডা মেয়ে-পুরুষ ছিল সেখানে। তারা হয়ত একটু দ্বিধা করছিল জলে নামতে। অজস্র ক্ষিপ্রগতি সাপের মতন নদীটা ছুটছিল বাঁদিক থেকে ডাইনে। খরার সময় এই নদী কেমন বিনীত হয়ে যায় ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এখন সেই ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতীর ঘূর্ণির ভাঁজেভাঁজে তারার মৃদু আলো মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মুখার্জিবাবুর সঙ্গে তাঁর পাহারাদার এবং অমল জলে নামল। মুণ্ডা মেয়ে-পুরুষ কটিও জলে নেমে এল প্রায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোথায় গিয়েছিল অমল জানে না। হয়ত বড়বিল, হয়ত বড়জামদা, আরো দূরের অন্য কোনো বাজারগঞ্জেও হতে পারে। এখন আবার বিবরে ফিরছে।

লম্বালম্বা লাঠি ছিল প্রায় সবার হাতে। হাত ধরাধরি করে, পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে, বারবার জলের তলার কাদায় লাঠি পুঁতে, দাঁতে দাঁত চেপে এগোচ্ছিল সবাই। মাঝামাঝি এলে জল কোমর ছাড়িয়ে উঠল।

একটা মুণ্ডা মেয়ে একটা বছর সাতের ছেলের হাত ধরে এগোচ্ছিল। এখন সে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে গেল। সেই মুহূর্তে পা সরে যাওয়ায় সে জলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মা নাকি মৃত্যুর পরও কোলের সন্তানকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু এই মেয়েটা তার ছেলেকে ধরে রাখতে পারল না। এই নদীতে কয়েনানদীর রহস্য নেই। কয়েনার সেই রহস্যজনক শক্তিমান সরীসৃপের অস্তিত্বের প্রমাণ এই নদীতে কেউ পায়নি। সাপে জড়ায়নি, ক্ষিপ্রগতি সাপের মতন স্রোত জড়িয়ে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে।

নদীটা তেমন চওড়া নয়। ওপারে পৌঁছতে বেশীক্ষণ লাগল না। ছেলেটাকে অনেক খোঁজা হল। তীর ঘেঁষে এক এক জায়গায় ভেসে-আসা ডালপালা জমেছিল। সেসব জায়গায় লাঠি দিয়ে মিথ্যেই প্রচুর খোঁচাখুঁচি করা হল।

অনেক পরে দাপাদাপি একটু কমলে মুণ্ডামেয়েটা ভিজে চুল, ভিজে কাপড়ে পা ছড়িয়ে বসে শালের অরণ্যের শব্দটা ও স্রোতের চাপা গর্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদছিল। মেয়েটা হরোমটো গ্রামের, যাযাবর মুণ্ডামেয়ে নয়।

এই বেসক্যাম্পের ডাকঘরের পেছন দিয়ে ঢালে নেমে গেলে খানিকটা দূরে সেই গ্রাম। দু-মাস আগেও ডাকঘরের পেছন থেকে অকৃপণ হাওয়ায় ভেসে-আসা শব্দটা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে সেই মেয়েটার বিলাপ মনে পড়ত। এখন আর তেমন মনে পড়ে না। ইদানীং নিস্পৃহতা বেড়েছে। এমন হবার কথাই ছিল। সবারই এমন হয়। না হলে দিনযাপন অসম্ভব। এক বছরে পাঁচ বছর বয়েস বেড়েছে। আশা হয়, এমন করে ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত-বয়স্কের মর্যাদা মিলবে।

এখন আর কেউ ঘরের বাইরে নেই। ডাইনে বাঁয়ে, ওপর নিচে, ছোটবড় প্রায় সব ঘরেই আলো জ্বলছে। অমল উঠে দাঁড়াল, নিজের ঘরে ফিরে যাবে। গা সিরসির করছে,

ঠাণ্ডা হাওয়া।

একদিন আশ্বিনের সকালে জীপ চলার উপযুক্ত নতুন তৈরি পথের পাশে গাঢ় পিঙ্গল পাথরের ওপর অজস্র শাদা শিউলি ছড়ানো দেখেছিল। সেই দৃশ্যটায় স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছিল। আর এক পড়ন্ত বিকেলে গামবুট পরা পা দিয়ে একটা ছোট পাথরের চাঁই ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেখেছিল, বিশ্বাস হয় না এমন বড় দুটো বীভৎস কাঁকড়াবিছে ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শূন্যে বিষাক্ত হুল নাচাচ্ছে।

প্রথম দৃশ্যটা খোয়া গেছে। শুধু দ্বিতীয় দৃশ্যটা আরো বেশী নাটকীয় তীব্রতা পেয়ে প্রায়ই চোখের সামনে কাঁপে।

## দুই

বনাই-কিয়নঝড় পর্বতমালার শিরায় শিরায় সঞ্চিত লোহা খুবলে নেবার জন্য যে কয়েকশো লোক শালের জঙ্গলে এসে জমেছিল, নতুন বছরে এক আশ্চর্য ঘটনায় তাদের সামনের সব কিছুর রঙ বদলে গেল।

খনিশহর বড়বিল এবং রেলস্টেশন বড়জামদার সঙ্গে এই বেসক্যাম্প প্রথম থেকেই যুক্ত ছিল। পাহাড়ের খাড়াই ও ঢালে এবং কিছুটা সমতলে জীপ চলার মতন রাস্তা বানিয়ে যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছিল। কারোনদীর প্রথম অস্থায়ী সেতু ভেঙে যাবার পর আবার নতুন সেতু তৈরি হয়েছিল। এখন পাহাড়ের চুড়োর আসল কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে বেসক্যাম্পকে যুক্ত করা হচ্ছিল। পাহাড়টার কোমর জড়িয়ে-জড়িয়ে, পাথর কেটে, জঙ্গল সরিয়ে একটা পথ প্রসারিত করা হচ্ছিল চুড়ো পর্যন্ত। চুড়ো থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটা টুকরো শহর গড়া হবে। সেই টাউনশিপের পরিকল্পনা চলছিল।

বেসক্যাম্পের একটা ঘরে বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটা স্কুল হয়েছে। সেখানে কাউকে বাংলা, কাউকে ইংরেজি, কাউকে হিন্দির মাধ্যমে পড়ানো হবে। এক ডাক্তার আগেই এসে একটা ঘরে ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সাজিয়েছিলেন। এখন সেই ঘরের বেড়ার গায়ে ঝোলানো একটা কালো সাইনবোর্ডে সাদা হরফে লিখে দেয়া হয়েছে: হাসপাতাল।

আয়োজনের ত্রুটি ছিল না, উত্তেজনার কমতি ছিল না।

কিন্তু সেবার একটা কষ্ট দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। বেসক্যাম্পে স্নানের ঘরে অথবা অন্য কোথাও জল আসছিল না। অনেক উঁচুর একটা সরু তেজী নদীর জল পাম্প করে টেনে নিয়ে পাইপ দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছিল। সেই নদীটা কোনো কারণে বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ বিরতির পর এক-এক ফোঁটা জল পড়ছিল স্নানের ঘরে রাখা পাত্রে।

এমন কষ্টের দিনে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা নিদারুণ চমক দিল।

তখন রবিবারের দুপুর। সূর্য ঠিক শীর্ষবিন্দুতে নেই, একটু গড়িয়ে গেছে পশ্চিমে। ছুরির ফলার মতন রোদ ঝলসাচ্ছিল। অমলের বারান্দায় সুনন্দ, নিরঞ্জন আর কিষেণচাঁদ জমিয়ে বসেছিল তাসের আড্ডায়। বেশী বকবক করছিল, হারজিত নিয়ে ঝগড়া করছিল সুনন্দ, অমলের মতন অ্যাসিস্টেন্ট সার্ভেঅর এবং তার ঠিক পাশের ঘরের বাসিন্দা। অথচ সুনন্দরই সবার থেকে বেশী সংযত থাকার কথা। তার বয়েস অন্য তিনজনের থেকে তিনচার বছর বেশী।

আঠার মাইল দূরের রেল-স্টেশনের দিক থেকে একখানা জীপ খাড়াই বেয়ে হিল

গীয়ারে একটানা গর্জন করে ওপরে উঠে এল। দুপাশের কোয়ার্টারের সারির মাঝখানে পাথুরে রাস্তা দিয়ে জীপখানা অমলের ঘরের কাছে এলে দেখা গেল, ড্রাইভারের পাশে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার রায় এবং পেছনের আসনে এক পরম বিস্ময়। সুনন্দ যেন আঁতকে উঠল, একটা দুর্বোধ্য শব্দ খসল তার মুখ থেকে।

জীপের পেছনের আসনে বসে একটি আনকোরা তরুণী সামনে আর দুপাশে তাকাচ্ছিল। অমলের বারান্দার দিকেও একবার তাকাল। তার দৃষ্টিতে ক্লান্তি, কৌতূহল, বিস্ময় কোনোটাই ছিল না, অথবা এসবই মেশানো ছিল। ঠিক কী যে ছিল, অতটুকু সময়ে বোঝা গেল না। অথচ অতটুকু সময়েই দেখা গেল, তার চুলের বিন্যাস বিচিত্র, বরং বলা যায়, কোনোই বিন্যাস নেই, শুধু ডানপাশে অস্পষ্ট সিঁথি করে পুরুষদের মতন চুল উল্টে দিয়েছে, কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে চুল, হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। তার হালকা রঙের শাড়িতে পাড় আঁচলা ছিল না; তার হাত, কান, গলা একেবারে নিরলঙ্কার। এমন দুপুরে এই আদলের মেয়েদের চোখে প্রায়ই রোদ্দুরের চশমা থাকে। তার চোখে রোদ্দুরের চশমা ছিল না।

জীপখানা সোজা খানিকটা গিয়ে আবার ডানদিকে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিরঞ্জন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'রায়ের কেউ হবে হয়ত, বেড়াতে এসেছে।'

'কী আমার বেড়াবার জায়গা রে!' সুনন্দ খেঁকিয়ে উঠল।

অমল আর কিষেণচাঁদ কোনো মন্তব্য না করলেও চারজনই বিস্মিত এবং অস্থির, হয়ত সুনন্দ অন্যদের থেকে একটু বেশী। বনাই পর্বতমালায় আর কোনোদিন এমন কেউ এসেছে কিনা জানা নেই। দূর সভ্য শহরেও এমন মেয়ের দেখা সব সময় মেলে না। এমন মেয়ে এখানে কেন, এই আদিম অরণ্যে!

এখানে কিছু কিছু অফিসার ও কর্মীর স্ত্রীরা আছেন, তাঁদের বাচ্চারা আছে। বড় ছেলেমেয়ে প্রায় একটিও নেই, যার যার শহরে নগরে রয়ে গেছে, স্কুল-কলেজের খাতিরে রয়ে গেছে। দুচার জন অফিসারের কমবয়সী স্ত্রীরা তাঁদের চারপাশে শহুরে পরিমণ্ডল রচনায় নিপুণ। তথাপি, একটু দেখেই মনে হল, তাঁদের এবং জীপের পিছনের আসনের মেয়েটির মাঝখানে দুস্তর ফারাক।

যখন তখন ঠোঁট বেঁকিয়ে নোংরা মন্তব্য করা সুনন্দর স্বভাব। যাকে বলে পরিশীলিত রুচি সে-জিনিসের বালাই তার নেই। কারো প্রতি শ্রদ্ধা নেই, মন থেকে বিস্ময়-বোধ খারিজ হয়ে গেছে। এখন নিজের থুতনিতে সযত্নে আঙুল বুলোতে বুলোতে স্বগতোক্তি করছিল : 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।'

তাসের আড্ডার দই কেটে গিয়েছিল। হারজিত নিয়ে আর ঝগড়া করছিল না সুনন্দ। এমন চালে থুতনিতে আঙুল বুলোচ্ছিল যেন কোনো গভীর ভাবনায় মগ্ন।

নিজের থুতনির প্রতি এত স্নেহের অবশ্য একটা কারণ ছিল। এক চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সফলতার সুখ সুনন্দ চেখে চেখে দেখছিল। আজ সকালে চা খেয়ে কাপের তলানি দিয়ে দাড়ি কামিয়ে সুনন্দ অমলের ঘরে এসেছিল মোলায়েম থুতনি দেখাতে। এমন আর কখনো শোনেনি অমল। সারা মুখে দাড়ির স্পষ্ট আভাস নিয়ে হাঁ করে সুনন্দর পরিচ্ছন্ন গালের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। জলের অভাব যতই থাক, চায়ের তলানি দিয়ে দাড়ি কামাবার কথা তার কখনো কল্পনায় আসেনি।

সুনন্দ মাঝেমাঝে বড় জ্বালায়, অকারণে নানাবিধ অশান্তি ডেকে আনে। তবু এখানে সে-ই অমলের ঘনিষ্ঠতম। বছর তিনেক বয়েসের ফারাক থাকলেও তারা একসঙ্গে ছিল ধানবাদে। সুনন্দ পরীক্ষায় ফেল করে করে অবশেষে অমলের বছরে পাশ করেছিল।

আসলে এখানে সুনন্দ বেমানান। ওকে মানায় সকাল-সন্ধ্যেয় কলকাতায় ভবানীপুরের সিনেমা হাউসের পাশের সেই বিখ্যাত চায়ের দোকানে। বেকার হলে বেশী মানায়, বাপের দু পয়সা থাকলে আরো বেশী। যে শুধু একদল দোস্তসহ চা-কফির আসরে সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখে জ্বালা ধরিয়ে জীবনযৌবনের নানাবিধ দুর্জ্ঞেয় রহস্য ফাঁস করার দায়িত্ব নিয়ে জন্মেছে এখানে সে ছটফট করবেই। শুকনো নেশা ছাড়িয়ে লম্বা একপা এগিয়ে গেলেও ঠাণ্ডা হবে না। তথাপি, বাইরে প্রচুর অসন্তোষ দেখালেও, সুনন্দকে কখনো সত্যিকার অখুশী মনে হয় না। একদা অমলের ধারণা ছিল, এই ধরনের ছেলের কোনো প্রচ্ছন্ন গভীর দুঃখ থাকে। ইদানীং সেই ধারণা বদলেছে।

তাসের আসর ভেঙে গেলে, সুনন্দ, কিষেণচাঁদ, নিরঞ্জন উধাও হলে, একা ঘরে শুয়ে এইসব ভাবছিল। বিশেষ করে এই রোদ্দুরে নিজের ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে সুনন্দ কোথায় যেন গেল দেখে তার বিষয়ে এইসব ভাবছিল। অমলের হয়ত একটু ঘুমোবার বাসনা ছিল। ঘুম আসছিল না। রবিবারেও নানা জায়গায় ব্লাস্টিং হচ্ছিল। পাথর ফাটিয়ে জমি সমান করা হচ্ছে। মাঝেমাঝেই সেই বিস্ফোরণের শব্দ।

কখনো জেগে এপাশ-ওপাশ করে, কখনো একটু ঘুমিয়ে, কখনো তন্দ্রাচ্ছন্নতায় পুরো বিকেলটা কেটে গেল। অল্পক্ষণের ঘুমের মধ্যেই একটা স্বপ্ন দেখছিল। প্রায় সময়েই স্বপ্ন ঠিক নিটোল হয় না, কোনো পরিণতিতে পেঁছবার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। এ-স্বপ্নটাও তেমন ছিল। অমল দেখছিল, একটা প্রাচীন শালগাছের গোড়ায় করাত লাগিয়ে সে আর সুনন্দ টানছে। গাছটাকে কাটতে চায়। দুজন দুপাশ থেকে কয়েকবার টানতে করাতটা গাছের গায়ে খানিকটা বসে গেল, কিছু কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তখন একদল মুণ্ডা মেয়ে-পুরুষ ছায়ার মতন এসে, অনেকটা দূরে তাদের এবং গাছটাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। মনে হল যেন তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধনুক। আর একবার করাতটা ওপাশ থেকে এপাশে টানতে তারা সবাই পিঠের ওপর থেকে একটা করে বিষাক্ত তীর তুলে নিল। তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে ধনুকের ছিলা কান পর্যন্ত টেনে সেই তীক্ষ্ম তীর ছেড়ে দিল সবাই একসঙ্গে।

স্বপ্নের তীরের ফলা তাদের শরীর স্পর্শ করার আগেই অমলের ঘুম ভেঙে গেল।

হাওয়ায় খোলা জানলার পর্দাটা উড়ছিল। পর্দাটা ঘরের ভেতরের দিকে উড়ে ওপরে উঠে গেলে, বিছানা থেকেই দেখল, তার কোয়ার্টারের সামনে জীর্ণ শালগাছটা দাঁড়িয়ে আছে। বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে তার ঘরের দিকে। গাছটাকে কেটে ফেলা খুব দরকার। নাহলে কখন ঝড়ো হাওয়ায় ঠিক তার ঘরের ওপর ভেঙে পড়বে।

এখানে গাছ কাটতে হলে বিভিন্ন তরফের অনুমোদন চাই। তাছাড়া মুণ্ডারা গাছ কাটার বিরোধী। গাছ তাদের দেবতা। অথচ এর মধ্যেই অনেক গাছ নির্মূল হয়েছে এবং মুণ্ডা মজুরও নিযুক্ত হয়েছে সে-কাজে। গাছ কেন মুণ্ডাদের দেবতা তার একটি অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা দিতে সুনন্দ উৎসাহী।

জানলায় সুনন্দ উঁকি দিল: 'বিছানায় পড়ে পড়ে কী করছিস? সন্ধ্যে হয়ে এল যে।'

অমল ম্লান হেসে বিছানা থেকে উঠল। এগিয়ে এসে দরজাটা খুলবার আগেই শুনতে পেল, সুনন্দ অস্থির হাতে দরজায় ধাক্কা মারছে। যেন খুব জরুরী কাজে এসেছে।

ভেতরে এলে সুনন্দকে মনে হল অত্যন্ত আত্মতুষ্ট। মসৃণ গালের সুখের স্বাদ নিশ্চয়ই এখনো জিভে লেগে নেই। অন্য কোনো সার্থকতার স্বাদ হয়ত পেয়েছে ইতিমধ্যে। অবশ্য, অমল লক্ষ্য করেছে, সুনন্দর হাসির মধ্যে প্রায়শই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ শানানো থাকে।

ঘরে এসেই খুশীখুশী গলায় বলল, 'সব খবর নিয়ে এলাম।'

'কিসের?'

'দুপুরবেলার সেই জীপের রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল।'

এবার উৎসাহ দেখাল অমল : 'কী খবর এনেছিস?'

মুহূর্তে অন্যপ্রসঙ্গে চলে গেল সুনন্দ : 'একটু চা কর। জল রেখেছিস, না আমার ঘর থেকে আনব?'

অমল কিছু না বলে হিটারে চায়ের জল চাপাতে গেল। কিছুক্ষণ সুনন্দ ওদিক দিয়েই যাবে না। কোন্ মহল থেকে কী খবর এনেছে, কিছুতেই এখনই বলবে না। নাটুকে উৎকণ্ঠা জমাতে সুনন্দ নিপুণ। প্রথমেই হয়ত বলবে, 'একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।' শ্রোতারা আগ্রহ দেখালে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাবে। হয়ত একঘণ্টা সেই বিশ্রী ব্যাপার সম্বন্ধে তার মুখ থেকে আর একটি কথা খসবে না।

সুতরাং এখন ওকে খুঁচিয়ে লাভ নেই।

সব সরঞ্জাম গুছিয়ে অমল চা তৈরিতে মন দিল। কেন যেন অস্বাভাবিক নিষ্ঠা এল কাজে। এমন অকারণে সুনন্দকে যতটা সম্ভব ভাল চা খাওয়াবার প্রেরণাটা কেন এল বুঝল না। সুনন্দ ততক্ষণ চেয়ারে এলিয়ে বসে গুনগুন করছিল।

খানিক পরে চায়ের কাপ শূন্য করে, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সুনন্দ বলল, 'নাম নয়নতারা মজুমদার। এসেছে চাকরি নিয়ে। স্কুলে বাচ্চাদের পড়াবে। টাউনশিপ তৈরি হলে প্রাইমারি স্কুলটাকে বড় করা হবে।'

তবু সব রহস্যের মীমাংসা হল না। এমন মেয়ের এখানে এমন স্কুলে চাকরি করতে আসা অভাবনীয়।

অমল বলল, নিরঞ্জনের মনে হয়েছিল, রায়ের আত্মীয়া হতে পারে, এখানে বেড়াতে এসে থাকতে পারে।

'নিরঞ্জনের এমন অনেক কিছু মনে হয়। ওর মাথায় কিছু নেই, আমি অনেক দিন থেকেই জানি। তবে, বলা যায় না, রায়ের সঙ্গে কোনো দূর এবং মধুর সম্পর্ক থাকতেও পারে।' সুনন্দ মন্তব্য করল ঠোঁট দুটো বাঁদিকে সামান্য টেনে।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আজ রাতটা রায়দের ওখানে থাকবে। কিন্তু কাল চলে যেতে হবে নিজের কোয়ার্টারে। রায়ের বউ রোজরোজ আদর করে ঘরে রাখবে না।'

'তুই এসব কার কাছ থেকে শুনলি।'

সুনন্দ শুধু মৃদুমৃদু হাসল। এ ব্যাপারে সে সাংবাদিকদের মতন কঠোর। প্রাণ গেলেও সংবাদের গোপন উৎস বিষয়ে কিছু কবুল করবে না।

## তিন

সব ছুটির দিন ওরা আসে না। সব ছুটির দিন তাসের আড্ডা জমে না। বারবার দেখেছে, সুনন্দ এলে কোনো না-দেখা সুতোর টানে আরো কয়েকজন আসে। সুনন্দই আড্ডা জমায়। সুনন্দ এখানে অমলের ঘনিষ্ঠতম, দুজনের পাশাপাছি কোয়ার্টার, অথচ প্রায় রবিবার সুনন্দ অন্তত বিকেল সন্ধ্যেয় নিজের ঘরে থাকে না, অমলের ঘরেও আসে না। অমল ছাড়া অন্য দোস্তদের মজলিশে গিয়ে জমে। তখন কেমন একা-একা লাগে, বিশেষ করে শেষ বিকেলে শালের ছায়াগুলো প্রসারিত হওয়ার সময়। সুনন্দর অন্য দোস্ত-দের মজলিশে ভিড়ে পড়বার মতো কলজের জোর অমলের নেই। জীপ চলার মতো চওড়া পথের পাশে, দুটো পথের কাটাকুটির কোণে ওরা উঁচু মাচার ওপর কয়েকটা কাঠের গুমটি ঘর করেছে। সন্ধ্যের মুখে গুমটি ঘরের মাচায় বসলে কার কেমন চাকরি, কেমন পদমর্যাদা, মালুম হয় না। সেখানে নানাবিধ শুকনো ও তরল নেশা, হাঁটুতে চাপড় মেরে চিৎকার। সামনে কয়েক হাত দূরে ধুনি জ্বলে। খানিক রাত্তির হলে সুনন্দ হয়ত দারোয়ানদের একটির কাঁধে হাত রেখে কোয়ার্টারে ফেরে।

সুনন্দর আচরণ মোটেই নতুন নয়। কিছুটা মাঝারি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর মতন। অমল আগে এমন দেখেছে।

এক রবিবার ওরা এল না। সুনন্দও ঘরে নেই। একা চুপচাপ বসে সন্ধ্যে হওয়া দেখবে না বলে অমল রোদ্দুর পড়লে মুণ্ডাদের গ্রামটার দিকে নামছিল। বেসক্যাম্প থেকে অল্প দূর, ঢাল বেয়ে খানিক সমতলে নামতে হয়।

মুণ্ডাদের হরমটো গ্রামে দেখবার মতন তেমন কিছু নেই। বাঙলাদেশের গ্রাম থেকে বিশেষ আলাদা মনে হয় না। বৈশিষ্ট্য হিসেবে শুধু চোখে পড়ে, পাথুরে মাটির ঘরগুলোর খোলার চাল বড় নিচু, উঠোন আর চাষের জমি কত ছোট। বিস্তার নেই, পাহাড়ের বেষ্টনি তিন দিকে।

বৈশাখের শেষে খরার জ্বালা কমে এসেছিল। দুদিন বৃষ্টি হয়েছিল সামান্য। ধুলো কিছু ধুয়ে যাওয়ায় পাতার রঙ খুলেছে। এক সারে কয়েকখানা ঘরের ঠিক পেছনে তিনটে চাষী জমিতে লাঙল দিচ্ছে। সামনের লোকটার বয়েস বেশী, বুকের হাড় ঠেলে উঠেছে, পেছনের দুজন স্বাস্থ্যবান তরুণ। তিন জোড়া রুগ্ন গরু পাথুরে জমি কেটে এগোতে প্রায় ফৌত। দুখানা ঘরের মাঝখানে একটি করে লাউমাচা। বড় বেশী সাজানগুছোন।

পরিচ্ছন্ন উঠোন এবং লঙ্কা পেঁপে লেবুর পাতায় তখনো অল্প রোদ ছিল। বিকেল হয়ে এল তবু একটা পাখি উড়ছে না। ব্লাস্টিংয়ের শব্দে পাখিরা ক্রমান্বয়ে গভীরতর অরণ্যে সরে গেছে। অমল দেখল, য়্যান্ড্রিয়াসের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। থিয়োডোলাইট, রেঞ্জিং রড, ডাম্পি লেভেল ইত্যাদি নিয়ে সার্ভেঅরদের সংগে সংগে ঘোরা য়্যান্ড্রিয়াসের কাজ। অমল প্রথম দিন তার সংগেই এই গ্রামে বেড়াতে এসেছিল। আজ হয়ত য়্যান্ড্রিয়াস সুনন্দ-দের মজলিশের মতন কোনো আড্ডায় গিয়ে জমেছে। অমল জানে, এখনো য়্যান্ড্রিয়াসের ঘরে বউ আসে নি। তবে তার বোন শুকমতীর ঘরে থাকবার কথা। সে হয়ত গলায় কাঠের ঘণ্টিবাঁধা মোষের খোঁজে গেছে।

খানিক এগোলে এতোয়ারির ঘর। জমিতে লাঙল চেপেধরা যে লোকটার বুকের হাড় ঠেলে উঠেছে, এতোয়ারি তার জরু। কারো নদীর স্রোতে তার একটা ছেলেকে ছিটকে যেতে

অমল দেখেছিল। এখন এতোয়ারির ঘরের সামনে এসে অমল খুব নতুন কিছু দেখে থমকে দাঁড়াল। এর জন্য মোটেই তৈরি ছিল না।

দাওয়ায় মোড়ার মতন কিছুতে নয়নতারা বসে আছে। তার পাড়হীন হালকা সবুজ শাড়িতে শেষবেলার রোদ্দুর। তাকে ঘিরে উদম অথবা সামান্য নোংরা কাপড় জড়ানো এক-পাল ছেলেমেয়ে। এতোয়ারি অবিরাম দুটো হাতই নেড়ে কী সব বলছে। কথায় কুলোচ্ছে না বলে হয়ত এত বেশী হাত নাড়ছে। নয়নতারার যেন প্রচুর মনোযোগ, গালে হাত দিয়ে এতোয়ারির কথা শুনছে।

সবাই অমলের দিকে ফিরে তাকাল। তখন অমল এতোয়ারির ঘরের দিকে এগোচ্ছিল। নয়নতারা খুব স্বাভাবিক একটু হাসল, যেন মুণ্ডাদের গ্রামে নয়—বেসক্যাম্পে ডাকঘরের দরজায় দেখা হয়েছে। আপনাকে তো চিনি, সেই যে সেদিন সাহুর দোকানের সামনে দেখা হয়েছিল, রায়বউদি আলাপ করিয়ে দিলেন—নয়নতারার হাসিতে শুধু এই পূর্বপরিচয়ের স্বীকৃতি ছিল। অমল তেমন সহজ করে, অল্প ঠোঁট টেনে সামান্য দাঁত দেখাতে পেরেছে মনে হল না, কারণ তার চোখে বিস্ময়ের ধার ছিল। নয়নতারাকে এখানে দেখবার জন্য তৈরি ছিল না।

অমল মুখ খুলবার আগে নয়নতারাই দাওয়া থেকে নেমে এসে বলল, 'আপনারা এদিকে আসেন নাকি?'

অমল ঠিক এই প্রশ্নই করতে চেয়েছিল নয়নতারাকে। অথচ মুখ খুলবার অবকাশ মিলল না। আসলে অমল কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল এবং এতোয়ারির উঠোনে এসে সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন ভাবছিল, আমরা তো এদিকে অবশ্যই আসি। জঙ্গলে পড়ে আছি; দূরের খনি শহর এবং কাছের লোকালয়ের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্বাভাবিক। আমি নিজে অন্তত প্রায়ই এদিকে আসি। এই গ্রামের দশজনের বেশী আমার পরিচিত। নয়নতারা হয়ত আত্মগরিমায় ভুগছে। ভেবেছে, মুণ্ডাদের এই গ্রাম বেসক্যাম্পের প্রাত্যহিকতার নকশার বাইরে এবং সেই নকশা ছিঁড়ে জীপ চলার রাস্তা ছেড়ে ঢালে খানিক নেমে এখানে বেড়াতে আসবার মতো রগরগে উৎসাহ একমাত্র তারই আছে। এমন না ভাবলে অমলকে ওই প্রশ্ন করবে কেন। অবশ্য এসব সত্যি না-ও হতে পারে। বাইরে থেকে খুব সপ্রতিভ দেখালেও সবাই তা নয়। কিছু একটা বলার জন্যই ওকথা হয়ত বলেছে।

নয়নতারাকে উঠতে দেখে বাচ্চাগুলোর চকচকে চোখ কেমন নিভে গিয়েছিল। এতক্ষণ সম্ভবত তারা উত্তেজিত ছিল, আশা করছিল তাদের সামনেই নয়নসুখ কিছু ঘটবে। অথচ হঠাৎই হালকা সবুজ উঠোনে নেমে গেল। নয়নতারাকে ঘিরে বাচ্চাগুলো কিচিরমিচির করছিল। তাদের চুল টেনে দিয়ে আদরটাদর করছিল নয়নতারা। তার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে, অমল তখন মেয়েটা অহমিকায় ভুগছে কিনা ভাবছিল।

উঠোনের পাশে একটা সেগুনগাছের ছায়ায় এসে নয়নতারা আবার বলল, 'চলুন, ফিরবেন তো এখন? আপনাদের সহকর্মীদের ছেলেমেয়েরা ছাড়া এই গ্রামের বাচ্চারাও আমার স্কুলে যেতে রাজী কিনা তার খোঁজখবর নিতে আমি এসেছিলাম। আপনি? কোনো কাজ ছিল?'

অমল এতক্ষণে বলতে পারল, 'এমনিই। এদিকে আসি মাঝে মাঝে। আজ কোনো কাজ ছিল না। এখানে অনেকে আমার চেনা।'

খাড়াইয়ের দিকে এসে নয়নতারা বলল, 'এই প্রথম এদিকে এলাম। আমি ভেবেছিলাম,

এদের ঘরগুলো হবে উঁচু মাচার ওপরে। অন্য পাহাড় অঞ্চলে সেই রকম দেখেছি। নিরাপত্তার জন্য ওরা উঁচু মাচার ওপরে ঘর বানায়।'

কথাটা প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নেই, তবে অমল আগে কখনো ভেবে দেখেনি। নয়নতারা যেমন অবলীলায় খাড়াইয়ে উঠছিল, অমল বুঝল, পাহাড় অঞ্চলের অভিজ্ঞতা অবশ্যই আছে। সহজ হবার চেষ্টায় বলল, 'মুণ্ডাদের গ্রামটা আপনার ভাল লাগলে ওদের বিয়েটিয়ের সময় আসবেন। আমি একবার দেখেছি। ভারি মজা হয়। হাঁড়িয়াটাড়িয়া প্রচুর চলে অবশ্য। নতুন বউকে একটা ঘরে রেখে দরজা আগলে দাঁড়ায় তিনচারটি জোয়ান। নতুন বর তাদের হটিয়ে বউ জয় করে আনে।'

নয়নতারা মৃদু শব্দ করে হাসল। সহজ পথ দেখাবার অথবা, ভাবতে লজ্জা কি, হাত ধরে একটু সাহায্য করার বিন্দুমাত্র সুযোগ অমলকে না দিয়ে খাড়াই পার হয়ে এল। আলো কেমন আকস্মিকভাবে চলে গিয়ে সন্ধ্যের ছায়া নেমেছে। বেসক্যাম্পের সব আলো জ্বলে উঠেছে। নয়নতারার কপাল ঘামে ভিজে চিকচিক করছিল। অমল একবারই মাত্র দেখল। ওর মুখের দিকে তাকানো কঠিন। নয়নতারা এমন নিষ্পলক চোখে তাকায়, গা সিরসির করে।

ডাকঘরের কাছে এসে অমল নিজের কোয়ার্টারটা দেখাল। একটু দ্বিধার পর বলল, 'আসবেন?'

'আজ থাক। আমার ওখানে আজ সন্ধ্যেয় দু-একজনের আসবার কথা আছে। আর একদিন আসব।'

নয়নতারার চলে যাবার সময়ের নিয়মমাফিক হাসিটা আশ্চর্য সরল।

চৈত্রের এক দুপুরে নয়নতারা মজুমদার এখানে এসেছিল। পরের আষাঢ়ের মধ্যেই সে প্রায় সবার আলোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠল।

বছরে অন্তত চার মাস এখানে কাজে মন্দা আসে। একটানা বৃষ্টিতে সব সংকল্প ঢিলে হয়ে যায়। বৃষ্টির সঙ্গে কুয়াশা আসে। খাড়াই থেকে ঢালের অজস্র ফাটল বেয়ে লোহা-ধোয়া কালচে রক্তের মতন নোংরা জল নেমে যায়। তখন প্রায় সবারই প্রচুর ফুরসত। তখন প্রায় সবারই জিভ ধারাল হয়ে ওঠে।

নয়নতারার নিন্দেয়, অমল দেখেছে, অনেকেরই জিভ আক্ষরিক অর্থে লালায়িত। স্কুলে পড়ানো নাকি তার অজুহাত মাত্র। কয়েকজন অফিসার তার আসল ছাত্র। তার কোয়ার্টারে তারাই তাকে প্রতি সন্ধ্যেয় ঘিরে থাকে। ঘরের বাইরে তারাই তার সঙ্গী। জীবনে যাকিছু সত্যিই জানাবার, সেই ছাত্রদের সে জানায়। রায়, বলা বাহুল্য, তার ছাত্রদের মধ্যে সব থেকে উজ্জ্বল।

অমলের এক-একবার মনে হয়েছে, এই ধরনের রসাল মন্তব্য করতে যাদের জিভ নেচে ওঠে, তারা দু-একবার কথার ফাঁকে কেমন অস্বাভাবিক নিঃশ্বাস চেপে রাখে। সচেতন প্রচেষ্টায় চেপে রাখলেও, সন্দেহ হয়, সেই নিঃশ্বাস দীর্ঘ আর বিলম্বিত।

কয়েকজন অফিসার ও কর্মীর স্ত্রীরা সব থেকে সোচ্চার। একটি নাম শুনলেই তাঁদের শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। পরস্পরের প্রতি তাঁদের কমবেশী ঈর্ষা ছিল। স্বামীর মর্যাদার মতন কিছু মামুলি উপকরণ ছিল তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্ত্র। অবশ্য তাঁদের মধ্যে দু-একজন বিয়ের আগের জীবনে একটু বেশী আলো পেয়েছিলেন এবং সেই আলোর

বিচ্ছুরণে জ্বলছিলেন অন্যরা। এখন সেই পারস্পরিক ঈর্ষার আর তেমন ধার নেই। বরং, অমলের মনে হয়েছে, একটি নামের ঘৃণ্য অনুষঙ্গ তাঁদের সবাইকে একই মঞ্চের দিকে টানছিল। নয়নতারার রক্তরঙ-নখশোভিত আঙুল একটি মাত্র সুতোয় বাঁধা অনেকগুলো পুতুলের মতন তাঁদের নাচাচ্ছিল।

নয়নতারার সঙ্গে দু-একবার সামান্য আলাপ, টুকরো কথা হয়েছে অমলের। আচরণে প্রচুর সৌজন্য। তথাপি তার সান্নিধ্যে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছে। মুখের দিকে প্রায় পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিতে গা সিরসির করে।

একদিন সেই মেয়ে ঠিক তাদের সামনেই একটা ছোটখাট দুর্ঘটনায় পড়েছিল।

অমল এবং সুনন্দ আরো দুচার জনের সঙ্গে হেঁটে ফিরছিল জাপানী বিশেষজ্ঞদের য়্যালিউমিনিঅমের ঘরগুলোর পাশ দিয়ে। একটা জীপ এগিয়ে আসছিল। কাছে এলে দেখা গেল, নয়নতারা একা, নিজেই চালাচ্ছে, অন্য কেউ নেই জীপে। মোড় নেবার সময় গাড়িটার একপাশ একটা শালগাছের গোড়া সামান্য ছুঁয়ে গেল। একটুক্ষণের জন্য স্টিয়ারিংটা তার হাতের শাসনে ছিল না। তখনই পাশের অগভীর ফাটলে একটা চাকা নেমে গেল।

উইন্ড স্ক্রীনে অথবা তার পাশে ঘা লেগে কপাল বেশ কেটেছিল। অমলরা সেই জীপে করেই তাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। অমলের হাতে স্টিয়ারিং ছাড়তে নয়নতারা সহজে রাজী হয়নি। দুর্ঘটনার পরই নিজেই জীপটা আবার চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল হাসপাতালে। হেসে হেসে অমলদের বলছিল, 'আমার কিছু হয়নি। কপালটা একটু ছড়ে গেছে। কপাল দিয়ে তো গাড়ি চালাতে হয় না।'

পরের কয়েকদিন অমল অনেককে বলতে শুনেছে: 'দুর্ঘটনার সময় নয়নতারা প্রকৃতিস্থ ছিল না। বেশী পানটান করে বেসামাল হয়ে পড়েছিল।'

ইতিমধ্যে সুনন্দ আরো কিছু তথ্য উপহার দিয়েছিল: 'ডিগ্রীটিগ্রী নেই রে। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ। একটা বিয়ে হয়েছিল, কাগজে সই-করা বিয়ে। কাটান-ছাড়ান হয়ে গেছে।'

## চার

বৃষ্টির মাসগুলোর শেষে বনাই-কিয়নঝড় পর্বতমালার শালবনের সবুজ উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল। পাতায় ডালে সঞ্চিত ধুলো-নোংরা ধুয়ে গিয়েছিল চারমাসের বৃষ্টিতে। আশ্বিনের শেষে আকাশ ঘননীল, টুকরো শাদা মেঘ ভাসছিল। দিনগুলো রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছিল, পাতার সবুজ আর পাথুরে মাটির কালচে রক্তাভার অমিল চোখে লাগছিল। রাত্তিরের হাওয়ায় হিম।

কাজের চাকার বেগ বাড়ছিল প্রতিদিন। চারমাসের শিথিলতার খোঁয়াড়ি ভাঙছিল।

সবথেকে উঁচু পাহাড়টার উত্তর-পশ্চিম ঢালে কাজ হচ্ছিল সব থেকে বেশী। ব্লাস্টিং হচ্ছিল ঘনঘন। একটা বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যাবার অল্প পরেই আর একটা শব্দ উঠছিল। চুড়োর খানিক নিচে থেকে পাহাড়টার শরীর কেটেকেটে গভীরে ঢুকছিল মজুররা, তার পাথরের তৈরি হৃৎপিন্ডটা খামচে ধরবার বাসনা। ঢালের ওপর থেকে নিচের দিকে একটার পর একটা লম্বা খাঁজ তৈরি হচ্ছিল সিঁড়ির মতন। এক-একটা খাঁজ ঠিক আদল পেলে কংক্রীট জমানো হচ্ছিল তার ওপর। পাথরের চাঁই গুঁড়িয়ে লোহার টুকরো ছেঁকে নেবার জন্য এখানে ক্রাশিং প্লান্ট বসানো হবে। জাপানী বিশেষজ্ঞরা আগেই এসে-

ছিলেন, এখন ভারী যন্ত্রপাতি আসতে শুরু করেছে। চোখের বাইরের জিনিস দেখবার অভ্যেস থাকলে মনে হবে, এই শালবনের বাতাসে ডলার আর ইয়েনের গন্ধ।

আকরিক লোহা সংগ্রহের এত বড় আয়োজন এর আগে এদেশে আর কখনো হয়নি। খনি এলাকা থেকে ক্রাশিং প্লান্টে যাওয়া-আসার প্রধান রাস্তাটাও তৈরি হচ্ছিল। বছর দেড়েকের মধ্যেই এই রাস্তা দিয়ে একটির পর একটি ডাম্পার পাথরের চাঁই বয়ে নিয়ে যাবে ক্রাশিং প্লান্টে।

সেই রাস্তার প্রত্যন্তে একটা জীপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অমল এই সব দেখছিল, ব্লাস্টিংয়ের শব্দ শুনছিল। দেখে দেখে অমলের বয়েসে মুগ্ধ হবার কথা। কিন্তু ইদানীং বিস্ময়বোধ আগের মতন নেই, অনেক শিথিল। তবু খুশী খুশী লাগছিল।

অমলের ঠিক ওপরের অফিসার রাঘবন এসে জীপে উঠলেন। পাহাড়টার চূড়োর কাছে যে প্রধান অফিসবাড়িটা তৈরি হচ্ছিল, সেখান থেকে এলেন। তাঁর অপেক্ষায়ই এখানে দাঁড়িয়েছিল অমল। মুন্ডা মজুর য়্যান্ড্রিয়াস আশপাশে ঘুরছিল। এখন উঠে বসল পেছনের আসনে। সারেন্ডা রেঞ্জের দিকে খনি এলাকার সীমানা মাপতে যেতে হবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অমল। ইচ্ছে করেই ড্রাইভার নেয়নি। ডাইনেবাঁয়ে ঘনঘন বাঁক নিয়ে, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, অসমান পাথুরে রাস্তায় জীপ নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে প্রচ্ছন্ন উল্লাসে শরীরে উষ্ণতা আসে। নিজের হাতে স্টিয়ারিং না থাকলে তেমন জমে না।

তখন সকাল। রাত্তিরের হিমে ভেজা পাতা সবে শুকিয়েছে। একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে অমল চেনা দৃশ্যটা আবার দেখল। ঘন পিঙ্গল পাথরের ওপর অজস্র শাদা শিউলি ছড়িয়ে আছে। পাপড়িগুলো শুকোয়নি এখনো।

অমল গাড়ি থামিয়ে দিতে একটা জোর ঝাঁকুনি লাগল। এতক্ষণ আর সব ধ্বনি ছাপিয়ে উঠেছিল জীপ চলার শব্দ। এখন গাড়িটা থেমে যাওয়ায় আকস্মিক নৈঃশব্দ্য বড় ভারী মনে হল।

রাঘবন বললেন, 'কী হল?'

'আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না দেখে থামালাম। এমন লাফ মেরে গাড়ি চললে সিগারেট ধরাতে অসুবিধে হয়। আপনি তো সিগারেট ছাড়া বেশীক্ষণ থাকেন না। ধরিয়ে নিন।'

রাঘবন সিগারেট ধরালেন। চোখে ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি মাখিয়ে অমলের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন: 'তুমি ফুল দেখছ।'

অমলও হাসল। ফুল দেখছিল সন্দেহ নেই। এখনো সেই বয়েসে পেঁছিতে একটু বাকী আছে যখন যারা ফুল দেখে, গন্ধ নেয়, তাদের দেখে দাঁতে দাঁত চেপে হাসবে।

প্রশ্রয় পেয়ে আরো ছেলেমানুষি করল অমল। নেমে গিয়ে শিউলি কুড়িয়ে আনল। তার আর রাঘবনের মাঝখানে সীটের ওপর রাখল ফুলগুলোকে। বাঁ হাতে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়ে য়্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। গাড়িটার প্রথম লাফেই অনেক ফুল ছড়িয়ে পড়ল তার ও রাঘবনের এবং এমনকি পেছনের য়্যান্ড্রিয়াসের পায়ের কাছে। পড়ুক। অমলের ওই ফুলের আর কোনো দরকার নেই। একটু ছেলেমানুষি করতে পেরেই খুশী।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। বস্তুত গাড়ি চলার শব্দের জন্য কথা বলতে হলে বড় চেঁচাতে হয়। অবশ্য বারবার বাঁক নেবার সময় গতি কমলে শব্দও কমছিল।

চড়াই-উতরাই পেছনে রেখে একটা সমতল অংশে নেমে এল। সেখানে রাস্তাটা খানিক দূর পর্যন্ত সোজাই গিয়েছে। এতক্ষণ রাস্তার একপাশে খাড়াই, একপাশে ঢাল ছিল।

এখন দুপাশের সমতলে ঘন জঙ্গল।

প্রায় একসঙ্গে নতুন একটা দৃশ্য তিনজনের চোখে পড়ল, এই অরণ্যের হিংস্রতার আনকোরা একটা প্রমাণ। শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার প্রায় পাশেই একটা মৃত প্রাণীর পেটের ওপর সামনের দু পা রেখে দাঁড়িয়েছিল ভয়ঙ্কর শক্তিমান হিংস্র জন্তুটা। এরা এখনো এত কাছে রয়েছে অমল ভাবেনি। ভেবেছিল, এত ব্লাস্টিংয়ের শব্দে অনেক দূরে সরে গেছে।

'কী করব?' অমল জীপ থামাবে, না গতি খুব বাড়িয়ে সোজা চলে যাবে জানতে চাইল।

রাঘবন কোনো মন্তব্য করার আগেই বাঘটা ডান দিক থেকে লাফিয়ে বাঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জায়গাটায় পেঁাছলে তিনি বললেন, 'রাখ, দেখি একটু।'

অমল জীপ থামাল। তার পিঠের ওপর দিয়ে রাঘবন ডান দিকে ঝুঁকে পড়লেন। রাস্তার প্রায় পাশেই একটা মরা শুয়োরের গা থেকে তখনো তাজা রক্ত ঝরছিল। একবার যেন প্রাণীটার পেট-পিঠের চামড়া শিউরে কেঁপে উঠল। এখনো বেঁচে আছে নাকি? এখনো বেঁচে থাকা স্বাভাবিক না। আতঙ্কেই তো মরে যাবার কথা। অমল হয়ত ভুল দেখেছে।

এখানে এমন থেমে থাকা কি ঠিক হচ্ছে? আজ সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী নেই। বাঘটা যদি কাছেই কোথাও থাকে! অমল জীপের ইঞ্জিন চালু রাখল।

হঠাৎ য়্যান্ড্রিয়াস লাফিয়ে নেমে শুয়োরটা জীপে তুলে নেবার অনুমতি চাইল রাঘবনের কাছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অমল চমকে উঠল। শুয়োরের মাংস খাবার জন্য য়্যান্ড্রিয়াস হন্যে হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো লোভে জ্বলজ্বল করছিল, জিভ মনে হল লালাসিক্ত। একটু আগে হিংস্র জন্তুটা দেখেও অমলের এত চমক লাগেনি।

এতক্ষণ প্রশ্রয়ে স্নিগ্ধ ছিলেন রাঘবন। এবারে অত্যন্ত রেগে গেলেন। জোর ধমক দিলেন য়্যান্ড্রিয়াসকে। ধমক খেয়ে য়্যান্ড্রিয়াস একান্ত অনিচ্ছায় জীপে ফিরে এল। তার জীপে ওঠার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, রাঘবনের হুকুম না মেনে যে-কোনো মুহূর্তে পেছন ফিরে শুয়োরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, মরা জানোয়ারটাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

অথচ য়্যান্ড্রিয়াস, আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে অমল ভাবছিল, অন্য সময়ে কত সংযত। বয়েস বেশী না, অমলের সমান হবে, তবু প্রবীণের মতন শান্ত। খাটতে কোনো অনিচ্ছা নেই, রোদ্দুরে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে, তবু সব সময় হাসছে। সার্ভেঅরদের সঙ্গে যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে বেড়ায়। অধিকাংশ দিন অমলের সঙ্গে থাকে। য়্যান্ড্রিয়াসের মুখের এমন চেহারা অমল আগে কখনো দেখেনি। অন্তর্মনের গোপন বাসনাগুলো লাফ মেরে বেরিয়ে এলে বাইরের চেহারা কেমন বদলে যায়!

অন্য সময়ে শান্ত য়্যান্ড্রিয়াস এখন বাঘের মুখের শুয়োর খাবার লোভে জানোয়ারের মতন হয়ে যাচ্ছিল দেখে ঘটনাটা অমলের মনে রয়ে গেল। না হলে এর মধ্যে মনে রাখবার মতন কিছু ছিল না। আগেও তো এই শালবনে হিংস্রতার মুখোমুখি হয়েছে কয়েকবার। এবং অমলের সেই সব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনন্য নয়। আরো অনেকেরই সেই স্বাদ পাওয়াই স্বাভাবিক। কারো কারো মুখে এ-ধরনের ঘটনার বর্ণনাও শুনেছে। আসলে এখানে এমন অভিজ্ঞতা না হওয়াই আশ্চর্য।

কয়েক মাস আগে মেঘাতুবুরুর পশ্চিমে সেগুনগাছের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গিয়েছিল সীমানা মাপতে। সেদিন য়্যান্ড্রিয়াস ছাড়া একটি সশস্ত্র রক্ষী ছিল সঙ্গে। রাঘবনও ছিলেন।

তখন কিশোর বয়েস সেই সযত্নবিন্যস্ত গাছগুলোর। প্রত্যেকটি মাত্র দশ ফুটের মতন উঁচু, অথচ পাতাগুলো অবিশ্বাস্য বড়। পাতার ছাউনির নিচে পায়ের তলার পাথুরে মাটিতে ভাল করে আলো পৌছয়নি। অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ। পাতলা অন্ধকারে কাজ করতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হাওয়ায় পাতা নড়লে আলোর শীর্ণ রেখাগুলো কাঁপছিল।

এক সময় পেছন থেকে রাঘবন আচমকা অমলের জামার কলার টেনে ধরেছিলেন। সামনে একটা দীর্ঘ ময়াল। বন্দুকধারী রক্ষীটি পরপর কয়েকটা গুলি ছুঁড়েছিল। ছায়া-অন্ধকারে জীপের টায়ারের মতন মোটা সাপটা কয়েকবার বীভৎস পাক খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে এসেছিল সবাই। মরা সাপটার শরীর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে রাঘবন রক্ষীটার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। একটাও কথা বলেন নি, কিন্তু রক্ষীর মুখে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টিতে বিরক্তি, ক্ষোভ, অসমর্থন মেশানো ছিল।

য়্যান্ড্রিয়াসের লোভ দেখে আজ অমলের আশ্চর্য লাগল; সেদিন রাঘবনের মুখের দিকে তাকিয়েও বিস্মিত হয়েছিল। আজ মরা শুয়োরটার কাছে রাঘবনের কথায় জীপ থামিয়েছিল অমল। প্রথম প্রথম অত সাহস ছিল না। তখনো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়নি বলেই হয়ত আতঙ্ক বেশী ছিল। প্রথম দিকের একদিনের এই ধরনের একটা ঘটনার কথা মনে এলে মজুরদের মতন নিজের হাঁটুতে চাপড় মেরে হাসতে ইচ্ছে করে। বাচ্চারা খুব মজা পায় সেই ঘটনার বর্ণনা শুনলে। রাঘবনের ছেলে দুটোকে একাধিকবার বলেছে সেই গল্প। শুনতে শুনতে তাদের চোখ গোল গোল হয়ে যায়, তারপর গল্পের শেষের দিকে হেসে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। স্কুলের লম্বা ছুটি হলেই ছেলে দুটো এখানে আসে মা-বাবার কাছে।

সেবার একজোড়া বাঘ দেখেছিল। সেই প্রথম।

সবথেকে উঁচু পাহাড়টার উত্তরের ঢালে একটা অগভীর খাদে কাজ হচ্ছিল। কাছেই ছিল একটা গভীর খাদ আর একটা একমুখো সুড়ঙ্গের মতন য়্যাডিট। জিওলজিস্ট প্রধানের সঙ্গে অমল, সুনন্দ, কিষেণচাঁদ, য়্যান্ড্রিয়াস ও একটি সশস্ত্র রক্ষী সেখানে গিয়েছিল। পাথরের চাঁইয়ে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো লোহার চরিত্রের ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার আয়োজন চলছিল। জায়গাটা সম্বন্ধে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল খুব তাড়াতাড়ি।

কেউ বাঘের গর্জন শোনেনি, কিন্তু একটা কাতরানির মতন শব্দ শুনতে পেয়েছিল সবাই। শব্দটা অমলের নিজের মুখ থেকে বেরোয় নি—এমন কথাও জোর করে বলতে পারে না। বেশ খানিকটা দূরে জানোয়ার দুটো এই দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রহরীটাই হয়ত প্রথম দেখতে পেয়েছিল জন্তু দুটোকে। তার দৌড়ে পালানোর ভঙ্গি অন্য সবার মনের জোর নষ্ট করে দিল। অমলের একবার ইচ্ছে হয়েছিল কাছের য়্যাডিটটার অন্ধকার বিবরে ঢুকবার। অন্য কারো মনে তেমন ভাবনা আসেনি। পেছন দিকে কয়েক পা গিয়ে সবাই দৌড় দিয়েছিল প্রহরীটার মতন। দৌড় শুরু করার আগেই যন্ত্রপাতি হাত থেকে খসে পড়েছিল,—থিয়োডোলাইট, ডাম্পি লেভেল, রেঞ্জিং রড, সব।

ছোটবড় পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে প্রায় হাজার খানেক গজ দৌড়ে এসে সেদিন জীপে

উঠেছিল।

বিপদ ছিল, বলা বাহুল্য। তবু এখন মনে পড়লে হাসি পায়।

নতুন চাকরি পেয়ে কিষেণচাঁদ সেদিনই প্রথম পাহাড়ের ঢালে গিয়েছিল কাজ করতে। পালিয়ে আসার আগে অমলের মনে হয়েছিল, কিষেণচাঁদ কোনোদিন সার্ভেঅরের যন্ত্রপাতি ছোঁয়নি। এইসব সামান্য কাজকে গুরুত্ব দেয়া তার মেজাজে পোষায় না—এমন ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ক্যায়সে নাপ লের‍্যাহে হ্যাঁয় অমলবাবু? মাইনে শিখা থা, ভুল গ্যয়া।'

সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল অমল। এখন আর আশ্চর্য লাগে না। কিষেণচাঁদের মতন আরো কয়েকজন এসেছে এখানে, এখনো আসছে, বিশেষ বিশেষ অফিসারের সুপারিশে। অমল জানে, তারাই আগে ওপরে উঠে যাবে। এসব ভেবে নিজের মনকে খোঁচায় না। সুনন্দর মতন যখন তখন নোংরা মন্তব্য করে অশান্তি ডেকে আনে না।

কিষেণচাঁদের মতন অমলেরও এই প্রথম চাকরি। ধানবাদ থেকে পাশ করে এসেছিল। যতকিছু শিখেছিল তার সামান্যই এখানে কাজে লাগে। যে আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা ভেবে প্রথমে প্রায় রোমাঞ্চিত হয়েছিল, তা আর কোনো বিশেষ অনুভব আনে না। কলকাতার কলেজ ছেড়ে ধানবাদে যেতে প্রথমে কষ্ট হয়েছিল। সেখান থেকে পাশ করে আবার কলকাতায় ফেরার পর চাকরি পেয়ে এখানে আসবার সময় কিন্তু কষ্ট হয়নি। চাকরির দরকারও ছিল। মা'র সঞ্চিত টাকা তার ধানবাদে পড়ার সময়েই তো শেষ হয়ে এসেছিল। মা'র তো ছেলে ছাড়া একটি মেয়েও আছে। মল্লিকা তো অমলের থেকে মাত্র বছর তিনেকের ছোট। সে ধানবাদে থাকার সময়েই মল্লিকা স্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছিল। ধানবাদ থেকে পাশ করে অমল কলকাতায় ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করেছিল, মেয়ের পড়াশুনো এবং বিয়ের প্রশ্ন মা'র ভাবনা জুড়ে রয়েছে।

আর অল্প দূর গিয়ে জীপ থামাতে হবে। হাত-পা যন্ত্রের মতন কাজ করলেও মল্লিকার কথা মনে পড়ায় কেমন খুশীতে অমলের ঠোঁটে হাসির আভাস ফুটে উঠছিল। মানতে হবে, মেয়েটা সুন্দর হয়েছে! নয়নতারার থেকে সুন্দর। তবে মুখের আদলে, বিশেষ করে পোশাকের বিন্যাসে নয়নতারার মতন ধার নেই। অবশ্য মল্লিকার বয়েসও নয়নতারার থেকে কম।

মল্লিকার সঙ্গে অমলের চেহারার মিল প্রচুর। দুজনই মা'র চেহারা পেয়েছে, মা'র উচ্চতা, রঙের উজ্জ্বলতা। বস্তুত কম বয়েসে অমলের চেহারায় কিছু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তা নিয়ে ছোটবেলায় মাঝে মাঝে পাড়ার সামান্য বেশী বয়েসের পাকা ছেলেরা কাঁচা রসিকতা করেছে। এখন ভাবলে হাসি পায়।

বেলা বাড়ছে। কড়া রোদ জীপের সামনের রাস্তাটায়। মল্লিকা এখন হয়ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সামনে নামল। এমন হতে পারে, আগে থেকেই হয়ত কোনো অস্থির তরুণ গেটের কাছে মল্লিকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভেতরে গিয়ে ওপরে ওঠার জন্য সিঁড়িতে পা রাখল পাশাপাশি। মেয়ে বলে লিফ্‌টে যেতে পারত মল্লিকা। গেল না। ছেলেটির সঙ্গে ওপরে উঠবে বলে লিফ্‌টে গেল না।

এমন হতে পারে, হওয়া কিছু আশ্চর্য না। তার জন্য অমলের মোটেই হিংসে নেই। এই হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত সরীসৃপের অরণ্যে মল্লিকার কথা ভেবে বরং অমলের চাপা ঠোঁটের হাসি স্পষ্ট হল।

স্টিয়ারিং-ধরা হাতের দিকে অমল তাকাল একবার। কারোনদীর তীরের তাঁবু থেকে

এপর্যন্ত নানা ঋতুর স্পর্শে সেই হাতের রঙের উজ্জ্বলতা অবসিত। মসৃণ ত্বকে তামাটে রুক্ষতা এসেছে। জীপ চালিয়ে চালিয়ে কড়া পড়েছে দুহাতেই।

## পাঁচ

আজ বনেজঙ্গলে কোনো কাজ ছিল না অমলের। নেহাত চাকরি, তাই সকালে নিয়ম-মাফিক অফিসবাড়িতে গিয়েছিল চার-পাঁচ মাইল উঁচুনিচু পাহাড়ে পথ পার হয়ে। বিকেলের দিকে অফিস ছুটি হওয়ার অনেক আগে আবার কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে।

বারান্দায় বসেছিল লোহার চেয়ারটায়। মাঝেমাঝে দু-একটা কথা বলছিল ড্রাইভার প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে। রাঘবনের হেফাজতে যে সরকারি জীপখানা রয়েছে তার পরিচর্যা করছিল প্রীতম। কাল থেকে গাড়িখানা অমলের ঘরের পাশে রয়েছে। গতকাল পর্যন্ত তিনদিন অমলই চালাচ্ছিল। ছুটি দিয়েছিল প্রীতমকে। মাঝে মাঝে এমন ছুটি পেলে প্রীতম তার দোস্তদের সঙ্গে গিয়ে আসর জমায়। যে কনট্রাক্টর কোম্পানি টাউনশিপের অধিকাংশ কোয়ার্টার তৈরির কাজ পেয়েছে তার কয়েকজন কর্মী প্রীতমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছুটি পেলেই প্রীতম তাদের আড্ডায় চলে যায়। নেশায় বুঁদ হয়ে ফিরে এসে কখনো কখনো অমলের কাছে কিছু গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। সেই টুকরো শহর তৈরির সঙ্গে জড়িত কয়েকজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারকে কনট্রাক্টর কোম্পানি নাকি কয়েক লাখ টাকা নজরানা দিয়েছে।

কাল রাঘবনের সঙ্গে একটু বেশী দূরে যেতে হবে। প্রীতমই গাড়ি চালাবে। তাকে বারে বারে ছুটি দেয়া ভাল দেখায় না। জীপের উইন্ডস্ক্রীনে লাগানো একটা কাগজে 'টেস্টেড' কথাটা লাল ইংরেজি হরফে ছাপা ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল একটা খুব কাছের তারিখ। তবু তিনদিন পরে গাড়ি হাতে পেয়ে প্রীতম একটু নেড়েচেড়ে দেখছিল।

প্রীতমের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অমল দেখতে পেল, অন্য কারো কোয়ার্টার থেকে নয়নতারা ফিরছে। হেঁটে আসছে একা, তার হালকা রঙের শাড়ির ওপর পড়ন্ত বেলার রোদ পড়েছে। অমলের ঘরের সামনে দিয়েই তাকে যেতে হবে। কাছে এলে অমল তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল।

একেবারে বারান্দার পাশে এসে নয়নতারা প্রথম কথা বলল, 'কী করছেন বসে বসে? আজ কাজ নেই?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অমল বলল, 'ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'মুখার্জিবাবুর ঘরে। তাঁর সর্দিজ্বর হয়েছে। আমার তো শিক্ষাদান সকালেই শেষ হয়ে যায়। কী আর করি, এতক্ষণ বুড়োর সঙ্গে বকবক করছিলাম।'

অমলের একটু লজ্জা হল। সকালে অফিসে গিয়ে শুনেছিল, বুড়ো ক্যাশিয়ার মুখার্জিবাবু জ্বরের জন্য ছুটি নিয়েছেন ঘরে ফিরে একবার তাঁর খোঁজ নিতে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ তাঁর কথা মনেই পড়েনি।

দৃষ্টি একটু ধারাল করে নয়নতারার দিকে তাকাল অমল। এতক্ষণ কাজ ছিল না বলে জ্বরাক্রান্ত মুখার্জিবাবুর বিছানার পাশে বসেছিল! এইসব চিরকেলে মেয়েলিপনার সঙ্গে নয়নতারাকে মেলানো সহজ নয়।

চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমল বলল, 'বসবেন?'

নয়নতারা কিছু বলবার আগেই এক রগরগে নাটুকে দৃশ্য দেখাল প্রীতম সিং। পেছন দিকে লাফ মেরে বারান্দার গায় আছড়ে পড়ে জখম জন্তুর মতন দাপাতে লাগল।

নাটুকে দৃশ্যটার আকস্মিকতায় প্রথমে চমকে উঠলেও অমল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল কী হয়েছে। প্রীতমের কাতরানির সঙ্গে ছেঁড়াছেঁড়া কয়েকটা কথা শুনে আর সন্দেহ রইল না। পায়ে জুতোর ঠিক ওপরে আগুনে পোড়ানো লোহার সিক ঢোকানোর মতন যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে প্রীতম সেই অপসৃয়মান দুশমনটাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল! তার গায়ে কটাকটা রোঁয়া, শূন্যে বাঁকানো বিষাক্ত হুল, একটা পাথরের চাংড়ার ওপাশে দ্রুত চলে গেল।

কাঁকড়াবিছের গায় কটাসে রোঁয়া এখানে আসবার আগে অমল কখনো দেখেনি। শুনেছিল, যেখানে হুল বিঁধেছে সেই জায়গায় কাঁকড়াবিছের থেঁতলানো শরীর ঘষে দিলে যন্ত্রণা কমে। কিন্তু ইতস্তত ছড়ান পাথরের চাংড়াগুলো সাবধানে সরিয়ে কিছু দেখতে পেল না।

জীপের বনেট তুলে ইঞ্জিনের পরিচর্যা করার সময় প্রীতমের পায়ে জুতো ছিল। নাগরা। ঠিক তার ওপরে বাঁ পায়ে হুল ফুটিয়েছে। ডান পা হয়ত গাড়ির কোনো অংশের ওপর তুলে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল।

প্রীতমকে বারান্দায় টেনে তুলে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে বসে থাকতে পারছিল না, গড়িয়ে পড়ছিল মেঝেয়।

বনেটটা নামিয়ে অমল তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাল। এখনই প্রীতমকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

অমলের কাঁধগলা আঁকড়ে ধরে প্রীতম একপা শূন্যে নাচাতে নাচাতে জীপে উঠল। বসে থাকতে পারছে না, তাই সামনে না উঠে পেছনের লম্বা আসনে কাত হয়ে কাতরাতে লাগল। যেমন দাপাদাপি করছিল, মনে হল, সীট থেকে পড়ে যেতে পারে।

নয়নতারা হঠাৎ বলল, 'আপনি পেছনে ওকে ধরে বসুন।' কথাটা বলেই সে ড্রাইভারের জায়গায় উঠে গেল।

বেশ আশ্চর্য লাগল অমলের। তবে এসব নিয়ে বাহানা করার তখন সময় ছিল না। পেছনেই উঠল। ডাক্তারের একটা মন্তব্য মনে পড়ছিল: 'সাপে ছোবল মারলে তবু বাঁচাতে চেষ্টা করব, কিন্তু এখানকার কাঁকড়াবিছেয় হুল ফোটালে আর চেষ্টাও করব না।'

প্রীতমটা বড় ঝামেলা করে। কী দরকার ছিল জঙ্গল ঘেঁষে সুস্থ ইঞ্জিনের প্রতি প্রেম দেখাতে যাবার! এখন চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে, রস গড়াচ্ছে কষ বেয়ে।

ডাক্তারের দরজায় পৌঁছতে ছ'-সাত মিনিট। জীপের মধ্যেই ডাক্তার প্রীতমকে ইনজেকশন দিলেন। বললেন, 'ঘোড়ার মত শক্ত শরীর। হয়ত কিছু হবে না। তবু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

গুয়ার হাসপাতাল অন্তত মাইল পনরো দূর। একটা সমর্থ লোক দরকার, প্রীতমকে ধরে রাখতে হবে। না হলে জীপ লাফাতে থাকলে কোথায় গড়িয়ে পড়বে ঠিক নেই। সুনন্দ অথবা অন্য কারো ফেরার অপেক্ষায় থাকাও অনুচিত। ডাক্তার গাড়ি চালাতে জানেন না। জানলে তাঁকে ড্রাইভারের জায়গা নিতে অনুরোধ করে দেখা যেত। তিনি পেছনে উঠে প্রীতমকে ধরে থাকুন—এমন কথা বলবার সাহস নেই। প্রীতম অফিসারটফিসার হলে অথবা অমলের সুনন্দর মতন সাহস থাকলে কথাটা বলা যেত। তাছাড়া ডাক্তার এসব ব্যাপারে

নিরুত্তাপ। একদিন তিনি তাসের আড্ডায় মগ্ন থাকার সময় একজন এসে বলেছিল, মাইল তিনেক খাড়াইয়ে লাইটপোস্টের মাথা থেকে একটা লোক পাথুরে মাটিতে পড়ে মরে গেছে। ডাক্তারের মুখে তারপরও থ্রি স্পেডস। লোকটার হৃৎপিণ্ড তখনো নড়ছে কিনা যাচাই করার কোনো উৎসাহ দেখালেন না।

নয়নতারা আগেই জানিয়েছে, গয়া পর্যন্ত জীপ চালিয়ে নিয়ে যাবার মতন আত্ম-বিশ্বাস তার নেই। পেছনে এসে প্রীতমকে সামলানোও তার পক্ষে কঠিন। আর সে এই ঝামেলায় কেন আসবে?

দু-তিন মিনিট ধরে অমল এইসব ভাবছিল। এমন সময় লোক পাওয়া গেল। পান চিবোতে চিবোতে এসে হাজির হল ভরতচন্দ্র গিরি। নয়নতারার কোয়ার্টারে থাকে, রান্না করে। নিজে চা খায় না, কিন্তু দিদিমণির চায়ের সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক। নয়নতারাকে খুঁজছিল ভরত। চায়ের সময় চলে গেল, অথচ দিদিমণি ফিরছে না।

ভরতকে পেছনে ওঠাতে দু-একটা ধমক দিতে হল। অনুরোধে কাজ হচ্ছিল না। কিছু বুঝতে না পারার ভান করছিল। প্রীতমকেও ধমকাতে হল একবার। বড় বেশী গর্জাচ্ছিল জানোয়ারের মতন।

নয়নতারা ড্রাইভারের পাশের সীটে গিয়ে বসেছিল। পকেটে কত টাকা আছে দেখে নিয়ে অমল সামনে উঠল। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে নয়নতারাকে বলল, 'নামুন। ঘরে গিয়ে নিজে চা বানিয়ে খেতে হবে।'

নয়নতারা নড়ল না: 'ভাবছি আপনাদের সঙ্গে যাই। বেড়ানো হবে। গয়া জায়গাটা দেখিনি কখনো। ছোট হলেও শহর তো। দেখে আসি।'

অমলের এবার খুব আশ্চর্য লাগল। প্রীতমকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসতে সাহায্য করাটা নয়নতারার পক্ষে তেমন অস্বাভাবিক নয়, যদিও অমল প্রথমে অবাক হয়েছিল। বরং বলা যায়, গাড়িটা ডাক্তারখানা পর্যন্ত চালিয়ে এনে নয়নতারা তার চরিত্রের একটা মৌল লক্ষণই জাহির করেছে। কিন্তু এখন গয়া পর্যন্ত যেতে চাওয়া বিস্ময়কর। কয়েকজন উঁচু অফিসারের সান্নিধ্যে সময় কাটায়। মুখার্জিবাবু, প্রীতম, অমল কেউ অফিসার না।

অমল গলার আওয়াজে প্রচুর বিনয় এবং কৃতজ্ঞতার সুর মিশিয়ে বলল, 'আপনি আর কেন কষ্ট করে অতদূর যাবেন? ফিরতে দেরি হতে পারে। অন্য কাউকে না পেলে না হয় একটা কথা ছিল।' একটু হেসে আবার বলল, 'তাছাড়া আপনার প্রতিনিধিই তো যাচ্ছে,—ভরতচন্দ্র।'

একটুও না হেসে নয়নতারা প্রায় পলকহীন চোখে অমলের মুখের দিকে তাকাল। কেমন টেনে টেনে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি আমাকে কী ভাবেন?' তারপর মুখ ফিরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত মেজাজে বলল, 'চলুন।'

তার হাসিকে নয়নতারা প্রশ্রয় দেয়নি দেখেও, কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমল আবার বেহায়ার মতন এবং কিছুটা বোকার মতন হাসল। হাত-পা অবশ্য যন্ত্রের মতন কাজ শুরু করে দিয়েছিল। প্রথমেই একটা আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে ঢাল বেয়ে বাঁ দিকে নেমে গেল গাড়িটা।

প্রীতমের কাতরানি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল হয়ত। আবার কাতরানি শুরু হলে এক-একবার গোটা দুই নাম উচ্চারণ করছিল। সম্ভবত তার বাড়ির লোকের নাম। এখন যন্ত্রণা একটু কমেছে কিনা অমল চিৎকার করে জানতে চাইল। জবাবে

প্রীতম জানাল যে, সে মরছে, আর বেশী দেরি নেই। মৃত্যুর কথা ভরতের হৃদয়ে বড় আঘাত দিয়েছে মনে হল। আবেগে ভেজা গলায় প্রীতমকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

পাহাড়তলি থেকে নেমে সমতলে এসে ফোরহুইল-ড্রাইভ জীপটার গতি বেশ বেড়ে গেল। এক সময় নয়নতারা বলল, 'হাসপাতালটা কাদের?'

'ইন্ডিয়ান আয়রনের।'

'সেখানে কারো সংগে আপনার আলাপ আছে?'

'না। আমি শুধু দূর থেকে হাসপাতালটা দেখেছি।'

আবার চুপ করে রইল নয়নতারা। রোদ আর কোথাও নেই। সন্ধ্যের আগে পেঁছিতে পারলে ভাল। অন্ধকার হয়ে এলে তো গাড়ির গতি কমাতে হবে। উল্টো দিক থেকে ঝড়ের মতন এসে বিরাট একখানা ট্রাক পাশ ঘেঁষে চলে গেল। কালচে-হলুদ ধুলো উড়লে শাড়ি দিয়ে চোখমুখ ঢাকল নয়নতারা।

অমল ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলে মা খুশী হননি। সাবধানে গাড়ি চালানোর বিষয়ে প্রচুর উপদেশ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞের মতন। গাড়ি জোরে চালানোর লোভের ফাঁদে পা দিতে বার বার নিষেধ করেছিলেন। আস্তে চালানোও যে সব সময় নিরাপদ নয়, অমল মাকে বোঝাতে পারেনি।

কারোনদীর সেতুটা পার হবার সময় সেই মুণ্ডা মেয়েটার কান্না আবার মনে পড়ল। রাস্তাটার এক-এক জায়গায় আস্‌ফল্টের আস্তরণ। কিন্তু প্রধানত ভারী ট্রাকের চাকার ঘায়ে অজস্র গর্ত তৈরি হয়েছে। এঁকেবেঁকে কসরত করে এগোন সত্ত্বেও জীপটা লাফাচ্ছিল। কখনো কখনো দুপাশে জংগল সাফ, চাষের জমি। ক্বচিৎ একখানা সুন্দর বাংলো। রাস্তা থেকে দূরে বলে ছবির মতন। রান্নাঘরের দিক থেকে কুয়াশার মতন ধোঁয়া উড়ছে, বারান্দার সামনের জমিতে বসে আছে দু-চার জন, টেবিলে সম্ভবত চায়ের সরঞ্জাম।

কিছুক্ষণ প্রীতমের সাড়া নেই। ইন্‌জেক্‌শনের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল ধরে নেওয়া যায়। বেশ আগে থেকেই একটা মৃদু সুবাস পাচ্ছিল অমল, কেমন নেশা ধরার মতন। এই মুহূর্তে বুঝতে পারল, নয়নতারার চুলের গন্ধ।

গুয়া খনি শহর। ধোঁয়া, ধুলো এবং একদিকে উজ্জ্বলতা আর একদিকে অন্ধকার নিয়ে বিশিষ্ট। এখানে এর আগে আর একবার মাত্র অমল এসেছে। তথাপি শহরের এই চেহারার সংগে অমল পরিচিত। বিশেষ করে খনি শহর বড়বিলের চরিত্র তো খুবই চেনা।

হাসপাতালে পেঁছিতে প্রায় সন্ধ্যে হল। প্রীতম সিংকে স্ট্রেচারে করে ভেতরে নিয়ে যাবার পর অপেক্ষা করতে হল এক ঘণ্টার বেশী। তখন সব দিকে আলো জ্বলে উঠেছে। তবে, এক ঘণ্টার বেশী অপেক্ষা করতে হলেও, প্রীতমের বিষয়ে ভাল খবর এল। খুব একটা আশঙ্কার কারণ নেই।

প্রীতমকে অবশ্য হাসপাতালে রেখে আসতে হল।

শহরের মধ্যে একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে নয়নতারা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই এই, রাখুন রাখুন।' অমল গাড়ি থামিয়ে হাসল। নয়নতারারও তাহলে একই অসুখ। এতক্ষণ তারই মতন ছটফট করছিল চায়ের জন্য।

দোকানটা বাজে, তবে ভেতরে অনেক জায়গা, বেশী ভিড় নেই। এর থেকে ভাল চায়ের দোকান এখানে আছে কিনা জানে না। এখন খুঁজে বেড়াবার ইচ্ছেও নেই। নেমে ভেতরের দিকে একটা ছোট টেবিলের দুপাশে বসল। ভরত রয়ে গেল গাড়িতে, চা খায় না।

বার দুয়েক জিভে-গলায় অতিরিক্ত মিষ্টি আর দুঃসহ গরম চায়ের স্পর্শ পেয়ে নয়নতারা চনমন করে উঠল। নিরুৎসাহজনক পরিবেশ সত্ত্বেও খুব যেন খুশী খুশী: 'কী ব্যাপার বলুন তো? এতক্ষণ একবারও আপনাকে সিগারেট ধরাতে দেখলাম না। আপনি কি সঙ্গের মহিলার অনুমতির অপেক্ষা করছেন?'

এমন হালকা মেজাজে নয়নতারাকে কথা বলতে কখনো শোনেনি। হয়ত আগে কখনো অবকাশ হয়নি বলেই শোনেনি। অমল বলল, 'আমি তো সিগারেট খাই না। চা খাই।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সিগারেট খেতে কেউ কি বারণ করেছে?'

অমল বুঝতে পারল না, নয়নতারা ঠিক কী বলতে চায়। সে কি তাকে শিশু প্রমাণ করার জন্য মা'র নিষেধের ইঙ্গিত দিচ্ছে, নাকি কোনো মেয়ের নিষেধের প্রতি কটাক্ষ? একটা সান্ত্বনা অবশ্য অমলের ছিল। নয়নতারার পলকহীন চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিতে আর অস্বস্তি আসছে না।

অমলের জবাব না পেয়ে নয়নতারা বলল, 'আপনি কতদিন হল এখানে এসেছেন?'

'প্রায় শুরু থেকে। এটা তো বাষট্টি সালের শেষ। পুরো তিন বছর হয়ে গেল।'

'এই চাকরিতে কেন এসেছেন? এখানে আপনি বেমানান।'

একদা প্রচুর উচ্চতা সত্ত্বেও অমলের চেহারার কিছু মেয়েলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাড়ার পাকা ছেলেরা রসিকতা করত। চামড়ায় তামাটে রুক্ষতা এলেও নয়নতারা কি তেমন কিছু ইঙ্গিত করছে? গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই ধরনের চাকরির প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধানবাদে পড়াশুনো করে বেশ ঝামেলার পরীক্ষা উতরে এসেছি। আমার এখানে আসাই তো স্বাভাবিক। বরং আপনিই এখানে অত্যন্ত বেমানান। আপনার এই জঙ্গলের বাচ্চাদের স্কুলে চাকরি নিয়ে আসা প্রায় রহস্যজনক।'

নয়নতারা নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আরো দুকাপ চায়ের নির্দেশ দিয়ে বলল, 'আমার এখানে আসাটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে? অথচ আমার ধারণা আমি রীতিমত বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি। আমার ডিগ্রী নেই, অভিজ্ঞতা নেই। এই মাইনেয় এই চাকরি আমাকে এখন কেউ দেবে না, শহর অঞ্চলে তো নিশ্চয়ই না। আমি এখানে কত মাইনে পাই জানেন?'

অমল জানে না, যদিও জানতে পারা কিছুই কঠিন নয়। একথা কখনো মনে আসেনি। শুধু বলল, 'না।'

'য়্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে কম, কিন্তু আপনাদের সমান দক্ষিণা পাই। এই টাকা কলকাতার কোনো স্কুল আমাকে দেবে না।'

'কলকাতায় অথবা অন্য কোনো শহরে স্কুল ছাড়া আর কোথাও বুঝি চাকরি মেলে না? আর বেশী দক্ষিণা আপনার কাছে কতটা জরুরী তা অবশ্য আমি জানি না।'

নয়নতারা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিয়ে, মুখে কিছু বিকৃতি এনে, চোখ নামিয়ে অনেকটা নিজেকেই বলল, 'তখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছেটা তীব্র হয়েছিল।'

সুনন্দর কথা মনে আসছিল অমলের। নয়নতারার বিষয়ে প্রথম দিকে সুনন্দর সংগৃহীত তথ্য মনে আসছিল। হেসে বলল, 'আপনি যা-ই বলুন, আমরা প্রথমে চমকে গিয়েছিলাম। বারান্দায় তাসের আড্ডায় বসে আপনাকে বড়জামদা স্টেশনের দিক থেকে রায়ের সঙ্গে আসতে দেখে কিছুক্ষণ আমাদের মুখ থেকে কথা খসেনি।'

'বেশ বাড়িয়ে বলতে পারেন দেখছি।' নয়নতারাও হাসছিল।

'আস্ত একখানি পার্ক স্ট্রীট কিয়নঝড়ের জঙ্গলে উঠে এলে কেমন লাগে বলুন!'

দোকানের কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছে দেখে বুঝতে পারল, দুজনেই একসঙ্গে শব্দ করে হাসছিল।

নয়নতারা বলল, 'রায় লতায়পাতায় আমার আত্মীয়। কলকাতায় আমার ইন্টারভিউয়ের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। প্রথমে তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেছিলাম। আমার এখানে আসাটা খুবই সংগত হয়েছে মনে হচ্ছে। বরং, আবার বলছি, রেগে যাবেন না, আপনার ওই যাকে বলে বিষণ্ন চোখ এখানে কেমন যেন লাগে।'

'খুব গুরুজনের মতন কথা বলে যাচ্ছেন!' অমল নড়ে বসতে চেয়ারটা ক্যাঁচ করে উঠল।

মাথা ঝাঁকিয়ে নয়নতারা বলল, 'আচ্ছা শুনি, আপনার বয়েস কত?'

রেগে উঠতে গিয়েও অমল হাসল: 'ছাব্বিশ।'

'ছাব্বিশ! সালটা বলুন তো।'

'উনিশ শো ছত্রিশ।'

'কী মাস?'

'আশ্বিন।'

নয়নতারা জিভ আর দাঁত দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল: 'ইস, কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল! আমারও উনিশশো ছত্রিশ, তবে আশ্বিন না। আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?'

'কলকাতায়।'

'আমি কার্সিয়াংয়ে। দেখা যাচ্ছে, আমরা একজন দেশের দক্ষিণে আর একজন উত্তরে প্রায় একসঙ্গে ম্যাঁ ম্যাঁ করছিলাম।'

হাসির গমকে চেয়ার থেকে প্রায় গড়িয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিয়ে নয়নতারা আবার বলল, 'অমল, আপনি-আপনি করা বিশ্রী লাগছে। তুমি বলা ভাল।'

সঙ্গে সঙ্গে অমলের মনে হল, জলো গল্পে একটা জিনিস থাকে যাকে বলা যায়, আপনি থেকে তুমিতে সঞ্চরণ। চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, 'এখন ফিরতে হবে না? কাঁকড়াবিছে থেকে কোথায় এসে পেঁছেছি!'

ফেরার পথে শহর ছাড়িয়ে এসে দুপাশের জঙ্গলে ঘন অন্ধকার। দুটো হেডলাইট থেকে সামনের রাস্তায় ঋজু রেখায় প্রসারিত আলোয় সেই অন্ধকার গভীরতর দেখায়। মাঝে মাঝে এক একটা জীপ অথবা ট্রাক সামনের দিক থেকে এসে পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল। একটা ট্রাকের ওপরের একদল মুণ্ডা মেয়েপুরুষের সম্মিলিত গান কানে ঘা দিয়ে গেল। রাত্তিরে গাড়ি চালাবার সময় উল্টো দিক থেকে কোনো গাড়ি এলে হেডলাইট নেভানো-জ্বালানো দরকার। এখানে কেউ কেউ সে রীতি মানে না। হেডলাইট জ্বালিয়েই সামনে থেকে এগিয়ে এসে পাশ দিয়ে চলে যায়। চোখ ঝলসে যায়, বেশ বিপজ্জনক। শুধু আজ নয়, আগেও অমল এমন দেখেছে। তবে এখানে এই ধরনের গাফিলতি হলে কাউকে 'এ প্রাইভেট কি বাচ্চা' জাতীয় সম্বোধন করতে শোনেনি। যাঁর গাফিলতি তিনি হয়ত উচ্চতম অফিসার, নেশাগ্রস্ত, অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং গালাগালি দেবার ঝুঁকি কে নেবে?

অথচ আশ্চর্য, এই ক'বছরে অমল এখানে একটিও মারাত্মক মোটর দুর্ঘটনার কথা শোনেনি।

পেছনে ভরতের কোনো সাড়াশব্দ নেই। গাড়িতে আছে কি নেই বোঝা যায় না। রাত্তিরে ফিরে আবার নয়নতারা এবং নিজের জন্য রান্না করতে হবে। ভরতের হয়ত সেজন্য মেজাজ খারাপ। প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে তার সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তেমন কিছু থাকলে আজকের ঝামেলাটা খুশী মনে নিতে পারত।

নয়নতারার শাড়ির অংশ মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে এসে অমলের বাঁ হাত ছুঁয়ে যাচ্ছিল। চায়ের দোকানে বিস্ময়কর প্রগলভতার পর এখন নয়নতারা ভরতের মতন চুপ করে আছে।

আবার এখন কারোনদীর সেতুটা পার হয়ে অমল সেই মৃদু গন্ধটা পেল। নয়নতারার চুলের গন্ধ।

আজই প্রথম এত বেশী আলাপ। এর আগে যতবার কথা হয়েছে, টানটান আত্ম-সচেতনতা ও সৌজন্য ছিল। একান্ত ঘনিষ্ঠ সংলাপের শিথিলতা আগে কখনো আসেনি। সন্ধ্যার পর চায়ের দোকানে বড় বেশী হাসি ছড়িয়েছে। চায়ের দোকানে যত কথা বলেছে, বিশেষ করে নয়নতারা, তার অধিকাংশ হাস্যকরও।

তথাপি ঝাঁঝাঁ রাতদুপুরে নির্জন ঘরের অন্ধকারে অমল পুরোপুরি জেগে ছিল। ঘুমের কোনো লক্ষণ নেই। চোখ জ্বালা করছিল। হাত রেখে দেখেছে, কপালটা গরম। অনির্দিষ্ট কোনো আশ্চর্য চেতনার ক্রমান্বয়ে তীব্রতা বাড়ছিল।

ভোরের দিকে বেশী ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে দেরি হয়ে গেল।

প্রীতমের বিষয়ে সব বিবরণ দিতে হল রাঘবদের কোয়ার্টারে গিয়ে।

আজ বেশ দূরে কাজে যাবার কথা ছিল। অমলকে নিয়ে অফিসবাড়িতে গিয়ে রাঘবন অনেক পরে কর্মসূচী বদলের সিদ্ধান্ত জানালেন। দূরে যেতে না হলেও, য়্যান্দ্রিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে অমলকে একবার খনি এলাকায় যেতে হল। রাঘবন রয়ে গেলেন অফিসবাড়িতে।

উত্তরের ঢালের দ্বিতীয় খনির সীমানায় একটা অগভীর খাদ গভীর করবার আগে ডায়মন্ড ড্রিলিংয়ের আয়োজন চলছিল। আরো গভীরে নেমে যাবার আগে নানাবিধ ধাতুর সঙ্গে মেশানো লোহার চরিত্র নির্ধারণ করা দরকার। দেখল, ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার স্বয়ং সেখানে উপস্থিত।

সুতরাং দুপুর থেকে বেলাশেষ পর্যন্ত অমলের সেখানেই কাটল। ডিসেম্বরেও রোদ গায়ে বিঁধছিল। প্রচুর অস্বস্তি ছিল চোখে, যেন তখনো খোঁয়াড়ি ভাঙেনি। অথচ অমল তো সত্যি কোনো ঝাঁঝালো পানীয় গলায় ঢালতে এখনো শেখেনি। কাল সন্ধ্যায় তো শুধু দুকাপ নির্ভেজাল চা খেয়েছিল।

বিকেলে আবার অফিসবাড়ি হয়ে চার-পাঁচ মাইল উতরাইয়ে বেস ক্যাম্পে নিজের ঘরে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে। ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে য়্যান্দ্রিয়াসের বোন শুকমতী দুধ দিতে এল। চায়ের জন্য দুধ নিতে হয়, মোষের দুধ, অথচ শুকমতী বলে গরুর। কেন যে মিথ্যে বলে অমল বোঝে না। হয়ত মেয়েটা কোথাও শুনেছে, বাঙালীরা গরুর দুধ বেশী পছন্দ করে। সুনন্দ ফেরেনি দেখে তার চায়ের দুধও অমলের ঘরে রেখে দিল।

শুকমতীরা ক্রিশ্চিয়ান। তার একটা ক্রিশ্চিয়ান নাম আছে, একদিন বলেছিল, এখন

আর মনে নেই অমলের। মুণ্ডাদের মধ্যে পুরুষ থেকে মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী। সংখ্যায় বেশী বলে দাম কম কিনা জানে না। দেখে কিন্তু মনে হয়, মেয়েরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশী খাটে। মেয়েটার বিষয়ে এই সব ভাবছিল, কারণ আজ অকারণে লাজুক-লাজুক হাসছিল শুকমতী। কাচের গ্লাসে দুধ ঢেলে দেওয়ার সময় এবং তারপরও অমলের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। খানিক অবাক হয়ে থেকে অমলের মনে হল, রহস্যটা বুঝেছে। কোনো অফিসারের স্ত্রী শুকমতীকে একটা অক্ষত জামা উপহার দিয়েছেন। জামাটা পরে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে শুকমতী, লজ্জা পাচ্ছে। আগে কখনো জামা পরতে দেখেনি এবং জামা না পরার জন্য কোনোদিন তো লজ্জা পেতে দেখেনি মেয়েটাকে।

শুকমতী নিজেই জানাল, যিনি স্কুলে পড়ান তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে জামাটা। এমন একটা জিনিস তার পক্ষে অঙ্গে ধারণ করা নাকি খুব কঠিন কাজ।

মেয়েটা চলে যাবার অল্প পরে দরজায় কার ছায়া পড়ল। ঘর থেকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়িয়ে অমল দেখল, নয়নতারা। তখনই মুখ থেকে কথা খসল না।

নয়নতারা বলছিল, 'এইমাত্র ফিরলে?'

'আধঘণ্টা হয়েছে ফিরেছি।' অমল একটা লোহার চেয়ার এগিয়ে দিল।

ঘরখানার সব কোণে একবার চোখ বুলিয়ে এনে চেয়ারটায় বসে নয়নতারা বলল, 'জল চাপাও। তোমার সঙ্গে চা খাব বলে এসেছি।'

অনেকটা কাল সন্ধ্যের মেজাজ।

অমল আজ খাদে নেমেছিল। তার চিহ্ন শরীরের নানা অংশে। স্নানের ঘরে গিয়ে এখনই পরিচ্ছন্ন হয়ে আসা দরকার। নয়নতারা আসবার আগে আধঘণ্টা সময় পেয়েছিল। তার মধ্যে যদি হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে নিত!

'দু মিনিট তোমাকে বসতে হবে। আমার গায়ে, চুলের মধ্যেও নোংরা। একটু সাফ-সুফ হয়ে আসছি। আজ খাদে নেমেছিলাম।' অমল হিটারে জল চাপিয়ে দিল।

স্নানের ঘরে দু মিনিট না, পাঁচসাত মিনিট লাগল। ভাবছিল, নয়নতারার সামনে তার পরিচ্ছন্ন হবার সাধ কেন? নিজেকে উজ্জ্বল করে দেখাবার বাসনা? নাকি শুধুই নিজের শরীরমনের পবিত্রতার জন্য স্নানের ঘরে এসেছে? বেরিয়ে যদি দেখে, নয়নতারা চা তৈরি করে বসে আছে, দুটো পূর্ণ পেয়ালা থেকে হালকা কুয়াশার মতন ধোঁয়া উড়ছে, তাহলে বেশ জমজমাট হয়। জলো গল্পের মতন, আপনি থেকে তুমিতে আসার মতন, জমে যায়।

বেরিয়ে অবশ্য দেখল, নয়নতারা ঠায় বসে আছে। ভেতরের বারান্দায় ধোঁয়া উড়ছে, তবে কেটলির ফুটন্ত জল থেকে।

ভেতরের বারান্দার একটা ছোট টেবিলে অমলের চায়ের সরঞ্জাম ছিল। নয়নতারা সেখানে অমলের পাশে এসে দাঁড়াল। হাতের ব্যাগ থেকে সেলোফেন কাগজে জড়ানো অনেকটা চা-পাতা টেবিলে রেখে বলল, 'এই পাতাটা দিয়ে চা করো।'

সত্যি রাগ হল অমলের : 'বেশ তো লোককে অপমান করতে পার! এর থেকে ফ্লাস্কে তৈরি-চা নিয়ে এলেই পারতে।'

দু সেকেন্ড অবাক হয়ে থেকে নয়নতারা শব্দ করে হেসে উঠল : 'এইজন্যই কাল বলেছিলাম, এখানে তোমাকে মানাচ্ছে না, এখানে এসব ছেলেমানুষি অচল। ওই চা-পাতাটা আমি কলকাতা থেকে আনিয়েছি, আসলে কার্সিয়াং থেকে। বেশ ভাল চা। ফুরিয়ে এসেছে। সামান্য যেটুকু ছিল নিয়ে এলাম। দিন তিনেক তোমার একার চলতে পারে।'

অমল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। একটু থেমে নয়নতারা বলল, 'তুমি সরে যাও। আমি চা বানাচ্ছি।"

ঘরে এসে অন্য চেয়ারটায় অমল বসল। চা নিয়ে আসতে কয়েক মিনিট লাগল নয়নতারার। অমল দিন সাতেক আগে কেনা একটা বিস্কুটের টিন এনে রাখল টেবিলে।

চায়ে দুবার ঠোঁট ছুঁইয়ে নয়নতারা বলল, 'প্রীতম সিংয়ের খোঁজ নিয়েছিলে?'

'রাঘবন নিয়েছিলেন। ভাল আছে। কাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। মুখার্জি-বাবুকে অফিসে দেখলাম। জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছেন।'

ঘরে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। কাল সন্ধ্যের মতন বাইরে সব আলো জ্বলে উঠেছে। অমল উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালল। ঘরের সামনের এবং পেছনের দুটো জানলার পর্দাই হাওয়ায় উড়ছিল। পেছনের জানলা থেকেই অন্ধকার অরণ্যের শুরু।

নয়নতারা বলল, 'পর্দার কাপড়টা বেশ। তুমি নিজে পছন্দ করে কিনেছিলে?'

'মনে পড়ছে না। পুরোন পর্দা। রঙ জ্বলে গেছে।' অমল কথা বলছিল সামনের জানলাটায় চোখ রেখে। নয়নতারার মতন সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। মনে হল, সুনন্দ এদিকে তাকাতে তাকাতে নিজের ঘরে গেল। এতক্ষণে ফিরল তাহলে। অবশ্য নয়নতারা যতক্ষণ আছে, এঘরে আসবে না। পরে হয়ত দু-একটা প্রশ্ন করতে পারে, রসিকতাও।

কিছু যেন বলতে নয়নতারা দ্বিধা করছিল। খানিক সময় চুপচাপ টেবিলে আঙুল বুলিয়ে বলল, 'আমি জানি, এখানে অনেকে আমাকে খুব অপছন্দ করেন। কিন্তু আমি কী করতে পারি! নিজের ঘরে একা বসে সব সময়টা কাটিয়ে দেয়া শাস্তি মনে হয়। মেলা-মেশা ছোটবেলা থেকে শিখেছিলাম, শেখানো হয়েছিল।'

অমলের নিশ্চয়ই কিছু বলা উচিত। কী বলবে, কথা খুঁজে পেল না। শুধু বোকার মতন একটু হাসল। হাসিটা করুণ। নয়নতারা উঠে গিয়ে পেছনের জানলার পাশে দাঁড়াল, যার ওপাশ থেকেই অন্ধকার শালবনের শুরু।

অমল আরো বোকার মতন একটা প্রশ্ন করল, 'ভরতচন্দ্রের খবর কি? কাল ফিরে রান্না করেছিল?"

'ভরতের একটাই খবর। নিজে চা খায় না, কিন্তু চায়ের দোকান করার জন্য খেপে উঠেছে। নতুন যে টাউনশিপ তৈরি হচ্ছে, সেখানে চায়ের দোকান করবে। অনুমতির জন্য আমি রায়কে বলব আশা করে আমাকে খুব যত্ন করছে।'

টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে, যাবার সময় নয়নতারা বলল, 'আমি আসলে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম, অমল। শনিবার রাত্তিরে তুমি আমার ওখানে খাবে।'

'কিসের নেমন্তন্ন?'

'এমনিই। যাবে কিন্তু।'

বাইরে এসে দরজায় তালা দিয়ে অমল বলল, 'চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।'

## ছয়

বুধবার সন্ধ্যেয় নয়নতারা এসেছিল। খুব কাজের চাপ ছিল তার পরের দুদিন। ভালই হয়েছিল, নাহলে হয়ত রাত্তিরে আরো কম ঘুম হত। ঘুমহীন রাতগুলো দুঃসহ।

শীতের রাতগুলো শেষ হতে চায় না। কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সিরসির করে হাওয়া আসে। ঘুম না এলে গায়ে কাঁপুনি ধরে যায়, অথচ কপালটা মনে হয় গরম।

শনিবার বিকেলের দিকে অমল বুঝতে পারছিল, সুনন্দ ঘরে আছে। তবু সেদিকে একবারও গেল না। কেন যেন সুনন্দর সান্নিধ্য চাইছিল না। নিজের নির্জন ঘরে চুপচাপ কাটাতে, হয়ত কোনো বই নিয়ে বসে থাকতে অমলের খারাপ লাগে না। বিশেষ করে এই কদিন একা থাকতেই ইচ্ছে করছিল।

বিকেলে সুনন্দর ঘরের দিক থেকে মুরগির চিৎকার ভেসে এল কয়েকবার। রীতিমত রহস্যজনক। তবু সেদিকে গেল না অমল। আর, কী আশ্চর্য, সুনন্দও একবার এল না এদিকে।

সন্ধ্যে হল, সর্বদিকে আলো জ্বলল, ট্রাঞ্জিস্টার সেটের গানের তীক্ষ্ণ ঢেউগুলো উড়ে এল সুনন্দর ঘর থেকে। খানিক পরে বেশ সেজেগুজে ঘর অন্ধকার করে বাইরে এল অমল। দরজায় তালা লাগাবার সময় সুনন্দর ভেতর থেকে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল এক ঝলক। তারপর, বলা যায়, সন্তর্পণে বারান্দা থেকে নেমে গেল।

খাড়াই বেয়ে অনেকটা উঠলে ডানদিকে রায়ের কোয়ার্টার। সেই বড় আকারের ঘরখানাকে কেন্দ্রে রেখে প্রচুর জায়গা নিয়ে সমান দৈর্ঘ্যের অজস্র কাঠ মাটিতে পুঁতে একটা বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে। দেখলে বোঝা যায়, বিশেষ কারো বাসস্থান। তার সামনে একসারিতে অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ঘর কয়েকখানা। আরো একটু এগোলে বাঁয়ে বাচ্চাদের স্কুল এবং তার পাশে নয়নতারার কোয়ার্টার।

কাঠের বেষ্টনীর কাছ থেকেই বেশ খানিকটা ঢালে নয়নতারার ঘর দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে অমলের মনে হল, উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সামনের বারান্দায় অনেক লোক। সে কি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। এখনো কি সান্ধ্য আসর ভাঙেনি। তা-ই বা কী করে হবে। সে তো সাড়ে সাতটার আগে বেরোয় নি। কাঠের বেষ্টনীর ওপর শরীরের কিছু ভার দিয়ে একটু দাঁড়াল। ভেঙে পড়বে না। খুঁটিগুলো মাটির গভীরে না ঢুকলেও গোড়ায় সিমেন্ট দিয়ে শক্ত করা আছে।

আরো খানিকটা এগিয়ে অমল নয়নতারার বারান্দার লোকদের চিনতে পারল। অ্যাসিস্টেন্ট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার সাহনী, জিওলজিস্ট চ্যাটার্জী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভৈশ, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী এবং রায়। এঁরাও তাহলে আজ নিমন্ত্রিত। অথচ অমল অন্যরকম ভেবেছিল। ভেবেছিল, একা তাকেই ডেকেছে নয়নতারা। শরীরমনে একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রীতম সিংয়ের মতন ককিয়ে উঠল না, বলা বাহুল্য, তবে মনে হল কষ্টটা দুঃসহ। ফিরে যাবে?

ভাবছিল অন্ধকারে গা ঢেকে ফিরে যাবে কিনা, অথচ, যেন না জেনে, পায়েপায়ে এগোচ্ছিল। আরো কয়েক গজ এগিয়ে নয়নতারার ঘর-বারান্দা থেকে প্রসারিত আলোর পরিধির মধ্যে এসে পড়ল অমল। শেষ কয়েক পা ফেলার মধ্যে কেমন জিদের কাঠিন্য এসে গিয়েছিল।

নয়নতারাই হয়ত সবার আগে তাকে দেখতে পেয়েছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সানন্দে বলল, 'এস অমল। এত দেরি করলে কেন?'

বারান্দায় উঠেই অমলের মনে হল, অন্য কেউ তাকে এখানে আশা করেননি। এঁরা সবাই তো আগে এসেছেন; নয়নতারা কি বলেনি এঁদের যে, অমলও নিমন্ত্রিত! তখনই

অবশ্য সবাই সামলে নিয়েছেন। অমলের সঙ্গে সহজ হবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

সহজ হবার চেষ্টা চোখে লাগছিল। তার উপস্থিতিতে নয়নতারা ছাড়া আর সবার প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি বুঝতে পারছিল অমল। প্রতিযোগিতায় রায়ই জিতলেন। বিরামহীন বৃষ্টির মতন কথা বলছিলেন। তাঁর পক্ষে কি এত কথা বলা স্বাভাবিক। একান্ত ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন করছিলেন। এমন কি কলকাতায় মা কেমন আছেন তা-ও জানতে চাইছিলেন। অনেক উঁচু থেকে অঢেল স্নেহ ঝরাচ্ছিলেন প্রত্যেকটি কথায়। তার মধ্যে কাজে অমলের আন্তরিকতারও উল্লেখ ছিল।

সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখে অস্বস্তি হচ্ছিল। বাইরেও ধোঁয়ার মতন কুয়াশা। প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া অমল নিজে থেকে একটিও কথা বলতে পারছিল না। শুধু এক-একবার ধারাল চোখে সহজ স্বাভাবিক হাসিখুশী প্রগলভ নয়নতারাকে দেখছিল।

বোঝা গেল, অমল আসবার আগে আলোচ্য বিষয় ছিল কারোনদীর সেতু। নতুন করে উঠল প্রসঙ্গটা। সেতুটা আবার ভেঙেছে। তার জন্য কাউকেই এতটুকু অখুশী মনে হল না। বরং প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে আশা প্রকাশ করা হচ্ছিল, নতুন সেতুটা হবে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র হলেও বিস্ময়কর নিদর্শন। শীতকালে সেতুটা ভাঙার জন্য কেউ তেমন আশ্চর্য হননি। কারণ বর্ষায় নদীটা হন্যে হয়ে উঠলেই নাকি ফাটল ধরেছিল। সৌভাগ্য এই, কোনো বড় দুর্ঘটনা হয়নি। গাড়ির এবং লোকের ভার নিয়ে ভেঙে পড়েনি।

ক্রাশিং প্লাণ্ট চালু হলে কত টন লোহা রুঢ়কেল্লায় আর কত টন বিশাখাপত্নমে যাবে সেবিষয়েও কিছু আলোচনা হল। অমল শুধু শুনছিল এবং সবই তার জানা বিষয় হলেও তখন অন্তত কোনো কথার মানে খুঁজে পাচ্ছিল না।

নয়নতারা খানিক আগে উঠে ঘরে গিয়েছিল। এখন সবাইকে ভেতরে ডাকল।

এই ঘরের মধ্যে এর আগে অমল আসেনি। বাইরে বারান্দায় এসেছে কয়েকবার। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বড় টেবিলে নয়নতারা নানাবিধ খাদ্য সাজিয়েছে। টেবিলটা ঘিরে সাতখানা চেয়ার রাখা হল। রায়ের পাশের চেয়ারে বসতে হল অমলকে।

এখানে তো বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। আলু-পেঁয়াজ, দু-একটা শুকনো সবজি এবং রবিবারে মাংস ছাড়া আর কিছু মেলে না। ক্বচিৎ কখনো মাছ আসে। প্রথম দিকে মুরগি সস্তা ছিল। এখন মুণ্ডারা খলিফা হয়ে গেছে। একটা ছোট মুরগির জন্য দশ টাকা হাঁকে। এতসব সুখাদ্য কেমন করে যোগাড় করল নয়নতারা!

খাবার টেবিলে বসে কোন্‌টি নয়নতারা নিজে রেঁধেছে আর কোন্‌টি ভরতচন্দ্র তাই নিয়ে প্রায় জুয়োখেলা হচ্ছিল। অমল কিছু খেতে পারছিল না, কিছুই খেতে পারছিল না। এমন বিস্বাদ খাদ্য যেন আর কোনোদিন মুখে তোলেনি। গলার মধ্যে যেন কিছু একটা আটকে আছে।

ঘরখানার জানালার পর্দা আনকোরা আর আশ্চর্য সুন্দর। সেদিন তার ঘরের জানলার রঙজ্বলা পর্দা নিয়ে কি নয়নতারা ঠাট্টা করছিল। এক কোণে রাখা একটা পেডেস্টাল ফ্যানের ব্লেড শীতকাল বলে শাদা-ফুল-তোলা লাল কাপড়ে সযত্নে জড়ানো। এখানে আর কারো ঘরে অমল পেডেস্টাল ফ্যান দেখেনি। আহা, এই ঘরে একটা দুধরঙ ফ্রীজ থাকলে মানাতো!

ভাবছিল, নয়নতারার ধারণা অমল এখানে বেমানান। এই শালবনে সে বেমানান কিনা ঠিক জানে না। তবে নয়নতারার এই ঘরে তাকে মানাচ্ছে না, একেবারেই না। বয়েসে

নয়নতারা ছাড়া আর সবার থেকে বেশ ছোট হলেও, উচ্চতায় রায় ছাড়া আর সবাইকে সে ছাড়িয়ে যাবে। তবু, অন্তত আজ, এই ঘরের সঙ্গে নিজেকে মেলানো অসম্ভব।

রায় আর সাহনীর মাঝখানে বসেছিল অমল। তাঁরা দুজনই খেতেখেতে শব্দ করে হাসছিলেন। কথার ফাঁকে তাঁদের হাসি শুনতে শুনতে অমল অনেক রকম খাদ্যের সুবাস ছাপিয়ে আসা একটা কড়া গন্ধ পেল। গন্ধটার সঙ্গে সে পরিচিত। বিশেষ করে প্রীতম সিং বারবার তাকে এই গন্ধ চিনিয়ে দিয়েছে। কোনোদিন গন্ধটাকে তেমন কিছু মনে হয়নি। অথচ আজ খুব খারাপ লাগল।

নয়নতারা কয়েকবার বলল, 'অমল যে কিছুই খেলে না।'

জবাবে অমল কষ্ট করে হাসল। বরং বলা যায়, একটা অনুচ্চারিত অট্টহাসি অথবা কান্না তাকে ঘিরে রইল।

খাবার টেবিল ছেড়ে সবাই আবার বারান্দায় এলে, নাটুকে আকস্মিকতা ঢাকবার চেষ্টা করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নিল অমল। বারান্দা থেকে নেমে, নয়নতারার ঘরের প্রসারিত আলোর পরিধির বাইরে কুয়াশা আর অন্ধকারে নিজেকে ঢাকল।

অস্বাভাবিক দ্রুত হেঁটে, কয়েকবার হোঁচট খেয়ে, ফিরে এল নিজের কোয়ার্টারে। তালা খুলে ঘরে ঢুকে, কোনোরকমে জুতো এবং কোটটা ছেড়ে অন্ধকারেই বিছানায় শরীর রাখল। অন্যদিন এমন করে না। রাত্তিরে ফিরলে আগে আলো জেবলে ঘর ভাল করে দেখে নেয়। অন্যদিন এমন অন্ধকারে বিছানায় যাওয়া অভাবনীয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দরজায় পরপর কয়েকটা জোর ঘা পড়ল। উঠে আলো জেবলে দরজা খুলে দেখে সুনন্দ।

সুনন্দ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'তোর জন্য বসেবসে রাত দুপুর। গিয়েছিলি কোথায়? তিন ঘণ্টা ধরে তোর দরজায় তালা ঝুলছে।'

মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে আবার বলল, 'কিছু হয়েছে নাকি? কেমন করে যেন চেয়ে আছিস! খেয়েছিস? রান্না করলি কখন? আমার ঘরে আয় একবার। এখনই আয়। জামাকাপড় পরে পাল্টালেও চলবে।'

বুধবারের পর আজ শনিবার। এর মধ্যে নয়নতারার কোয়ার্টারে নেমন্তন্নের কথা সুনন্দকে বলেনি। দু-তিনবার দেখা হয়েছে, তবু বলেনি। এখন সুনন্দর সঙ্গে চুপচাপ তার ঘরে এল। সুনন্দ টেবিলে রাত্তিরের খাবার গুছিয়ে বসল। একটা পাত্রে অমলের জন্য মুরগির মাংস আর পাশে রুটি রেখেছে। বলল, 'বস্, মাংসটা ফাইন রেঁধেছি।'

এতক্ষণে কথা বলল অমল, 'মুরগি পেলি কোথায়?'

'তা দিয়ে তোর দরকার নেই। তোকে খেতে বলেছি, খা।'

'আমার কাছে লুকোতে পারবি না, সুনন্দ। হঠাৎ মুরগি কিনলি কেন বল্?'

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সুনন্দ অমলের মুখের দিকে তাকাল: 'কিনি নি। রোজ-রোজ জ্বালায়। আজ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। অনেক কসরত করে ধরেছি একটাকে।'

'পরের মুরগি চুরি করলি!'

'বেশ করেছি। ন্যাকামি না করে খেয়ে নে। রেঁধেছি ফাইন!'

বিকেলে মুরগির চিৎকারের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। হাত গুটিয়ে বসে অমল বলল, 'আমি খেয়ে এসেছি। নয়নতারার ওখানে নেমন্তন্ন ছিল।'

সুনন্দ খাওয়া শুরু করেছিল। বন্ধ হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল অমলের

দিকে। খানিক পরে একেবারে অন্য গলায় বলল, 'মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না খেয়েদেয়ে এসেছিস!'

সুনন্দর মতন যখনতখন দায়িত্বহীন মন্তব্য করা অমলের স্বভাব নয়। সুনন্দর মতন মনের যে-কোনো ভাবনা কথা হয়ে অবলীলায় মুখ থেকে বেরিয়ে আসে না। নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে অমল অভ্যস্ত। তথাপি ধানবাদে থাকার সময় এবং এখানে আসার পরেও কখনো বিশেষ কিছু সুনন্দর কাছে লুকোয়নি। এখানে সুনন্দ তার ঘনিষ্ঠতম। এই চার-পাঁচ দিনে একটা অদৃশ্য পাঁচিল উঠছিল তাদের মাঝখানে। সেই পাতলা পাঁচিলটাকে এখন লাথি মেরে ভেঙে দিল অমল। চারপাঁচ দিনের, বিশেষত আজ সন্ধ্যের পরের অভিজ্ঞতার টুকরোটুকরো অংশ ছিঁড়েছিঁড়ে পরিবেশন করল সুনন্দর সামনে। সব কথা বলল না। সব কখনো বলা যায় না। তার অভিজ্ঞতার দুঃসহতার ঈষৎ আঁচ শুধু দিল সুনন্দকে।

সুনন্দ দারুণ গম্ভীর হয়ে গেল। এত গম্ভীর হতে তাকে দেখা যায় না। তার ভ্রূসন্ধিতে খাঁজ পড়ল দুতিনটে।

গা সিরসির করা শীতের হাওয়া আসছিল। অমল কোটটা ওঘরে খুলে রেখে এসেছে, পায়ে স্লিপার। উঠে দরজাটা বন্ধ করে একটানে সুনন্দর বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে এল। ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ফিরে এসে বসল টেবিলের পাশে।

সুনন্দ বলছিল, 'নতুন কিছুই শোনাতে পারলি না। সেই পুরোন মদ। তোর বোতলটাও নতুন কিনা সন্দেহ হয়।—কী বলছিলি যেন -মদের গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছিল! আরো কতকাল নাবালক থাকবি?'

'আমার চরিত্রের ওপর টীকা বাদ দিয়ে, কী বলতে চাস বল্।'

সুনন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বুঝিয়ে বলবার জন্যই তো সে উস্খুস্ করছিল। ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'অন্য দেশের কথা জানি না। এদেশে কিন্তু সেই পুরোন প্যাটার্ন একইরকম আছে, কোনোই বদল হয়নি। এই বেসক্যাম্পে যে কঠিন স্তরবিন্যাস দেখছিস, সারা দেশে সেই একই নক্শা। একই আদলে সারা দেশ চলছে। এই খুদে বেসক্যাম্প তার শিশুসংস্করণ।'

সুনন্দর উৎসাহ নিভিয়ে দেবার জন্য তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অমল বড় করে একটা হাই তুলল : 'বুঝলাম। তোর পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে এত ভনিতা করছিস কেন? তুই বলতে চাস, এখানে নয়নতারা একটি ব্যক্তি নয়, একটি স্তরে কিছু ঐশ্বর্য ও বিলাসের প্রতীক মাত্র। চালু নক্শা বদলে না গেলে, সেখানে আমার হাত পেঁছিবে না।' দুবার কেশে আবার বলল, 'খিদের মুখে তোর সমাজদর্শনের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে। রাত দুপুরে বাণী শুনতে তোর ঘরে আসিনি।'

সুনন্দ হিহি করে হাসল : 'বেশ তো, যে জন্য ডেকেছি তাই কর্। হাত গুটিয়ে বসে না থেকে, খেয়ে নে। আর আমার একটা শুধু কথা শোন্। গোপাল আমার, ধেনুর আগে ধাইয়ো না!'

শব্দ করে হাসতে গিয়ে অমল থেমে গেল। একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল সামনে রাখা খাদ্যের দিকে। বস্তুত এখন বুঝতে পারছিল, প্রচুর খিদে পেয়েছে। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে চুরি করা মাংসের টুকরোয় দাঁত বসাল।

[ক্রমশ]

# একটি জগাখিচুড়ি শব্দের অভিধান

সুবীর রায়চৌধুরী

অভিধানে যতোগুলি শব্দ আছে সে সকল আসলে জীবিত
জীবনবিশিষ্ট সত্তা, হয়তো হুবহু এই বকুলের মতো—

বিনয় মজুমদার : অঘ্রানের অনুভূতিমালা

আপনি 'ছি ছি' শব্দটির মানে জানেন? ছি ছি বলতে আপনার তোবা তোবা বা মর্জিনার অবিস্মরণীয় গান 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' ইত্যাদি অনেক কিছুই মনে পড়বে, কিন্তু নিন্দা-ঘৃণা-তাচ্ছিল্য ছাড়া ছি ছি-র সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ কি আপনার চোখে পড়েছে? আপনি কি জানতেন ছি ছি বলতে এককালে অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ানদের (তখন বলা হতো ইউরেশিয়ান) বোঝাতো? হিকি-র 'বেঙ্গল গেজেট'-এ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল:

প্রেটি লিট্‌ল লুকিং গ্লাসেস
গুড অ্যান্ড চীপ ফর ছি ছি মিসেস।

বলা বাহুল্য এই ছি ছি ভারতীয় ভাষা থেকেই গৃহীত এবং এ থেকে বোঝা যায় ইউরোপীয়রা কী চোখে অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ানদের দেখতো।

কলকাতা-র নামের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের অন্ত নেই। কিন্তু কলকাতার যে একটি প্রচলিত নাম ছিল ডিচ বা ডিচার, সে-খবর আজ আমরা কয়জন রাখি? মারাঠা ডিচের জন্য কলকাতার এই নামকরণ। বর্ষাকালে বা অন্য সময়ে কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে মনে হয় এই নাম এখনও সার্থক। মাহুত অর্থে 'ইন্ডিয়ান' শব্দের প্রয়োগও আজ অপ্রচলিত। 'কুমকী' শব্দটি আমি কোনো বাঙলা অভিধানে পাই নি। হাতি ধরার জন্য মেয়ে-হাতি দিয়ে ফাঁদ পাতা হতো। বাঙলাদেশে নাকি এই মেয়ে-হাতির নাম ছিলো 'কুমকী'।

হেনরি ইউল এবং আর্থার বারনেল সংকলিত 'হবসন জবসন (১৮৮৬)' শব্দার্থ অভিধানে এ-ধরনের শব্দের ছড়াছড়ি। যাঁরা ভয়ে বা আলস্যে অভিধান খোলেন না, তাঁরাও এই বইয়ের দু-এক পাতা ওলটালে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে শব্দের ইতিহাস অনেক সময়ে গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর। একজন মানুষের জীবনে যেমন অনেক স্মৃতি, অনেক অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে, তেমনি একটি শব্দের মধ্যেও নিহিত থাকে কতো ইতিহাস, কতো বিস্মৃত পরিচয়। কথায় বলে কান শুনতে ধান শোনা। কিন্তু ভাষার শব্দভাণ্ডারে এরকম কতো কান যে ধান রূপে স্থায়ী হয়ে গেছে তার কিছু নজির মিলবে 'হবসন জবসন'-এ। ধরুন, কোনো পাক-ভারতীয় মুসলমানকে যদি জিগগেস করা হয় হবসন জবসন মানে কী, তাহলে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না যে মহরমের হা হাসান হা হোসেন-এর গোরা সংস্করণ হলো হবসন জবসন। হাসান-হোসেনের জন্য বিলাপ গোরা সৈন্যদের কানে শোনাতো হবসন জবসন। এরকম আরেকটি শব্দ রমদম<রমজান। তেমনি আমরা যদি কারো মুখে শুনি 'আপার রজার', আমরা ভাববো কোনো ইংরেজি শব্দ। কার মাথায় আসবে যে আপার রজার হলো যুবরাজ-এর বিকৃত রূপ? সেন্ট ডিভ্‌স বললে সেন্ট হেলেনা-র

মতো কোনো দূরের দ্বীপ মনে হত। আসলে সেন্ট ডিভস হলো সন্দ্বীপ-এর সাহেবি নামকরণ। তেমনি আমাদের কারো চট করে মনে হবে না যে আইল-ও-ব্যাটস হচ্ছে এলাহাবাদ। স্যর হেনরি ইলিয়ট 'দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ্ টোল্ড বাই ইট্স ওউন হিস্টোরিয়ান্স' গ্রন্থে লক্ষ করেছেন যে গোরা সৈন্যরা অনেক সময় দেশীয় নবাব-সেনাপতিদের নাম তাদের সুবিধেমতো অনুষঙ্গে রূপান্তরিত করতো। ফলে 'শেখবতী' তাদের মুখে দাঁড়ালো 'শেরি অ্যান্ড ওয়টর', 'সিরাজউদ্দৌলা' হলো স্যর রজার ডাউলার, দলীপ 'টিউলিপ'-এ। আর শাহ সুজা মুল্ক্ হলেন 'চা শুগার অ্যান্ড মিল্ক'।

শুধু কি গোরা-সাহেবদের দ্বারা বিকৃত শব্দই হবসন জবসন-এ আছে? জেন্টু-মুরবাবুদের তৈরি বহু শব্দও এখানে পাওয়া যাবে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'কিশমিশ' আমরা সবাই জানি খাবার জিনিশ। কিন্তু কিশমিশ-এর আরেকটি মানে আমাদের মাতৃভাষার অভিধানে পাওয়া যাবে না। এর অন্য একটা অর্থ হলো ক্রিসমাস, যাকে আমরা বড়োদিন বলি। সাহেবদের বাবুর্চি-খানশামারা ক্রিসমাসকে শুনতো কিশমিশ। ইংরেজি আরেকটি শব্দের কৌতুকপ্রদ বিকৃতি ঘটেছে; অ্যাক্টিঙ>এক টেঙ>এক ঠেঙ, বা ঠ্যাঙ। অস্থায়ী পদে কর্ম করলে হয় অ্যাক্টিঙ। সুতরাং অ্যাক্টিঙ মানে একঠেঙে, কেননা স্থায়ী কর্মচারীর প্রতাপ তো তার থাকে না। 'কুই হায়'-এর দল বলতে কোনো গুহ্য সাধক সম্প্রদায়কে বোঝায় না, এক কালে বাঙলাদেশে ফিরিঙ্গিরা এই নামেই পরিচিত ছিলেন। কেননা চাকরদের তাঁরা হাঁক দিতেন এইভাবে: কোই হ্যায়? তাদের বিকৃত উচ্চারণে সেটা ক্রমশ দাঁড়ালো কুই হায়-এ। তা থেকে কুই হায়-এর দল। তেমনি ফিরিঙ্গি পরিবারে মনিবের সঙ্গে দেখা হবে না, এর প্রতিশব্দ দাঁড়িয়েছিলো 'দরওয়াজা বন্ধ্'।

'হবসন জবসন' শব্দার্থ অভিধানে বহু অপশব্দ আছে, যাদের উৎসও বেশ কৌতুকপ্রদ। যেমন 'সাডেন ডেথ' মানে কি?—আকস্মিক মৃত্যু? মোটেই না। মুখরোচক মুরগির মাংস হলো সাডেন ডেথ। গোরা-সাহেবরা যখন ডাকবাঙলোয় উঠতেন, তখন তাঁরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খানশামারা উঠোনে-পালা মুরগির ছানাকে কেটে ছাল ছাড়িয়ে রান্না চাপিয়ে দিতো। সাহেবরা কলঘর থেকে বেরোবার আগেই তৈরি হয়ে যেতো মাংস। এতো তাড়াতাড়ি ধরা-কোটা এবং রান্নার জন্য এই অদ্ভুত নাম। আনুমানিক ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'ভয়েজ টু চায়না' গ্রন্থে পূর্বোক্ত অর্থে সাডেন ডেথ-এর প্রয়োগ দেখা যায়। তেমনি 'রেড ডগ'-এর সঙ্গে কুকুরের কোনো সম্বন্ধ নেই। এর মানে ঘামাচি। 'হবসন জবসন' অভিধানে আছে যে, চার্লস নেপিয়ার হেন জাঁদরেল ব্যক্তিও গরমকালে লোকজনের সঙ্গে দেখা করবার সময় দরজার ধারটায় দাঁড়াতেন, যাতে দরকার মতো দরজায় পিঠ ঘ'ষে ঘামাচিগুলোকে চুলকে নিতে পারেন। বড়োলাট বাহাদুর বেন্টিঙ্কও নাকি ব্রিটিশ কেতা ভুলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ে রেড ডগের জ্বালা প্রশমনের জন্য পিঠ চুলকোতেন।

ইউরোপীয়দের চারশো-সাড়ে চারশো বছর আগে ভারতবর্ষে আগমন, প্রথমে বাণিজ্য বিস্তার, পরে রাজ্যজয়—এ সবই আজ ইতিহাস। এ বিষয় নিয়ে প্রচুর বইও লেখা হয়েছে। ইউরোপীয়রা বিশেষভাবে ইংরেজরা চলে যাবার পরও রেখে গেছে তাদের ভাষা। সেই ভাষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগ এতো ঘনিষ্ঠ যে স্বাধীনতার পর তেইশ বছর ধরে 'অ্যাংরেজি হটাও' আন্দোলন করেও আমরা ইংরেজিকে তুলে দিতে পারি নি। আমরা ভারতীয়রাই বাধা দিয়েছি। ইংরেজকে বিদায় দিলেও ইংরেজিকে ত্যাগ করিনি। অন্যদিকে প্রাচ্য ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে মেকলের উন্নাসিকতা সত্ত্বেও ইংরেজি অভিধানে ভারতীয় শব্দের

সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ভাষার ক্ষেত্রে এই আদান-প্রদান প্রায় অনিবার্য। এখানে কোনো শুচিবাই চলে না। ইংরেজি অভিধানে যেসব ভারতীয় শব্দ স্থান পেয়েছে সেগুলির যেমন ধ্বনিগত রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি বাঙলাতে গৃহীত ইংরেজি বা অন্যান্য ইউরোপীয় শব্দও অবিকৃত থাকে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে 'বাবু ইংরেজি' এবং 'ফিরিঙ্গি বাঙলা-হিন্দি' আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত। মুৎসুদ্দি-বাবুদের ইউ ফাদার-মাদার বা আই হ্যাজ জাতীয় ইংরেজি এখন আর কেউ ঠাট্টা করে ছাড়া বলেন না, অন্যদিকে আপনার অ্যানি-মিয়া হয়েছে অর্থে 'আপনি বিরক্ত<বি-রক্ত হইয়াছেন' শোনা যায় না।

'হবসন জবসন' অভিধানের বৈশিষ্ট্য হলো এর অধিকাংশ শব্দ ইংরেজি অভিধানেও স্থান পায়নি, আবার বাঙলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অভিধানেও বর্জিত হয়েছে। হয়তো পরিবেশ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব শব্দের ঐতিহাসিক প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। সে অর্থে উক্ত অভিধানের বহু শব্দই মৃত। শুধু অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান উপন্যাস বা রচনা বলে যাকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, সে জাতীয় বইতে এই ধরনের শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'হবসন জবসন'-এর সাব-টাইটেল আছে এইভাবে: 'এ গ্লসারি অব কলোকিয়্যাল অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান ওয়র্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস'। আমাদের সামাজিক জীবনে এক শ্রেণীর অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ানরা যেমন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয়ের কাছ থেকে সমান দূরত্বে থেকে গেছেন, তেমনি পূর্বোক্ত বহু শব্দই আজ দীর্ঘ অব্যবহারে বিস্মৃত। 'টোপিওয়ালা' বললে আজ আর বিশেষভাবে শাদা সাহেবকে বোঝাবে না, যেমন কোনো বাঙালি-বিহারী-অসমিয়াকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করলে সাহেবদের অর্থে 'বাবু' শব্দটির পরিচয় পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে একদা বহু ব্যবহৃত 'কম্পিটিশনওয়ালা' শব্দটিতেও আজ মরচে পড়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস আজো আছে, কিন্তু রাইটার বললে আজ আর কেরানি বা আমলা বোঝায় না। আজ যদি কোনো সাহেব বা ভারতীয়কে 'সিটিং আপ' প্রথার কথা বলা যায়, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। এক কালে ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্সি শহরে কোনো পদস্থ ইউরোপীয় আমলার মেমসাহেব নতুন এলে তাঁকে তিন রাত ধরে নিজের বাড়িতে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে হতো। এই অনুষ্ঠানের নাম 'সিট আপ' প্রথা। আরো দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। স্টিমার শব্দটি বাঙলায় কেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও সুপরিচিত। কিন্তু স্টিমার অর্থে ভারতীয় ও ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণে তৈরি 'আগুন বোট' স্থায়ী হয় নি। অথচ এ-জাতীয় বহু খিচুড়ি শব্দ হেড-পণ্ডিত, হাফ-আখড়াই এখনও দিব্যি চলে।

বহু ক্ষেত্রে আবার শব্দগুলি প্রচলিত থাকলেও অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। এটা অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে হতেই পারে। যেমন হিন্দিতে 'রাম রাম' শুভেচ্ছাজ্ঞাপক, কিন্তু বাঙলায় রাম রাম-এর সঙ্গে ছি ছি প্রায় অপরিহার্য। তুলনীয়: 'আরে ছি ছি রাম রাম বোলো না হে বোলো না'। তেমনি 'হবসন জবসন' অভিধানে 'চীজ' কথাটি প্রশংসার্থে ব্যবহৃত। কিন্তু বাঙলায় 'ছেলেটি একটি চীজ' অথবা 'ও যে কী চীজ তা তো জানো না' মোটেই প্রশংসা করে বলা হয় না। কিন্তু 'মাই নিউ আরব ইজ এ রিয়্যাল চীজ' বললে সুখ্যাতিই বোঝায়।

এ থেকে অবশ্য পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে 'হবসন জবসন' অভিধানের সব শব্দই নেহি ঘরকা নেহি ঘাটকা। অনেক শব্দ ইংরেজিতেও গৃহীত, কিছু শব্দ বাঙলা এবং অন্যান্য ভারতীয় শব্দের অভিধানে এখনও পাওয়া যায়। প্রথম জেমসের আমল থেকে ক্যালিকো, চিন্‌টজ (-ছিট) ইত্যাদি শব্দ ইংরেজিতে প্রচলিত। তবে 'হবসন জবসন' প্রধানত সেই সব শব্দের সংকলন যার মূল বিকৃত—যেখানে ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বের অনুশাসন কঠোর

নয়। দুই ভিন্নভাষী বিদেশীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ভাববিনিময়ের তাগিদে বিকৃত উচ্চারণ এবং অনেক সময়ে ভুল অর্থে যে শব্দগুলি তৈরি হয়েছিলো বিশেষভাবে তারই সংগ্রহ 'হবসন জবসন।' 'হবসন জবসন'-এর ভূমিকায় যাকে বলা হয়েছে, 'এ ব্যাস্টার্ড ভ্যারাইটি অব দি ল্যাঙ্গুয়েজ', তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে এখানে। প্রকৃত অর্থেই এটা মুখের ভাষার অভিধান এবং সে মুখের ভাষা কারো মাতৃভাষা নয়।

২

English officers...have become de-Europeanised from long residence among undomesticated natives...such officials are what Lord Lytton calls *White Baboos*—Aberigh-Mackay, *Twenty-One Days.*

স্যর উইলিয়ম স্লীম্যান ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠগিদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দাবলি 'রামসিয়ানা' নামে প্রকাশিত করেন। ঠগিরা ছাড়া রামসিয়ানার শব্দগুলি সাধারণের কাছে অর্থবহ নয়। 'হবসন জবসন' এই অর্থে কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ শব্দসংকলন না হলেও যেসব ইংরেজ বা ইউরোপীয়ের ভারতীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় নেই, তাদের কাছে অতোটা আকর্ষণীয় মনে হবে না। যেসব 'শ্বেতাঙ্গ বাবুরা' এরকম ইংরেজি বলতেন, 'দি ওল্ড বক্‌শি ইজ্ অ্যান অফুল বাহাদুর, বাট হি কীপস এ ফার্স্টরেট বোবার্চি' (<বাবুর্চি) কিংবা 'আই ডোন্ট কেয়ার এ ড্যাম' (<দাম), তাদের কাছে এর উপযোগিতা এবং আকর্ষণ অসামান্য।

'হবসন জবসন'-এর যুগ্ম সম্পাদক আর্থার কোক বারনেল এবং স্যর হেনরি ইউল-এর সঙ্গে দেখা হয় আকস্মিকভাবে। বারনেল ইউল-এর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোটো ছিলেন।

আর্থার কোক বারনেল (১৮৪০-৮২ খ্রী) ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক। তাঁর পিতা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবিভাগে কাজ করতেন। আর্থার বারনেল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. হয়ে মাদ্রাজে আসেন। বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদে কর্ম করে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি জেলা জজের পদে উন্নীত হন। জেলা জজ রূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তবে চাকরিজীবনে তিনি সবচেয়ে বেশিকাল ছিলেন তাঞ্জোরে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিলো না। ফলে বাধ্য হয়ে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। বারনেল বহুভাষাবিদ পণ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তিনি বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন, পরে সেগুলি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দান করে যান। সংস্কৃত ছাড়াও তিব্বতী, আরবী, জাপানী, পালি ইত্যাদি ভাষায় তাঁর অল্প-বিস্তর অধিকার ছিলো। তিনি নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'হ্যান্ডবুক অব সাউথ ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি,' 'দি পর্তুগীজ ইন ইন্ডিয়া', 'দি ঐন্দ্র স্কুল অব স্যান্‌সক্রিট গ্রামারিয়ানস'।

স্যর হেনরি ইউল (১৮২০-৮৯ খ্রী) ছিলেন কর্নেল। তাঁর পিতাও ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করতেন। বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ার গোষ্ঠীতে তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করে আসাম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রেলবিভাগেও কিছুদিন কাজ করেন। দুটো শিখযুদ্ধের সময়ই তিনি অংশ

নিয়েছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন এলাহাবাদে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে অসামান্য জ্ঞানের জন্য তিনি বিলেতের রয়্যাল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটি ও ইটালির জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটির দ্বারা সম্মানিত হন। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অন্যতম লেখক ছিলেন, "হবসন জবসন" ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন।

বারনেল-এর সঙ্গে কর্নেল ইউল-এর প্রথম আলাপ হয় ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বারনেল ভারতে ফিরে গিয়ে ইউলকে লেখেন যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শব্দাবলির একটি অভিধান প্রকাশের জন্য তিনি শব্দ-সংগ্রহ করছেন। উত্তরে ইউল তাঁকে জানান যে এরকম একটা পরিকল্পনা দীর্ঘকাল ধরে তাঁর মাথাতেও আছে এবং তিনি রাজি হলে কাজটা যুগ্মভাবে করা যেতে পারে। তারপর দীর্ঘ দশ বছর ধরে অসামান্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে শব্দসংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অভিধানটি সম্পূর্ণ হবার আগেই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বারনেল-এর মৃত্যু হয়। অভিধানটি প্রকাশিত হয় হয় তারো চার বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। অভিধানটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং এর সম্পাদক উইলিয়াম ক্রুক। তিনি নতুন সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন যে তিনি নতুন কোনো শব্দ সংযোজনের চেষ্টা করেননি। শুধু দু-একটি রচনা বা রচনা বিষয়ে উদ্ধৃতি যা হয়তো প্রথম সংস্করণে আকস্মিকভাবে বাদ পড়ে গিয়েছিলো, সেগুলি বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে যোগ করেছেন। পঁয়ষট্টি বছর পরে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বিতীয় সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। একই বছর দিল্লি থেকেও একটি ভারতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে।

ভূমিকা গ্রন্থপঞ্জি সূচিপত্র বাদ দিয়ে এই অভিধানটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৮৬। ডবল মিডিয়াম আকারের দু-কলমে ছোটো হরফে ছাপা এতে শব্দ আছে সাত হাজারের কিছু বেশি। জি সুব্বারাও তাঁর "ইন্ডিয়ান ওয়র্ডস ইন ইংলিশ (১৯৫৪)" বইতে বলেছেন যে অক্সফোর্ড অভিধানে স্বতন্ত্র শব্দরূপে নির্দেশিত ভারতীয় শব্দের সংখ্যা প্রায় নশোর মতো। স্বভাবতই বাঙলায় গৃহীত ইংরেজি শব্দের সংখ্যা বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল হতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের প্রথম সংস্করণে শব্দসংখ্যা ছিলো পঁচাত্তর হাজার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ও. ডি. বি. এল. গ্রন্থে হিশেব ক'রে দেখিয়েছেন যে ঐ শব্দাবলির মধ্যে সাতশো ইংরেজি শব্দ, প্রায় একশো পর্তুগীজ শব্দ। এছাড়া কিছু ওলন্দাজ-ফরাশি শব্দও আছে। সুব্বা রাও-এর মতে তেলুগু কথ্য ভাষাতেই প্রায় তিন হাজারের মতো ইংরেজি শব্দ পাওয়া যায়। যাই হোক, সুব্বা রাও শতক ভিত্তিতে ইংরেজি ভাষায় গৃহীত ভারতীয় শব্দের হিশেব দিয়েছেন এইভাবে : সতেরো শতক ৩৬৯, আঠারো শতক ১৬০, উনিশ শতক ২০০, বিশ শতক ২১, মোট ৭৫০। সুতরাং বলা বাহুল্য 'হবসন জবসন'-এ সংকলিত সাত হাজারের বেশি সংকলিত শব্দের এক-দশমাংশও স্থান পায়নি অক্সফোর্ড অভিধানে।

সুব্বারাও-এর হিশেব অনুযায়ী সতেরো শতকে ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। এগুলির অধিকাংশ স্বভাবতই বাণিজ্যিক পরিভাষা বা বস্ত্র-ব্যবসায় সংক্রান্ত। আভিধানিকেরা যাকে বলেন 'কন্টেন্ট ওয়র্ডস', এগুলি মূলত তাই। ব্যবহারিক প্রয়োজনে এগুলি গ্রহণ করা হয়, সাহিত্যিক মূল্যের প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

আঠারো শতকে গৃহীত শব্দাবলির সংখ্যা সতেরো শতকের তুলনায় অনেক কম।

কিন্তু গৃহীত শব্দের পদপরিবর্তন করে ব্যবহার, ভারতীয় অনুসর্গ-প্রত্যয় যোগ ইত্যাদির ফলে অনেক বেশি আত্মস্থীকরণ হয়েছে। উনিশ শতকে আবার আঠারো শতকের চেয়ে বেশি শব্দ ইংরেজিতে এসেছে। এর কারণ হলো উনিশ শতকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চার প্রসার এবং আর্যভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি। অবশ্য এই আগ্রহের সূত্রপাত আঠারো শতক থেকেই লক্ষ করা যায়। ফলে এই পর্বে গৃহীত ভারতীয় শব্দাবলির মধ্যে ব্যবহারিক বা আইন-কানুনের পরিভাষা ছাড়াও বহু দার্শনিক শব্দও আছে। বিশ শতকে আবার অনেক রাজনৈতিক শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ করি।

কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনে এবং আমলাতান্ত্রিক প্রয়োজনে ভারতীয় শব্দের ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে। এককালে সাহেব আমলারা এতো বেশি ভারতীয় শব্দ ব্যবহার করতেন যে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের প্রতি বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের কাছ থেকে নির্দেশ আসে যে তাঁরা যেন প্রেরিত রিপোর্টসমূহে যথাসম্ভব ভারতীয় শব্দ বর্জন করেন। এমনকি হেস্টিংসের বিচারকালে এডমন্ড বার্ককেও পার্লামেন্টে ঘোষণা করতে হয়েছিলো : এই ভাষা কোম্পানির আমলাতান্ত্রিক প্রয়োজনে এবং শাসনকার্যের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পার্লামেন্টে এগুলির প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। কেননা অধিকাংশ সদস্যের কাছেই এই শব্দগুলি অপরিচিত ও অর্থহীন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখতে পাই। শাসনকার্যে তো বটেই, সাহেবদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ভারতীয় শব্দের ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে। শাসক এবং শাসিতের সম্পর্কে ব্যবধান যতোই বিস্তৃত হতে থাকে, শব্দের গ্রহণও সেই অনুপাতে কমতে লাগলো। যে শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই বা থাকলেও খুব মনঃপূত নয়, শুধু সেগুলিই গৃহীত হলো। ফলে ভ্রমণকাহিনী বা ভারতীয় পটভূমিতে লেখা উপন্যাস বা কাহিনী ছাড়া এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার বিশেষ রইলো না। 'হবসন জবসন'-এ সংকলিত বহু শব্দ সংকলনের সময় থেকেই মৃত। এমনকি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে একজন বিদুষী ইংরেজ লেখিকা 'হবসন জবসন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখছেন : হবসন জবসন হিন্দু নাবিকদের একটি পার্বণ।

সাধারণ অভিধানের সঙ্গে 'হবসন জবসন'-এর পার্থক্য বিষয়ে আগেই কিছুটা বলা হয়েছে। আলোচ্য অভিধানের সংকলকেরা কখনো একে পুরোপুরি অভিধান বলে দাবি করেননি। তাঁরা বলেছেন গ্লসারি অর্থাৎ শব্দার্থ অভিধান। তাঁদের গ্রন্থের সাব-টাইটেলটি দীর্ঘ : এ গ্লসারি অব কলোকিয়্যাল অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান ওয়র্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস, অ্যান্ড অব কিন্ড্রেড টার্মস, ইটিমোলজিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল, জিওগ্র্যাফিকাল অ্যান্ড ডিসকারসিভ। সুতরাং এটি একটি বিশেষ ধরনের শব্দকোষ। এখানে অভিধানটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে:

ক. 'হবসন জবসন' শব্দকোষের অধিকাংশ শব্দই বিকৃত রূপ ও উচ্চারণে নির্দেশিত—হয় শ্বেতাঙ্গ বাবুদের দ্বারা না হয় জেন্টু-মুরদের দ্বারা বিকৃত। ইউল যাকে বলেছেন, 'ভালগার কোয়াসি ইংলিশ স্পেলিংস'। আভিধানিকের পরিভাষায় এগুলি ডেনিজেনস বা বিদেশী। ফলে শব্দগুলি চেনা গেলেও বানানগুলি আমাদের অপরিচিত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

যে বানানে অভিধানে নির্দেশিত ॥ মূল শব্দ

KUBBER, KHUBBER <খবর

CUSCUSS, CUSS < খশখশ
KUBBERDAUR < খবরদার
GUP < গল্প
GUNTA < ঘণ্টা
GOOZUL-KHANA < গোসলখানা
CRANNY < কেরানি
JUGGURNAUT < জগন্নাথ
JADOOGUR < জাদুঘর
TODDY < তাড়ি
DOAI, DWYE < দোহাই
PICQUEDAN, PICQUEDENT < পিকদান
MAUMLET < ওমলেট

খ. বিকৃতরূপে নির্দেশিত ব'লে এর অধিকাংশ শব্দই প্রামাণিক অভিধানগুলিতে স্থান পায়নি। এমনকি 'হবসন জবসন' শব্দটিই অক্সফোর্ড অভিধানে (১৯৩৩ খ্রী) স্থান পায়নি, যদিও ওয়েবস্টারে আছে।

গ. যদিও একে গ্লসারি বা শব্দার্থ অভিধান বলা হয়েছে, কিন্তু পরিসর অনেক বিস্তৃত। গেজেটিয়ার এবং কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও এর অন্তর্ভূত। সেযুগের ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রধান প্রধান রাজ্য ও শহরের ভৌগোলিক পরিচয়ও এখানে পাওয়া যাবে। আবার সতী, ঠগ, চা ইত্যাদি বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা আছে।

ঘ. ভারতবর্ষের পশু-পক্ষীদের বিবরণও কম মনোজ্ঞ নয়। হাড়গিলা পাখিকে কেন অ্যাডজুট্যান্ট বলা হয়, এলিফ্যান্ট শব্দটি কী করে হলো এরকম অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ আছে।

ঙ. 'হবসন জবসন' শুধু ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দেরই সংগ্রহ নয়। তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং তার বাইরের দেশ থেকে গৃহীত বহু শব্দও এখানে পাওয়া যাবে। তামিল তেলুগু হিন্দী বাঙলা উর্দু নেপালী বর্মী মালয়ী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ছাড়াও তুর্কী-চীনা-জাপানী শব্দও আছে। দু-একটি জাপানী শব্দের নমুনা : তাড়াতাড়ি অর্থে 'জিগিজিগি', পেট চিরে আত্মহত্যা অর্থে 'হারাকিরি'। তাছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা থেকে গৃহীত শব্দও অল্পবিস্তর স্থান পেয়েছে।

চ. হবসন জবসন-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত পালা-পার্বণের পরিচয় দেওয়া আছে, যেমন, পোঙ্গল, মহরম, হোলি, দসেরা, রমজান। অনেক হিন্দু দেবতা বিষয়েও বিশদ আলোচনা আছে, যেমন শালগ্রাম, জগন্নাথ।

হবসন জবসন-এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগ থেকেই শুরু হয়। সেগুলি অবশ্য বস্ত্র-ব্যবসায় সংক্রান্ত। তাছাড়া ইংরেজিতে লেখা ভারত-ভ্রমণকাহিনীতেও বহু লেখক ভারতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিলেতে হেস্টিংসের বিচারকালে বিশেষভাবে বহু ভারতীয় শব্দের অর্থনির্দেশের প্রয়োজন হয়। সে সময় থেকে ভূমিরাজস্ব আইন ও শাসনকার্যে প্রচলিত ভারতীয় শব্দের পরিভাষা সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ জাতীয় বইয়ের একটি তালিকা 'হবসন জবসন'-এর গ্রন্থপঞ্জিতে দেওয়া আছে।

আলোচ্য অভিধানের ভূমিকাতে দাবি করা হয়েছে যে যদিও কারি, তাড়ি, বারান্দা, চুরুট, লাঠি, নবাব, টিপয়, সিপাই, কড়ি ইত্যাদি ইংরেজি অভিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তবুও কম্পাউন্ড, বাট্টা, পাকা, চোরি, বাবু, মাহুত, আয়া, নাচ, কম্পিটিশনওয়ালা, গ্রিফিন ইত্যাদি পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি। তবে সংকলকেরা বলেছেন যে, ইংরেজিভাষীদের অজানতে বহু ভারতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন মানোয়ারি জাহাজের তিন রকম নৌকোই যথা কাটার, জলি-বোট এবং ডিঙি—সবগুলিই সম্ভবত ভারতীয় শব্দ থেকে গৃহীত।

সংকলকেরা লক্ষ করেছেন অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান শব্দাবলির ওপর পর্তুগীজ ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি এবং ওলন্দাজ ভাষার সবচেয়ে কম। অনেক সময় বহু ভারতীয় শব্দ পর্তুগীজ ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের কাছে পেঁছেছে, যেমন;

প্যালাঙ্ক্যুইন <পর্যঙ্ক, পলঙ্ক

ম্যান্ডারিন <মন্ত্রী

ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানীর প্রভাব সর্বাধিক। এই ভাষার সঙ্গে এ দেশের ইউরোপীয়রা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকায় ইউরোপীয়দের মধ্যে সেগুলির চর্চা তুলনায় কম, যদিও শব্দাবলির অনুপ্রবেশ কম ঘটেনি, যেমন বিটেল (মালায়লী), ম্যাঙ্গো (তামিল), জ্যাক (মালয়ালী), চুরুট (তামিল ও মালয়ালী), মঙ্গুজ (তেলুগু), পারিয়া (তামিল), টিক (মালয়ালী), কারি (তামিল) ইত্যাদি।

ভূমিকার পরিশেষে বারনেল অ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান শব্দাবলি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের আলোচনায় বিশেষভাবে মূল্যবান :

'Considering the long intercourse with India, it is noteworthy that the additions which have thus accrued to the English language are, from the intellectual standpoint, of no intrinsic value. Nearly all the borrowed words refer to material facts, or to peculiar customs and stages of society, and though a few of them furnish allusions to the penny-a-liner, they do not represent any new ideas' (p XXXI).

এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন সুব্বা রাও তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে। তিনি তাঁর বইতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এইসব শব্দ শুধু 'এক পয়সায় এক লাইন' দরের লেখকেরাই ব্যবহার করেন না, মিলটন, ড্রাইডেন, ব্রাউনিং (ব্রাউনিং-এ অবশ্য অপপ্রয়োগ আছে) থেকে শুরু করে থ্যাকারে কিপলিং টমসন প্রমুখ বহু লেখকের রচনাতেই এগুলির ব্যবহার আছে। বলা বাহুল্য এই তালিকা সত্ত্বেও বারনেল-এর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। সুব্বা রাও নিজেই অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে সাহেবরা হয়তো 'শাম্পু' শব্দটি ব্যবহার না করেও শাম্বু করতে পারেন কিংবা 'ডাঙ্গারি' (মোটা কাপড়) পরেও শব্দটি বর্জন করে দিব্যি চালাতে পারেন। তবে এইসব শব্দাবলি তাঁদের রচনায় অনেকটা দৈনন্দিন আহার্যের মধ্যে পোলাও-মাংসের মতো—নিত্য প্রয়োজনীয় হয়তো নয়, কিন্তু স্বাদ বদলায় এবং বৈচিত্র্য আনে।

৩

*.Take this as a good fare-well draught of English-Indian liquor.*

'হবসন জবসন' অভিধানে সংকলিত শব্দাবলি ইংরেজি বা ইউরোপীয় ভাষায় কতোটা গৃহীত হয়েছে, গৃহীত হলেও স্থায়ী হয়েছে কিনা অথবা তাদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে কিনা সেটা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু আমার মনে হয় বাঙলা অভিধানের সংকলকেরা এই অভিধান থেকে অনেক শব্দ অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়েও নতুন আলোকপাত করে।

ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট বা কোর্টে আমরা হামেশাই যাতায়াত করি। কিন্তু 'ব্যাঙ্কশাল' শব্দটির মানে আমি কোনো বাঙলা অভিধানে পাই নি। ব্যাঙ্কশাল (<বণিকশালা, ভাণ্ডশালা)-এর মানে ১। গুদোমঘর ২। পোত-অধিকর্তার দপ্তর। তেমনি 'কুমকী' শব্দটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও বহু প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ বিষয়েও অনেক তথ্য আছে। প্রসঙ্গত দু-একটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন, দারোগা, দেউলিয়া।

'দারোগা' শব্দটি রাজশেখর বসুর মতে তুর্কী শব্দ, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতে আরবী শব্দ, যোগেশচন্দ্র, হরিচরণের মতে ফারশী শব্দ। তবে মানের দিক দিয়ে একটি অর্থই সবাই বলেছেন, পুলিশের পদস্থ কর্মচারী।

হবসন জবসন-এর মতে 'দারোগা' শব্দটি ফারশীর মাধ্যমে এলেও শব্দটি মোঙ্গল ভাষা থেকে গৃহীত এবং শব্দটির অর্থসংকোচ ঘটেছে। 'দারোগা' অর্থে তৈমুর এবং তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তার আমলে জেলা অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বোঝাতো। ১৭৯৩ থেকে ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'দারোগা' শব্দটি ব্রিটিশ পুলিশ ব্যবস্থায় শুধু পুলিশ কর্মচারী অর্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। উইলসনের মতেও যে কোনো দপ্তর বা বিভাগের প্রধানকে দারোগা বলে। কিন্তু পরে শুধু শুল্ক, আবগারি এবং পুলিশ কর্মচারীর ক্ষেত্রেই এই শব্দটির ব্যবহার হয়।

এমনি আরেকটি শব্দ দেউলিয়া, দেউলে। যোগেশচন্দ্র, হরিচরণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতে শব্দটি হিন্দি থেকে এসেছে এবং এর অর্থ নিঃস্ব বা সর্বস্বান্ত। কুচবিহার উপভাষায় প্রচলিত অতিরিক্ত একটি অর্থ নির্দেশ করেছেন, সাংসারিক কার্যের তত্ত্বাবধায়ক।

রাজশেখর বসু নিঃসম্বল অর্থে দেউলে শব্দটির উৎস নির্দেশ করেছেন সংস্কৃত 'দেবকুলিক' থেকে। কিন্তু 'দেবকুলিক' থেকে যে দেউলিয়া শব্দটি এসেছে তার মানে 'টেম্পল অ্যাটেনড্যান্ট' (দ্র টারনার সংকলিত 'এ কম্প্যারেটিভ ডিকশনারি অব দি ইন্ডো-এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস) বা মন্দির-পরিচারক (দ্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন)।

দেউলে কথাটির সঙ্গে দীপ শব্দের কোনো অনুষঙ্গ আছে কিনা সে-প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, 'ব্যবসায়ী নিঃসম্বল হইলে সে অবস্থা জানাইবার অভিপ্রায়ে বাড়ীতে দিবসে দীপ জ্বালিয়া রাখে'। আর হরিচরণের মতে, 'ঋণ শোধনে অসমর্থ হইয়া দীপ জ্বালে'। 'হবসন জবসন' অভিধানে এই প্রসঙ্গে ড্রুমন্ড-এর 'ইলাস্ট্রেশনস অব দি গ্র্যামাটিক্যাল পার্টস অব দি গুজরাটী, মারহাটী অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেস (১৮০৮)' থেকে যেটুকু উদ্ধৃতি আছে, তাতে আরো খবর জানা যায়:

'It is the custom . . . when a merchant finds himself failing, or failed, to set up a blazing lamp in his house, shop or office, and abscond therefrom for sometime until his creditors are satisfied by a disclosure of his accounts or dividend of assets.' এ থেকেই সম্ভবত বাঙলায় 'লাল বাতি জ্বালা' কথাটি এসেছে।

'তেলিঙ্গা' শব্দটি আঠারো শতকের বাঙলায় 'সিপাহি' অর্থে ব্যবহৃত হতো। অথচ এই অর্থে আধুনিক বাঙলা অভিধানে শব্দটির স্বীকৃতি নেই। কেবল সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে আছে, 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজী সৈন্য এই তেলেঙ্গা জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছিল'।

'হবসন জবসন' অভিধানে কতকগুলি প্রসঙ্গ আছে যেগুলি প্রায় সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। এর মধ্যে ধরনা, সতী, জগন্নাথ ইত্যাদি বিষয়গুলি তথ্যবহুল। ধন্না বা ধরনার সঙ্গে আধুনিক ঘেরাও-এর খুব মিল আছে। বাঙলা অভিধানগুলিতে ধন্না শব্দের মানে দেওয়া থাকলেও ঐতিহাসিক আলোচনা নেই। ধন্না পাওনাদারেরা দিতে পারে অথবা কোনো অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় দেবচরণে ধন্না দেওয়া যায়, যার অন্য নাম হত্যা দেওয়া।

'হবসন জবসন'-এ আছে ধন্না দেওয়া ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। মার্কো পোলোর বিবরণেও দক্ষিণ ভারতে ধন্নার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ধন্না অপরিচিত নয়। আয়ার্ল্যান্ডেও এ জাতীয় প্রথা একদা ছিলো। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা অনুসারে ধন্না বে-আইনি ঘোষিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে ইউল এবং বারনেল তাঁদের অভিধানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতানায় প্রচলিত নানা ধরনের ধন্নার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। পাঞ্জাবে এক ধরনের ধন্নাওয়ালা ছিলো তাদের নাম 'এসমিওয়ালা'। তারা চামড়ার দড়ি গলায় ঝুলিয়ে দোকানের সামনে ভিক্ষের জন্য হত্যে দিয়ে প'ড়ে থাকে। অন্যদিকে 'দড়িওয়ালা'রা গলায় দড়ি দেবার ভয় দেখাতো। 'দন্ডিওয়ালা'রা লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে গালিগালাজ করতে থাকে। 'গুরজমার' এবং 'ছুঁড়িমারে'রা আত্মহত্যার ভয় দেখায়। ধন্না বিষয়ে বিভিন্ন লেখক থেকে মনোজ্ঞ বিবরণ আছে 'হবসন জবসন'-এ। এই প্রসঙ্গে আনুমানিক আঠারো শতকের একটি ধন্নার (যা বর্তমান ঘেরাও-এর মতোই) উল্লেখ করছি :

সেনাপতি নন্দীরাজ যখন সতী মঙ্গল শিবিরে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর সৈন্যরা বকেয়া পাওনা ও মাইনের জন্য তাঁকে 'ঘেরাও' করলো। নন্দীরাজের বিশ্বস্ত অনুচর হরি সিং নেমকহারামি ক'রে (ফরগেটিং দি টাইজ অব সল্ট) প্রভুর ঘুম এবং খাওয়াও বন্ধ ক'রে দিলেন। শেষে জল পর্যন্ত। নিরুপায় নন্দীরাজ তখন তাঁর সঙ্গে যা কিছু গয়নাপত্র ও অন্যান্য জিনিশপত্র বিক্রি ক'রে হরি সিং-এর পাওনা চুকিয়ে বিদায় করেন।

ধন্নার আরো চরম রূপের পরিচয় পাওয়া যায় 'রাস-মাল'-এ। তার নাম ত্রাগা। অধ্যাপক হোদিওয়ালা-র মতে 'ত্রাগা' এসেছে 'তাগাদা' থেকে। পূর্বোক্ত লেখক 'হবসন জবসন'-এর একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেন 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুইয়ারি' পত্রিকায়। একবার কাথিয়াওয়াড়ের এক চারণ তার মোড়লের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য নৃশংস প্রথার আশ্রয় নেয়। কয়েকজন চারণ নিয়ে প্রথমে তিনদিন অনশন করে। তাতেও কোনো ফল হলো না দেখে তারা 'ত্রাগা' অবলম্বন করলো। সে প্রথা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নৃশংস। চারণদের কেউ কেউ নিজের হাত কেটে ফেললো। তারপর দলের তিনজন বৃদ্ধার গলা কেটে মুন্ডুগুলো মোড়লের দরজায় মালার মতো ঝুলিয়ে রাখা হ'লো। কোনো কোনো মেয়ে তার স্তন কেটে ফেললো। চারজন বুড়োর গলা কাটা হলো। দুজন মেয়ে দেয়ালে ঠুকে মাথা ভাঙলো। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং পাওনাদার চারণ নিজের শরীরে তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে-পুড়তে চেঁচাতে লাগলো, আমি মরছি, কিন্তু ভূত হ'য়ে এর ঘাড় মটকাবো। সুলতান ফিরোজ তুঘলক-এর আমলে ব্রাহ্মণেরা জিজিয়া করের বিরুদ্ধে

ধরনা দিয়েছিলেন ব'লে ঐতিহাসিক নজির আছে। তাঁরা রাজপ্রাসাদের সামনে আমরণ অনশনের ব্রত নেন।

'সতী' শব্দটি হবসন জবসন-এর মতে সপ্তদশ শতকের আগে কোনো ইউরোপীয়ের লেখায় পাওয়া যায় না। একে ডিওডোরাস-এর বর্ণনায় পাওয়া (৩১৭ খ্রীঃ পূঃ) যায় যে ইউমেনেস-এর সেনাবাহিনীতে একজন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ কেতুয়ুস ( ? )-এর মৃত্যু হ'লে তাঁর দুই স্ত্রী সহমরণে অভিলাষী হন। কিন্তু একজন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ব'লে তাঁকে সহমরণে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

ইউল এবং বারনেল-এর মতে এই প্রথা শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও কোনো কোনো জায়গায় প্রচলিত ছিলো। ভোলগা তীরবর্তী কিছু কিছু রাশিয়ানদের মধ্যে, টোঙ্গা এবং ফিজি দ্বীপে সতীদাহের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়। হেরোডোটাস-এর মতে থ্রেসিয়ানদের দু-একটি উপজাতির মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিলো। বালি দ্বীপে উনিশ শতক পর্যন্ত এর অস্তিত্ব সংকলকেরা প্রত্যক্ষ করেছেন।

জাগরনাট বা জগন্নাথ মূর্তিটি বিষ্ণুর বিশেষ রূপ হিশেবে উপাসিত হ'লেও 'হবসন জবসন' কানিংহাম প্রমুখের সাক্ষ্যে বলেছেন যে জগন্নাথ বিগ্রহটি সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত। দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও প্রায় অনুরূপ বিগ্রহের উপাসনার প্রচলন দেখা যায়।

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 'হবসন জবসন'-এ সংকলিত সাত হাজারেরও বেশি শব্দের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া অভিধান তো এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলার জিনিশ নয়, বারেবারে খুঁটিয়ে পড়তে হয়। দু-একটি ইংরেজি অভিধানের গ্রন্থপঞ্জিতে 'হবসন জবসন'-এর স্বীকৃতি দেখলেও আমি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙলা অভিধানে হবসন জবসন-এর উল্লেখ দেখি নি। অথচ এর বহু শব্দ বাঙলায় (যেমন ব্যাঙ্কশাল, কুমকী ইত্যাদি) গ্রহণ করা চলে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা কখনো কখনো গ্রন্থটির উল্লেখ ক'রে থাকেন, কিন্তু তাঁদের তো শব্দের চেয়ে সংবাদে অধিকতর আগ্রহ। আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক এবং আভিধানিকদের এই বইটি বিষয়ে ঔদাসীন্য বিস্ময়কর। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে এর অন্যতম কারণ হলো অভিধানটি আধুনিক না, সুতরাং বর্তমানে অনুপযোগী। সাহেবরা চ'লে গেছে এবং তাদের নিজস্ব উচ্চারণে বাঙলা-হিন্দি আজ আর শোনা যায় না। সুতরাং আজকের সাধারণ পাঠকের কাছে এর উপযোগিতা সামান্য।

এ যুক্তি হয়তো ঠিকই। 'হবসন জবসন' ঐতিহাসিক অভিধানটি ঠিক সাধারণের জন্য নয়, বিশেষজ্ঞের জন্য। যদিও পড়তে সাধারণ পাঠকেরও ভালো লাগবে। অধ্যাপক এস. এইচ. হোদিওয়ালা বহু বছর আগে এই বইটির শব্দাবলি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের বিশেষজ্ঞরাও বইটি সম্পর্কে নীরব। আমার মনে হয় ভারত-ব্রিটিশ সংস্পর্শের একটি স্থায়ী স্মৃতিসৌধ হলো 'হবসন জবসন'।*

---

*Hobson-Jobson. *By* Col. Henry Yule & A. C. Burnell. Routledge & Kegan Paul. London. 1968.

## সংস্কৃতি সাময়িকী

**শব্দ থেকে পালানো**

ক্ষুধার্ত একটি পত্রিকায় সেদিন চোখে পড়ল এক-পৃষ্ঠার কবিতা, যেখানে একটিমাত্র শব্দকে জপমালার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি হয়েছে এক নকশা। আবার যাঁরা ক্ষুধার্তের বিপরীত, কবিতাকে যাঁরা রাখতে চান একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাঁদেরও রচনায় মিলবে ঐ একই খেলা : একটি-দুটি শব্দে, এমনকি বর্ণে, বর্ণের নানা রকম নকশায় কাগজ ভরছেন তাঁরাও। হাল-ফ্যাশানের এক মার্কিন যুবা অনেক বিবেচনার পর তিনটি শব্দকে ভেঙে সাজালেন দু-লাইনে, হয়ে উঠল আধুনিকতম কবিতার উত্তেজনা। এতোটাই তিনি জানাতে পারেন যে টাইপরাইটারের রিবনে যদি আবছা হয়ে আসে কালি তাহলে আরেকটা স্বতন্ত্র জন্ম হবে রচনার, কবিতার স্বরূপই যাবে পালটে। খুব নতুন হয়তো নয়, দাদাবাদের সময় থেকেই চলছে ঈষদুষ্ণ এই সব মজা-পাওয়া, আরাগঁও A থেকে Z পর্যন্ত গোটা বর্ণমালা সাজিয়েই কবিতা নামে উপহার দিয়েছিলেন একদিন। তবে কিনা সম্প্রতি ঝোঁকটা দেখা দিল এ-দেশেও। বাঙলায় শুদ্ধ কবিতার সন্ধান অথবা মহারাষ্ট্রে 'কনক্রিট পোয়েট্রি'র বিশ্বাস কবিদের উশকে দিচ্ছে এই ধরনের অ্যাবস্ট্রাকশনের খেলায়।

কেবল যে কৌতুকভরেই এটা ঘটছে তা ভাবলে অবশ্য অন্যায় হবে। কৌতুক অবহেলা বা নৈরাশ্যময়তা কখনোই এর রচনামূলে নেই তা নয়, কিন্তু অনেক সময়েই এর ভিতরে কাজ করে একটা ভুল দার্শনিকতা, গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় শব্দবিলাসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। নির্মনা নিরনুভব শব্দপ্রয়োগের বহুলতায় চার দিকে সবই যখন অস্পষ্ট বোধ হয়, তখন এমন এক অন্ধ প্রতিক্রিয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়তো নয়। আমাদের জীবনযাপনকে ঘিরে ধরছে পঙ্গপালের মতো শব্দাবলি, কিন্তু ক্রমে টের পাই যে অল্পে অল্পে তার পরিবহন গেছে নষ্ট হয়ে। নিষ্ফলা কথায় দিন কাটে দ্রুত, রাত্রে ঘরে ফিরে দেখি সঞ্চয় ঘটে নি কিছু। অভ্যাসবশে কথা বলা আর মিথ্যে বলার এই সমূহ সর্বনাশ শিল্পেও তার চিহ্ন রেখে যায়, কবিতারও অবয়ব হয়ে ওঠে কলরোলময়, বার্তাবিহীন, অভ্যাস-তাড়িত। যেমন দেখা হলেই 'ভালো তো' ব'লে পরস্পরের আলংকারিক মাথা-নাড়া আপনিই এসে যায়, বাঙলা কবিতায় আজ পয়ারপঙ্ক্তি প্রায় ততোটাই অনিবার্য মিথ্যে নিয়ে জুটে যায় কলমের মুখে, বেঁচে থাকার সঙ্গে রচনার সামঞ্জস্যের কোনো প্রয়োজন ঘটে না আর!

হতে পারে যে শোচনীয় এই মিথ্যাবাণিজ্যের ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রথম আবেগে শব্দেরই ওপর একটা ভুল অভিমান তৈরি হয়। মনে হয়, যার পরিবহন নেই তাকে আমার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু শব্দজাত মিথ্যেকে উপেক্ষা করবার চেষ্টায় এ হলো শব্দকেই উপেক্ষা করা। এই উপেক্ষায় যে কবি ফিরে যান একটি-দুটি শব্দে, এমনকি বর্ণে, বর্ণের নানা রকম নকশায়-নিজের অগোচরে তিনি কবিতাজগৎ থেকেই নিষ্ক্রমণের পথে এসে দাঁড়ান। এখনো তিনি হয়তো তাঁর খেলাকে মহিমান্বিত ক'রে নিয়ে ভাবছেন, কবিতা আজ একটা অডিও-ভিশুয়াল ব্যাপার, কেবল শ্রুতিগম্যই নয় : হয়তো মনে মনে এই রকম একটা ন্যায় তৈরি করছেন যে শব্দের একক ক্ষমতা আজ লোপ পাবার পথে। কিন্তু এই ভাবনাই কবিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার ক'রে নেবার গলিপথ। এই অবিশ্বাস বড়ো হয়ে উঠলে বিদেশী এক লেখকদলের মতো আমাদেরও হয়তো ঘোষণা করতে হবে : কবিতা আর নয়।

মার্টিন হ্বালসের, পিটার হাম এবং এই ধরনের আরো দু-চারজন জার্মান লেখক না কি অল্প দিন আগে জানিয়ে দিয়েছেন, নাটক-কবিতা-গল্পের মধ্যে আর তাঁরা নেই, তাঁদের আর বিশ্বাস নেই শব্দে। শব্দনকশাপ্রবণ লঘু লেখকদের কথা নয় আমাদের মান্য কবিদের মনেও কখনো কি উঁকি দিচ্ছে না তুল্য সংশয়? সমর সেন যে কবিতা ছেড়ে যান তার কারণ হয়তো ভিন্ন, কিন্তু উৎপলকুমার বসুর সাম্প্রতিক নীরবতা এই সূত্রে ভেবে দেখবার যোগ্য। কেন উৎপলকে শেষ পর্যন্ত ভাবতে হলো যে মিক্সড মিডিয়া ছাড়া পথ নেই আজ?

এটা ঠিক যে এ'রা অনেকেই যা ধরতে চেয়েছিলেন সে হলো নিবিড় এক সাংগীতিক প্রতিমা।

কবিতা নিজেই নিজের সম্পূর্ণ সত্তা, সে কেবল স্পর্শ ক'রে আছে সেই প্রতিমা। তাই তার আর কোনো দ্বিতীয় মানে নেই, কোনো প্রতিশব্দ হতে পাবে না তার। তাই হয়তো কবিসভায় কবিতার তাৎপর্য বুঝতে চাইলে গিনসবার্গকে নির্বাসন হবার উপক্রম করতে হয়। এবং হয়তো সেই কারণেই, ঈষৎ খেলাচ্ছলে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শক্তির কবিতা বিচার করেন কেবল গদ্য-অন্বয় ক'রে, কখনো কখনো পরিহাসাত্তার ঝুঁকি নিয়ে শব্দের মানে ব'লে দিয়ে। কেননা স্বতন্ত্র শব্দের অনেক অভিধা-অর্থ আছে, কিন্তু পুরো কবিতার নেই কোনো যোগ্য প্রতিশব্দ। অর্থতাৎপর্য খুঁড়ে আনবার চলতি যে সমালোচনা রীতি, তার বিরুদ্ধ-অভিযান ব'লে মুহূর্তে একে চেনা যায়। এর মধ্যে প্রায় এতোটাই বলবার ইচ্ছে যেন প্রচ্ছন্ন যে কবিতাও শুদ্ধ সংগীতের মতো বিষয় আর বিন্যাসে একাকার লীন, পৃথক ক'রে তাকে ভেঙে দেখানোর কোনো মানে নেই।

কিন্তু সংগীতকে যদি ভাবা যায় শুদ্ধতম শিল্প, যেমন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা টমাস মান, তবে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যেই কি ছবি বা কবিতার মুক্তি? যে-আক্ষেপে ভালেরি লিখেছিলেন জিদকে 'এক পৃষ্ঠা লেখা কি কখনোই একটুখানি স্বরলিপির মহিমায় পৌঁছতে পারে', সে-আক্ষেপও তাঁর রচনাকে তো রুদ্ধ করতে পারে না শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এই ভাবনার উৎস থেকেই ছবি বা কবিতা ক্রমে এগিয়ে যায় সাংকেতিক সাংগীতিক বিশ্বে। আর তারও পরে অনেক স্তর পেরিয়ে যখন আজকের দিনের নামহীন ছবি নামহীন কবিতার ধূসর অ্যাবস্ট্রাকশনে পৌঁছই, দেখি সমস্ত পরিবহন বন্ধ। তখন? তখন, ভাবলে অন্যায় হয় না যে, ভবিষ্যৎকাল একদিন বিহ্বল ঘৃণায় তাকাবে এই পরম ধূসরতার দিকে।

অর্থাৎ সংগীতের মতো হওয়া আর সংগীত হওয়া এক কথা নয়। শব্দ যে তার চারপাশের জড়ত্ব নিয়েই এগোতে চায় সত্যের দিকে, এই তো তার গৌরব। এ-কথা ঠিক যে 'কবির শব্দ যেখানে থামে, সেখান থেকেই শুরু হয় এক বিপুল বিভা', কিন্তু কবির শিল্প তো এই যে তিনি পারেন শব্দকে আলোর সেই তটভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। শব্দের পারম্পর্য নতুন ক'রে গেঁথে দেন তিনি, আর তারই মধ্যে রণিত হতে থাকে নিঃশব্দ সংগীত। এই তার আলো।

কেন তাহলে পুরো হার হবে আজ? কেন একদিকে বর্ণমালার নকশা, আর অন্যদিকে সেই একই প্রতিক্রিয়ায় মিশ্রশিল্পের বিকল্প? একটা মস্ত অবজগৎ দেখতে দেখতে জেগে উঠছে যেখানে ছবিতে আলোয় সুরে শব্দে মেশামেশি হয়ে শরীরকে সুদ্ধ ক'রে নিতে চায় শিল্পবাহন। শরীর, সে যেন তার সমস্ত আর্তনাদ বাঁকিয়ে ধ'রে তৈরি করছে ছবি বা কবিতা। কেবল মার্কিন হিপি-সমাজের অন্তর্বৃত্তে নয়, এই একটা নতুন সংস্কৃতিমণ্ডল রচিত হবার উপক্রম আজ সব দেশেই অল্প-বিস্তর স্পষ্ট। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে এই নতুন জগৎ কবিতার প্রতিস্পর্ধী নয় একেবারেই, তার সমান্তরাল মাত্র, সহযোগী। এই শিল্প যে-অভিজ্ঞতা দিতে পারে তার তুল্য অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করা কবিতারও পক্ষে অবাস্তব নয়। কবিতারই সে চেষ্টা, শব্দেরই সে চেষ্টা, শব্দ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়। তাই মিশ্রশিল্পে নয়, সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাকশনের ঝোঁকে নয়, নিঃসঙ্গ প্রাকৃতিক আয়োজনেও নয়—আরো বাইরে ঘুরিয়ে ধরতে হয় জাল।

কেননা সংগীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করতে হয় দৈনন্দিনের। প্রবল প্রহারের উত্তেজনার মধ্যে চলছে দিনকাল। একদিকে হাতে রাখি চাঁদের শিলা, অন্যদিকে বরফজমা শীতের মাঠে প্রতি-বাদরত মেয়েদের ওপর মুদ্গর তোলে গণতন্ত্রী পুলিশ, বর্ণের কারণে ধর্মের কারণে এদেশে-ওদেশে জীবন হয় জামিন, ফুটপাথে ফুটপাথে জ্যোতিষীর নিয়তিরেখা পালটে যায় নিষিদ্ধ ইস্তাহারে, উজ্জ্বল মেধাবী যুবাদের মাথা থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত তৈরি হতে থাকে সামর্থ্যের সংযোগ। এই মহাসময়কে তুলে আনতে পারব না ভেবেই কি শব্দ থেকে দূরে পালান কবি? নিছক শব্দও কি জানে না একে ছুঁতে? এই প্রশ্নের জবাবের জন্য আজ তৈরি থাকতে হবে তাঁকে।

শঙ্খ ঘোষ

**আধুনিক বাংলা থিয়েটারের সমস্যা**

অধুনা বাংলা থিয়েটারকে যদি পেশাদার এবং অপেশাদার এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় তবে লক্ষ করা যাবে অপেশাদার থিয়েটার পেশাদার থিয়েটারের তুলনায় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। নাট্য-আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা যদি বাংলা থিয়েটারে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে তাও ঘটেছে এই অপেশাদার দলগুলির মাধ্যমে। তাই এই আলোচনা মূলত অপেশাদার দল সম্পর্কে। কেননা বর্তমান বাংলা থিয়েটারের চরিত্র ও মানসতা এদের মধ্যেই প্রকাশ পায়।

এই অপেশাদার দলগুলি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। (১) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে পুজো-পার্বণ ইত্যাদি কোনো বিশেষ উপলক্ষে বছরে দু-একবার অভিনয়ের আয়োজন করেন এবং সাধারণত নিতান্ত প্রমোদের জন্যই এই অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে। প্রধানত পেশাদার মঞ্চের বহু অভিনীত পপুলার নাটকগুলিই এ'রা অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেন—নাটকের মাধ্যমে কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রচার এ'দের উদ্দেশ্য নয়। (২) আজকাল প্রায় প্রত্যেক অফিসেই একটি প্রমোদবিভাগ আছে। অফিসের কর্মীরা বৎসরান্তে বিপুল অর্থব্যয়ে এক বা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেন। এখানেও নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো স্থির লক্ষ্য নেই। পূর্বোক্ত পপুলার নাটকের দিকে এ'দেরও সমান ঝোঁক দেখা যায়। (৩) এছাড়া যে দলগুলি আছে তাঁদের গ্রুপ থিয়েটার নামে চিহ্নিত করা হয়। এ'রা সচেতন শিল্পচর্চায় বিশ্বাসী। চূড়ান্ত নৈপুণ্যের জন্য একই নাটক এ'রা বারবার অভিনয়ের আয়োজন করেন। বক্তব্য ও চর্চার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। এ'দের প্রযোজনায় সমকালের চরিত্র ধরা পড়ে। দেশ-বিদেশের নাট্যধারার প্রতি এ'রা আগ্রহী এবং নব্যরীতির নাটক অপেশাদারী প্রথায় এবং পেশাদারী নিষ্ঠায় পরিবেশনের প্রয়াস পান। যদিও অর্থকরীভাবে (দু-একটি দল ছাড়া) এ'রা আদৌ লাভবান হন না তথাপি পেশাদারী থিয়েটারের সঙ্গে এ'দের বিরোধও স্পষ্ট। এই শেষোক্ত দলের সমস্যা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা।

নাটক॥ গ্রুপ থিয়েটারগুলির অন্যতম প্রধান সমস্যা নাটক। যেহেতু এ'দের বক্তব্য এবং লক্ষ্য স্থির সে কারণে প্রয়োজনীয় নাটকের অভাব সবিশেষ অনুভূত হয়। মৌলিক, অনুবাদ বা রূপান্তর এবং ছোটগল্প অথবা উপন্যাসের নাট্যরূপ সাধারণত এ'রা মঞ্চস্থ করেন। দুঃখের বিষয় বহু বিদেশী গল্প বা ছায়ায় রচিত বা রূপান্তর অনেকসময় মৌলিক নাটক বলে চালানো হয়। ধরা পড়ে গেলে সে দৈন্য লুকোবার স্থান থাকে না। গত দশবছরে দশটি প্রথম শ্রেণীর মৌলিক নাটক লেখা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ মনে হয় এতাবৎ প্রথম শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকেরা নাটকের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। ইদানীং অবশ্য দু-একজন এগিয়ে আসছেন কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে তাঁরা প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার ফলে মৌল কোনো সুঠাম নাটকও গড়ে উঠছে না।

মঞ্চ॥ দ্বিতীয় সমস্যা মঞ্চ। যদিও বা কন্টেস্ট্টে একটি নাটক হাতে এলো তার উপযুক্ত মঞ্চায়নের কোনো সুযোগ নেই। কলকাতা শহরে পাঁচটি পেশাদার মঞ্চ আছে যা উত্তর কলকাতায় অবস্থিত এবং দক্ষিণ কলকাতায় একমাত্র মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ—যদিও চরিত্রে পেশাদার নন তথাপি অন্যান্য পেশাদার মঞ্চের মতো বৃহস্পতি, শনি, রবি এবং ছুটির দিন বাদ দিয়ে অন্য দিনগুলো অপেশাদার দলগুলিকে ভাড়া দিয়ে থাকেন। খোঁজ নিলে জানা যাবে ঐ মঞ্চ একদিনের জন্যও অব্যবহৃত থাকে না পরন্তু চারপাঁচ মাস আগে থেকে চেষ্টা করা না হলে প্রয়োজনীয় মাত্র একটি দিনের জন্যও ভাড়া পাওয়া কঠিন। এর মধ্যে আবার স্টার থিয়েটার টিকিট বিক্রি করে অভিনয়ের জন্য ভাড়া দেন না এবং অন্য মঞ্চগুলিতেও যদি কোনো দলের নিয়মিত বেশি টিকিট বিক্রি হতে থাকে তারিখ পেতে অসুবিধে হয়। এ ছাড়া রবীন্দ্রমঞ্চ, নিউ এম্পায়ার, কলা মন্দির, থিয়েটার সেন্টার, ত্যাগরাজ হল, অন্ধ্র হল, মহাজাতি সদন, লেক স্টেডিয়াম, ফাইন আর্টস একাডেমি, য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট প্রভৃতি মঞ্চেও প্রতিদিন না হলেও প্রায় নিয়মিতই বিচিত্র অনুষ্ঠান চলে—তার মধ্যে কোনো কোনো দিন অবশ্য থিয়েটারের জন্য ভাড়া পাওয়া যায়—অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে কোথাও অভিনয় করা চলে না। এবং উপর্যুপরি কিছুদিন একটি নাটকের অভিনয় করার সুযোগ না থাকায় ভালো নাটকের ভালো প্রযোজনা সত্ত্বেও পারফেকশান ইত্যাদি দূরের কথা

অর্থকরীক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। এভাবে একটা দল কতদিন টি'কে থাকতে পারে?

অর্থ॥ যে কোনো কাজেই যদিও অর্থকরী সমস্যাই প্রাথমিক হতে পারে কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারে এর স্থান তৃতীয়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে এ'দের আর্থিক সচ্ছলতা আছে। বরং ঠিক উল্টোকথাই বলা চলে। তথাপি দুরন্ত আবেগ এবং মহৎ সৃষ্টির প্রেরণায় অর্থকে এ'রা দূরে সরিয়েছেন। কাউন্টারের উপর ভরসা না করে এ'রা বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগীদের কাছে অগ্রিম টিকিট নিয়মিতভাবে বিক্রির চেষ্টা করেন এবং প্রাথমিক ব্যয়ভার নিজেদের পকেট থেকেই বহন করেন। বলাবাহুল্য এতে সাধারণত খরচ ওঠে না এবং নিয়মিত অর্থকরী ক্ষতির দায় সংস্থাকে বহন করতে হয়। এই ক্ষতি থেকে বাঁচবার দুটি পথ আছে। এক, অন্যদলের প্রযোজনায় কলকাতায় বা মফস্বলে আমন্ত্রিত অভিনয় এবং মাঝে মধ্যে স্মারকপুস্তিকা করে কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ। বলাবাহুল্য—এগুলি কোনো নির্দিষ্ট আয়ের পন্থা নয়—প্রায় ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকা। তবুও নতুন নাটক হয়, পুরোনো ক্ষতির কথা ভুলে গিয়ে নতুন নাটক তৈরির আনন্দে আবার সবাই মেতে ওঠে।

দর্শক॥ দর্শকের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্থির মন্তব্য করা কঠিন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত যদিও তার মক্ষিকাচরিত্র স্পষ্ট ছিল তবে সম্প্রতি বিষয়নির্বাচনে রুচির ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। গত কুড়িবছর আগেও দেখেছি পেশাদার মঞ্চে এক-একটি নতুন নাটকও দু-তিন মাসের বেশি চলেনি, আবার একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছে। কিন্তু ইদানীং সেই পেশাদার মঞ্চেই একটি নাটক কমপক্ষে একবছর দেড়বছর, কখনো কখনো আরো বেশি চলে। এবং ওদিকে অপেশাদার দলের সংখ্যা তখন সীমাবদ্ধ ছিল, এখন অগুন্তি। তখন সাধারণ ক্ষেত্রে পেশাদার মঞ্চের জনপ্রিয় নাটকগুলিই অপেশাদার দলেরা অভিনয় করতেন এখন সাধারণত নতুন ধরনের নাটক প্রযোজনা করেন। কখনো কখনো অপেশাদার দলের নাটকও পেশাদার মঞ্চ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ অপেশাদার দলের প্রভাব অনেকাংশে আজ পেশাদার মঞ্চের উপর পড়েছে। অনেক অপেশাদার দলের অভিনেতা-অভিনেত্রী পেশাদার মঞ্চে যোগ দিয়েছেন এবং পেশাদার কোনো কোনো অভিনেতা অপেশাদার দল খুলে অন্য ধরনের নাটক প্রযোজনার চেষ্টা করেন। পেশাদার এবং অপেশাদারের মধ্যে এমনি করেই একটা অলিখিত যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। তার অন্যতম কারণ মনে হয় দর্শকের রুচি অপেশাদার দলগুলিকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে।

এতৎসত্ত্বেও অপেশাদার দলগুলি আজো অর্থকরীভাবে পুষ্ট হতে পারছে না: তার অন্যতম কারণ (১) স্থায়ীভাবে অভিনয়ের অসুবিধা এবং (২) বুদ্ধিবাদী প্রযোজনা সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের অপ্রস্তুতি। যদিও তুলনায় শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ যথেষ্ট, সেই কারণেই দ্রুত অগ্রসরমান, তাই আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সাধারণ দর্শক আধুনিক বাংলা থিয়েটারকে আরো অনেক এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।

সমালোচক॥ যদিও ইদানীং দৈনিক এবং সাময়িক পত্রপত্রিকায় থিয়েটারের সমালোচনা দেখা যায় তার মধ্যে বেশিরভাগ আলোচনাই থিয়েটারের গঠনমূলক কাজে লাগে না। তার অন্যতম কারণ এগুলির অধিকাংশ লেখকই থিয়েটারবোদ্ধা নন, একধরনের ভাসাভাসা ধারণা থেকে মন্তব্য করে থাকেন। একই নাটকের পাঁচটি পত্রিকার পাঁচটি সমালোচনা পাশাপাশি সাজালেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। এর ফলে প্রযোজক এবং দর্শকের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। নিতান্ত ব্যবসায়িক কারণে অক্ষম প্রযোজনাকে প্রশংসা করার লোভ সমালোচকের ত্যাগ করা উচিত। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই সে কথা সত্য নয় তবে সৎ সমঝদারী সমালোচনার সংখ্যা অত্যল্প। আধুনিক বাংলা থিয়েটারকে পুষ্ট করতে গেলে প্রকৃত সমালোচকের ভূমিকা যে অসামান্য সে কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

সরকারী দায়িত্ব॥ 'নাটক দিয়েই দেশকে চেনা যায়' অথবা 'জাতীয় সরকারের কর্তব্য জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করা' ইত্যাদি আপ্তবাক্য বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির তেইশ বছর পরেও আমাদের সরকারের অচলায়তন চিন্তার কোনো স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে মনে হয় না। একথা বিশেষ করে বাংলা দেশের পক্ষে অতিমাত্রায় প্রযোজ্য। সত্য, যে লক্ষ

লক্ষ টাকা ব্যয় করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী উদ্যোগে কিছু মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু নাটকের কারণে সে মঞ্চ কতখানি ব্যবহার করা হয় বলা কঠিন। দিল্লীতে একটা থিয়েটারের স্কুল খোলা হয়েছে শ্রীযুক্ত আলকেজি মহাশয়ের পরিচালনায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ছাত্রছাত্রী সেখানে থিয়েটার শিখতে যান। কিন্তু শেখার পর স্বাধীনভাবে কোথায় তাঁরা থিয়েটার করবেন বলা কঠিন। অর্থাৎ তখন পেশা হিসেবে অন্যকিছু গ্রহণ করে মাঝে মধ্যে শৌখিন-ভাবে থিয়েটারের চর্চা চালানো যেতে পারে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রসদন কি জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে না যা সরকারী উদ্যোগে শিক্ষিত অভিনেতৃ-কলাকুশলী দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাংলা নাটকের মান উন্নত করবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনায় একটি নাট্যগোষ্ঠী বাংলাদেশে আছে যার নাম পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা—এটি সরকারী প্রচারযন্ত্র। সুতরাং এর মাধ্যমে সত্যিকারের সৎ নাটক গড়ে ওঠা কঠিন। কিন্তু এই যন্ত্র চালু রাখতে সরকারের বহু অর্থব্যয় হয় অথচ অপেশাদার দলের কোনো ভালো নাটক নিয়মিত প্রযোজনার জন্য কখনো সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় না। তবু বাংলাদেশ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়মিত করে যাচ্ছে এবং আরো করবে—কিন্তু তাতে জাতীয় সরকারের দায়িত্ব ধামাচাপা পড়বে না।

**শ্যামল ঘোষ**

**বাংলা গল্পের নতুন ফরমুলা**

লোকে কেন গল্প পড়ে, তার কারণ বোঝাতে গিয়ে পরশুরাম একবার বলেছিলেন, 'মনে একটু ফূর্তি একটু সুড়সুড়ি একটু টিপুনি একটু ধাক্কা লাগাবার জন্যে। গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাইমলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়।' তা না হয় হল, কিন্তু ঐ 'প্রেমের গল্প, বড়োঘরের কেচ্ছা, ডিটেকটিভ কাহিনী, রূপসী বোম্বেটে,'—ও-সব যদি একটু নিপুণভাবে লেখা হত! কিন্তু এই বাংলাদেশে তা কি হবার জো আছে। সব তো হচ্ছে ফরমুলার ব্যাপার; নিশ্চয়ই কোনো-একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বই আছে এই নামে 'তিন মাসে এক ডজন গল্প-উপন্যাস লিখিবার সহজ পদ্ধতি', নয়তো এত চর্বিত-চর্বণ বাংলা সাহিত্যে সম্ভব হয় কী করে? অথচ এমন নয় যে লেখকরা নিজে এ-বিষয় নিয়ে মৌনীবাবা সেজে বসে থাকেন। শ্রী বুদ্ধদেব বসু একবার তাঁর এক গল্পের এক ঔপন্যাসিক চরিত্রের জবানিতে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন এই বলে; 'আমার বইগুলোর নাম হচ্ছে "সতীর অভিশাপ", "লাজাঞ্জলি", "শেষরাতে বিয়ে"—এমনি সব।* আর নাম মনে নেই, এক সংগে তিনটের বেশি নাম আমি কখনোই মনে আনতে পারি না। দুটো গল্প আছে : এক, দুর্জয় সতীকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে দুর্বৃত্তের চরম দুর্দশা; আর—অত্যন্ত পবিত্র প্রেমের গল্প, মাঝখানে একটু মনোমালিন্য, শেষ পাতায় উলুধ্বনি। এই দুটো গল্পেরই রকমফের করে পঁয়ত্রিশখানা বই। একখানা বই শেষ করতে আমার সাতদিনের বেশি সময় লাগে না; মনে-মনে সব ছক-কাটা আছে; পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ অনায়াসে, তরতর ক'রে লিখে গেলেই হয়, মাঝে-মাঝে একটু করুণ রসের প্যাঁচ লাগিয়ে কান্না বের করা—আর দুর্বৃত্তের পাপিষ্ঠ মন বা প্রেমের নির্জলা নিষ্কামতার বর্ণনাচ্ছলে বেশ একটু রসালো ঝাঁঝালো মশলা মিশিয়ে দেয়া—ইংরেজিতে যাকে বলে পেপ্‌। ব্যস, হ'য়ে গেলো। যেমন স্বচ্ছন্দে বই লিখি, তেমনি সহজে বই কাটে।' শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ও এক গল্পের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'আমার একটি গুণ আছে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সাহিত্যিকের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীষী। কিন্তু দেশের নাড়ীনক্ষত্র তো জানতে আমার বাকী নেই। ওরা ভাজে ঝিঙে, বলে পটল। আমিও তুলি পাঁক। কিন্তু তার অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে দিই। আমার গল্পের গন্ধ শুঁকে পাঠক ভাবেন পুণ্যার্জন করছেন। কারণ পাপকে আমি ঘৃণ্য-ভাবে দেখাই সমাজকে পাপমুক্ত করতে। আমার বইয়ের শেষ পাতাটা আগে পড়বেন। দেখবেন পাপের শাস্তি আছেই। অন্তত পাপীর ব্যর্থতা আছে, ভয়ংকর ব্যর্থতা।' খুঁজলে কি আর

* পাঠক টিপ্পনীটা লক্ষ করবেন। যেন বটতলাই কেবল ফরমুলার কারবার করে—তথাকথিত বুদ্ধি-জীবী লেখকরা যেন নিয়তই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তন্ময়!

আরো কোনো-কোনো লেখকের রচনায় ফরমুলা সম্বন্ধে এমনি টিপ্পনী পাওয়া যাবে না?

অথচ, আশ্চর্য, এই অবস্থাটা পালটাবার চেষ্টা হচ্ছে না কেন, জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন, অমনি মেঝেয় আলপিন পড়লেও ভয়ংকর আওয়াজ হবে। সেই খাড়া-বড়ি-থোড়, আর থোড়-বড়ি-খাড়া। সতী বেশ্যা (না, এ শুধু শরৎচন্দ্রের কপিরাইট নয়), নির্যাতিতা বঙ্গললনাদের জন্য অশ্রুপাত, বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছিল গোঁয়ারগোবিন্দ আসলে সোনার চাঁদ ছেলে, মধ্যবিত্তদের স্বর্গস্বপ্ন—এই নিয়েই বাংলা গল্প-উপন্যাসের নিরেনব্বুই ভাগ কেটে যায়। ক্ষতি কী, যদি সে-সনের কাটতি থাকে, যদি লোকের তা-ই ভালো লাগে।

সত্যি ভালো লাগে?

কে-একজন বাঙালি ঔপন্যাসিক কিছুকাল আগে একবার বলেছিলেন, 'ও-সব অমরতা-ফমরতা দিয়ে লেখকদের এককালে ধাপ্পা দেওয়া যেত। এখন যে-কোনোদিন উন্মাদের হাতের অ্যাটমবোমা জগৎশুদ্ধ উড়িয়ে দিতে পারে। অমরতা নিয়ে কে আর এখন মাথা ঘামায়। এই মুহূর্তটাই সব।' অ্যাটম বোমার যুগে 'এই মুহূর্তে' কথাটির মানে কী? মাত্র 'দুইমাসে সপ্তম মুদ্রণ,' পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্রের স্বত্ববিক্রয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাওয়া পালটেছে? বেশ তো, পুরোনো ছকটা বদলে ফেলা যাক। লেখা যাক আরাম-কেদারার সাংবাদিকদের 'স্টোরি'র মতো রাজনীতি নিয়ে নভেল, লেখা যাক ইতিহাস নিয়ে রগড়ারগড়ি, লেখা যাক সমাজ উন্মোচন করার নাম করে আদিরসাত্মক আদিখ্যেতা—হের ডকটর জিগমুণ্ড ফ্রয়েডের চেলাদের লীলাক্ষেত্র করে ফেলা যাক গল্প-উপন্যাসকে।

তাও হল। লেখার ধরন? নতুন ভাবনা আছে প্রকরণ নিয়ে, শৈলী নিয়ে? সেই তো আদ্যিকেলে প্লট ক্যারেকটার অ্যাকশন, সেই চিরপুরাতন রগরগে নিটোল আখ্যান, ছাঁচে ফেলা চরিত্র, মাঝে-মাঝে কেবল বিলিতি কেতাব থেকে বড়ো-বড়ো বুলি ছিটিয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা।

'ষোলো আনা সত্যি নয় আপনার এই অবলোকন—কিছু-কিছু লেখা হচ্ছে অন্যরকম, ভিন্ন চালের।' 'কী?' 'এই-যে সমাজের দুরবস্থা, চারপাশে জোচ্চুরি হতাশা বিশৃঙ্খলা—এর মধ্যে এ-কালের ছেলেরা কেমন বখে যাচ্ছে—এইসব খুলে দেখানো হচ্ছে। আসক্তভাবে, নিরাসক্তভাবে। সব কিন্তু ঝাঁঝালো মশলাই নয়, আছে বাস্তবের নিখুঁত প্রতিচিত্রন। তাছাড়া মানুষের মন—তারও জাগরণ দেখানো হচ্ছে। লেখা হচ্ছে ব্রাত্যদের নিয়ে, সমাজ থেকে বর্জিত একলা মানুষদের নিয়ে, মাস্তানদের নিয়ে। মধ্যবিত্ত চৌহদ্দির বাইরে চলে এসেছে গল্প - ক্ষয়, ভাঙন, ধর্ষকামিতা, মর্ষকামিতা, স্বপ্নাতুরতা—এইসবও থিম।'

বেশ তো, কয়েকটা ও-ধরনের গল্পই খুলে দেখা যাক তাহলে।

২

সত্যি-যে কয়েক বছর ধরে এমন কিছু-কিছু গল্প লেখা হচ্ছে, দিশি-বিলিতি মহিলাপত্রিকায় তেমন গল্প সচরাচর বেরোয় না। সত্যি-যে সে-সব গল্পের চরিত্রদের কথা বলার ভঙ্গি ও ভাষা পর্যন্ত মধ্যবিত্ত রুচির পক্ষে পীড়াদায়ক। সমাজ থেকে তাড়ানো সব ছেলে সে-সব গল্পে ভিড় করে আছে; তারা চাকরি-বাকরি পায় না, চারপাশে দ্যাখে জোচ্চুরি ফাঁকি ফেরেব্বাজি, তাদের সামনে আশা নেই, নেই পারিবারিক জীবনের সান্ত্বনা, নেই কাজের মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা, নেই আত্মোৎসর্গের অহমিকা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি দেয়, তা কোনো কাজে লাগে না। ভোটপ্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না কোনোদিন। অথচ 'কারা যেন' দিব্যি কী করে 'নাম-কাম-আরাম' নিয়ে মহাসুখে আছে। ফলে এই সমাজতাড়ানো ছেলেছোকরারা প্রতিবাদের ভাষা হিশেবে বেছে নিয়েছে আঘাতকে—মধ্যবিত্তরা যে-সব জিনিশ দামি বলে ভাবে, তাকেই তারা আঘাত করতে চায়। তাদের ভাষা, পোশাক-আশাক, চলনবলন—সব ভিন্নরকম। মধ্যবিত্তদের ভাষায় তারা গুণ্ডা, তারা মাস্তান (ভারতচন্দ্রের অর্থে নয় বোধহয়), তারা 'লোফার'। তারা দ্যাখে হিন্দি ছবি, রবীন্দ্র-সংগীতের বদলে গায় চুটকি হিন্দি সুর, তারা বিশ্বাস করে না সতীত্বে, রামরাজ্যে, দশরকম অনু-শাসনে বা অষ্ট-আচরণ-বিধিতে। মোটামুটিভাবে এদের নিয়ে লেখা বেশিরভাগ গল্পেরই পশ্চাৎপট

এই। তারপরে থাকে একটা কাহিনী এবং—আমার বলতে দুঃখ হচ্ছে নতুন-একটি ফরমুলা।

এদের যদি পারিবারিক জীবন সুখের হত, যদি এরা সময়মতো চাকরি পেত, যদি সময়মতো বিয়ে-থা করত, যদি এদের পায়ের সামনে না থাকত অর্থ-সমাজ-রাজনীতির চোরাবালি, অর্থাৎ যদি এরা সবাই ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা সমাজের ঘিয়ে-ভাজা মধ্যবিত্ত হত, মধ্যবিত্ত হওয়া থেকে নেমে যাওয়ার দুঃখ না-পেত তাহলে এরা কেউই এ-রকম হত না। ধাপ্পা, জোচ্চুরি, ফেরেব্বাজি ও তার সাফল্য দেখে-দেখে যদি এদের বড়ো হতে না হত, তাহলে এরা হত সুবোধ ছেলে, সুশীল যুবা, নেহাতই গোবেচারা ভালোমানুষ। কেউ যদি এদের সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করত, এদের সঙ্গে বন্ধুতা করত, তাহলে এই দুরবস্থা হত না। আসলে এখনও আছে শোধরাবার উপায়, এখনও এরা ভেতরে-ভেতরে মধ্যবিত্তই, এদের স্ল্যাংবুলি, কথ্যভাষার নতুন জোরালো প্রয়োগ, এদের চুলের ছাঁট, চলার ভঙ্গি, গুণ্ডামি-ষণ্ডামি সব ছদ্মবেশ, সব আসলে মধ্যবিত্তের স্বর্গসুখের জন্য ডিগবাজিখাওয়া হাহুতাশ, আসলে এরা এখনও ঝানু শয়তান হয়নি, পোক্ত 'ইভল' এরা নয়, ভেতরে-ভেতরে এরা সবাই সোনার টুকরো ছেলে, আহারে, রামের সুমতি হোক। তা, বাইরে থেকে যে লোককে চেনা যায় না, এটা আর নতুন কথা কী। স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট (ঢাকা)-ও অমন অনেক চরিত্র তৈরি করে গিয়েছেন।

৩

গতবছর পুজোর সময় 'নবকল্লোল' কাগজটিতে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল। অনেকগুলো নিম্নমধ্যবিত্ত বেকার ছেলের মধ্যে একজন হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেল, বক্সওয়ালা চাকরি; নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরে যে পেল, তা নয়—ও-রকম বিদ্যেবুদ্ধি আরো অনেকের ছিল, তার বন্ধুবান্ধবদেরই ছিল;—চাকরিটা পেল নানা সুতো টানাটানি করে। তারপর পড়ল ওপরওলার নেকনজরে, তার গ্লানি হয় মনে-মনে, বেকার বন্ধুবান্ধবদের প্রতিক্রিয়াও যেন কেমন-কেমন, কিন্তু চাকরি ছাড়লে বাড়িশুদ্ধ লোক খাবে কী, আবার চাকরি রাখতে হলে ওপর-ওলার মন রাখতে হয়, আর মন রাখার মানে হল তাঁর হাতের পুতুলটি বনে গিয়ে অবশেষে তাঁর কন্যাকে বিয়ে-করা। সাজানো প্রেম, সে জানে। তার ছেলেবেলার প্রেম আস্তে-আস্তে ভেঙে যাচ্ছে—কিন্তু চাকরি, খুড়োর কলের ডগা থেকে ঝোলা ঐ চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়—অতএব কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম, তাঁর কন্যাকেই বিয়ে করতে হল। নিষ্ঠুর জগৎ, বিবেকহীন, দয়ামায়াবর্জিত, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির পথ এমনই আত্মঘাতী। কতগুলো পরিস্থিতি সত্যি খুব বাস্তব-ভাবে তৈরি-করা। কিন্তু শেষটা কী, কল্পনা করুন-তো, তবে বুঝবো। শেষটায় থাকে এক আত্মত্যাগী সর্বত্যাগী যৌবনে যোগিনী, এক দুঃখিনী রোগজীর্ণা মুমূর্ষু তরুণীর তাৎক্ষণিক ভুল স্বর্গ, বাইরে থেকে দেখতে কর্কশ ও হৃদয়টিদয়ের বালাই নেই এমন-এক যুবকের পরম আত্ম-ত্যাগ। এই উপসংহার স্বয়ং প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকেও লজ্জা দিত—ফরমুলার একেবারে তিন-গুণ বেশি।

আরেকটি কাগজ 'বৈতানিক', তাতে শ্রীনির্মল সরকারের একটি গল্প বেরিয়েছে, 'শোন্‌পাপড়ি'। কতগুলো মাস্তান ছোক্‌রা, বেকার, মেয়ে দেখলে সিটি দেয়, চোঙা পাৎলুন পরে, পায়ে ছুঁচলো জুতো (গল্পটা এ-বছরে লিখলে হয়তো চিবুক অবধি নামা জুলপি থাকতো), কথাবার্তার ভঙ্গি ও ভাষা ভালো নয়, চটকদার হিন্দি গান ছাড়া আর-কিছুই তারা জানে না। রত্না, সে পাড়ার মেয়ে, কলেজে পড়ে; স্বভাবতই এদের টিপ্পনী ও সিটিতে সে অস্থির, এদের সে পছন্দ করে না। তার পছন্দ এক জাঁদরেল ডাক্তারের ছেলে সহপাঠী দিলীপকে—যার দাদা বিদেশে, সেও অচিরেই হয়তো বিলেত যাবে। একদিন রাত্তির দশটা নাগাদ রত্নার দাদার খুব অসুখ করে বসল, বাড়িতে আর-কেউ নেই, এখন-তখন অবস্থা; রত্না দিলীপকে ফোন করে বললে। দিলীপের আবার তখন বউদির বোনের জন্মদিনে গিটার বাজাবার কথা—সামাজিক এই দায়িত্ব ফেলে সে রত্নাকে সাহায্য করতে যায় কী করে? শেষটায় কারা তবে রত্নার সাহায্যে লাগল? পাড়ার সেই মাস্তানরা, যাদের এতদিন তার অতীব অরুচিকর ঠেকতো। তারাই ট্যাক্সিওলাকে ভয়-টয় দেখিয়ে ডেকে এনেছে, হাসপাতালে নিয়ে

গেছে সময়মতো, অপারেশনও সম্ভব করে তুলেছে সময়মতো।

হ্যাঁ, এত সোজা।

আরেকটি উপন্যাস, নাম 'দহন', লেখক শ্রীহরিপ্রসাদ ভৌমিক, বেরিয়েছে 'কৃশাণু' পত্রিকায়। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র দেবু ঘোষ, তারই জবানিতে গোটা গল্পটা বলা—তারই 'তথাকথিত' অমার্জিত রূঢ় কর্কশ ভাষায় সোজাসুজি উন্মোচন করা হয়েছে সমাজের নানা কুশ্রীতা ও নোংরামি। সমাজ দেবু ঘোষকে বলে গুণ্ডা, লোচ্চা, মারাত্মক লোক। তার দাদার নাম ও প্রতাপ কত, তিনি সমাজসংস্কারক, কালোবাজারে টাকা কামিয়েছেন; তার মেজদা লালিমা পাল (পুং)-এর নতুন সংস্করণ, কবিতা লেখেন, ঘাড়ে পাউডার মাখেন; তার বউদি ঝকঝকে তকতকে, পালিশ লাগানো, মহিলা সমিতি করেন। এই অধঃপাতে যাওয়া গুণ্ডা আত্মীয়ের জন্য তাঁদের মাথা কাটা যায় আর কি! আর আছে একটি সতী বেশ্যা, ঝুমা, তার পেটে অন্য কারু বাচ্চা, জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেবু আশ্রয় নিয়েছে ঝুমার কাছেই। খুন, জখম, রাহাজানি দেবুর কাছে কিছু না। আরো আছে অনেক লোক—সমাজে তাদের নামডাক, এবং (সেই জন্যেই?) তারা সব্বাই এককেটা মুখোশপরা বদ-মায়েশ। এই মস্ত মাস্কারেড-এর মধ্যে একমাত্র দেবু আর ঝুমারই মুখোশ নেই—এই মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের ত্যাগ করেছে, কিন্তু তারাই শুধু সৎ, তাদের মুখে আর মনে শতযোজন বিভেদ নেই, তারা বর্বর, কিন্তু সরল সোজা শাদাশিধে।

আরেকটা গল্প: 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের 'তলিয়ে যাবার আগে'। ১৯৬৯-৭০এর কলকাতা এই গল্পে নাকি উন্মোচিত। গল্পটা শুরু হয়েছে 'দি স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত এক কেচ্ছা দিয়ে—সেই-যে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে সস্ত্রীক ভদ্রলোক দ্যাখেন তাঁর পার্ককরা গাড়িটা যথাস্থানে নেই; এদিক-ওদিক তাকিয়ে দ্যাখেন গাড়িটা দূরে অন্ধকারে দাঁড়করানো; কাছে গিয়ে দ্যাখেন কয়েকটি গুণ্ডা অপেক্ষা করেছিল তাঁর জন্য—তারা গাড়িটা ভদ্রলোকের কাছ থেকে কেড়ে নিলে, যাতে পুলিশে খোঁজ না দেন সেজন্য জামিন নিয়ে গেল তাঁর সুন্দরী সুরক্ষিতা স্ত্রীকে, যাবার আগে শাসিয়ে গেল পুলিশে খবর দিলে তাঁর আর রক্ষে নেই। ভদ্রলোক চাকরি করেন বক্সওয়ালা, একেবারে ৬৯-৭০ সালের আনকোরা মধ্যবিত্ত তিনি, এতটাই আনকোরা যে তাঁর বাঙালি স্ত্রী শাড়ির তলায় ফ্লেশকালার প্যানটি পরেন (এই তথ্যটি পরে গল্পে চমৎকার কাজে লাগানো হয়েছে); মধ্যবিত্তদের সপ্তম স্বর্গে তাঁদের বাস; যে-সব ভোগ্যপণ্য পেলে মধ্যবিত্তেরা বিকিয়ে যায় সব আছে ভদ্রলোকের—এবং তিনি সব মধ্যবিত্তের মতোই ভীরু, সকাতর, রুচিবান ও মুখে বড়ো-বড়ো বুলি। পুলিশকে জানাতে ভয়, সাবাড় করে দেয় যদি। অথচ স্ত্রীর সতীত্বের ঠ্যালায় এতটাই উৎকণ্ঠিত যে নার্ভ সামলাবার জন্য ঘন-ঘন আধুনিক বটিকা গলাধঃকরণ করেন।

ফিরে এলেন তাঁর স্ত্রী—আটচল্লিশ, না কত ঘণ্টা পরে। ফিরে এসে যা বললেন, তা আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহের চেয়েও রোমাঞ্চকর। বললেন যে, গুণ্ডা তিনটে আসলে দুধের ছেলে, নেহাতই অল্প বয়েস, নেহাতই আনাড়ি নারীশিকারী; গাড়ি—একটা সচল আস্ত গাড়ি পেয়ে তাদের আর খুশি ধরে না, ভয়ডর শিকেয় তুলে ইতালিয়ান স্পীডস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলকাতার নানা রাস্তায় তুলকালাম ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ (অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিশ্চয়ই না! এত জোরে নইলে ঘোরা গেল কী করে! বর্ণনাটা কী রুদ্ধশ্বাস, প্রায় প্রথম যৌনসংগমের মতো পুলকচঞ্চল), তারপর তারা কোথায় এক আঁধার-ডেরায় গিয়ে পৌঁছল। নিজেদেরই ভয় ষোলো আনা, তাই মাঝে-মাঝেই ছুরিছোরার ভয় দেখায়। মাগো, কথা বলার ছিরি কী-রকম, ঠিক রক-বাজদের মতো। মতো, কারণ পরে জানা গেল তাদের 'গুরু' অর্থাৎ তুলকালাম পালের গোদাটি এক বেকার এনজিনিয়ার, আরেকটি ছেলে নেহাতই খোকামতো। চাকরি নেই, আশা নেই, কিচ্ছু নেই—খুনজখম গুণ্ডামি ধর্ষণ ছাড়া আর কীই বা করবে? কিন্তু সবে তো হাতেখড়ি, তাই এই সুরক্ষিতা মহিলাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে (ভদ্রমহিলা অবশ্যই সতীত্ব বাঁচাবার জন্য ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেছিলেন)—আনাড়ি তো—কোথায় কী করে কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু নাইলনের (নাকি আরো আধুনিক কোনো ফাইবারের 'প্যানটি', কে জানে?) সূক্ষ্ম তফাতেই সতীত্ব বেঁচে রইল। কিন্তু এদের আনাড়ি দেখে—হ্যাঁ, সত্যি,—এবং এরা আসলে সবদিক থেকে বঞ্চিত সোনার-টুকরো ছেলে বুঝতে পেরে—মাখনের মতো আমূল গলে গিয়ে মহিলাটি প্যানটি খুলে ফেললেন,

কী ক'রে কী করে সব হাতে ধরে-ধরে শিখিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাদের ডেরা থেকে আসবার আগে বুঝতে পেরেছেন এই সবহারা ছেলেগুলো তাঁর মধ্যবিত্ত বক্সওয়ালা স্বামীর চেয়ে কত ভালো। প্রেম দিয়ে এদের আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, বোঝাতে হবে জোর করে কিছু হয় না।

এখন, এই গল্প (গান্ধি শতবার্ষিকীর বছরে লেখা নাকি?)—এও উচ্চাভিলাষী। এরও ইচ্ছে, লোকে এই গল্পকে বাস্তব অবস্থার নিখুঁত প্রতিচিত্রন ভাবুক—সব ন্যুয়ান্স সমেত, অবশ্যই। আহা, এদের বুঝল না, চিনল না—এরা আসলে কত ভালো, দ্যাখো। একটু আদর পেলেই এরা আবার হিরের টুকরো ছেলে হয়ে উঠবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? জগতে তাহলে 'ইভল' কিছু নেই, অমঙ্গল কিছু নেই, পাপ কিছু নেই—যদি তা থেকে থাকে তো নিতান্তই সাময়িক বিভ্রান্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার তন্মাত্র প্রতিক্রিয়া! ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা যে ভাবছেন প্রজনকোষেই গণ্ডগোল থাকে, তা তবে ঠিক নয়—সামাজিক অবস্থার জন্যই এই গণ্ডগোল! সবাই এদের চিনুক, জানুক, প্রেম বিলাক, ভালোবাসুক, তাহলেই যুবশক্তির এই অপরিসীম অপচয়, এই অপব্যয়—সব বন্ধ হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই, এটা একটা জনপ্রিয় মত।

কিন্তু তা যদি হয়, তবে আমরা এমন জায়গায় পা দিচ্ছি, দেবদূতেরাও ভয়ে যে-জায়গার ধারকাছ মাড়ান না—অন্তত বঙ্গসাহিত্যের দেবদূতেরা মাড়ান না। সামাজিক অবস্থা তো আর জলহাওয়ানিরোধকরা কোনো কামরা নয়—এর সঙ্গে জড়ানো অর্থনীতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, এইসব। আপনি যদি মানেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই সমাজের এই বদখৎ অবস্থা, তাহলে তা পালটানো দরকার, এবং পালটানো যায়—এও মানতে হয়। কীভাবে পালটাবেন? গান্ধির দর্শন দিয়ে? নাকি নীট্‌শের মহান বর্বরদের আগমনী গেয়ে? নাকি অন্যকোনো রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে? আর যদি মানেন যে লোকে খারাপ হয়, মন্দ হয়, বদমায়েশ হয়, লোকে অন্ধকারে বদ্ধমূলে কিন্তু আলোর দিকে উঠতে চায়, এবং বাস্তব ও স্বপ্নের এই দ্বন্দ্ব মনুষ্যজন্মেরই অনস্বীকার্য দুরবস্থা, তাহলে এই প্যানপেনে কাঁদুনি কেন?

বলা বাহুল্য, এ-সব গল্প নয় সেই একশো বছর আগেকার 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক' বা কলাকৈবল্যবাদমার্কা গল্প। এদের বক্তব্য আছে, পুরোপুরি উদ্দেশ্যময় রচনা। কিন্তু বক্তব্যসম্বল ও উদ্দেশ্যময় হওয়া সত্ত্বেও সবটাই কেমন যেন ঘোলাটে, আবেগপ্রবণ ও বাস্তব অবস্থার ভুল প্রতিচিত্রন। আপনি প্রতীকী গল্প লিখতে পারেন, কিন্তু সেই লেখার রীতি তো মানবেন। আপনি রূপকের ছলে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাচ্ছেন, রূপকের মধ্যবর্তী ন্যায় ও অন্তরালবর্তী বক্তব্য যদি নিহিত যুক্তির দ্বারা সম্পর্কিত না-হয় তবে চলবে কী করে। আপনি চাচ্ছেন বাস্তব অবস্থাকে নিরাসক্ত (বা আসক্ত)-ভাবে খুলে দেখাতে; আপনি বলতে চাচ্ছেন সমাজের এই-যে দুরবস্থা তার সংশোধন সম্ভব ও আশু কর্তব্য; সেক্ষেত্রে রাজনীতি-অর্থনীতিকে স্পষ্টাস্পষ্টি নজরে রাখা উচিত—সমস্ত ব্যাপারটাকে মৃগীরোগ বা আবেগউচ্ছ্বাস দিয়ে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তাছাড়া সব ক্ষেত্রেই যদি এমন দেখি মাস্তানরাই আসলে ভালো, সমাজের বাকি সাধারণ লোকেরা সর্বদিক থেকে নষ্টের গোড়া, তখন মনে হয় পুরো সমস্যাটাকে নিশ্চিন্ত ফরমুলার ছকে ফেলে দেখা হচ্ছে।

**মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

**সাম্প্রতিক উপন্যাসের নতুন বৃত্ত**

সাম্প্রতিক কালে গল্প উপন্যাস লিখে বাঙলাদেশে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (বৃহন্নলা, অনিলের পুতুল, কুবেরের বিষয় আশয়), মতি নন্দী (ফেরারী, দুঃখের বা সুখের জন্য, নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান, দ্বাদশ ব্যক্তি), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (ঘুণপোকা) বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (নিশীথ ফেরী) অন্যতম। অবশ্য জনপ্রিয় বলতে যা বোঝায়, এঁরা এখনও তা হয়ে ওঠেন নি। এঁদের খ্যাতি এখনও সাময়িকপত্রের সম্পাদক, লেখক এবং পাঠকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই চারজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসগুলো পড়ার পর কিন্তু এই সন্দেহ ঘন হয়ে ওঠে,

যে-বৃত্তের মধ্যে এ'রা আটকে পড়েছেন, সেই বৃত্তের গণ্ডি ছিঁড়ে বেরিয়ে না আসতে পারলে, এ'দের ঔপন্যাসিক গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবেও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কোন্ বৃত্তে এ'রা আটকে পড়েছেন এবং সেই বৃত্তের বাইরে না-আসতে পারলে কেন এ'দের গুরুত্ব স্বীকৃত হবে না, তার আলোচনা এই রচনার বিষয়।

একথা বলে নেওয়া প্রয়োজন, উপন্যাসের দুশো বছরের আন্তর্জাতিক ইতিহাসে উপন্যাসের প্রকৃতি এতবার ভোল পাল্টিয়েছে যে আধুনিক পাঠক উপন্যাসের কোনো সংজ্ঞাই আজ মেনে নিতে রাজি হবেন না। উপন্যাসে আজ ঘটনাবিন্যাস থাকতেও পারে না থাকলেও চলে, চরিত্রসৃষ্টি ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য হতেও পারে না-ও হতে পারে, বহির্জগতের সঙ্গে ঔপন্যাসিক জগতের বাস্তব মিল থাকতেও পারে না থাকলেও ক্ষতি নেই, একটা দেশের একটা কালের পরিচয় উপন্যাসে থাকতে পারে, একটি মুহূর্তকে টেনে নিয়েও উপন্যাস রচিত হতে পারে, হাজার পাতার উপন্যাস আজও যেমন আছে পঞ্চাশ পাতার উপন্যাসও তেমন থাকা সম্ভব। সেইজন্য উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে আধুনিক পাঠকের তেমন মাথাব্যথা নেই, একটা রচনা উপন্যাস অথবা বড়ো গল্প না ছোটোগল্প, এই নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ আর যারই থাক সাধারণ পাঠক আজ আর করেন না। পাঠক আজ কোনো দাবি দিয়ে উপন্যাস পড়তে যান না, উপন্যাসে তিনি কী চান তা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। সাবেকি উপন্যাসে অভ্যস্ত পাঠক অবশ্য একে উপন্যাস জগতে চরম অরাজকতা বিবেচনা করতে পারেন, তবে রাজার শাসন, একটা সুশৃঙ্খল জগৎ, আজ যখন পৃথিবীতে আর কোথাও থাকছে না, তখন এই অরাজকতার অভিযোগ আধুনিক পাঠককে, আধুনিক ঔপন্যাসিককে বিচলিত করে না।

এই যখন অবস্থা তখন উপন্যাসের আলোচনার নিরিখ কী হতে পারে? একটা সহজ উপায়, উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে আলোচনা না করা। অথবা প্রত্যেকটি আলোচ্য উপন্যাসে, আলাদা আলাদা ভাবে, ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের গৃহীত ফর্ম কীভাবে নিয়েছেন, সেই ফর্মটি তিনি সাফল্যের সঙ্গে নিতে পেরেছেন কিনা, তাই নিয়েই শুধু আলোচনা। এবং ফর্ম যেহেতু বিষয়ানুসারী হতে বাধ্য, সেইজন্য উপন্যাসের বিষয়ের পক্ষে গৃহীত ফর্মটি উপযুক্ত হয়েছে কিনা, তার বিশ্লেষণ। কিন্তু ফর্ম নিতান্তই বিষয়ের আধার, বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ না হলে, যতোই কুশলী হোক না কেন, কোনো ফর্মের আবেদনই স্থায়ী হয় না।

বিষয়ের দিক দিয়ে মতি শ্যামল শীর্ষেন্দু বরেনের উপন্যাসের সাদৃশ্য আছে। তাঁদের ঔপন্যাসিক জগৎ একই। এই জগতের পরিচয় দিতে হলে, খুব সহজেই দেওয়া যায় মার্ক্সীয় ভাষায়। এই জগৎটি হচ্ছে পেতিবুর্জোয়াদের জগৎ; আরও সীমাবদ্ধ করে বলা যায়, বাঙালি নাগরিক ভদ্র পেতিবুর্জোয়া সমাজ। ইতিহাসের গতিতে এই সমাজ দুদিকে বিবর্তিত হতে পারে। এই সমাজ নেমে এসে শ্রমিক সমাজে পর্যবসিত হয়। নতুবা, ভাগ্যক্রমে এর কিছু কিছু অধিবাসী আর্থিক সাচ্ছল্যের আশীর্বাদ পেয়ে বুর্জোয়া সমাজে উত্তীর্ণ হয়। আলোচ্য ঔপন্যাসিকদের জগতের বিবর্তন অবশ্য একমুখী—শ্রমিক সমাজের দিকে। তাঁদের জগৎ নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রসমাজ, যা অনিবার্যগতিতে ভেঙে পড়ছে। এই সমাজের প্রতি এই ঔপন্যাসিকদের মায়া আছে কিন্তু শ্রদ্ধা নেই, এই সমাজকে এ'রা ঘৃণা করেন কিন্তু এ থেকে নিস্তারের উপায় তাঁদের জানা নেই, এই সমাজের আবর্তে পড়ে তাঁদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখই জীবনের একমাত্র অবলম্বন, ভাষান্তরে অভিশাপ, হয়ে দাঁড়ায়। এ'দের উপন্যাসের একমাত্র সুর এই নেমে আসার দুঃখ আর গ্লানি। রাজনীতি এ'দের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে স্পর্শ করেনি, ফলে অনাগত সুখের দিনের আশা এ'দের আবিষ্ট করেনি, সে পথে যে পেতিবুর্জোয়া উদ্দীপনা আছে তা এ'দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি, ফলে এ'দের জগৎ অবধারিতভাবে শেষ হয়ে যায় কানাগলির মধ্যে হারিয়ে, আত্মহত্যা বা অপমৃত্যুর মধ্য দিয়ে। দ্রুত ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলার সময় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার স্পৃহা বা শক্তি এ'দের নেই, ফলে এ'দের জগতেও সংঘাতের অনুপস্থিতি। ধ্বংসের স্রোতে এই ঔপন্যাসিক জগতের চরিত্রগুলো পাক খেতে খেতে ডুবে যাচ্ছে। রাজনীতি-অর্থনীতির চাপে পড়ে যে সমাজ পিষ্ট হতে পিষ্টতর হচ্ছে, সেই সমাজে এই চরিত্রগুলি কলের পুতুলের মতো এগুচ্ছে হোঁচট খাচ্ছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে এবং এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, প্রথম থেকেই, না পাঠকের না লেখকের,

কোন সংশয়ই নেই। এই জগতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই, রহস্যের কোন স্থান নেই, মায়াজাল বিস্তারের কোন সুযোগ নেই। কেবল ধ্বংসের দিকে অনিবার্য যাত্রা।

মতি শ্যামল শীর্ষেন্দু বরেনের উপন্যাসের এখানেই বৈশিষ্ট্য, এখানেই ব্যর্থতা। বিষয়ের প্রাচুর্য নেই, বৈচিত্র্য নেই। যে-সমাজে তাঁদের জন্ম সেই সমাজে প্রাচুর্য নেই বৈচিত্র্য নেই। সব মানুষই এক ধাঁচে গড়া, এক জীবন, এক ভবিষ্যৎ। সেই সমাজকে নিষ্ঠাভরে ফুটিয়ে তুলেছেন, সুতরাং তাঁরা তাৎক্ষণিক বিচারে বিশিষ্ট। কিন্তু এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন, বিদ্রোহ করেন নি। তাঁদের ক্ষোভ ঘৃণা আক্রোশ সৃষ্টিশীল নয়, আত্মধ্বংসী সমর্পণ। ফলে তাঁদের রচনা বিদ্রোহী মানুষের নয়। এখানে সংগীত নেই, গাম্ভীর্য নেই, মহত্ত্ব নেই, আছে কেবল ক্লীব সমাজের গ্লানি। এখানেই তাঁদের বিষয়গত ব্যর্থতা। ফর্মগত ব্যর্থতাও, একমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করার জন্য। এতে বিষয়ের সংঘাত নেই, ফলে উপন্যাসেও গতি নেই। পাঠকের মন টেনে নিয়ে যেতে পারে সেই শক্তি এই উপন্যাসে নেই, কিছুক্ষণ পড়ার পরই উপন্যাসের পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়, শেষ পর্যন্ত পড়ার ধৈর্য থাকে না। সব চরিত্রই সব ঘটনাই একজাতীয় মনে হয়, ক্লান্তি আসে।

দ্বন্দ্ব ছাড়া ইতিহাস হয় না, দ্বন্দ্ব ছাড়া উপন্যাসও হয় না। সাবেকি উপন্যাসে দ্বন্দ্ব ছিল চরিত্রে চরিত্রে, চরিত্রে ঘটনায়, আধুনিক উপন্যাসে দ্বন্দ্ব থাকে অনুভূতিতে অনুভূতিতে, আবেগে আবেগে, মনে শরীরে। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে খুঁজতে হয় মূল দ্বন্দ্ব-গুলো, এই দ্বন্দ্ব বস্তুবাদী হলে ভালোই; ভাববাদী হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু দ্বন্দ্ব থাকতেই হবে। উপন্যাসের সার্থকতাও নির্ভর করে তাৎপর্যপূর্ণ দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে। মতি শ্যামল শীর্ষেন্দু বরেনের উপন্যাসে সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ দ্বন্দ্বের অভাব সেইজন্যই পীড়া দেয়, বিষয়কে যেমন এই অভাব একমাত্রিক করে তোলে, সমাজের পুরো ছবিটা, বিভিন্নগতি জগৎকে সরিয়ে রেখে, কেবল একটি গতির উপর সম্পূর্ণ আশ্রয় নেওয়ায়, তাঁদের দৃষ্টি যেমন একপেশে হয়ে দাঁড়ায়, ফলে ইতিহাস বিকৃত হয়, তেমনই পাঠকও একঘেয়েমির দোষে এই উপন্যাসপাঠে তেমন উৎসাহ পান না। এই একমাত্রিক জগৎ আশ্রয়ী হওয়ার জন্য এঁদের উপন্যাসও স্বল্পকলেবর হয়ে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্বহীন জীবন কল্পনা করা যায় না, দ্বন্দ্বহীন উপন্যাসও বেশিক্ষণ টানা যায় না। যে কোনো উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে, ঔপন্যাসিক তাঁর সমাজের, চরিত্রের, আবেগের, যুক্তির মূল দ্বন্দ্বগুলো খুঁজে পেয়েছেন কিনা তার উপর।

"কুবেরের বিষয় আশয়" বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিশিষ্ট। একমাত্রিক উপন্যাস, যাতে মতির হাত খুলেছে, এবং শ্যামলের প্রথম দুটো উপন্যাসও যে-পর্যায়ে পড়ে, তা ছাড়িয়ে এই উপন্যাস দ্বিমাত্রিক পর্যায়ে গেছে। এর চাইতে বড়ো প্রশংসাবাণী বর্তমান বাঙলা উপন্যাস সম্পর্কে বলা যায় না, সুতরাং এই উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু আলোচনার দাবি করে।

উপন্যাসটির শুরু যথারীতি নিম্নবিত্ত বাঙালি ভদ্রযুবককে নিয়ে অর্থনৈতিক চাপে যে ক্লিষ্ট, এবং তার জগৎ সেইজন্য কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন। অসাচ্ছল্যের গ্লানি ফুটে উঠেছে কুবেরের জমি কেনার উদগ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, জমি কেনার জন্য অল্পবিত্ত বাঙালি যা যা করে, কুবেরও সেই গোলক-ধাঁধায় ঘুরছে। মতি, শীর্ষেন্দু, বরেনের হাতে, এই গোলকধাঁধায় ঘোরা নিয়েই শেষ হতো উপন্যাস। কিন্তু শ্যামল সেই অন্ধ গলি থেকে ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত বেরুতে পেরেছেন। শস্তায় জমি কিনে, প্লট প্লট সেই জমি বিক্রি করে, কুবের হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল। অল্পবিত্ত বাঙালি-মাত্রেরই যা স্বপ্ন, টাকা হলে গ্রামে বিরাট বাড়ি করে, আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে, জমিদারি মেজাজে থাকা। কুবেরের স্বপ্নও বাস্তব হতো যদি না কুবেরের ভাইয়েরা তাদের পেতিবুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য দাদার প্রজা হতে অস্বীকার করত। কুবেরের বড়লোক হওয়া বৃথা হল, স্বপ্ন ভেঙে গেল। উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স এই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মুহূর্তে। এর পর উপন্যাসের অব-রোহণ পর্বের শুরু, টাকার জন্য টাকা করার প্রাণান্তকর প্রয়াসে কুবেরের অপঘাতে মারা যাওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিপর্যয়কর পরিণতি।

এই বিষয়বস্তু এইজন্য বিশিষ্ট, হাল আমলের বাঙলা উপন্যাসে আমরা শুধু পেতিবুর্জোয়ার অবনতির কাহিনীই পাই, বিদ্রোহের তো নয়ই, আরোহণের আখ্যানও অতি স্বল্প, থাকলেও তা তাৎপর্যপূর্ণ হয় না। "কুবেরের বিষয় আশয়" একমাত্র ব্যতিক্রম। পেতিবুর্জোয়া সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজে উত্তরণ এবং তার ফলে চরিত্রের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ফ্যান্টাসি এই উপন্যাস নয়। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে, কাঠায় কাঠায়, বিঘায় বিঘায় এগিয়ে, জমি কেনার, ফসল কেনার গল্প শ্যামল সৎভাবে এবং একই সঙ্গে সুখপাঠ্য করে লিখেছেন। এবং তারই সঙ্গে পেতিবুর্জোয়া মূল্যবোধের সঙ্গে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সংঘর্ষ এই উপন্যাসের দ্বিতীয় মাত্রাটি এনে দিয়েছে, কাহিনীর ঘনত্ব বাড়িয়েছে। থীসিস আছে, অ্যান্টিথীসিসও আছে। সিন্থেসিস অবশ্য নেই, পাঠকও তা দাবি করেন না, কেননা আজকের ইতিহাসে সেই সিন্থেসিসের রূপ এখনও অস্পষ্ট।

ফর্মের বিচারে অবশ্য 'কুবেরের বিষয় আশয়' সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারেনি। এবং তার কারণ তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্যামলের অস্বচ্ছ চিন্তা। শহরের বেড়া টপকে তিনি গ্রামে ঢুকতে পেরেছেন, কিন্তু অভিমন্যুর মতোই, গ্রাম থেকে বেরুনোর রাস্তা তাঁর জানা নেই। বর্ধিষ্ণু কৃষকসমাজে প্রবেশ করার পর কুবেরের পরিণতি কোন্ রূপ নেবে, সে সম্বন্ধে শ্যামলের পরিষ্কার ধারণা না থাকায়, অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়ে উপন্যাসটি শেষ করতে হয়েছে, যার ফলে উপন্যাসের সমাপ্তি বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হয়ে যাওয়া জোতদারের জীবনে যত ক্ষতির কারণই হোক না কেন, তা একটি ঘটনামাত্র, হয়তো দুঃখকর ঘটনা, কিন্তু জীবনসংহারক নয়। ফলে ধান নষ্ট হওয়াটা এই উপন্যাসে প্রায় প্রতীকী হয়ে উঠেছে, কিন্তু সমস্ত উপন্যাসের গতি যে ভাবে এগিয়েছে, বাস্তবানুগ ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে প্লট যে ভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে পাঠকের মন এই প্রতীকী উপসংহারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যার জন্য পাঠকের সন্দেহ হয়, লেখার অবসাদে, কোথাও একটা থামা দরকার, এই জন্যই শ্যামল নায়ককে মেরে ফেললেন। অবশ্য সাপের কামড় খেয়ে কুবেরের নানা সমস্যার অন্ত ঘটল সন্দেহ নেই। স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতার জন্য নায়কের বিবেকপীড়া, গুরুপ্রতিম ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের গ্লানি, আত্মীয়হীন বাড়িতে থাকার ক্ষোভ, সঙ্গে আছে উপন্যাসের সবচাইতে দুর্বল ব্যাপারটি, কুবেরের জীবনের সেই স্যাড এক্সপিরিয়েন্সের, বেশ্যাসংগমের, স্মৃতি, যার জন্য তার আতঙ্ক কোন এক মারাত্মক রোগ তার শরীরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিশোরজীবনের স্বাভাবিক আতঙ্ক যে কুবেরের মতো বিষয়ী লোক সযত্নে লালন-পালন করবে এটা অবিশ্বাস্য। (প্রসঙ্গত, শ্যামলের এই মুদ্রাদোষ, কীর্তনের ধুয়ার মতো একটি কথা বারবার বলা, তাঁর প্রথম দুই উপন্যাসেও ছিল। স্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথাটি হয়তো ফরস্টার বর্ণিত রিফ্রেন-এর মতো বারবার এসেছে। কিন্তু রিফ্রেন-এর সার্থকতা তখনি যখন সেটা উপন্যাসের মূল স্রোতের অঙ্গ। কুবেরের স্যাড এক্সপিরিয়েন্স এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর তাৎপর্যময় অংশ তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত।)

সাপের কামড়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির উপসংহার যদি আপত্তিকর হয়, তাহলে কীভাবে এর পরিণতি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো? একটা উপায় ছিল, নতুন সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে কুবেরের পুরনো সমাজের মূল্যবোধের সংঘর্ষের বাস্তবানুগ প্রতিক্রিয়া ও উপসংহার। কুবেরের জীবনের ট্র্যাজেডি, তার পুরনো সমাজকে ত্যাগ করে সম্পূর্ণ একা নতুন সমাজে ঢোকার চেষ্টা। যে পেতিবুর্জোয়া সমাজে তার মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, তার স্বপ্ন এবং সংস্কার, তার সঙ্গে নতুন সমাজের মূল্যবোধের ঘোর বিরোধ। বস্তুত, বড়লোক হবার পর তার প্রায় নির্বাসনই ছিল উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিণতি। মার্কস বর্ণিত 'বুর্জোয়াজিফিকেশন'-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে এই 'এলিয়েনেশন'-এর বোধ। সমস্ত পেতিবুর্জোয়া সমাজের নাড়ি কেটে যখন তার দুয়েক-জন ব্যক্তি বুর্জোয়া সমাজে ঢুকতে যায়, অসম্ভব ব্যক্তিত্ব, সহনশীলতা, এবং লজ্জাঘৃণাভয় জাতীয় পুরনো সংস্কার কাটাতে না পারলে, নতুন সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে, এই একাকিত্ব-বোধ অনিবার্য। কুবেরেরও সেই একাকী জগতে বাস করাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক তাঁর পেতিবুর্জোয়া সংস্কারের জন্য সেই সাবেকি রোম্যান্টিকতার দাবি মানতে গিয়ে, নায়ককে মেরে ফেলতে বাধ্য হলেন। এখানেই তাঁর দুর্বলতা। বঙ্কিম শরৎ রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসের

অবিশ্বাস্য উপসংহারের যে ট্র্যাডিশন চলছে, শ্যামলের উপরও তা বর্তেছে।

শ্যামল তবু একমাত্রিক জগৎ থেকে বেরোতে পেরেছেন, ফলে তাঁর শেষ উপন্যাসে একটা ব্যাপ্তি আছে, যা সাবেকি উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু মতি তাঁর নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের আওতা থেকে বেরুতে পারেন নি। মতির সবচাইতে আকর্ষক উপন্যাস, 'দুঃখের বা সুখের জন্য', এই প্রসঙ্গে, শ্যামলের 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটির সঙ্গে পড়া যেতে পারে। এই উপন্যাসেও সেই জমি কেনার গল্প। কিন্তু শ্যামলের নায়ক জমি কিনে পেতিবুর্জোয়া সমাজের দমবন্ধ জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছে, মতির নায়ক পারে নি। তাই মতির নায়ক যখন জমানো টাকায় ধারকর্জ করে জমি কিনল, নায়কের স্ত্রীর তখন প্রথমে মনে হয়েছিল নায়ক যেন নারায়ণ হয়ে জমির উপর দাঁড়িয়ে, বিশ্বচরাচর লুপ্ত, শুধু চিরকাল ধরে রয়েছে তিন কাঠার জমিটা। কিন্তু একদিনেই স্ত্রীর মোহনিরসন ঘটল, তার কাছে নায়ক দেখা দিল অতি সামান্য মানুষ হিসেবে, যার চার দিকে চারটে পিলার বসানো, সীমানা দিয়ে বাঁধা পড়ে গেছে। এই পচনশীল নায়ককে দেখে তার স্ত্রীর মনে হতো প্রায়ই, ভাঙাচোরা একটা বাড়ির কথা, যার বাড়ি নেই, আছে শুধু পৈতৃক বাড়ির স্মৃতি। উপন্যাসের শেষে তাই জমি কেনা ঘটল না, হঠাৎপ্রাপ্ত প্রাসাদোপম বাড়ির দলখানাও এল না, পরিবর্তে বহির্জগতের কাছে পরিগণিত উন্মাদিনী হয়ে স্ত্রী একটি ভাঙা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় জোটাল, এবং নায়ক কোথায় মিলিয়ে গেল।

'দুঃখের বা সুখের জন্য' অবশ্য মতির প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস নয়। তাঁর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' এবং 'দ্বাদশ ব্যক্তি' বরং মতির স্বাক্ষর বেশি বহন করে। তাঁর লেখার ধরন রিপোর্তাজ জাতীয়, নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে গ্লানিময় খুঁটিনাটি একটার উপর একটা চাপিয়ে তিনি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত নির্মম, প্রায় রুক্ষ, কোমলতা আবেশের চিহ্ন সেখানে নেই, চাঞ্চল্যকর রোমাঞ্চের গল্প তিনি এড়িয়ে যান। এটাই তাঁর সহজে আসে, সেজন্য 'দুঃখের বা সুখের জন্য' উপন্যাসের শেষ অংশের রোমাঞ্চপ্রিয়তা পাঠককে পীড়া দেয়, রোম্যাণ্টিক পরিবেশে নায়িকার স্বেচ্ছানির্বাসন সেই চিরকালের রোম্যান্টিক পলায়নী মনের সৃষ্টি। এই সমাপ্তির সঙ্গে উপন্যাসটির মেজাজের মিল নেই।

"দ্বাদশ ব্যক্তি" এবং "নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান" উপন্যাস হিসেবে অকিঞ্চিৎকর, কেননা এদের বিষয়বস্তুতে ঘনত্ব নেই, ফলে এদের আবেদনও ক্ষীণ। তাছাড়া, মতি প্রথমেই একটি ফ্রেম তৈরি করে নিয়েছেন এবং সেই ফ্রেমে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রসমাজ যতটুকু আঁটে ততটুকুই আঁটিয়েছেন। বলা বাহুল্য, যেখানে ফ্রেম লেখার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে না, লেখার আগেই লেখকের মনে তৈরি হয়ে থাকে, সেই লেখা ছকমাফিক বলেই নিষ্প্রাণ মনে হয়। 'দ্বাদশ ব্যক্তি'র ফ্রেম নামেতেই স্পষ্ট, যে খেলোয়াড় দলে থেকেও নেই, যে কেবল খেটে মরে কিন্তু বাহবা কখনই পায় না। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের লোকেরাও এই দ্বাদশ ব্যক্তির মতোই, সমাজে থেকেও এরা সমাজে নেই, উদয়াস্ত খেটে মরে কিন্তু নিজেকে সমাজের একজন বলে পরিগণিত করাতে পারে না। 'দ্বাদশ ব্যক্তি'র নায়ক অন্যর ভালো করতে গিয়ে নিজের অসুবিধা সৃষ্টি করে মধ্যে মধ্যে নিজেকে বিপদাপন্নও করে। কিন্তু যাদের জন্য ভালো করতে যাওয়া তারাই তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। ফলে নায়কের আপন সুখসুবিধা মাথায় ওঠে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায় সে, কিন্তু তার কপালে কখনই তা হয়ে ওঠে না। নায়কের যৌনরোগে ভোগা এবং পেনিসিলিনের অন্বেষণ মতির হাতে এতই প্রকটভাবে প্রতীকী হয়ে উঠেছে, যৌনরোগ যে বাঙালী যুবকের একটা পাপবোধ এবং পেনিসিলিন যে একটা মুক্তির উপায়ের প্রতীক, এই ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট, যে পাঠকের কাছে মনে হয় উপন্যাসটি যেন রেলের উপর দিয়ে চলেছে, কোন্ স্টেশন থেকে ছাড়ছে এবং কোথায় পৌঁছবে তা তার জানা। বিষয়বস্তুতে সৎ কিন্তু ফর্মে ছকবাঁধা হওয়ার ফলে উপন্যাসে প্রসারতা আসে নি, পাঠকের মনে ব্যাপ্তি প্রতিফলিত হয় নি। এরই সঙ্গে অবশ্য বিষয়বস্তুর একমাত্রিকতা, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ধ্বংস, যুক্ত হয়ে উপন্যাসটির আবেদনকে আরও ক্ষীণ করে তুলেছে।

"নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান" বিষয়েও একই কথা বলা যায়। ফিল্মস্টারের গাড়ি একটা সরু-

গলির মধ্যে ঢোকার পরে, তার চারপাশের সংসারগুলোর দিকে আলো ফেলে লেখক সরুগলিটার কয়েক ঘণ্টার দৃশ্য ডকুমেন্টারি ছবির মতো তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির নামকরণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান ওই সরুগলির সংসারগুলোর উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে নি. লেখকের কাছে নায়কের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড নেহাতই একটা উপলক্ষ, যাকে কেন্দ্র করে তিনি কয়েক ঘণ্টা ওই গলিতে কাটাতে পারেন। বলা বাহুল্য, কোন সংসারেই, কোন চরিত্রেই লেখক ভেতরে ঢুকে যান নি, তাঁর যেটুকু দেখা সবটুকুই বাইরে থেকে। অবশ্যই বলা চলতে পারে, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে আবার ভিতর-বাহির কী, এর তো সবটুকুই প্রকাশ্য, এর সুখদুঃখ আশা-আহ্লাদ সবই এত অগভীর, এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজের গ্লানিবোধটাই একমাত্র সত্য যে কয়েক ঘণ্টামাত্রই এবং তা-ও বাইরে থেকে দেখলেও এদের সবটুকু বোঝা হয়ে যায়। এখানেই মতির বৈশিষ্ট্য, এখানেই ব্যর্থতা। একমাত্রিক জগৎটি তিনি সুন্দর ফুটিয়েছেন এবং ফুটিয়ে সেই অকিঞ্চিৎকরতার খাঁচায় আটকা পড়ে গেছেন। থীসিস আছে, কিন্তু অ্যান্টিথীসিসের আভাস নেই। চরিত্রগুলোতে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতমাত্র নেই।

একমাত্রিক হলেও, ফর্মের বিচারে নিখুঁত না হলেও, শ্যামল-মতির একটা জগৎ আছে। শ্যামলের ঔপন্যাসিক জগৎ, মতির ঔপন্যাসিক জগৎ বললেই পাঠকের কাছে একটা জগতের ছবি ভেসে ওঠে, প্রেমহীন, বৃত্তিহীন, নির্মম, রূঢ় একটা জগৎ। শীর্ষেন্দু-বরেনের উপন্যাস সম্পর্কে তেমন কথা বলার সময় হয় নি এখনও। তাঁদের উপন্যাসের জগৎ এখনও অসৎ, দুই অর্থেই। শ্যামল-মতির জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের একপার্শ্বিক হলেও মিল আছে, শীর্ষেন্দু-বরেনের জগতের সঙ্গে নেই। পাঠকের সন্দেহ জাগে, শীর্ষেন্দু-বরেনের লেখা একেবারেই উৎকল্পিত।

ঔপন্যাসিক কৃতিত্বে শীর্ষেন্দু-বরেন শ্যামল-মতির কাছাকাছি যেতে পারেন নি, যদিও তাঁদের উচ্চাশা উচ্চতর ছিল। ঘটনাচরিত্র শ্যামল-মতিতে যা-ও বা আছে, শীর্ষেন্দু-বরেন তা-ও বর্জন করেছেন। তাঁদের উপন্যাসে যা কিছু ঘটছে, সব নায়কের মনে। সাবেকি উপন্যাসের ঢঙ ত্যাগ করায়, আধুনিক স্টাইলের আশ্রয় নেওয়ায়, শ্যামল-মতির সহজ পথ বর্জন করায়, তাঁদের প্রচেষ্টা কঠিনতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"ঘুণপোকা"র বিষয়বস্তু সম্পূর্ণই চলতি ফ্যাশনের অনুসারী। নায়কের কাছে তার পরিপার্শ্বিক জগৎ অতি কুৎসিত ঠেকছে, তার সৌন্দর্যপূজো তাতে ব্যাহত হওয়াতে সে তার বর্তমানকে বর্জন করে, অতীতের রোমন্থন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যেখানে রূঢ়তা নেই, রহস্য আছে, কর্কশতা নেই, পবিত্রতা আছে। যেহেতু এমন জগৎ তৈরি করার তার সামর্থ্য নেই, অন্য কেউ করে দেবে তেমন ভরসাও নেই, সুতরাং নায়কের মৃত্যু ঘটল। পৃথিবীময় উপন্যাসের যে ফ্যাশন এখন চলেছে, কর্কশতার ঘায়ে রোম্যান্টিক মনের মৃত্যু, সেই ফ্যাশন শীর্ষেন্দু গ্রহণ করেছেন, গল্প না-বলার ফ্যাশনও তিনি নিয়েছেন, এবং সাম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাসের ফ্যাশন খারাপ শব্দ বলাও তিনি নিয়েছেন, কিন্তু কোন ফ্যাশনই তিনি আত্মস্থ করতে পারেন নি। ফলে, তাঁর উপন্যাস পড়ে পাঠক তাঁর পরিচিত রূঢ় জগৎও খুঁজে পান না, আকাঙ্ক্ষিত জগতের সন্ধানও পান না।

এই আত্মস্থতা না আসার ফলে শীর্ষেন্দুর বক্তব্যে ঘোর বিরোধ থেকে গেছে। দুটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক। মোটর সাইক্লিস্টদের সম্পর্কে তাঁর নায়কের মনোভাব কী? প্রথমদিকে তিনি বলছেন, ছোটবেলা থেকে তাঁর নায়কের স্বপ্ন দুর্দান্ত মোটরসাইক্লিস্ট হওয়া, দুর্দান্ত ঝড়ের দাপটে রাস্তা অতিক্রম করে যাওয়া। কিন্তু পরবর্তী অংশে, নায়ক বলছে, অহংকারী মোটর-সাইক্লিস্টদের জ্বালায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। নায়কের তাহলে প্রকৃত বক্তব্য কী? নায়কের প্রেম সম্পর্কেই বা লেখকের কী মনোভাব? হাঁটুর উপর বসে প্রেমভিক্ষা করা নায়কের কাছে ক্লীবত্ব মনে হয়, অথচ এক প্রেমিকা, যাকে সে দেহসর্বস্ব মনে করে, তাকে হঠাৎ এক মুহূর্তে রহস্যময়ী মনে হওয়াতে তার ইচ্ছা করেছিল হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা করে। তার রহস্যময়ী নারীর সন্ধান যখন সে পেলই, তখনও তার আচার-আচরণ ওই হাঁটুগেড়ে প্রেমভিক্ষার মতনই। পবিত্রতার কাছে, শুদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ তাহলে কীসের লক্ষণ, মানুষের না ক্লীবের? এই স্ববিরোধ সমর্থনে লেখকের একমাত্র উপায় ছিল, প্রেম বা মোটরসাইকেল সম্পর্কে একটা অ্যাম্বিভ্যালেন্স বা

উভবলিতা আনা। কিন্তু সেরকম কোন উদ্দেশ্য আছে বলে, উপন্যাসটি থেকে, মনে হয় না। মোটরসাইকেল এবং প্রেম, কুৎসিত এবং সুন্দর, এই দুটো স্তম্ভের উপরই যদিও পুরো উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য চরিত্রসৃষ্টি, গল্প বলার দায়িত্ব শীর্ষেন্দু যেহেতু স্বেচ্ছায় বর্জন করেছেন, সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক পারম্পর্য না রাখার অভিযোগও ওঠা উচিত নয়। সুতরাং তাঁর নায়ক হঠাৎ কেন দুম করে চাকরি ছাড়ে, তার বাল্যবন্ধু কেন অকারণে তাকে মারতে মারতে সম্ভবত মেরেই ফেলে, শহরের তুখোড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও কেন সে এক কাল্পনিক মোটরসাইক্লিস্টকে মেরে ফেলার অপরাধবোধে ভোগে, এসব প্রশ্ন সম্ভবত অবান্তর। কিন্তু তাঁরই গৃহীত ফর্ম সম্পর্কে একটা কথা থেকে যায়। যেহেতু তাঁর বিষয়বস্তু হল শহরের রূঢ় যুবকের অন্তরে যে এক সংবেদনময় সত্তা আছে তাকে ফুটিয়ে তোলা, সেইহেতু পাঠকের দাবি তার সেই সংবেদনময় সত্তার আরও নিবিড় পরিচয় পাওয়া। কিন্তু সেই সংবেদনশীল সত্তা ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত যে ভাষা প্রয়োজন, যে ভাষায় রহস্য, মায়া-মমতা, প্রেম ফুটিয়ে তোলা যায়, শীর্ষেন্দু সেই ভাষা ব্যবহার না করায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি। তাঁর পুরো উপন্যাসটিই মনে হয় কলকাতার বোধবুদ্ধিহীন রকবাজ ছোঁড়ার কাব্যচর্চা। রকবাজ ছোঁড়ার যে কাব্যচর্চায় অধিকার নেই, তা নয়, তবে 'ঘুণপোকা' পড়ে সে-সম্বন্ধে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা বেশ কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, উপন্যাসের সেই অংশটুকু স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে নায়ক তার প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে ঘরে এনে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে। লাফালাফির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, মেয়েটি সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু যে খর্বকায় বাক্যের সাহায্যে শীর্ষেন্দু সেটা বর্ণনা করছেন তাতে গতি আসে নি, আর ব্যঙ্গ থেকে করুণা, করুণা থেকে প্রেমে উত্তরণের জন্য যে কাব্যপ্রাণ সঙ্গীতধর্মী চিত্রময় ভাষার দরকার ছিল, তাও নেই। ন্যাড়া ভাষায় লিরিক তৈরি করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা প্রচেষ্টাই থেকে গেছে।

একথা বলা বাহুল্য, "ঘুণপোকা" উপন্যাসটি আলোচকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হওয়ার জন্য এর দোষগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছে। শীর্ষেন্দুর 'পারাপার' ধারাবাহিকভাবে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, চেষ্টা সত্ত্বেও তা সংগ্রহ করা গেল না, সুতরাং তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয় সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব হল না। 'ঘুণপোকা' কিন্তু এই অর্থে বিশিষ্ট যে ঔপন্যাসিক বর্তমান যুগের উপন্যাসের ধারায় লিখতে চেষ্টা করেছিলেন, যে ধারা সাবেকি ধারার চাইতে অনেক বেশি প্রয়াসসাধ্য। তাঁর বিষয়, তাঁর ফর্ম বাঙলা উপন্যাস জগতে তেমন চলতি নয় বলেই, এই ব্যর্থতা বেশি দুঃখকর।

শীর্ষেন্দু তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ছিলেন কিন্তু মাধ্যমের দুর্বলতার জন্য ব্যর্থ হয়েছেন। বরেনের "নিশীথ ফেরী" পড়ে বোঝা গেল না, তাঁর বিষয়বস্তুটিই কী। নায়ক পার্টির কাজ করে, কোন্ পার্টির কাজ তা খুলে বলা না হলেও বোঝা যায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজ। সাম্প্রতিক বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা রাজনীতির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার অসম্ভব প্রচেষ্টা করছেন, অথবা সম্ভবত ঘুরিয়ে বলাই বোধহয় অধিক সংগত যে, এঁরা রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন বলেই এঁদের উপন্যাসও জীবনের বিকৃত রূপায়ণ হয়ে দাঁড়ায়। বরেনের উপন্যাস শুরু করার পর একটা আশা জাগে যে সম্ভবত বরেন চলতি রাজনীতিবিমুখ ফ্যাশনের দুর্বলতা এড়িয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সে আশা ভেঙে যায়। রাজনীতির স্পর্শ এই উপন্যাসে নিতান্তই ভাসা-ভাসা। তার বদলে যা আছে তা চলতি বাঙলা উপন্যাসের অতি পরিচিত জগৎ, সেই নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের গ্লানি আর সংস্কার। একটি রাজনৈতিক কর্মী আর-একজন রাজনৈতিক কর্মীর হাতে একটি রিভলভার পাচার করে দিচ্ছে, এই পাচার করার কাহিনীর উপর পুরো উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য পাচার করার প্রক্রিয়াও মুখ্য নয়, এই পাচার করা ব্যাপারটা নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ভীতু যুবকের মনে কী নিদারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, তাই বরেনের উপজীব্য।

শুধু পাচার করা, শুধু ত্রাস দিয়ে উপন্যাস রচনা করা যায় না, বরেন তা জানেন। এবং পাঠকের সুবিধার্থে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এই বলে যে তাঁর নায়কের মনে দ্বন্দ্ব আছে, এই দ্বন্দ্ব তার নিজস্ব সুখসুবিধার অন্বেষণের সঙ্গে পার্টির কাজের দ্বন্দ্ব। তাই যদি হয়,

তাহলে পার্টির কাজ সম্পর্কে তাঁর আরও গভীর সংস্পর্শ ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল। বস্তুত, নায়ক বেকার বলে অন্য কাজ না পেয়ে শেষমেষ পার্টির হোলটাইমার হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মনে মনে নেয়; বলা বাহুল্য এই ধরনের কর্মী কোন কমিউনিস্ট পার্টিরই কাজে লাগার কথা নয়। এরকম কর্মীর মনে আর যে দ্বন্দ্বই থাকুক তাতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকে না। ফলে, রাজনীতি ব্যাপারটিই উপন্যাসে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। এবং যেহেতু রাজনীতি ও মধ্যবিত্ত যুবকের সংস্কারের দ্বন্দ্ব, ঔপন্যাসিকের ধারণা তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য, সেইহেতু রাজনীতির অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে, উপন্যাস দানা বাধে নি। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি সম্পর্কে বরেনের ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তাঁরই এক কথায়, রাজনৈতিক কর্মীর স্বাভাবিক জীবনের রুটিন ত্যাগ করা, বরেনের চোখে বোহেমিয়ান জীবন। যাঁর চোখে রাজনীতি এবং বোহেমিয়ানতা এক, তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা দুষ্কর।

রাজনীতির মাত্রা ঢোকানর যে চেষ্টা ছিল বরেনের, তা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর উপন্যাস আবার সেই একমাত্রিক, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের, গোলকধাঁধায় ফিরে গেছে। শীর্ষেন্দু তাঁর উপন্যাসে সুন্দর জগতের স্বপ্নের দ্বিতীয় মাত্রাটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, আবার কুৎসিত জগৎটিও তিনি যথেষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে ফোটান নি বলে প্রথম মাত্রাটিও আনতে পারেন নি। তেমনি বরেনও মধ্যবিত্ত সমাজের মাত্রাটিও ফোটাতে পারেন নি, রাজনীতিক মাত্রাও আনতে পারেন নি। সামান্য একটি রিভলভার পাচার করার সময় তাঁর নায়কের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে, সেই ত্রাস, শুধু জঙ্গীবাদী কমিউনিস্টের কাছেই হাস্যকর মনে হবে না, সাধারণ দিনগতপাপক্ষয় জীবনের কেরানির কাছেও হাস্যকর মনে হয়।

অবশ্য সন্দেহ হয়, বরেনের বিষয়বস্তু এর কোনটাই নয়, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ফোটান তাঁর উদ্দেশ্য নয়, পাখিপ্রাণ বাঙালী তরুণের হৃদয়ে রিভলভারজনিত ত্রাসের ছবি নয়, হয়তো রিভলভার ব্যাপারটিই অন্য কিছুর প্রতীক। অন্তর্বাসের নিচে রিভলভার রাখার কথা, লিঙ্গের কাছাকাছি, জন্মদাগের সঙ্গে রিভলভারের অবিরাম ঘষাঘষি, প্রস্রাবখানায় নায়কের বিচিত্র কর্মকান্ড ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা পাঠকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে, হয়তো রিভলভার শুধু রিভলভারই নয়, হয়তো তার লিঙ্গের, হয়তো জীবনের প্রতীক। এই সন্দেহ আরো জাগে উপন্যাসের নামকরণ থেকে। নিশীথ ফেরী। এর কী অর্থ? নিশীথে যে ফেরি করে? বোধহয় নয়, কারণ তাহলে বানানে গন্ডগোল হয়। নিশীথে যে ferry-তে চলে, রিভলভার, উত্তেজনা, জীবন পৌঁছে দেওয়ার জন্য? তা-ও নয় বোধহয়, ইংরেজি বাঙলা মিশিয়ে নামকরণ হয়েছে বলে বোধ হয় না। নিশীথে ঘুরে বেড়ায় যারা তাদের গান নিশীথফেরি (তুলনীয়, প্রভাতফেরি)। এখানেও বানানের গন্ডগোল। তাহলে কী? হয়তো, নিশীথ ferry-ই বটে। নায়কের যাত্রা অবশ্য নিশীথে ঘটে নি। তবু, অন্ধকার সমাজের প্রতীক হতে পারে নিশীথ। আর ট্রেন তো আধুনিক মনোবিজ্ঞানে লিঙ্গের প্রতীক বলে প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে। সব মিলিয়ে হয়তো ঔপন্যাসিকের মনে রিভলভার-ট্রেন-সাপ-লিঙ্গ-জীবন এই রকম একটা অনুষঙ্গ ছিল। এই প্রতীকের ব্যবহার ভালোই হত, যদি কাহিনীটি সুবিন্যস্ত হত, বিশ্বাসযোগ্য হত, সহানুভূতি উদ্রেক করতে পারত, চরিত্রটি পাঠকের কল্পনার কাছে অনুসরণযোগ্য হত। কোনটাই না হওয়াতে, মূল উপন্যাসটির বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় চলে যাওয়াতে, প্রতীকের ওজন কমে গেছে।

অবশ্য বরেনের উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রকাশক যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাতে 'নিশীথ ফেরী'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরো জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকাশক বলছেন, এর বিষয়বস্তু রাজনৈতিক হত্যা সম্পর্কে লেখকের সংশয়। এই বিষয়টি যে লেখকের মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যে রাজনৈতিক কর্মীটির হাতে নায়ক রিভলভার পাচার করে দিচ্ছে, তার মুখে আপন প্রতিচ্ছবি দেখা, স্বপ্নে খবরের কাগজে আততায়ীর হাতে আপন মৃত্যুর ছবি দেখা ইত্যাদি, এই রাজনৈতিক হত্যা সম্পর্কে লেখকের সংশয়েরই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এই বিষয়টি একেবারেই রাজনৈতিক প্রশ্ন। দেশের কোন্ অবস্থায় শত্রুকে শারীরিক হত্যা বিপ্লবীদের অনুসরণযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে, মার্কসীয় বিজ্ঞানে শত্রুনিধনে শারীরিক হত্যা কতদূর প্রযোজ্য, সেই ব্যাপারে লেখক একেবারেই নীরব। ফলে নায়কের দ্বন্দ্ব কোনমতেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ধরা যাক, নায়কের রোম্যান্টিক মন মানুষ হত্যার কল্পনার গ্লানিতে ভারাক্রান্ত। ফলে তার রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে রোম্যান্টিক চরিত্রের দ্বন্দ্বও উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারত। কিন্তু প্রথমেই যা বলা হয়েছে, রাজনৈতিক অংশ দুর্বল হওয়ায় এই দ্বন্দ্ব কখনই দানা বাঁধতে পারে নি 'নিশীথ ফেরী' উপন্যাসে। উপন্যাসের শেষ দু-তিন পৃষ্ঠা ছাড়া এবিষয়ে লেখক কোন ইঙ্গিতও দেন নি। ফলে, যদি লেখকের মনে তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য বলে এই জিনিসটাই থাকত, তাহলে বলতে হয়, এই অংশে যথেষ্ট জোর না পড়ায়, বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি।

যে কোন মহৎ উপন্যাসে, সার্বেকি কিংবা বর্তমান, একটা ত্রিমাত্রিক জগৎ আছে। জগৎ, প্রতিজগৎ এবং দুয়ের সংঘর্ষে তৃতীয় জগৎ। এই ত্রিমাত্রিক জগৎ বহির্মুখী হতে পারে অন্তর্মুখী হতে পারে, চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠতে পারে, ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠতে পারে, চিন্তার মধ্যে ফুটে উঠতে পারে। এই জগৎটাকেই ঔপন্যাসিক জগৎ বলে। ইতিহাসে দর্শনে একেই বলে থীসিস, অ্যান্টি-থীসিস ও সিন্থেসিস। একটা কথা আছে মহৎ ব্যক্তিত্ব ছাড়া মহৎ উপন্যাস রচনা করা যায় না, বিরাট ব্যক্তি হলেই বিরাট উপন্যাস লেখা যায়। এ কথাটার একটিই অর্থ। দৃষ্টির প্রসারতা না থাকলে উপন্যাসের ব্যাপ্তি আসে না। সমাজকে এবং ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করতে পারলে এই ত্রিমাত্রিক জগৎ তৈরি করা যায় না। মতি-শ্যামল-শীর্ষেন্দু-বরেনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হয়তো ভালোমন্দর পার্থক্য আনা যায়, কিন্তু মোটের উপর, দূরবীক্ষণে, তাঁদের জগৎ মোটামুটি একমাত্রিক, তার কারণ তাঁদের সমাজ এবং ইতিহাসের পরিপূর্ণ উপলব্ধির অভাব। এবং এই কারণেই মনে হয় তাঁরা মহৎ, বিরাট উপন্যাস কখনই লিখতে পারবেন না।

আর একটি কারণ এঁদের ভাষার দুর্বলতা। এঁদের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষণ আছে, এঁরা কেউ কখনও কবিতা লেখেন নি, ফলে শব্দ-সচেতনতা এঁদের বৈশিষ্ট্য নয়। শ্যামল অবশ্যই ব্যতিক্রম, তাঁর ভাষা পরিপাটি, মার্জিত, ঝরঝরে, ঝকমকে। বাকি তিনজনের ভাষা অথর্ব, ভঙ্গুর, হাঁপানি রুগীর মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু শ্যামলের পরিপাটি ভাষাও, আবার সেই বিষয়ের মতো, একমাত্রিক। তাঁর গদ্য ব্যঙ্গধর্মী, বিদ্রূপাত্মক, খোঁচা মারতে খুবই পারঙ্গম, কিন্তু ভাষাতে উত্থানপতন ও টানাপোড়েন নেই। তাঁর নাগরিক গদ্য একটি তির্যক সুরই আনতে পারে, কিন্তু ভাষার চঞ্চলতা, প্রবহমানতা না থাকায় কিছুকাল পরই তা একঘেয়ে লাগে। এতে গাম্ভীর্য নেই, সংগীত নেই, বৈচিত্র্য নেই। সমাজের কাছে এই চারজন যেমন আত্মসমর্পণ করেছেন, বিদ্রোহ করেন নি, ভাষার কাছেও, শব্দের কাছেও এঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন। শব্দকে ভেঙেচুরে তছনছ করেন নি, ক্লিশেকে অক্লেশে গ্রহণ করেছেন।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

## স মা লো চ না

---

**রক্তাক্ত ঝরোখা**— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই কাব্যসংকলনটিতে কবির কাব্যবিবর্তনের এক নতুন পর্যায় দেখা গেল। লক্ষ্য করেছি, আগের সংকলনগুলিতে তিনি যতটা আত্মময়, কমনীয়কণ্ঠ, কর্মসচেতন অথচ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঐতিহ্যাসক্ত, এই নতুন সংকলনে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত, কখনো কর্কশকণ্ঠ, ব্যঙ্গাত্মক, চলতি স্ল্যাং-প্রয়োগে ইচ্ছুক এবং আরো বিদগ্ধ।

তবু সেই পঞ্চাশের দশকের আত্মময় কমনীয়তা এখানেও স্পষ্টভাবে শোনা যায়:

চোখের সামনে মিলালো তার রাঙা পট্টডোরী,
সুবর্ণের কড়িবউলি দুখানি হাত খোঁজে,
পথ মরে যায়, অথচ আজ ঘরহারা চৌকাঠে
চোখে চোখে আগলে রাখি নাকের একটি নথ॥ (নাকের একটি নথ)

দিন ঘনালে সপ্রতিভ
আঁকবো ব্রতের আল্পনা,
শুনতে চাইবো আবার বলছে
বাংলাদেশের অঙ্গনা
আর্শি আর্শি
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি। (ভাঙা সাঁকোর ধারে)

ও গেল যখন, পড়োলি মাঠের একটিও ঘন ঘাস
কোনো শিশিরের আর্শিতে তার মুখ
দেখতে যায় নি, ঝাউয়ের খোঁপায় অজস্র বিশ্বাস,
ঝর্ণার জল সরল, অকৌতুক। (অভাব শোভা)

কিংবা অনায়াসে-আঁকা আলোড়িত আহ্লাদের ছবি:

বলতে বলতে নষ্ট মেয়ে ছুটে-ছুটে পড়ে
এর ঘরে ওর ঘরে যার-তার ঘরে
এর ওর পেশাদার হ্রদের আহ্লাদ
ভেঙেচুরে এর-ওর খলপ্রপাত
একাকার কেয়াখয়ের পানসুপুরি অসংলগ্ন হাত
সবসুদ্ধ গোটা সমুদ্রটা নিয়ে সে আমার ঘরে
ঢুকে প'ড়ে দোর বন্ধ করে: (একটি মৃত্যু)

এইসব কবিতায় "যৌবন বাউল" কিংবা "নিষিদ্ধ কোজাগরী"-তে কবির শাণিত শপথ উচ্চারণের কমনীয় বলিষ্ঠতার আমেজ আসে। কিন্তু "নিষিদ্ধ কোজাগরী"র শেষ কবিতায়

('স্থগিত') জহ্লাদের 'শিকার-শূয়োর বাঁচিয়ে রেখে/এক-এক ক'রে শরীরাংশ-মাংস' কাটার ছবি দেখে কবি যেমন বোবা কান্নায় ভরে উঠেছিলেন সেই বোবা কান্নার পর্ব 'রক্তাক্ত ঝরোখা'য় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্যক্তিত্বের প্রসারে উন্মুখ হয়ে কবি এখন বলছেন:

আহত পাখিটি মানুষের মতো টাসটাস
প্রজ্ঞা বলছে, স্পষ্ট শুনেছি। সে পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যথায় একাকী। (চামুণ্ডা)

এই একাকিত্ব-মুক্ত পাখির সঙ্গে কবি একাত্ম হয়ে মানুষের মূল্যবোধরিক্ততায় আহত হয়েছেন :

যতই টগর করবী
তাকে দাও, সে যে হাঙরের মতো গিলবে সে-ফুল হাঁ করে,
আমার অভিজ্ঞতায় সে এক মানবী। (চামুণ্ডা)

এই মূল্যবোধ-রিক্ততাই কবিকে প্রতারণার অনুভব, ছলনাময়ীর পুংশ্চলী মনোভাব ('খেলা' কিংবা 'ক্ষতিপূরণ'-এর মতো কবিতা) এবং পরস্ত্রী সংস্পর্শের দেহজ সুখের অনুভবে টেনে নিয়ে গেছে। যে সুদেষ্ণা "নিষিদ্ধ কোজাগরী"র কবির সামনে 'অটুট আলীঢ় ভঙ্গিতে' 'নির্যাতিত নারীদের জঙ্ঘায় জঙ্ঘায় বুদ্ধমূর্তি জেবলে' ধরেছিল সে এখানে সততা এবং পাপের ধারণা নিয়ে কবিকে খেলিয়ে বেড়ায়। 'রক্তাক্ত ঝরোখা'য় অলোকরঞ্জনের এ অনুভব নতুন বলেই মনে হয়। এছাড়াও আছে 'সুখোষ্ণ স্বপ্নদর্শী' আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতি ব্যঙ্গ ('অগ্নিতুষার') এবং মানুষের নিশ্চেতন জড়তার প্রতি নীরব আক্ষেপ ('একা')। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র দ্রষ্টার ভূমিকায় ('আমার শুধু চোখের দেখা/আমার শুধু কান্না-পাওয়া') এখানেও কবিকে পাচ্ছি, যদিও এখানে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর :

চারিদিকে ঘুরিয়ে মরে একই ঘানি
আবেগের অনাবেগের, এমন-কি আজ
বাসনা বাসনা নয়, আশ্লেষেও
নতুনের আস্বাদ নেই, উঞ্ছপ্রথা,
প্রজনন প্রজাপালন যুদ্ধ এবং
সনাতন যুদ্ধরতি অন্যভাষা;
পাতাহীন শিউলি গাছের খিন্নশাখে
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা॥ (একা)

এই দ্রষ্টার ভূমিকা থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছেন কবি এই কাব্যে। যেন কোনো অনিবার্য অথচ দুর্বোধ্য বৈরিতার সূত্রে কবি জড়িয়ে পড়েছেন এই রক্তাক্ত সংসারে, যেন নিরুপায় নিরীহ জীবের মতো সমাজের অ-মানুষের শিকার হয়েছেন ('রক্তাক্ত ঝরোখা' অংশে), 'কাদা পায়ে হাতির দাঁতের গড়া আত্মার আঙুর'টি তাঁর দলে গেছে। মনে হয় কবির এই সামাজিক যোগ তীব্র মহানুভবে সমৃদ্ধ নয়, নইলে বৈরিতার চিন্তা আসে কেন? সমাজের পাপ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে কি শুধু বৈরিতার সূত্রে? মানবিকতার গভীরতর আত্মিকসূত্রে সে পাপের ভাগীদার কি হতে হয় না? কবি কি তাঁর আদর্শের 'আপেল'টিকে শুধু না-চেরা নীরক্ত রাখতে এসেছেন ('অভুক্ত দেবতার আপেল চিরে রক্ত/আমি সইতে পারি না')? যে পাপ সমাজে দিনে দিনে জমা হচ্ছে দুচার প্রজন্ম ধ'রে, তাকে প্রচণ্ড আঘাতের ব্যঙ্গাস্ত্র তো তাঁরই

হাতে রয়েছে। তীব্র মানবিক সহানুভূতির জোরেই (বৈরিতার অসহায় বেদনায় নয়) সে আঘাত জোরালো হবে, ধারালো হবে। 'রক্তাক্ত ঝরোখা'-অংশে এইরকম একটা অভিপ্রায় অবশ্য উচ্চারিত হতে দেখেছি:

> উচ্চারণ করো, যথা ইস্পাতের দৃপ্ত জাহ্নবী
> ধরে জ্যোৎস্না, কিংবা খরসূর্যের অমিত স্বেচ্ছাচার,
> শুধু জেনো একমাত্র মানদণ্ড নয় প্রতিচ্ছবি,
> নিদারুণ গহ্বরগুলিরে ঢাকে অরণ্য অটবী,
> মুমূর্ষুকে যে বলে অপ্রিয় সত্য সে অতি নচ্ছার। ('রক্তাক্ত ঝরোখা')

এই নতুন শপথ কিন্তু কোনো ধারালো উচ্চারণ আনলো না, প্রকাশভঙ্গিতে যতটা তিনি ব্যঙ্গাত্মক ও শ্ল্যাং-প্রয়োগে দক্ষ হতে ইচ্ছুক, কবিতার ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা ততোটা দেখা গেল না। কবি-ব্যক্তিত্বের অতিভদ্রতা, কাব্যশিল্প সম্পর্কে অতিসচেতনতা, ঐতিহ্যযোগের প্রতি উদগ্র মনোযোগ এবং অতিরিক্ত শ্রুতিসচেতনতা অলোকরঞ্জনের কবিতাকে অনেকক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত শাণিত সিদ্ধিতে পেঁছে দেয় নি। অথচ 'নর্তকী', 'অগ্নিতুষার' কিংবা 'ধ্যানধারণার ভিড়ে'র মতো কবিতা তাঁরই বাক্‌প্রৌঢ়ির আশ্চর্য নিদর্শন। এলিয়ট-উত্তর এস্‌ট্যাবলিশ্‌মেন্ট-ধারী 'স্কোয়ার্‌স্‌'দের পোশাকি ভাষা সম্পর্কে বীটদের যে আপত্তি (বীটদের দোষত্রুটির কথা স্মরণ রেখেই বলছি) অলোকরঞ্জনের কাব্যশিল্প সম্পর্কে বর্তমান সমালোচকের আপত্তি অনেকটা সেই ধরনের।

**উজ্জ্বল মজুমদার**

**মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ**—আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ২৯। মূল্য ষোলো টাকা।

পত্রধারা সংকলন স্বদেশ বা বিদেশ কোথাও তেমন সুপ্রাচীন নয়। প্রধানত জীবনী রচনার উপকরণ হিসেবেই পত্রগুচ্ছের প্রতি প্রথম গবেষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে প্রতিভাবান ব্যক্তির নেপথ্যচারী মানসতার প্রতি কৌতূহল অথবা সমসাময়িক অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধানে পত্রাবলি আকরস্বরূপ হ'য়ে উঠলো। সর্বদাই সাহিত্যিকগুণসম্পন্ন ব'লেই নয়, খ্যাতিমান ব্যক্তির রচনা হিসেবেই সেগুলো মূল্য পায়। এই ব্যাপারে আরো ভাগ্যবান কবিরা। কারণ, কাব্য যেহেতু অনেকটাই অকথিত ব্যঞ্জনার উপর নির্ভরশীল, তাই ভাবের ফাঁক ভরাতে কবিদের চিঠিগুলো আমাদের দিশারী হ'তে পারে; আমরা জেনে নিতে পারি কোন কবিতার মূলে ছিলো কী ভাব, প্রাথমিক ভাবনার কঙ্কাল থেকে কেমন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে একটি নিটোল কবিতা। কীট্‌স্‌-ইয়েট্‌স্‌, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ তাই আমাদের কাছে নিছক রচনার গুণবত্তা ছাড়াও অতিরিক্ত অভিনিবেশ দাবি করে। ডায়েরি জাতীয় স্মৃতি-চারণার থেকেও এ-দিক দিয়ে পত্রাবলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই কারণে যে, চিঠিতে পাই একটি নাটকীয় আলাপচারিতা; কখনো সে-সংলাপ চলতে থাকে নিজেরই সঙ্গে, কখনো উদ্দিষ্ট প্রাপকের উপস্থিতি কল্পনা ক'রে।

তাঁর পত্রাবলি প্রসঙ্গে মোহিতলাল নিজেই বলেছেন: 'সাহিত্যক্ষেত্রে তথাকথিত সমাজে

আমি একটু জোর করিয়া স্বগর্বে [সগর্বে ?] স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াসী বটে—কিন্তু যেখানে বিরলে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে চিত্তবিনিময় করি সেখানে সেই কৃত্রিম অভিমান দূর করিয়া দিই, কারণ সে-ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন নাই!' সুতরাং অসংগত নয়, যদি আমরা এই পত্রাবলি থেকে জেনে নিতে চাই তাঁর 'কৃত্রিম অভিমানে'র স্বরূপ অথবা কেন তিনি 'জোর করিয়া সগর্বে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াসী'। লক্ষ করবার মতো বর্তমান পত্রগুচ্ছে মোহিতলালের যে-চিঠিগুলি সংকলিত হয়েছে, মাত্র সতেরোটি বাদে অবশিষ্ট সবগুলি তাঁর উপান্ত্য কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত গোধূলি' প্রকাশের পরে লেখা। কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেননি, কিন্তু স'রে দাঁড়িয়েছেন কবিতার উন্মথিত বেদনাতুর সৃষ্টিযজ্ঞ থেকে। তাঁর নিজের কথায়, কাব্যচর্চা ছেড়ে তখন তিনি 'বাংলা সাহিত্যের কোষ্ঠী- ও দশা-বিচার' শুরু করেছেন। অর্থাৎ এই চিঠিগুলির মধ্যে কবি মোহিতলালকে আমরা ততোটা পাবো না, যতোটা পাবো সমালোচক ও সমাজজিজ্ঞাসু মোহিতলালকে। কবি মোহিতলাল স্বপ্নাতুর ও বেদনাবিদ্ধ; আর সমালোচক মোহিতলাল গর্বিত ও উন্নাস। এই অসংগতির মনস্তত্ত্ব তিনি নিজেই উদ্ঘাটন করেছেন : 'আমি যাহা নই অনেক সময়ে, কেবলমাত্র বিরক্তি ও সত্যসুন্দরের জন্য যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিবশে তাহাকেই স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকি।'

খুব সত্যি অর্থেই মোহিতলাল হয়তো কবিতার শহীদ। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয়, মোহিতলাল অনেকটা ড্যান্ডিদের মতো নিজেকে বঞ্চিত প্রতারিত ভাবতে ভালো-বাসতেন। অথবা বলা যায়, এই সংবেদনশীল কবি একই সঙ্গে ছিলেন নির্যাতন-বিভ্রমের (persecution complex) শিকার। তা না-হ'লে মাত্র প'য়ত্রিশ বৎসর বয়সে [১৯২৩] তিনি কী ক'রে লিখতে পারলেন 'বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি out of time, এবং বোধ হয় out of placeও বটে।...আমাকে কেহ বুঝিবে না, আমি বড়ই স্বতন্ত্র, বড়ই একাকী।' এমন-কি 'সাহিত্যিক ষড়যন্ত্রে'র কল্পনাও তাঁকে বিচলিত করেছে। আসলে 'আমাকে কেহ বুঝিবে না'—এই বিবিক্ত দ্বীপময়তা আধুনিক মনের কুললক্ষণ। তাঁর উদগ্র আত্মশ্লাঘার—'আমি form ও style-এর শেষে পৌঁছিয়াছি—বাংলা গীতিকাব্যে classical style-কে ভাষায় ও ছন্দে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছি'—উৎসও এই শঙ্কা। আবার এই আশঙ্কা থেকেই তিনি নিজের কবিতার 'তাৎপর্য-ঘটিত অনুপপত্তি' দূর করতে এগিয়ে এসেছেন।

পূর্ণ প্রতিপত্তির দিনে প্রায় পূর্বদ্রষ্টার মতো নিজের সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যদ্বাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, জীবনের মূল্যেই যেন তার সত্যরক্ষা ক'রে গেছেন (পৃ. ৫ ও ২৪৭)। কবিজীবনের প্রারম্ভে নজরুল ও মধ্যাদিনে "শনিবারের চিঠি"র সঙ্গে সম্পর্ক ও তার পরিণতি তাঁর আশাভঙ্গের বিশ্রুত রূপরেখা। শতাব্দী-শুরুর কবিদের ললাটলিপি ছিলো বিড়ম্বিত কবিখ্যাতি। মোহিতলালও সেই 'অদৃষ্টের ফাঁসী' ছিঁড়ে ফেলতে পারেননি। যখন কিছুই থিতিয়ে যেতে পারছে না নবীনদের, তখন স্রোতে গা ভাসানো অথবা আত্মলীন হ'য়ে কাল-যাপন ছাড়া উচ্চাভিলাষী কবিদের গত্যন্তর ছিলো না। কিন্তু মোহিতলালের পক্ষে অকল্পনীয় ছিলো পাদপ্রদীপের আড়ালে জীবন যাপন। এই দ্রুত পরিবর্তমান প্রেক্ষিতে মোহিতলালের ক্ষণদীপ্ত কবিখ্যাতি ও বিস্মৃতি, ভগ্নস্বাস্থ্য, আর্থিক সংকট—তাঁর সমগ্র জীবনদৃষ্টিকেই অসহিষ্ণু ক'রে তুলেছিলো। আসলে আধুনিক মনস্কতা রয়েছে তাঁর শোণিতে ও স্নায়ুতে, তাই প্রতি মুহূর্তেই তিনি নিজেকে সেঁকে নিতে চেয়েছেন ক্রমান্বয় উত্তেজনায়। আর এই আগুন নিয়ে খেলায় সম্ভব নয় মাত্রা ঠিক রাখা, সে-কথা তিনি নিজেও জানতেন, 'বাঁশী ছাড়িয়া যে লাঠি ধরে তাহার উত্তেজনা কিছু অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য।' এই অস্বাভাবিকতাই

দেখা দিয়েছে 'অতি আধুনিক' সাহিত্যবিচারে, ভাষার শুচিতা রক্ষায়, বাঙালী নিশ্চিহ্ন হওয়ার অমূলক ত্রাসে, গান্ধীর প্রতি অশ্রদ্ধেয় উচ্চারণে, সর্বোপরি 'হিন্দু-ভারত'এর কল্পনায়! আত্মসমালোচনার তুলনায় আত্মগ্লানি তাঁকে অধিকার করেছে।

প্রকৃতপক্ষে মোহিতলালও চেয়েছিলেন আধুনিকদের একজন হ'তে। তাঁর কবিতায় সে-বাসনা গোপন নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া তাঁকে অতীত-মুখী ক'রে তুলেছিলো, তাঁকে নিতে হয়েছিলো উনিশ শতকী প্রাদেশিক জাতীয়তার পতাকাবাহীর ভূমিকা। এই পর্বের সমাজ ও সাহিত্য আলোচনায় তিনি শুধু কৃতবিদ্য নন, সৃষ্টিশীল; কারণ সেখানে তিনি শিক্ষার্থী। কিন্তু সমকালীন বিরুদ্ধমতবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গে যখনই এসেছেন, তাঁর শ্রদ্ধা—সমালোচকের যোগ্যতার যা প্রধান শর্ত—অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। তাঁর সমালোচনা হ'য়ে উঠেছে বিষোদ্গার।

মনের সমতা হারিয়েছিলেন মোহিতলাল। শব্দযোজনা ও বাক্যগঠনে তিনি ভাষার 'স্বধর্ম' রক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু নিজেই 'দৃষ্টি করা' লিখেছেন স্পষ্টত ইংরেজি to cast a look-এর অনুসরণে। অথবা যখন একটি বাক্য শেষ করেছেন অসমাপিকা দিয়ে : 'তিনি বলিলেন, তাহা করা কঠিন, কারণ চতুর্দিক হইতে বড় অভিযোগ হইতেছে বই-এর সংখ্যা ও পাঠ্যের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া'—তখন এই বাক্যগঠন যে 'বাংলা' হয়নি, এ-তথ্যটি তাঁর চোখে পড়েনি। অনেক চিঠিতেই ক্রিয়াপদের রূপে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ ঘটেছে। উৎকট স্ববিরোধেরও অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধির পরীক্ষক হ'য়ে তিনি সম্মানিত বোধ করেছেন, কোনো কবিযশঃপ্রার্থীকে সে-কথা মনে করিয়ে দিতেও ভোলেননি। আবার, কখনো ছাত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, 'পি.আর.এস ও পি.এইচ-ডি দেখিলেই নিজের বুদ্ধিটাকে মুঠা করিয়া ধরিয়া থাকিবে, যেন পকেট কাটা না যায়।' এর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ হ'লেও, এ-রুচিকে সম্মান জানানো যায় না।

মোহিতলালের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পরে তাঁর চিঠি পড়তে ব'সে এই বিচার স্বতই এসে পড়ে। কিন্তু মোহিতলালের অনম্য জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, আর যাই হোক, সাহিত্য তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ছিলো। আমরা যা হয়তো সমর্থন করতে পারবো না, এমন অনেক কিছুই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও ছিলো সুগভীর ও উৎকণ্ঠিত বেদনা। যখন তিনি বলেন, 'আমার বিদ্বেষের মধ্যে যে-আগুন আছে, তাও 'পাবক', আমার অহঙ্কারকে উজ্জ্বল করে', সচেতন এই মানুষটির আত্মপ্রত্যয় আমাদের সম্ভ্রম দাবি করে। আবার, অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে যখন তিনি বলেন, 'আমি কি কেহ নই? আর সকলেরই জীবনের সুখ, দুঃখে সিদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভে অধিকার আছে, নাই কেবল আমার? আমার সম্বন্ধে কেবল সাহিত্যসেবা, আর কোন দাবীর কথা ওঠে না, অর্থ বা যশ ত নহে, এমন-কি মান-অপমানের কথাটাও অবান্তর!'—আমাদের জ্ঞাপনীয় শুধুমাত্র সমবেদনা। মনের এই অনাবৃত প্রকাশই চিঠির অতিরিক্ত পাওনা।

আমাদের দেশে মূল্যবান দলিল, বই, সাময়িকপত্রই সংরক্ষিত হয় না—এখনও পর্যন্ত সেদিকে সচেতনতাও জাগেনি। পত্র সংগ্রহ তো দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে নিজের চিঠির অনুলিপি রাখতেন; এতোটা পরিপক্ক বিষয়বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সকলের থাকে না। সুতরাং অনিবার্যতই নির্ভর করতে হয় পত্রপ্রাপকের শুভবুদ্ধির উপর। কখনও-কখনও বৈষয়িকতা সে-ব্যাপারে বাদ সাধে। অন্যতম সম্পাদক আজহারউদ্দিন খানের কথায় জানতে পারি, এই বইটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবুও বলতে হয়, প্রাপকদের সহানুভূতি

ও শ্রদ্ধায় মোহিতলাল ভাগ্যবান। সংকলিত পত্রগুলির কালগত ব্যাপ্তি প্রায় বত্রিশ বৎসর (অগস্ট ১৯৩০—জুন ১৯৫২)। শেষ চিঠিটি মৃত্যুর চার সপ্তাহ আগে লেখা। বইটিতে স্থান পেয়েছে সাহিত্যচিন্তা, দেশ ও সমাজ, শিক্ষাদর্শন, ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন এবং বিবিধ—এই পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত মোট ১৯৩টি পত্র। সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না-দিলে 'বিবিধ' পর্যায় থেকে অনেকগুলিই অবশ্য বাদ যেতে পারতো। যাই হোক, এতোগুলো বিভাগে সাজাতে গেলেই সন্নিবেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীখান সে-বিষয়ে সচেতন। আমার মনে হয় শ্রীভবতোষ দত্তের প্রস্তাবিত বিভাগ সেদিক দিয়ে সুষ্ঠুতর এবং গ্রহণযোগ্য : 'মোহিতলালের পত্রের বিষয় মোটামুটি দুটি, সাহিত্য এবং দেশকাল। এই দুটি বিষয়েই সমালোচক ও চিন্তাশীল মোহিতলালের বক্তব্য সকলের শোনবার যোগ্য।' দ্বিতীয়ত শ্রীখানের 'মূল সুর লক্ষ্য রেখে' বিভাগ-নির্দেশের যুক্তি মেনে নেওয়া কষ্টকর। মোহিতলালের সব চিঠিই কি সেদিক থেকে কম-বেশি পরিমাণে 'ব্যক্তিচরিত্র ও অন্তর্জীবন' পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না? তাছাড়া, পত্রাকারে প্রবন্ধ লেখা হ'লেও চিঠি প্রবন্ধ নয়; বক্তব্য অবশ্যই থাকবে কিন্তু সঞ্চারী ভাবনার বিস্তারই চিঠির বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে গুরুত্বের -তর, -তম আবিষ্কার করতে গেলে ব্যক্তিগত অভিরুচিকে প্রশ্রয় দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীভবতোষ দত্তের ভূমিকা সুলিখিত। পাঠকের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসাগুলো মনে রেখে তিনি আলোচনা করেছেন এবং মোহিতলালের অন্যান্য গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতের আলোকে ও সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলির গুরুত্ব বিচার করেছেন। কিন্তু তাঁর একটি মন্তব্যে : 'কীট্‌সের এই (মনোগত আদর্শের তুলনায় সৃষ্টির) অসংগতির পীড়াবোধ ছিল না'—শ্রদ্ধাবান পাঠকও অস্বস্তি বোধ করবেন। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে গ্রন্থসম্পাদনার ক্ষেত্রে শ্রীদত্ত ইতিপূর্বেই একটি সুন্দর মান রচনা করলেও, বর্তমান সংকলনে তাঁর যথেষ্ট মনোযোগের পরিচয় পেলাম না। অন্যতম সম্পাদক হিসাবে নাম থাকলেও সন্দেহ হয় ভূমিকা ছাড়া সে-দায়িত্ব তাঁর কাছ থেকে পূর্ণ আনুগত্য পায়নি। বিভাগ নির্দেশের মতো, বইটির ভূমিকা ও পরিশিষ্ট প'ড়ে মনে হয়েছে, দুই সম্পাদকের মধ্যে সম্পাদনা বিষয়ে বোঝাপড়ার অভাব আছে। তাই পরিশিষ্টে নজরুল বা প্রবোধচন্দ্র প্রসঙ্গের পুনরুক্তি।

তথ্যপঞ্জির প্রতিটি তথ্য মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। তবুও চোখে পড়লো, স্পেন্‌সার (এডমান্ড, উইলিয়াম রবার্ট নন) বায়রনের সমসাময়িক হ'য়ে গেছেন, 'ফেইরী কুইন'-এর লেখক চাপা পড়েছেন। 'গোল্ডেন ট্রেজারি' কামগীতির (lust songs) সংকলন হ'য়ে গেছে! দুটি ক্ষেত্রে দেখলাম, প্রধান গ্রন্থের তালিকায় অন্যান্য নামের সঙ্গে কালেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌ও যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জির ঝামেলা এড়ানোর সহজ পথ এতোদিনে পাওয়া গেলো! য়ুগোর ও শোপেনহাউয়ারের বইগুলোর মূল নাম দেওয়া হয়েছে; রুশ লেখকদের বইয়ের নাম কিন্তু ইংরেজি ভাষান্তরে। ছাপার ভুল অসংখ্য। সব থেকে হাস্যকর য়ুগোর আয়ুষ্কাল তিন বৎসর (১৮০২-১৮০৫)! ছাপা হওয়ার প্রথম দিকে পাদটীকায় সংখ্যা ব্যবহারের সংকল্প ছিলো, ক্রমে যে তা পরিত্যক্ত হয়েছে তার মূক সাক্ষ্য বহন করছে সংখ্যাগুলো। জানতে ইচ্ছে হয়, মোহিতলালের বানান কেমন ছিলো। কিন্তু বইয়ের অজস্র মুদ্রণপ্রমাদের মধ্যে সেই তথ্যটি জেনে নেওয়ার অবকাশ নেই। তবে এমন বাক্য কি মোহিতলাল লিখতে পারতেন : '"বঙ্গদর্শনে" নাই-বা ছাপা হ'ল—তাতে আপনার মনে আঘাত না হবার কারণ নেই তো?'

অতিপরিচিত কয়েকজন বিদেশী সাহিত্যিকের নামের ইংরেজি লিপ্যন্তর, জন্ম-মৃত্যু

ও বইয়ের নাম সংকলন না-ক'রে শ্রীখান যদি চিঠির আরো কয়েকটি অজ্ঞাত সূত্র ধরিয়ে দিতেন, তাহ'লে ভালো হ'তো। যেমন ধরুন, ১৭৬ পৃষ্ঠার অপরিপক্ক কবিটি কে, বা ২৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অচিন্ত্যকুমারের 'অজ্ঞানকৃত ভুল' কী?

**স্বপন মজুমদার**

The Love Machine. *By* Jacqueline Susann. W. H. Allen. London. 35s.

লেখিকার আগের উপন্যাস *Valley of the Dolls* পড়িনি, তবে কথা শুনেছি—এবং না শুনে উপায় কী! বর্তমান উপন্যাসটিও best-seller তালিকায় যদি এখনো অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তো শীঘ্রই হবে, এবং সেই অতি বিশেষ ও সম্ভ্রান্ত কারণেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলেও গণ্য হবে নিশ্চয়। বিক্রি হতে পারা বা না পারার মধ্যেই আজ যখন সাহিত্যের গুণাগুণের মানদণ্ড ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ধারিত হচ্ছে, তখন খামোখা সমালোচনার কষ্ট স্বীকার করা কেন জানি না।

প্রকারান্তরে সত্য কথাটা বললাম: বইটি যে পড়তে পেরেছি, তা এই অবসরে জানানো ছাড়া অন্য তৃপ্তি পাইনি। তবু দুটি জ্ঞান লাভ করেছি। প্রথমত, আস্তিক নীতিবাদীদের কেউ-কেউ যেমন বলেন ঈশ্বর না থাকলে ভালো-মন্দের ভেদাভেদ থাকে না, সে-ক্ষেত্রে খুনী কোনো দোষে দোষী নয়, খুনের হাত থেকে কাউকে বাঁচানোও ধর্ম নয়, সব ঘটনাই নিজ-নিজ অস্তিত্বে সত্য ও সমান তাৎপর্যপূর্ণ—সেই রকমই আমাদের ভাঙাচোরা পুরানো জগতের ভালো-মন্দবোধের খুঁতখুঁতানি মন থেকে যদি একবার দূর করতে পারি তো আমেরিকান সভ্যতাটা একটা বিরাট প্রচণ্ড সত্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবেই, সেটার কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, সে-বিচারের গ্লানিকর দায়িত্ব হতে নিজেকে নিষ্কৃতি দেব। উপরন্তু তার নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরার খুঁটিনাটি নিয়ে সেটা যে আছে, ভয়ংকরভাবে আছে, সেই অস্তিত্বের বোধেই জাগব। অর্থাৎ সেই সভ্যতাকে তখন মেনে নেব একটা দেহের মতো, যার মলমূত্র যেমন সত্য, হাত-পা-আঙুল-চোখের দৃষ্টিও তেমনই সত্য—কোনোটাই ভালো অথবা মন্দ নয়। ভালো-মন্দের প্রশ্নও এ-গ্রন্থে কোথাও উত্থাপিত নয়, বিবেকহীন এক আশ্চর্য নির্বিকার বোধ সর্বত্র সঞ্চারিত। কারণ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য, বা নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের পবিত্রতা—এমন আহাম্মক কথার কল্পনাও কি আজ করা চলে?

দ্বিতীয় যে-জ্ঞানটি লাভ করলাম, সেটি হল এই যে আমেরিকায় নানান ধরনের writer's workshop ও ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে সাহিত্য-রচনাকেও শিক্ষা-বিষয়ের অঙ্গীভূত করার কল্যাণে কত রকমের চলনসই লেখা সেখানে লিখতে পারছেন আজ কত অজস্র জন—আমাদের মতো দেশে কল্পনাও করা শক্ত। আমাদের বহু পেশাদার সাহিত্যিকও গুছিয়ে লিখতে বসে হিমসিম খেয়ে যান—অথচ আমেরিকানরা এ-ব্যাপারে কী আশ্চর্যই না এগিয়ে চলেছে। এ-গ্রন্থের লেখিকা সাহিত্যিক হবার জন্য জন্মেছিলেন বলে মনে হয় না—হয়তো একদিন দুম করেই লিখতে আরম্ভ করেন। এবং যা-কিছুই লিখছেন, তা চলে যাচ্ছে, বেশ চলছে—লেখার স্বাচ্ছন্দ্য তাতে লক্ষণীয়।

বইটিতে গল্পের একটা কাঠামো থাকলেও একমাত্র প্রধান কর্ম যা আছে, তা একলা

ঘরে অবসর পেলেই নারী ও পুরুষের উলঙ্গ হওয়া, নির্বিবাদে, নির্বিচারে—এবং উলঙ্গ হওয়ার পরের সবেধন নীলমণি কাজটি। যে-কোনো নারীই হোক, যে-কোনো পুরুষই হোক। এবং যে-কোনো সময়ই হোক—সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, রাত্রি। পাতার পর পাতা শুধু বিহারের বর্ণনা।

একমাত্র বিপরীত বিহার নয়, সাধারণ বিহারের নমুনাও অজস্র। বিহার নারী ও পুরুষে, পুরুষ ও পুরুষে—কৌতূহলী পাঠক ঘেঁটে দেখতে পারেন। কাহিনী যেহেতু প্রচার, ফিল্ম ও টেলিভিশন জগৎকে কেন্দ্র করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেহেতু লেখিকা স্বয়ং এ-জগতের সঙ্গে একদিন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিলেন, সন্দেহ হয় মিথ্যা তিনি কিছুই লেখেন নি হয়তো, বরং হয়তো তাঁরই আত্মজীবনীর কিছু অংশ এখানে বিধৃত।

ছুঁড়ি-বুড়ি নিয়ে প্রধানত তিনটি মেয়ে Amanda, Maggie ও Judith—যারা নায়ক রবিন স্টোনের প্রেমাকাঙ্ক্ষীই শুধু নয়, সেকেলের মতো তাকে বিয়ে করার জন্যও পাগল। রবিন এদিকে love machine, হৃদয়ে তার দাগ পড়ে না, সে শুধু machine-এর মতো love করে—আশা করি love কথাটার অর্থটা এখানে সুস্পষ্ট। এটা যখন বললাম, তখন সমস্ত গল্পটাই বললাম—শুধু বাকী থাকে যেটা, সেটা সেই রবিনেরও নাকি শেষে ভাবপরিবর্তন হয়, তিনটি মেয়ের একটিকে নিয়ে সে সেকেলে হতে চায়। এবং যে-ব্যাপারটা বলা বাহুল্য বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে না। তবে তাতে যায়-আসে না কিছুই, এত যৌন-ক্রিয়ার বৃত্তান্তে পাঠকের মনটা অবশ হয়ে পড়ে, পাঁচশো পৃষ্ঠার কাছাকাছি বইটা যেন শেষই হতে চায় না—শেষ করে মনে হয়, যাক বাবা, বাঁচা গেল।

মাত্র একটি সান্ত্বনা, এবং যার জন্য লেখিকাকে ধন্যবাদ। এধরনের বই সমালোচনা করতে বিশেষ কসরতের দরকার পড়ে না, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনও হবে অরণ্যে রোদন।

**লোকনাথ ভট্টাচার্য**

**কবি জীবনানন্দ দাশ।** সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা।

সমকালীন কোনো কবির পক্ষে অন্য একজন কবির নিরাসক্ত মূল্যায়ন খুব কঠিন কাজ। তবু সঞ্জয় ভট্টাচার্য এ-কাজ স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কাব্য-কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ লিখবার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অনেক কারণে এই দুই কবির মধ্যে আত্মিক সংযোগের সেতু তৈরি হয়েছিল। "কবি জীবনানন্দ দাশ" সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ গদ্যরচনা।

'সমালোচকের দায়িত্ব কবিতার অন্তর্গত বিভিন্ন অর্থ বার করে আনা'।—শুরুতে এই মন্তব্যে লেখকের লক্ষ্য স্পষ্ট। প্রথম দুটি অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দের স্থান নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। লেখক দেখাতে চেয়েছেন, কিভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার ছায়াতে জীবনানন্দের কবিতায় 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' এসেছে; কিভাবে 'তিনি রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরাধিকারকে হৃদয়াবেগ সংহত করার কাজে লাগিয়েছেন। সেই সংহত হৃদয়াবেগ থেকে উদ্ভূত প্রতিটি শব্দ কিভাবে অজস্র অর্থের দ্যোতক হয়ে 'জটিল' নামে

পরিচিত হচ্ছে—কবিতার মিত বিশ্লেষণে লেখক তা দেখিয়েছেন। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সেই বিশ্লেষণের বিস্তৃতি। জীবনানন্দের অনাধুনিকতা প্রসঙ্গে লেখক বলেন, 'সাময়িকতা আর আধুনিকতা এক নয়' এবং 'সময়ের বিশেষ বিশেষ বিন্দু আছে কিন্তু তা খণ্ডিত নয়।' সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ সাময়িকতার দ্বারস্থ না হয়ে আধুনিক।

"ঝরা পালক"-এর 'সদ্যপ্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা' কি করে তিলে তিলে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র সবুজ ফসল লালন করে তুলেছে তার আলোচনার পর লেখক দেখিয়েছেন, জীবনানন্দের কবিমানস "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র প্রাথমিক পর্যায়ে যে প্রাণোৎসারকে 'সবুজ ফসল' মনে করেছিল, প্রেমের অপঘাতে তা মৃত্যু দেখেছে। সেই মৃত্যুবোধ থেকে কবি খুঁজে নিয়েছেন 'ধূসর স্বপ্নের দেশ', যেখানে তাঁর 'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়...।' ক্রমে সেই 'চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদকে' অঘ্রান প্রান্তরে রেখে কবি 'গভীর ঘুমের আস্বাদে' নিজের আত্মাকে লালিত করেও ইতিহাসের জ্ঞানময়তায় জাগতে চেয়েছেন, প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড়তাবোধে জাগতে চেয়েছেন।

লেখকের মন্তব্যের সঙ্গে পাঠক সর্বত্র একমত হতে না পারলেও, বইটির সার্থকতা অবশ্যই সানন্দে মেনে নেবেন।

**ত্রিদীপ ঘোষ**
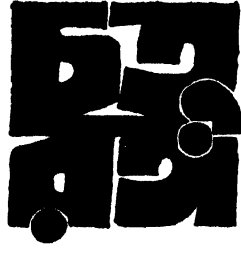
বর্ষ ৩২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭

# বাঙলার ভাব-বিপ্লব ও গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর

সুদেব সানা

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেলেও ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংরেজ শাসন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। উনিশ শতকের গোড়াতেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন বিদেশী শাসনকে বাঙলার ভাবলোকে পৌঁছে দিয়েছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই শাসনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল। এই অবশ্যম্ভাবী প্রসারের মধ্যেই বাঙলার নবচেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ সন্ধান করেছিল, শুধু তাই নয়, সমগ্র জাতীয় চেতনায় এদেশ থেকে এই শাসনকে উৎখাত করার আত্মিক শক্তিও ক্রমশ অনুভূত হয়ে উঠেছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাঙলার ভাব-বিপ্লবের চেতনাকে জাগিয়ে তুলে আশ্চর্য দ্রুততায় অগ্রসর করে দিয়েছিল। এই ঘটনাগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য : ক. ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু; খ. ১৭৭০ এদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী; গ. ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিসংক্রান্ত এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বকালে বাঙলার জনজীবন যে কতখানি বিপর্যস্ত, কালিমালিপ্ত এবং আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। অন্যদিকে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুদীর্ঘ এক অন্ধকার যুগের অবসান ঘটলো। মধ্যযুগীয় দেবনির্ভরতা, কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং বিপর্যস্ত মানসিকতা বাঙ্‌লার চিন্তাধারা থেকে বিদায় নিল। বাঙ্‌লার দীর্ঘদিনের সেই সারস্বত সাধনায় ছেদ পড়ল—কাহিনীকাব্যের পরিচিত ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্‌লার জাতীয় জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে কাঁচা মাল এবং বিদেশীপণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্যে বাঙ্‌লাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পণ্যবাজার স্থাপিত হল। যান্ত্রিক পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙলার কুটিরশিল্পের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

কিন্তু পরপর কয়েকবছর অনাবৃষ্টির জন্যে বাঙ্‌লায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তার ওপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহ আলম-এর কাছ থেকে ইংরেজরা বাঙ্‌লা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর রাজস্ব আদায়কারী রেজা খাঁর অত্যাচারে কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বনাশ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে এলো মহামারী। যখন বাঙ্‌লার কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের শেষ উত্তরাধিকারী জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্ব বিলোপের পথে, সেই সময় এ দেশে ইংরেজ শাসনের প্রসারকে আরো গতিশীল করে দিতে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ।

তাঁর অবলম্বিত ভূমিসংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙ্‌লাদেশকে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন করে দিল। যাঁদের সঙ্গে ভূমির কোনকালেই সম্পর্ক ছিল না, ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট একদল নতুন ধনী প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী হয়ে গেল। সেই ধনিসমাজ মূলত বিলাসী, ইংরেজের কালেক্টর শ্রেণীভুক্ত। যারা জমিতে চাষ করত, তারা ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী। এবং জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয়ের কিছু অংশও এই সর্বস্বান্ত সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের জন্য ব্যয়িত না হয়ে, নিজেদের বিলাসে ও খেয়ালে ব্যয়িত হত। এই ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যযুগীয় সামন্তশক্তি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে আর পারল না। এই ঘটনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

বাংলাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই সামন্তরাজশক্তি যখন ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট ধনী-সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলো না, স্বভাবতই বাংলা সাহিত্য তখন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। ধনিসমাজের সৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিপুষ্ট নতুন ভাবধারার সঙ্গে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভাবধারার এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাঙ্‌লার জনজীবন ও সাহিত্য কিছুদিনের জন্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। গৌড়ের রাজসভার মত এ দেশের অনেক ছোট বড় রাজসভা থেকে বাংলা সাহিত্য সাধারণ মানুষের মুক্ত অঙ্গনে উৎক্ষিপ্ত হল। সাধারণ মানুষ হল এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। এই বিপর্যস্ত মানসিকতার ফসল পাঁচালী, কবিগান।

তার ওপর নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে কৃষিজীবীরা ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে শহরের নীতিবোধবর্জিত বিকৃতরুচির সংস্পর্শে এলো, অন্যদিকে বাঙ্‌লার কৃষিব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিল।

এই ঐতিহাসিক কালতাৎপর্যে বাঙ্‌লাসাহিত্য বিশেষিত। বস্তুত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত আধুনিক চিন্তাধারা ও সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্ব। বাঙ্‌লাদেশে ভাববিপ্লবের এই সূচনাপর্বে যে সমস্ত নিম্নরুচির সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাকে যুগরুচি ও বাঙ্‌লা-সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দ্বিধা রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সুদীর্ঘলালিত পয়ার ছন্দের কাব্যসুষমা ও ভাবশোষণশক্তি পাঁচালীকার ও কবিগানের রচয়িতাদের তাৎক্ষণিক অনুভূতিসিদ্ধ রচনায় প্রায়শ দেখা যায় না। প্রচুর অব্যবহৃত শব্দের অযথা ব্যবহার, খণ্ড খণ্ড রচনা, এবং গদ্যময় শব্দের ওপর সুরারোপ সম্বলিত এই সমস্ত সাহিত্য অশিক্ষিত সমাজজীবনের মানসিকতাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এবং ভাব-বিপ্লবের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই খণ্ড খণ্ড কবিতার ভিতর দিয়ে মানুষ তার মনের ভাব-ভাবনা চিন্তাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে না। তাই এ সময়েই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে

এমন কিছুর সন্ধান চলছিল, যাতে ব্যবহারিক ও সাহিত্যিক উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হতে পারে। তৎকালীন বাঙলার মানুষের এই আত্মিক সংঘর্ষ ও অতৃপ্তিবোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে গদ্যভাষা—তাকে সাহিত্যিক মাধ্যম হিসেবে চিনিয়ে দিয়েছে ইংরেজ রাজশক্তির শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের কিছু কর্মচারী, মূলত বিদেশীরা।

বাস্তবিক পক্ষে, এই আবিষ্কারই বাঙালীকে তার জাতীয় চরিত্র গঠন ও তার আত্মিক সাধনা, মনন ও তার সাহিত্যরুচি সৃষ্টিতে বিপ্লব এনেছে, তা-ই ক্রমপ্রসারিত হয়ে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধেই যথাসময়ে সংহত হয়েছে এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যকে প্রাচ্যবাণীর বাহক-রূপে চিহ্নিত করেছে।

উনিশ শতকের পূর্বে গদ্যভাষার সাহিত্যিক ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে তৎকালে চিঠিপত্রে, দলিলে, ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যায়, প্রশ্নোত্তরমালায়, আয়ুর্বেদ-জ্যোতিষ-স্মৃতিন্যায় ও কথকতা জাতীয় রচনায় বাঙ্‌লা গদ্যের ব্যবহার ছিল।[১] নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে লিখিত এই সমস্ত দলিল ও পত্রাদির গদ্য সাহিত্যিক গদ্য থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রয়োজন-ভিত্তিক গদ্যের বাইরে কিছু শিষ্ট গদ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবধারার একখানি মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কবি রামকৃষ্ণ রায়ের "শিবমঙ্গল" কাব্যে। কাহিনীকাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে কবি কয়েকটি সাবলীল ও সম্পূর্ণ গদ্যবাক্য ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দুটি বাক্য উদ্ধারযোগ্য: (১) ভাইরে নন্দি গিযা শিবের সাক্ষাতে দুর্গার কেমত রূপ বলিতেছে অবধান করহ। (২) পার্বতী ভাগরথী স্নান করিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখ নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ।[২] উদ্ধৃত বাক্যদুটি থেকে পরবর্তীযুগের সাহিত্যিক গদ্যভাষার পার্থক্য খুব বেশি নয়। তবে এই গদ্যের ব্যবহার কাহিনীকাব্যের মধ্যে ছিল অত্যন্ত সীমিত। বাক্যদুটিতে বিশুদ্ধ সাধুগদ্যের যে ধ্বনিস্পন্দন অনুভূত হয়, পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের পূর্বে আর কোন গদ্যলেখকই তা ধরতে পারেননি। এ ছাড়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কড়চা জাতীয় রচনায় গদ্যের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়।[৩] তবে বাক্যগুলিতে ভাবের পূর্ণায়ত রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য বক্তব্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা নেই এবং এগুলি টুকরো টুকরো বাক্যের সমষ্টি।

তারপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে যে কালপর্ব শুরু হল, ১৮৫০ পর্যন্ত তারই দীর্ঘ বিস্তৃতি,—এবং এই সময়টাই বিদ্যাসাগর আবির্ভাবের পূর্ব-পরিপ্রেক্ষিত। এই সময়ের মধ্যবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল, (ক) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ঐ বছরই শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, (খ) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপন ও পর বছর শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা, মিশনারি-দের পরিচালিত মাসিকপত্র দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণের আবির্ভাব, (গ) হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্ত্যভাবধারার ব্যাপক প্রচার, সংবাদপ্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতি।

এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে নাগরিক বাঙালীর যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলে যে প্রতিক্রিয়া ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা দেখা গেছে এবং

---

[১] প্রাচীন বাংলা পত্রসংকলনগ্রন্থের অজস্র চিঠিপত্রে তৎকালে প্রচলিত মোটামুটি একটি গদ্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

[২] আশুতোষ ভট্টাচার্যের "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" সর্বশেষ সংস্করণে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

[৩] নরোত্তম দাসের "দেহ কড়চা" গ্রন্থ।

সর্বোপরি যে ইংরেজীয়ানার মোহ এসেছে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই প্রতিক্রিয়া, আত্মরক্ষা, মোহাবেশ, মোহভঙ্গ ও বাস্তববুদ্ধি জাগরণের পর্ব চলেছে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব এই মোহভঙ্গের সূচনায়।[৪]

বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাঙ্‌লা গদ্য যে লেখকগোষ্ঠীর চর্চায় পরিণতিমুখী ও ক্রমশ আত্মশক্তির অধিকারী হয়ে উঠছিল, সেই গদ্যলেখকদের তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। (১) খৃষ্টীয় মিশনারি ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী, (২) বিদেশী সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যলেখকগোষ্ঠী; (৩) রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রমুখ কয়েকজনের স্বাধীন, বেতনভুক ও পুরস্কারের নিমিত্ত প্রচেষ্টা। এ ছাড়া সংবাদ-সাময়িক পত্রের উদ্ভবের সময় এক ধরনের সাংবাদিক কথ্য-ভঙ্গির গদ্যভাষাগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এ দেশে আধিপত্য স্থাপনের পূর্বেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল, এঁরা এদেশে খৃষ্টের বাণী প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষবোধ্য একরকমের দেশীয় ভাষার চর্চা করেছিলেন। এঁদের রচনা ও কৃতিত্বকে সাধারণ সূত্রবদ্ধ করা যায়। (১) বাইবেলের অনুবাদ এবং গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের থেকে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা, (২) সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ও প্রথম বাঙ্‌লা ব্যাকরণ রচনা; (৩) আরবি-ফারসির প্রভাবমুক্ত করে গদ্যভাষাকে সংস্কৃত আদর্শানুসারী করে তোলা এবং সাহিত্যিক কথ্যভাষার দ্বিধান্বিত সূচনা। অনুবাদের বিশেষত অনুবাদ-সাহিত্যের কোন আদর্শ না থাকায় তৎকালে মিশনারিদের রচিত গদ্যভাষা আড়ষ্ট, বাক্‌রীতিতে সুস্পষ্ট ইংরেজী বাক্‌ভঙ্গির প্রভাব[৫] এবং অজস্র আরবি-ফারসি শব্দের অপব্যবহার। পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রের প্রচলনে এই আড়ষ্টতা অনেকখানি দূর হতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম বাঙ্‌লা গদ্যভাষার নিজস্ব প্রাণ-স্পন্দন ও তার নিজস্ব গতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরী। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন :

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any other language of India; four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কেরী বাংলা ভাষার যে সংহতিগুণ ও বলিষ্ঠ অনায়াসগতি আবিষ্কার করেছেন এবং বুঝেছেন,—সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার বাঙ্‌লা ভাষার প্রাণ,—সেই পথেই গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ও কুশলী পদচারণা। অন্যদিকে, "কথোপকথন" জাতীয় গদ্যগ্রন্থ সম্পাদনা করে কেরী সাহেব বাংলা কথ্যভাষার প্রতি পরবর্তী গদ্য-লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

[৪] ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার সম্পাদিত "শকুন্তলা ও সীতার বনবাস"-এর ভূমিকা, পৃ ১।
[৫] বিশেষত, ইংরেজী বাক্‌ভঙ্গির অনুসরণ ঐ সময়ে রচিত পুস্তকে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ ম্যানুএল দা আসসুম্পসাও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোম্যান কাথলিক সংবাদ'।

করেন; স্পষ্টতই এই কথ্যভাষাভঙ্গি মৃত্যুঞ্জয় ও সমকালীন অন্যান্য লেখকদের প্রভাবিত করে ভবিষ্যৎ চলতিভাষার আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করে দিয়েছিল।[৬]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের মধ্যে মুন্শী রামরাম বসু ও পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রধান ছিলেন। রামরাম সংস্কৃতভাষার পণ্ডিত ছিলেন না, বরং আরবি-ফারসিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি কেরী-নির্দেশিত পথ পুরোপুরি গ্রহণ কিংবা বর্জন করেননি। তিনি বুঝেছিলেন যে, সংস্কৃতের কৃত্রিমতার পরিবর্তে আরবি-ফারসি শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে তার যথাযথ প্রয়োগেই গদ্য আত্মবিকাশের বৈচিত্র্য খুঁজে পেতে পারে।

'কিন্তু দূরদর্শী রামরাম শিল্পী হিসাবে ছিলেন বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় দূরদর্শী ছিলেন না, কিন্তু শিল্পী হিসাবে ছিলেন সতর্ক স্থপতি। সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যকে তিনি গভীর অনুভবে আস্বাদন করেছিলেন বলেই বাংলাগদ্যে মর্যাদা, রুচিবোধ ও ছন্দস্পন্দনের ক্ষীণ আভাস তাঁর গদ্যে পাওয়া গিয়েছিল।'[৭] এই হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়কে বিদ্যাসাগরের পূর্বে সচেতন গদ্যশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল, (১) বিশুদ্ধ, সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি, বিন্যাসপদ্ধতি ও অন্বয়, (২) সাধু, পরিচ্ছন্ন ও বিবৃতিধর্মী গদ্য, ও (৩) চলিত, বাস্তব ও নাটকীয় সংলাপ পদ্ধতি। বিশেষত চলতি, ইতর ও গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার তাঁর গদ্যকে আধুনিক গদ্যের আত্মীয় করেছিল। তাঁর গদ্য সম্পর্কে মার্শম্যান লিখেছেন, "The student should be occasionally interrupted in the perusal of it by words and phrases of unusual occurrence,...Any person who can comprehend the present work and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language."

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে মার্শম্যানের বিশ্লেষণ নির্ভুল। তাঁর রচনায় ভাষার জটিলতা, শব্দাড়ম্বর ও তৎসম শব্দের ব্যবহারবাহুল্য এবং দূরান্বয়দোষ অত্যন্ত বেশি।[৮] এ ছাড়া লেখ্য ও কথ্য রীতির বিসদৃশ মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের রচনায় তা ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর সাধারণ ত্রুটির মধ্যে সমগ্রবাক্যের দৈর্ঘ্য ও ভাবসাম্য নিরূপণে সুমিতিবোধের অভাব মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সৌষ্ঠব গুণকে নষ্ট করেছে। কিন্তু কথ্যভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য রকমের পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন[৯], যা সাধুগদ্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের গদ্যভাষার ত্রুটি রামমোহন প্রমুখ মূলত সাংবাদিক গদ্য-রচয়িতাদের হাতেও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। অবশ্য, তৎকালে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যাঁরা গদ্য-ভাষার চর্চা করেছিলেন, ভাষাসরলতার ক্ষেত্রে রামমোহন তাঁদের অন্যতম। তিনি সচেতন ভাবে গদ্যভাষার চর্চায় নামেননি। উনিশ শতকের নবজাগৃতির যুগপুরুষ রামমোহন সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন:

"He was by nature one of those who leads, not one of those who follows, one of those who are in advance of, not one of those who are

[৬] কথোপকথন-এর স্পন্দন অংশে এই কথ্যভঙ্গির গদ্যভাষার প্রায় স্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষণীয়।
[৭] শকুন্তলা ও সীতার বনবাস—ভূমিকা, পৃ ৬।
[৮] বেদান্তচন্দ্রিকার গদ্য বর্তমান মন্তব্যের প্রমাণ।
[৯] প্রবোধচন্দ্রিকার আখ্যান অংশে এর অজস্র প্রমাণ আছে।

behind their age."[১০]

নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম, সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থেকেও তিনি বাংলা গদ্যের যে চর্চা করেছিলেন, তার কিছু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান এবং কিছু বিচার, বিতর্কমূলক রচনা। বাঙালীর আচার আচরণ এবং কর্মের মধ্যে আবেগের অতিরেকের সঙ্গে সঙ্গেই আছে সূক্ষ্মচিন্তা ও যুক্তি। রামমোহনের সমস্ত গদ্যরচনায় সেই অপ্রতিহত ও অসংসক্ত বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, আর বিদ্যাসাগরের রচনায় আবেগের অতিরেক ও বিশুদ্ধ কল্পনাশক্তির প্রকাশ। 'রামমোহনের রচনায় সাহিত্যরস ছিল না, তবে তাঁর ভাষা ছিল বক্তব্যের উপযোগী ও প্রাঞ্জল। সে যুগের বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জলতা গুণ ছিল সুদুর্লভ।'[১১] ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।' রামমোহনের গদ্যভাষা এবং তাঁর রচনাভঙ্গি সরল ও সুষম হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়নি। এর অন্যতম কারণ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও রামমোহনের গদ্যের দুটি দোষ চোখে পড়ে। প্রথম ছেদচিহ্নের স্বল্পতা, দ্বিতীয় দূরান্বয়।[১২] মৃত্যুঞ্জয় তাঁর গদ্যে কর্তাকর্মক্রিয়ার অন্বয়ের সমস্যা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর গদ্যে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ছিল, বাক্যগঠন সংস্কৃতানুসারী হওয়ায় অর্থবোধে অসুবিধা হত। রামমোহন বাঙ্‌লাগদ্যের এই দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তার প্রমাণ, তাঁর প্রথম বাংলা অনুবাদাত্মক নিবন্ধগ্রন্থ 'বেদান্তগ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' অংশ। বিদ্যাসাগরের গদ্য এই ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনি যথোচিত কমা-সেমিকোলন ও দাঁড়ির ব্যবহার করে বাংলা গদ্যের অন্তর্লীন ছন্দস্পন্দনকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাই তাঁর গদ্যভঙ্গি পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত গদ্যরীতি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের রচনাপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।'[১৩]

এ মন্তব্য সর্বাংশে যথার্থ নয়। রামমোহনের সামনে সংস্কৃত শাস্ত্রকারদের রচনাপদ্ধতিই শুধু আদর্শ ছিল না, ইংরেজী ও ফারসি রচনাপদ্ধতির আদর্শও ছিল। আর সমালোচক এবং প্রবন্ধকারকে 'পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ' করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই এ গদ্যভঙ্গি যে আধুনিক গদ্যের নয়, এমন কথা সুনিশ্চিত নয়। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রবন্ধরচয়িতা বঙ্কিম এবং আরও পরবর্তীকালে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল এবং বিশ শতকের অপরার্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ রীতি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় অনুসরণ করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, কথাসাহিত্যের উপযোগী সরস গদ্য এবং

[১০] উনিশ-বিশ : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২।
[১১] বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ ৩১।
[১২] পথ্যপ্রদান, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার প্রভৃতি গ্রন্থে এর প্রমাণ অজস্র।
[১৩] প্রবন্ধ সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী। বিশ্বভারতী।

স্বচ্ছ গদ্যভঙ্গি রামমোহনের রচনায় নেই।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর বাংলা গদ্যভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ভাবধারণের দিক থেকে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের অনুবাদাত্মক তিনখানা বই, "বেতাল পঞ্চবিংশতি ও "বাঙ্গালার ইতিহাস," এবং "জীবনচরিত" প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক গদ্যলেখকদের রচনাভঙ্গি থেকে তাঁর অবলম্বিত রীতি এতই ভিন্ন যে, পরবর্তীকালে 'গদ্যের জনক' বলে বিদ্যাসাগরকেই অভিনন্দিত করা হয়েছে, যদিও বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের দিক থেকে লক্ষ্য রাখলে বাংলা গদ্য সম্বন্ধেও এক-জনকত্ব অপেক্ষা বহু-মাতৃকত্বই অধিকতর প্রযোজ্য।

রামমোহন কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। কবিতা হিসাবে তাদের মূল্য কিছু না থাকলেও লক্ষণীয় যে, কবিতারচনার ক্ষেত্রে তিনি সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন, ভাষার ছন্দ ধরতে পেরেছেন। তাঁর একটি ব্রহ্মসংগীতের কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য :

'মন এ কি ভ্রান্তি তোমার,
আবাহন বিসর্জন বল কর কার,
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাকে
তুমি কেবা আন কাকে এ কি চমৎকার।'[১৪]

বিদ্যাসাগর কখনো কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন বলে জানা যায়নি। কিন্তু গদ্যে তিনি কাব্যের সুষমা আনতে পেরেছেন, রামমোহন যা পারেননি। বস্তুত রামমোহনের পূর্বে ও সমকালে কাব্যভাষার আদর্শ ছিল, কিন্তু সাধুগদ্যের কোন আদর্শ ছিল না। বিদ্যাসাগর এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিদ্যাসাগর কি সমাজের ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলত সংস্কারক। তিনি স্বয়ং লিখেছেন,- 'বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।'[১৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই উক্তিই শেষ কথা নয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিরোধ কিংবা বালবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়, তার চেয়েও সুদূরপ্রসারী কীর্তি হল, বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন এবং বাংলা গদ্যের সংস্কারমুক্তি। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিসিদ্ধ কিন্তু বহুবিবাহের ক্ষেত্রে মানবিক হৃদয় ও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যটি তাঁর শাশ্বত সহানুভূতিশীল হৃদয়াবেগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যটুকু স্পষ্টত মুদ্রিত হয়ে আছে। তাই বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব শুধু কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ির ব্যবহারে নয় [ প্রকৃতপক্ষে, বাংলা পুস্তকে ইংরেজের মত যতিচিহ্নের পুরাদস্তুর ব্যবহার...স্কুলবুক সোসাইটি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নীতিকথা ২য় ভাগ পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ৬০। ] শব্দগুচ্ছকে নিপুণভাবে সাজানোতেই নয়, কিংবা শুধু সাধুগদ্যের সৃষ্টিতেই নয়, তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল, বাংলা গদ্যভাষায় মানবহৃদয়ের স্পর্শকাতর অনুভূতি সঞ্চারে, কথাবস্তু ও আখ্যানভাগের মধ্যে মানবিক রস সিঞ্চনে এবং গদ্যভাষায় সাধারণ রীতি নির্মাণে।[১৬]

[১৪] অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উনিশ-বিশ" গ্রন্থের রামমোহন সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
[১৫] তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ।
[১৬] পরিশিষ্টে উদ্ধৃত বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় বক্তব্য সপ্রমাণের উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া আছে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে কোন নতুন বিধি সংশোধন প্রয়াস করেন নি। তবে শুদ্ধমাত্র দেশাচারকেই ধর্ম বলে মেনে না নিয়ে মানবিকতার মানদণ্ডেই সমাজনীতির সংশোধন চেয়েছিলেন।

তেমনি ভাষার দিক থেকেও তিনি তাকে আমূল পরিবর্তনের প্রয়াসী না হয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছেন এবং প্রচুর পরিমাণে মানবিকতাবোধ সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তুলেছেন। 'এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের রচনা রামমোহনের রচনা অপেক্ষা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধতর।'[১৭]

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যই শেষ কথা। তিনি লিখেছেন—'বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ-যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।[১৮]

উইলিয়াম কেরী বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যে সেই স্বপ্ন সার্থকতা লাভ করেছে কিন্তু বাঙালীয়ানাটুকু রক্ষিত হয়েছে। এখানেই বিদ্যাসাগরের গদ্য শিল্প হয়ে উঠেছে। এই শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে গদ্য লেখকদের রচনায় যখনই দ্বিধান্বিত মনোভাবের ছাপ সুস্পষ্ট হয়, তখনই বিদ্যাসাগরের রচনা শিল্পসৌকর্যে অতুলনীয় মনে হয়। বাংলা গদ্যে এই কৃতিত্বের জন্যই বিদ্যাসাগর সার্থক গদ্যশিল্পী।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক কৃতিত্বকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা চলে। (ক) প্রথম সাহিত্যগুণসমন্বিত রচনা নির্মাণ, (খ) শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি সার্থক অনুবাদ-সাহিত্যসৃষ্টি, (গ) বাংলায় প্রথম ভাষাশিক্ষার উপযুক্ত সবচেয়ে ভালো গ্রন্থমালা রচনা ; বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থের যুগাতিক্রম্য জনপ্রিয়তাই এর প্রমাণ, (ঘ) ১৮৫১ খৃঃ প্রকাশিত প্রথম বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, (ঙ) বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পুস্তকের আখ্যানভাগে ভবিষ্যৎ গল্পরচনার বীজ লুকিয়ে আছে এবং পরবর্তীকালে ভাষার ছন্দ আবিষ্কারে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বাক্যের প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন। এ ছাড়াও মৌলিক রসসাহিত্যসৃষ্টির জন্য ভাষার ভূমি প্রস্তুতের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের। স্বাধীন কল্পনা অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা এবং অনুবাদক বলে উল্লেখ করে তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করলেও তাঁরই প্রথম দিককার রচনায় বিদ্যাসাগরের গদ্যভঙ্গির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পদবিন্যাসরীতি, বিরামচিহ্নের সুষম ব্যবহার, গদ্যের নিজস্ব চাল বা ছন্দ, স্পন্দন, সুনির্বাচিত শব্দগুচ্ছের শোভন সংস্থাপন

[১৭] ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনন ও সাহিত্য—প্রণবরঞ্জন ঘোষ, পৃ. ১৫৩

[১৮] বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১০-১১।

প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গিকেই আশ্রয় করেছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে সাধুগদ্যের কোন আদর্শ ছিল না, কাহিনীবিন্যাসের সুষম রীতি ছিল না, আখ্যানের পরিবেশ সৃষ্টির রচনাচাতুর্য জানা ছিল না, বিদ্যাসাগরই প্রথম এই আদর্শ, রীতি ও রচনাচাতুর্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের বড়ো কৃতিত্ব তাই সাধারণ রীতি প্রতিষ্ঠায়। এই রীতির ওপর ভিত্তি করেই বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিকপ্রবণতাচিহ্নিত individual style বা ব্যক্তিগত রীতি সৃষ্টি করে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগর মূলত অনুবাদক হলেও কাহিনীগত বর্ণনাভঙ্গি অনুবর্তীকালের রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র সেই কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রির বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলার" কুহেলী-আচ্ছন্ন পরিবেশ সৃজনে এবং শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের নিশি অভিযান রচনায় অলক্ষ্য প্রভাব ফেলেছে। "শকুন্তলা"র প্রকৃতি-তন্ময়তা বঙ্কিমের বিজন বনপ্রকৃতি বর্ণনায়, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনায় এবং তারও পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর বিস্ময়বিমুগ্ধ নিসর্গ-চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। সীতার বনবাস-এর সীতা চরিত্রের কারুণ্য, সতীত্ব-চেতনা এমনকি ভাবাদর্শ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের অনেক নারীচরিত্রেই সংক্রামিত হয়েছে।[১১]

বিদ্যাসাগর-উত্তরকালের গদ্যসাহিত্য অনুধাবন করলে এ সত্য অজ্ঞাত থাকে না যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রচনায় অলক্ষ্যভাবে বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনচরিত শুধু ছায়া ফেলেনি, রবীন্দ্র-উত্তরকালের বিভিন্ন রচনাতেও বিদ্যাসাগরের চকিত স্পর্শ কিংবা ধ্বনি-স্পন্দন অনুভূত হয়। গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের শেষ পরিচয় এখানেই।

বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট করে তোলার জন্য এবং সেই বিবর্তনে গদ্যশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব নির্ণয়ে পূর্ববর্তী ও সমকালীন গদ্যলেখকদের শ্রেষ্ঠরচনা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য: (১) সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত, দেখ দিকি, তাঁহারা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ববিবরণ আমরা সমস্তই জানি, মাতাপিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না। যতক্ষণে বড় ভট্টাচার্য কিছু দিতেন, তবেই সেদিন নির্বাহ হইত, নতুবা হরিমটুক।—কথোপকথন, উইলিয়ম কেরী। ১৮০১। [গ্রন্থটির উদ্দেশ্য "Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengali language."] (২) কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন। কাহাকে বলেতে, কাহাকে প্রীতিতে, এইরূপ প্রায় কুমারিকা-খণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিলেন।'—রাজাবলী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮০৮। [শব্দব্যবহার স্বচ্ছ, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গল্পরসসমৃদ্ধ—যদিও গ্রন্থটি মূলত অনুবাদ এবং বিদেশীদের ভাষাশিক্ষার জন্য রচিত।] (৩) গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল কৃষ্ণাশ্রমের কারণ হয় তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে। পথ্যপ্রদান, রামমোহন রায়। ১৮২৩। [শব্দব্যবহারের কৌশলে ভাষা গতিময় এবং তর্ক-বিতর্কের উপযোগী, মূলত লক্ষমুখী

[১১] এই সাদৃশ্যগুলি যে পরবর্তীদের রচনায় দেখা যায়, তা কিন্তু তাঁরা সচেতনভাবে গ্রহণ করেননি। বস্তুত নিতান্ত অজ্ঞাতেই এই সাদৃশ্য তাদের রচনায় এসে গেছে। এখানেই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব—সে কৃতিত্ব তাঁর সাধারণ রীতি (common style) সৃষ্টিতে।

তীক্ষ্ন এবং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি।] (৪) [ক] 'একে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা, তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল।—বিদ্যাসাগর। ১৮৪৭। [গল্পরসের সহজ উৎসার, ঘটনার চমক ও কৌতূহল এবং বর্ণনার ঐশ্বর্য।]

(খ) 'গৌতমী। লতামণ্ডপে। প্রবেশ করিলেন;। এবং শকুন্তলার শরীরে। হস্ত-প্রদান করিয়া। কহিলেন,। বাছা। শুনিলাম,। আজ। তোমার বড় অসুখ হইয়াছিল;। এখন কেমন আছ,। কিছু উপশম হয়েছে?। শকুন্তলা কহিলেন,। হাঁ পিসি!। আজ বড় অসুখ হয়েছিল;। এখন অনেক ভালো আছি।'—শকুন্তলা, বিদ্যাসাগর। ১৮৫৪।

[গদ্যের মধ্যে যে ছন্দ আছে, যতিচিহ্নের সুষম ব্যবহার এবং উপযোগী তৎসম ও চলতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই অংশে অজস্র মানবিক রস উৎসারিত হয়েছে ও স্পর্শ-কাতর হৃদয়ের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।]

[গ] 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশ পথে সততসঞ্চরণমান জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ শীতল, ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।' সীতার বনবাস, বিদ্যাসাগর। ১৮৬০।

[প্রস্রবণ পর্বতের এই পরিচিত বর্ণনাটি মূলত অনুবাদ হলেও এর দৃশ্যসৌন্দর্য এবং সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগে ধ্বনিবিন্যাস আশ্চর্যভাবে সংগীতধর্মী হয়ে উঠেছে।]

(৫) '৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যাগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।...প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল। ক্রমে নৈশগগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভের এমন ঘোরতর দিগন্ত সংস্থিত হইল যে অশ্বচালনা অতি কঠিন হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে লাগিলেন।'—দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৬৫।

['৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে সেই অশ্বারোহী পুরুষের মান্দারণের পথে' একাকী পথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যেও individual style বা ব্যক্তিকরীতির নিঃসঙ্গ যাত্রা শুরু হল। এ গদ্যে ক্রিয়াপদের সুস্পষ্ট ব্যবহার একদিকে যেমন গদ্যের মধ্যে গতি সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের অনুসৃত রীতি থেকে সুস্পষ্টভাবে সরে এসেছে।]

# আমি সুখী, তুমি জানো সুখ কাকে বলে?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভুলে ভুলে ভুলে যাই, কোনোদিন মধ্যদুপুরের রৌদ্র পিঠে বয়ে
তোমার উদ্দেশে, শুধু একঝলক বিমূঢ় চোখের পক্ষপাত পাবো ব'লে
একতাল সবুজ পাতার গায়ে রক্তচক্ষু ফুলের চমক
দিতে পারবো ব'লে ঐ আপার চাইবাসা...চলে যাই

আজ ভুলে ভুলে যাই বিকেলের শুঁড়িপথ হাস্যকরোজ্জ্বল ছেলেবেলা
অন্ধকার ঘর জুড়ে ডাক-ছাড়া গান
ছাঁচতলায় পদশব্দ, সজিনার পাতার ফিসফাস
আর রাঙা পা দুখানি করতলে মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন
বিশ্বাসের, উলুর, শাঁখের
ভালোবাসা থেকে দূরে শ্রেষ্ঠতার মহান পূজার
মন্ত্র যেন তোমার অস্পষ্ট কথা
চোখ চাওয়া, পাংশু হিম ঘুম...এইসব

আজ মৃত, শান্ত, দূর--আয়ত্তের মধ্যে তুমি নও, নওলকিশোরী
তুমি নিঃসঙ্গের সত্য সঙ্গ দিতে
স্বপ্নে মেলে দিতে তুমি গৃহগন্ধ, বাগান, পুকুর
বস্তুত বাস্তুর খোঁজ দিতে তুমি মনীষা মিশিয়ে
কিন্তু আজ মৃত, শান্ত, বহুদূর--বাহ্যের আড়ালে...

আমি সুখী! তুমি জানো সুখ কাকে বলে?
ভুলে ভুলে ভুলে গিয়ে সুখী আমি, স্বতন্ত্র, স্বাধীন--
সুখী আমি। তুমি জানো সুখ কাকে বলে!

# কোথাও না কোথাও

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কোথাও না কোথাও ঠিক আছে
ঘরে ফিরে ঘুমের ভেতরে
ঘরে ফিরে রৌদ্রের ভেতরে
ঘরে ফিরে

বাক্স-তোরঙ্গের ফাঁকে পোষা খরগোশ ছুটে যায়,
ফাউ জ্যোছ্না প'ড়ে থাকে মিনিটখানেক, তারপরে
হঠাৎ দিগন্ত জুড়ে বোমা ফাটে কুকুরের মতো–
কোথাও না কোথাও তবু ঠিক থাকে
কোথাও না কোথাও
ঘরের ভেতরে ঘর,
নেটের মশারি থেকে ঘুমোনোর শব্দ ভেসে আসে।

প্রিয় ময়না টেপ-রেকর্ড ক'রে নেয় মানুষজনের বাঁধা-বুলি :
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে,
কোথাও না কোথাও--এই অদ্ভুত শহরে--
সব ঠিক আছে॥

# যথাযথ

**মানস রায়চৌধুরী**

কাঁচি দিয়ে ছেঁটে নাও ধর্মতত্ত্ব যেমন বাগান আশেপাশে
ঝোপের ভিতর দিয়ে বেলা তিনটের ছায়া শব্দহীন বুকে হেঁটে যায়
তার ছবি অ্যালবামে তুলে-রাখা যেতে পারে জানি
কে আর এসব রাখে। তুমি নাকি? তুমি?
ধর্মীয় মন্ত্রের পাখা পুরোনো ল্যাটিন আর ঐতিহ্যলালিত দেবভাষা
ঘরের ভিতরে আনে অনন্তের ধুলো।
যেন বাজনা শোনা যায় ইন্দ্রবীণা অথবা হার্পের
পাথরে উৎকীর্ণ সব শুদ্ধতার রেখা, বাস্তব ও বিমূর্ত
কোন কথা বলে যায়? কোনো দৃষ্টি পায় না প্রসাদ
মর্তালোকে অবিরাম শূন্যতার গান বেজে চলে
রয়েছে অজস্র বীণা তবু গান শূন্যতা বিথারী
কাঁচি দিয়ে ছেঁটে নাও ধর্মতত্ত্ব, যেমন শরীর তেমনি বানাও কামিজ।

# একটু আড়াল, একটু অহঙ্কার

**অমিতাভ দাশগুপ্ত**

মল-বাজানি-ছেনাল নয়, গে'ইয়া মেয়েমানুষ
যার সোয়ামী-র জমি-জিরেত, এমন কি হাল-বলদ
বাঁধা পড়েছে· ·কিশোরী নয় তরুণী নয়—সেই
নারীর মতন ছায়া পায়ে পায়ে পরের খেতে
চোরের মেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। খানিক দূরে মরদ
জলের ভেতর পাট ভেজানোর অছিলাটুক নিয়ে
নীল পাহাড়ের আদলে স্থির। শির্‌সিরেনি-ওঠা
নাকের পাটায় ফুলছাবিটি কম্প, সাতবিয়োনী
চুরি করতে নেমেছে আজ কয়েক গণ্ডা শশা।

রোদ মুছে দাও। ছায়ার 'পর ছায়ার পুঞ্জ জ'মে
কূল ছাপিয়ে আকাশ ভাঙুক—কেউ তাকে না দ্যাখে,
সব কেড়ো না, একটু আড়াল, একটু অহংকার
রাখতে দিও ঐ রমণীর। চোরের মেয়ে হয়েও
পরের খেতে দাঁড়িয়ে যে কিছুতে ভুলছেনা
সব্জি-বাগান, জমি-জিরেত বা পালা-পার্বনে
সারা গাঁয়ের লোক-খাওয়ানো ঝমঝমে সংসার।

# আধুনিকতার শেপ

তুষার রায়

এ রকমই হবে ভবিষ্যতে নাটক যখন
পাত্র-পাত্রী চুপচাপ যাবে আসবে, কাছে কিংবা দূরে
ভারসাম্যবিচলিত হাত পা এবং মাথা নাড়বে,
করাত ঘষার মতো কর্কশ শব্দ কিংবা সুরে
আবহসঙ্গীত কিংবা নৈঃশব্দ্যকে পাংচার করে যেন
স্পষ্ট কথার মতো কষ্ট দেবে কানে,

এ রকমই হবে নাটক, যখন পাঠককে অস্ত্রোপচারে
উপযোগী করে নেওয়া হবে নাটকের, যাতে কিনা
শিকারের দৃশ্যে বাঘ মারতে পারবে সেও, যাতে পারে
দুঃখের সিনে হাসতে, বিচারের সময়ে কাশতে
এবং অভিকর্ষহীনতায় যাতে কিনা ভাসতে পারে
এবং অক্সিজেন ছাড়াও নিতে পারে নিঃশ্বাস,

আমার বিশ্বাস, এ রকম ও রকম বা সে রকম
যে রকমই হোক না কেন কবিতা অথবা নাটক
যাতে কবি, নাট্যকার কিংবা পাঠক, এই তিনেই
আসল ব্যাপারগুলো শুনে জেনে অথবা চিনেই
আত্মহত্যার দৃশ্যে আত্মহত্যা, খুনের দৃশ্যে খুন
করতে পারবেন ধর্ষণের দৃশ্যে প্রকৃত রেপ্‌
তা হলেই দেখবেন চমৎকার প্যাটার্ন বা শেপ
একটা এসে যাচ্ছে আধুনিকতায়।

# মৌসুমীর শোক

**গৌরাঙ্গ ভৌমিক**

বেশ তো সুখেই ছিলে তুমি, বৃক্ষের আড়ালে রান্নাঘর
এবং উঠোনে গাছ— গোলাপ, রজনীগন্ধা তোমার বাগানে।
বৃষ্টি পড়লে, মনে হতো, ভরে উঠছো কানায় কানায়।
পড়ন্ত বেলার রোদে
সোনা-হওয়া, দক্ষিণের গানে
হৃদয়ে মৌসুমী ছিল, জল-হাওয়া, পাতার আড়ালে-ডাকা পাখি।

এভাবেই দিন যেতো, হয়তো-বা, আরো কিছুকাল—
ছায়া ও ফুলের গন্ধে লিখে রাখতে বাড়ির ঠিকানা।
হঠাৎ ভাদ্রের শেষে মৌসুমী যে শোক দেবে
স্বপ্নে তার হদিস ছিলো না।
বনস্পতি ভেঙে পড়ে, রান্নাঘর, মরা কাক, ভিটের ওপরে।

তুমি শুধু ভেবে যাচ্ছ, এ কোন্ ঋতুর কীর্তি?
কেন এই হৃদয়ে চুরমার?
তোমাকে কুড়িয়ে নিচ্ছে, কারা এসে? সমুদ্রে-পর্বতে কানাকানি :
(কেবল স্বপ্নের শান্তি চেয়েছিলে বুঝি এক জাদুকরী রাতে!)
যে-গাছের ফুলে তুমি ভরেছিলে পুরনো ফুলদানি,
তার মূলে ছিলো না কি গাঢ় অন্ধকার?
কেন খুঁটি বাঁধে নি যে কঠিন বিদ্যুতে?

ভাঙা ডাল, বনস্পতি, ভাঙা বাসা, চৌচির সংসার।
নিহত পাখির হাড়ে
পা রেখে কি ভেবে যাচ্ছ কোথায় আশ্রয়?
বুকের মধ্যেই বসে ভিখিরীটা কেঁদে যাচ্ছে শোকের সংবাদে :
কেন যে ফুটপাথে লোক শুয়ে থাকে,
কেন রৌদ্র করেনি সঞ্চয়?

নতুন চাষীরা যায়, ঝড় শেষে, সূর্যমুখী ফুলের আবাদে।

# অন্ধকারে

**রত্নেশ্বর হাজরা**

এখন তুমি মধ্যরাত্রির নিষাদের কাছে পা ছড়িয়ে বসে আছ     তোমার
জানু থেকে গোড়ালি অবধি নগ্নতায় পড়ছে শিশির
কাঁধের উপর শিস দিচ্ছে উত্তরের হাওয়া     দক্ষিণে এখন
তীব্র মাঘ          ছড়ানো স্তব্ধতা—

তুমি তোমার বুকের উপর ছায়া ধরেছ কালপুরুষের
মুখের উপর নুয়ে পড়েছে ছায়াপথ
একের পিছনে আরেক পৃথিবী ছুটে যায় প্রচণ্ড বেগে
যেখানে মহাবিশ্বে কারুর কোনো ফেরাফিরি নেই     কোনো
ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে যাওয়া বা লাফিয়ে ওঠা—

তুমি আজও ভীষণ সমারোহে পা ছড়িয়ে বসে আছ     তোমার
মধ্যরাত্রির নিষাদ চাঁদমারী করছে নগ্ন উরুতে
যন্ত্রণা আছে বা নেই অতীত ছিল বা আছে
কিন্তু অস্তিত্ব এখনো
কিছু থেকে কিছুর দিকে ধাবমান হওয়া ছাড়া কিছুই নয়—

অথচ তুমি সমস্ত বুকের উপর ছায়া ধরছো কালপুরুষের
ছায়া যখন দীর্ঘতম          ছায়া যখন
পথের পাশে শুয়ে থাকে মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে
তুমি তোমার মধ্যরাত্রির নিষাদের কাছে পা ছড়িয়ে বসে রইলে
তোমার জানু থেকে গোড়ালি অবধি নগ্নতায় পড়ছে শিশির।

# নকল রাজার দুর্গ

## সত্যেন্দ্র আচার্য

যেন একটু আগেও এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে ছিল সে। এবং সবেমাত্র গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে একটা আত্মগৌরব মুঠোয় ভরে ফিরে এসেছে—এমনভাবে চোখ করে বিহ্বল তাকিয়ে থাকে সুমন। এমন সুখ, আত্মবিহ্বলতা অনুভব করে যখন, তখনি শীলাবতী সামনে এসে চোখের ওপর ছায়া ফেলে। শীলাবতী চুপিচুপি সামনে এসে দাঁড়ালে, দাঁড়িয়ে ঠোঁটের ওপর হাসি রাখলে এবং দুষ্টুমি মাখিয়ে কিছু ঠুনকো অভিযোগ সাজালেই, সুমন যেন বোকা হয়ে যায়। ভীষণ বোকা সে, একথা মনে হলে সে লজ্জা পায় এবং লজ্জা পেলে একটা আশ্চর্য চোখ করে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে।

কী এত দ্যাখো আমার চোখের ভেতর? শীলাবতী তাকায় অপলক। এক-একদিন আবীর রঙের টিপ পরে কপালে শীলাবতী। আঙুল তুলে কপালের টিপ স্পর্শ করলে শীলাবতী, খুব তখন দুষ্টু হয়ে পড়ে সুমন।

এই, না। শীলাবতী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে তখন। না। শীলাবতী আঁচলটা বুকের ওপর তোলে তখন। ভীষণ তুমি এ হয়ে যাচ্ছ দিনদিন। যা। অসভ্য।

অথচ—

অথচ এই শীলাবতী আজ শুয়ে আছে। মাথার ওপর বিস্তৃত আকাশ আজ আর ভাল লাগে না। সকালের নরম রোদ বেড়ালের কপিশ চোখের মতন মনে হয়। বিকেলের শেষ রোদ কখন শেষ কার্নিশের ওপর বিবর্ণ রঙে ক্ষণকাল দাঁড়িয়েছিল তা আর চোখে পড়ে না। তাই সারাটা দিন এই বাড়িটার ভেতর ভীষণ বিপন্ন বলে মনে হয় নিজেকে। সুমন অফিস থেকে ফেরার পথে তাই একটা ঘণ্টা কিনে এসে দিয়েছে। বলেছে, ওঠার দরকার হলেও উঠো না। আবার কি কখন তাল বাধিয়ে বসবে? তার চেয়ে কারোকে না হয় ডেকো। কতবার চিৎকার করবে, বরং ঘণ্টা বাজিও। এমনি করে বাজাবে। পারবে না? সুমন নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, বাজালেই হয় মিঠু, না হয় আর-কেউ ছুটে আসবে। পারবে না?

বিড়ম্বিত চোখে তাকিয়ে ছিল শীলাবতী, ঘাড় নেড়েছিল। পারব। কিন্তু বাজায়নি শীলাবতী। আজ পর্যন্ত কারোকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকেনি।

প্রথম যখন অসুখটা করেছিল তখন সুমন সকাল সকাল ফিরত অফিস থেকে। মিঠুও স্কুল থেকে। সুমন এসে দেখত, মিঠু মায়ের কাছে খাটের ওপর বসে আছে। হয় ছবি আঁকছে তখন, কিংবা শীলাবতী গান শোনাচ্ছে। কখনো দেখেছে শীলাবতী গল্প শোনাচ্ছে, রূপ-কথার, মিঠু অবাক দৃষ্টিতে মায়ের চোখের ভেতর তাকিয়ে আছে।—সেই মিঠুও আজ আসে না। ফিরে ছাদে ওঠে। নামে সন্ধ্যা হয়ে গেলে।

সুমনও সন্ধ্যা হয়ে গেলে ফেরে এখন। সারাদিন পড়ে পড়ে কাঁদত শীলাবতী। বলেছে, আগে কত তাড়াতাড়ি ফিরতে, কী যে দেরি কর এখন?

কি করব বল। সুমন গলায় গাঢ়তা আনে। চেষ্টা যে করি না, এমন তো নয়? হাজার হোক অফিস তো। সুমন বুশসার্টের বোতাম খুলে খুব যত্ন করে হ্যাঙারে টাঙায়। পেছন

ফিরে হাত বাড়িয়ে ঝোলাতে ঝোলাতে বলে, ফিরব-ফিরব করলেই তো আর ফেরা যায় না, বোঝই তো?

চোখ বুজোয় শীলাবতী। একটু ঘুরে মুখোমুখি তাকাবার চেষ্টা করে। তুমি যখন থাক না, তখন কি যে কষ্ট হয়, খালি তোমার কথা মনে পড়ে।

একটা সিগারেট টেনে তোলে প্যাকেট থেকে সুমন। একমুখ ধোঁয়া ঘরের ভেতর ছড়িয়ে দেয়। গুনগুনিয়ে বলে, ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয় এখন।

আর একটু পাশ ফেরার চেষ্টা করে শীলাবতী। সুমনের চোখে তাকাবার চেষ্টা করে। আর ফিরেই বা করবে কি, ফিরলেই তো যন্ত্রণা। শীলাবতী বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। আমি বুঝি।

কপাল দ্যাখে সুমন। ঘাড়। সুমন ঘাড়ে হাত দিয়ে পাশ ফিরতে সাহায্য করে। শাড়ির একটা খসখস শব্দ ওপাশ থেকে এপাশে পিছলে পড়লে সুমন তাকায় বাইরে। জানলার সামনে সিমগাছটা তাকালেই চোখে পড়ে। ওই পত্রালির আঁকিবুকি, অজস্র হিজিবিজির মত পাতাগুলো একটু হাওয়ায় সরে সরে গেলে চাঁদটা শেষরাতের দিকে স্পষ্ট চোখে পড়ে একসময়। সুমন জানলা থেকে চোখ তুলে শীলাবতীর চোখের ওপর রাখল। হাত ধরল। ঠিক ইচ্ছা আর আসে না সুমনের, তবু ধরল। একটু ঝুঁকে পড়ল সুমন। আঁচল সরাল।

নিশ্চল পড়ে থাকে শীলাবতী। আঙুলের স্পর্শে তার বুকের স্পন্দন যেন দ্রুততর হয়। কেমন একটা সুখ শিরা থেকে শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। রক্তের ভেতর আছড়ে পড়ে। ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, আর না, আঁচলটা এবার টেনে দাও। একটু নড়বার চেষ্টা করে বলল, ওতে তোমার দুঃখ বাড়ে বই কমে না। তোমার এই স্পর্শ আমার রক্তের ভেতর তোমার দুঃখের কাহিনী বলে।

হাত তুলে নেয় সুমন। চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে চোখে চোখে তাকায়। ম্লান হাসল শীলাবতী। বহুদিন পরে কিন্তু তুমি এমনি করে আদর করলে। ধরলে। অহেতুক একটু কাশল শীলাবতী। দেখতে দেখতে মিঠু কত বড় হয়ে গেল, না?

হুঁ। ঘাড় নাড়ল সুমন। হাসি হাসি মুখ করে ওই শব্দটুকু শুধু উচ্চারণ করল সুমন।

কোমর থেকে পঙ্গু অংশটা আর একটু টানবার চেষ্টা করল শীলাবতী। আঃ! ওই অস্ফুট শব্দ করে বলল, না, মিঠুর কোলে আর কেউ কোনদিন আসবে না। তেমনি ম্লান অথচ অর্থপূর্ণ হাসল শীলাবতী। সুমনের চোখে না তাকিয়েই বলল, বরং ভালই, আমি মরে গেলে দশটার জন্যে ভুগতে হবে না তোমাকে। আচ্ছা—সুমনকে ছুঁল শীলাবতী।

কি? যে আঙুল কটা দিয়ে সুমনকে স্পর্শ করেছিল শীলাবতী, সেই আঙুলটা নিজের মুঠোয় বন্দী করে সুমন বলল, কি?

আমি যখন থাকব না, তুমি আবার বিয়ে করবে?

জানি না।

সুমন হাত ছেড়ে দিল না দেখে শীলাবতী বলল, তোমার কষ্ট আমি বুঝি। নামেই একটা বউ আছে ঘরে, কিন্তু সাধআহ্লাদ তো আর তোমার ফুরিয়ে যায়নি। বুড়ো হয়ে তো যাওনি।

ধ্যেত। হলেই বা কি। সুমন আরো খানিক নিচু হল। তুমি আমার দিনরাত্রিকে

ঘিরে আছ, সেই ভাল। ওটাই সব নয়।

সব। আঙুলে চাপ দিল শীলাবতী।

না। সব নয়।

মিথ্যুক। শীলাবতী হাসল না। বলল, কিন্তু কি করব বলো, মৃত্যু তো আমার হাত-ধরা নয়। এতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস অন্ধকারে ভেঙে চুরমার করে ঘরের ভেতর ভাসিয়ে দিল শীলাবতী।

সুমন এবার হেঁট হয়ে গলার নিচেটায় মুখ রাখল। ঘষল। তাতে কি। ঘরে ফিরে এই যে তোমাকে ছুঁই, এই যে ছুঁয়ে আছি, মিঠু, তুমি, আমি, তোমার আমার দুঃখ, এই তো আমার সব। গলা থেকে মুখ তুলে কানে কানে বলল, সহবাসটাই সব?

আকাশ বেশ পরিষ্কার এখন। সিমের ডালের ওপর পাতার হিজিবিজিতে সদ্যফোটা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। শীলাবতী একটু হেঁট হবার চেষ্টা করে অগোছাল কাপড়টাকে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বলল, জানো, আজ বিকেলে খুব হলুদ রং ছিল আকাশে।

সুমন সে জ্যোৎস্নায় শীলাবতীর আদল, বুক লক্ষ্য করল। দেখল, একটা নিষ্ঠুর অথচ কাতর বেদনার ছায়া তার সারা মুখে, কপালে আর ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে আছে। নিটোল, নিভাঁজ শরীর। আরো খুলে না দিয়ে কাপড়টা কোমরের ওপর থেকে তুলে গলার নিচে পর্যন্ত ঢাকা দিল। বুক ঢেকে দিল।

ঘরের ভেতর দুটো জানলাই খোলা ছিল। উঠে গিয়ে সুমন বন্ধ করে দিল। আলো জ্বালল। ঘরের ভেতর আলোটা বন্দী হয়ে আরো স্পষ্টতর হল, হয়ে শীলাবতীর মুখের ওপর আরো উজ্জ্বল হয়ে ভাসল।

ছড়ানো দেহটাকে বিছানার ওপর এখন একটা লম্বমান রেখায় সোজা করবার চেষ্টা করল, করে বলল, যাও খেয়ে নাও তো। রাত হয়েছে।

যাই। সুমন আর নতুন করে সিগারেট ধরাল না। বাইরে এল। এসে দক্ষিণের ঝুল বারান্দায় দাঁড়াল। আকাশ এখন আগের চেয়ে ঢের পরিষ্কার। অনেকক্ষণ দাঁড়াল সুমন। তারপর খাওয়া শেষ করে নিচে এল। মিঠু ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার ফিরে এল বারান্দায়। এসে পরপর দুটো সিগারেট পোড়াল। পুড়িয়ে যখন শুতে এল, দেখল শীলাবতী তখন জেগে নেই।

প্রথমে ডেকেছিল শীলাবতী। এই, কাঁদছো কেন, শুনছো, এই, কিন্তু তবু ঘুম ভাঙেনি সুমনের। হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু অত নিকট ব্যবধান সত্ত্বেও হাত গিয়ে পৌঁছয়নি সুমনের খাটের ওপর। ওঠবার চেষ্টা করেছিল, একটু কাত হয়ে, ঝুঁকে, কিন্তু না, পা টানতে পারেনি। তখন ওই ঘণ্টা। সুমন ধড়মড় করে উঠে বসে আলো জেলেছিল। কি হল?

কাঁদছো কেন? শীলাবতী বুক পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল মশারি তুলে। কত ডাকছি, তবু মশাইএর ঘুম ভাঙে না।

ওঃ! লজ্জা পাওয়ার সুর আনল গলায় সুমন। ভাল তো ঘুম হয় না, তাই মাঝে মাঝে এমনি স্বপ্নটপ্ন দেখি। তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।

মশারির ভেতর মাথাটা ডুবিয়ে নিল শীলাবতী। কিন্তু শুল না। সুমন ঘড়ি দেখল, দেখে আলো নিবিয়ে দিতে দিতে বলল, ভোর হয়ে এল বলে। চারটে।

শীলাবতী এবার বালিশে মাথা রাখল। রেখে বলল, শেষ রাতের স্বপ্ন ফলে যায় গো

মশাই। শীলাবতী অন্তরঙ্গ গলায় ডাকল, এই, কী স্বপ্ন দেখছিলে, লটারির প্রাইজ পেলে, না আমি মরে গেছি। কি?

ধ্যেত।

মিথ্যুক। বলছ না।

অন্ধকারেই একটা সিগারেট জ্বালল সুমন।

কিন্তু তুমি অত সিগারেট আগে খেতে না। গলার স্বরে অভিযোগের সুর মেশাল শীলাবতী। আজকাল রাত্তিরেও জেগে জেগে সিগারেট খাও।

ঘুম আসে না যে। গলার ভেতর থেকে ধোঁয়া অন্ধকারেই ভাসিয়ে দিল সুমন। এটা একটা অবলম্বন।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস টানল শীলাবতী। জানি।

তুমি ঘুমোও। সুমন খোলা জানলায় এবার তাকাল। নক্ষত্রালোকে আকাশ পরিব্যাপ্ত। নিমের মলিন ডাল, শ্যামল পত্রালী জ্যোৎস্নার জলে ভিজে গেছে। বাড়ির সারি ছুঁয়ে এ গলিটা ট্রাম লাইনে গিয়ে শেষ। সব বাড়ি, গাছ, কুমিরপিঠ অমসৃণ রাস্তা সব, সব জ্যোৎস্নায় ভিজে গেছে। যখন বুঝল শীলাবতী জেগে নেই, তখন আবার স্বপ্নের কথা ভাবল সুমন :

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে হয়ে অবশেষে এসে পড়ল এক শোভন নগরীর দ্বারপ্রান্তে। লক্ষ হস্তীর মত অন্ধকার সেখানে নেই। পত্রপুষ্পে, শ্যামল শোভায় বড় শোভিত নগরী। পরিচ্ছন্ন। শোভিত রাজপথ। পথের দুপাশে গগনস্পর্শী অট্টালিকা। উটের গ্রীবার মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। নির্মল হাওয়ায় পুষ্পের সুমিত সৌরভ ঝরে ঝরে দিগন্ত যেন ভরিয়ে দিয়েছে। সেই সৌরভের ভেতর লক্ষ্য করল জোড়া জোড়া তরুণ তরুণী। বিহ্বল চোখে সে দাঁড়াল। কিন্তু ভীষণ দুঃখ পেল সে একলা বলে। উচ্ছল শত শত যুবক-যুবতী তার ছায়া পদদলিত করে চলে যাচ্ছে। কী গর্বিত পদক্ষেপ। লাস্যময় অঙ্গভঙ্গি। লাস্যময় নারীপুরুষের মিছিল, মিছিল। সব মুখ সুখের কারুকাজে চিত্রিত। সে এখন স্তম্ভিত হল। দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জীবনের অর্থ খুঁজল। ভালবাসার। আবার হাঁটল। শ্যামল মাঠ, সবুজ তৃণভূমি পার হল। নদীতীর ছুঁয়ে আছে বিস্তৃত মাঠ যা দিগন্তে হারিয়ে গিয়ে শেষ। সে মাঠে দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনল। গাছগাছালির ঝোপের ভেতর বিচিত্র পাখিদের কলরব। সে সূর্যাস্ত দেখল নদীতীরে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই অনুপম নক্ষত্রালোকে আকাশ ভরে গেল। শ্যামল মাঠ, সবুজ তৃণভূমি আরো সুন্দর হয়ে সাজল। আর একটু হেঁটেই দেখল, নদী যেখানে দ্বীপ রচনা করে উদ্দাম, উধাও হয়ে গেছে অফুরন্ত আবেগে, সেই দ্বীপের ওপর লাশ-কাটা ঘর। সে ভয় পেল। কিন্তু তাকালেই সামনে পেল আঙুরের ক্ষেত। একটা মেয়ে প্রচণ্ড আবেগে দুঃখের গান গাইতে গাইতে আঙুর তুলছে।

সে দাঁড়াল। আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, তুমি যে দুঃখের গান গাইছ? এখানে দুঃখ আছে?

দুঃখ? আছে। কিন্তু সে দুঃখ অন্তরকে সুন্দর করবার জন্যে। যন্ত্রণা পাবার জন্যে নয়।

মৃত্যু?

তাই তো আমি গাইছি, আমার প্রেমিকের মৃতদেহ এই পথে আসবে বলে। এই ক্ষেতে সে আঙুর ফলিয়েছে। আজ দুঃখ, এই ক্ষেত, আঙুর, আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে।

দেখতে দেখতে শব এসে গেল। গুচ্ছগুচ্ছ আঙুর মৃতদেহের চোখে মুখে লাগছে, কিছু পুরুষ্ট ফল ফেটে গিয়ে চিবুক, ভুরু, কপাল ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আর দাঁড়াল না সে। হাঁটল। এল এক তোরণের সামনে। তোরণ পার হলেই দুদিকে দুটো পথ পুব পশ্চিমে চলে গেছে। দ্বাররক্ষী কুর্নিশ করে বলল, বাঁ দিকের পথে আছে ঝর্না, ডানদিক পাহাড়ে গিয়ে শেষ। ঝর্নার তীরে আর পাহাড়ের পাদদেশে দুজন যুবতী প্রতীক্ষারত। গেলে কিন্তু শর্ত আছে একটা।

শর্ত?

হ্যাঁ। তাকে ভালবাসতে হবে। সারাজীবনের সঙ্গী করতে হবে। হ্যাঁ, এটাই বিধি, বিয়ে করতে হবে।

অবাক হল সে। উৎফুল্ল গলায় বলল, বিয়ে?

হ্যাঁ। কিন্তু—দ্বাররক্ষী থামল।

কিন্তু?

একজন অনিন্দ্যসুন্দরী, অসামান্য রূপবতী, অপরজন বন্ধ্যা, কুৎসিত এবং বধির। দ্বাররক্ষী আবার কুর্নিশ করল, বলল, বলুন কোনদিকে যাবেন?

সে ঝর্নার পথ ধরল। ধরে রমণীয় ঝর্নার ধারে এসে দাঁড়াল। কলকল রবে উচ্ছল জলধারা বয়ে চলেছে। ভীষণভাবে রমণীসান্নিধ্য চাইল। ভালবাসতে চাইল। কিন্তু আঁতকে উঠল সে। চোখে হাত চাপা দিল। এই বন্ধ্যা, বধির, কুৎসিত এক জরাগ্রস্ত রমণীকে এ রাজ্যের বিধি অনুসারে বিয়ে করতে হবে বলে। সে এখন পথ খুঁজল। পালাতে চাইল। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। সে ঝর্নার জলে ঝাঁপ দিতে চাইল। অট্ট হেসে মেয়েটি তাকে বুকে জড়িয়ে নিল। সে নিষ্কৃতি চাইল। চিৎকার করল। চিৎকার করে কাঁদল।

এই কাঁদছো কেন, প্রথমে ডেকেছিল শীলাবতী, শুনছো, এই—কিন্তু তবু ঘুম ভাঙেনি সুমনের। হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু অত নিকট ব্যবধান সত্ত্বেও হাত গিয়ে পৌঁছয়নি সুমনের খাটের ওপর। ওঠবার চেষ্টা করেছিল, একটু কাত হয়ে, ঝুঁকে, কিন্তু না, পা টানতে পারেনি। তখন ওই ঘণ্টা। সুমন ধড়মড় করে উঠে বসে আলো জেবলেছিল। কী হল?

কাঁদছো কেন?

এই বিচিত্র স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে সুমন দেখল, পুবদিক কখন ফর্সা হয়ে গেছে চোখের ওপর। নিমের গা বেয়ে শিশির ঝরছে। ডাল থেকে একজোড়া পাখি উড়বে বলে ঘুরঘুর করছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। পাশের খাটে তাকাল সুমন। শীলাবতী এখনো জাগেনি। কিন্তু মিঠু কি উঠেছে? নিচে বামুনদির গলা শুনল সুমন, মিঠুকে ডাকছে। সুমনের মনে পড়ল, গতকাল বামুনদি শীলাকে বলেছে, মিঠু এখনি লুকিয়ে লুকিয়ে নিরোধের বিজ্ঞাপন পড়ে। একটু ম্লানহেসে কপালের শিরা কুঁচকে ঘণ্টা বাজিয়ে মিঠুকে ডেকেছিল শীলাবতী। মিঠু আসেনি।

আশ্চর্য! সুমন নিজের মনেই কেমন একটা অস্ফুট ধিক্কারজনক শব্দ উচ্চারণ করল। করে দেখল, শীলাবতী বেডপ্যান টেনে নিচ্ছে।

সুমন ঘড়ি দেখল, দেখে বুঝল, না, আজও লেট। ঝিরঝিরে বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। কী যে বৃষ্টি! সুমন বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে ঘামের বিন্দু মুছে নিল। না, আর থাকা যায় না শহরে। কত চিৎকার, কোলাহল, মিছিল, শ্লোগান, কিন্তু কী হচ্ছে, এগোচ্ছে

কিছু? শালা, আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবে না একটা গাড়ি? দশটা-পাঁচটার এই জোয়ারে গা ভাসালে কেমন মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে যায় ইদানীং সুমনের। আটপার্টি, ছ'পার্টি, নব, আদি কত কি! দেশের জন্যে ভালবাসার অন্ত নেই, সুমন ভাবল, আরে, অত করে সকলে মিলে দেশকে ভালবাসলে, ভালবাসার বন্যায় গোটা দেশটাই যে শেষে ভেসে যাবে। লেডিস সীটের দিকে জমাট ভিড়। রসিকতা। লক্ষ্য করল সুমন একজন লম্বা জুল্পিঅলা যুবক, যেমন দেওয়ালে বিজ্ঞাপন সাঁটা থাকে তেমনি সালোয়ার-কামিজপরা স্তনাবনত এক কিশোরীর সিক্তস্বরূপ দেওয়ালে নিজেকে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক রসিকতা করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমার তো ভাই বোমাতঙ্কে ঘুম হয় না। শালোয়ার কামিজের চেহারা দেখলে যা ভয় হয়, যেন দুটো বোমা নিয়ে আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। হি হি করে নিজে যত না হাসল, যাত্রীরা হাসল বেশি। লোকটা ভাড়া না দিয়ে নধর শরীর দুলিয়ে বেমালুম নেমে গেল ট্রাম থেকে।

দু স্টপ পরে সুমন নামল। নেমে একেবারে অবাক করে দিল ইন্দ্রাকে। ইন্দ্রা হাসল। চোখ মুখ খুশিতে ভরিয়ে তুলে বলল, আমি কিন্তু ভেবেছি কে-না-কে। তুমি যে ভাবতেই পারিনি।

নেমে সুমন একটা সিগারেট ধরাল। খানিক ধোঁয়া গলার ভেতর চালান করে দিয়ে খানিক হাওয়ায় ভাসাল। তা তো ভাববেই। গলায় রসিকতার সুর আনল সুমন।

ভারি দুষ্টু তুমি। ইন্দ্রা শব্দ না করে হাসল। এমন করে হাত ধরে টানলে, ট্রামশুদ্ধ লোক কী ভাবল বলো তো?

তা তো বলতে পারব না। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম বলো তো? বছর তিন, না?

তা—বেশ বড় করে উচ্চারণ করল ইন্দ্রা।

সুমন মাথা নাড়ল। তাই। একটু হেসে বলল, অফিস যাচ্ছ? ইন্দ্রা ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল। যখন এ পাড়ায়, ভাবতেই পার।

সুমন তাকাল। বড় সুন্দর যেন আজো সেই চোখ দুটো। সুমন লোলুপ চোখে ওর লাবণ্য দেখল।

কী অত দেখছ? ইন্দ্রা হাঁটার গতি আরো মন্থর করল। সেই আগের ইন্দ্রা কিনা?

তবু চোখ ফেরাল না সুমন। আশ্চর্য দুটো চোখ ইন্দ্রার। সুমন ভুরু দেখল। গলার নিচেটা। তারপর চোখে চোখ রাখল। সেই অগোছাল শরীরটা আরো কত গোছাল এখন। পরিপাটি এখন।

যাচ্ছি। ইন্দ্রা আবার হাসল। ভীষণ লেট হয়ে গেছি আজ। হয়ত লালদাগ এতক্ষণে পড়ে গেছে খাতায়। আবার হাসল ইন্দ্রা। সুমন লক্ষ্য করল সে হাসিতে যেন একরাশ সুর ঝরে পড়ল।

সুমনও অফিসে একে ঢুকল। লিফ্‌ট নিল না। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। সুমন এসে চেয়ারে বসল না। সোজা গিয়ে বন্ধ জানলাটা খুলে দিল। কিন্তু ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে। চারিদিক ঝাপসা। অন্ধকারের মতন। আবার জানলাটা বন্ধ করল সুমন। দীর্ঘদিন এ বাড়িতে চাকরি করছে সুমন কিন্তু জানলা খুলতেই যে গাছটা, ফুলে-ফুলে-ভর্তি যে গাছটা আজ তার চোখে পড়ল তা এর আগে কোনদিন লক্ষ্য করেছে বলে সুমনের মনে পড়ল না এখন। মিনিটখানেক কি যেন ভাবল। রাত্তিরের অবসাদ, ক্লান্তি এখন যেন আর তার শরীরকে স্পর্শ করে নেই। ঝুঁকে

পড়ে ড্রয়ার খুলে লটারির টিকিটটা টেনে তার ওপর গাছটার নাম লিখল। অজস্র আবেগ যেন তার মধ্যে এখন উঁকি দিচ্ছে। জানালা দিয়ে কতদিন মিছিল দেখেছে, কর্মব্যস্ত চলমান মানুষগুলোকে। কিন্তু বসন্তের সমারোহ দেখেনি কোনদিন এই গাছটায়।

টিকিটের ওপর গাছটার নাম লিখে সুমন নিজের মনে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, যে বলতে পারবে, আমি কি লিখেছি টিকিটের ওপর, সে কিন্তু এই টিকিটটা বিনা পয়সায় পেয়ে যাবে।

বেশ মজা পেল সকলে। জানলার দিকে তাকাল। কিন্তু জানালা বন্ধ। অসময়ে বাইরে এই বৃষ্টি বলে। সুমন বলল, বলুন রমেনবাবু, জানলা খুললেই কী প্রথম চোখে পড়ে। যা আমি টিকিটের ওপর লিখেছি।

ট্রাম লাইন।

আপনি সুশীলবাবু?

ঠিক লক্ষ্য করিনি।

আপনি কমলবাবু?

রাজভবন।

না। গাঙ্গুলী আপনি?

নিরোধের বিজ্ঞাপন।

একটু যেন দম নিল সুমন। বলল, আচ্ছা, মিস মল্লিক?

লালদীঘি।

সুমন যেন এ মুহূর্তে কোন দুঃখহীন পুরুষ। তার পৃথিবীর পরিধি হঠাৎ এখন বিরাট। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, শোভিত জগতের কেউ এখন সে, সেই স্বপ্নেদেখা জগতের মত। যেন সে বিশাল এক পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে এ মুহূর্তে সব দুঃখ সমস্ত ক্লেশ ভুলেছে। নিরতিশয় উল্লাসের গলায় সুমন টিকিটের পেছনের লেখাটা সকলকে দেখিয়ে পকেটে রেখে দিল,—রাধাচূড়া।

# শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

## হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ফুলিঙ্গ সমাদ্দার—এই নামে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একদা যে কবিতা লিখতেন, তা আমি পড়িনি; কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য" পড়েই আমার মনে হয়েছিলো এই কবি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ; তাতে অন্তত এমন কতগুলি কবিতা ছিলো, যা আমার পড়া আধুনিক বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষাতে নূতন বলে মনে হয়েছিলো। নানা ধরনের আঙ্গিককৌশল ছাড়াও চোখে পড়েছিলো সাধারণভাবে অপ্রচলিত একটি মানসিকতা। কয়েকটি কবিতার আন্তরিকতাও আমার ভালো লেগেছিলো। যেমন বইটির প্রথম কবিতাটি, যার শেষ ক-টি লাইন উদ্ধৃত করছি:

> পাবো না কখনো তারে আর, একবার পেয়েছিনু শুধু চাই নিষ্ক্রিয় প্রয়াসে
> চাই পেতে তারে এমনি খেলায়
> গভীর অছন্দে এই প্রেম সব, স্পন্দন পরম, সব; বাল্য, মনে হয় তুমি কেড়ে
> নিলে খেলনা মরে যাবো।
>
> (খেলনা পৃ ১)

এইখানে, বা 'জরাসন্ধ' (হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য/পৃ ৩) কবিতায় এমন-একটা সোজাসুজি এবং সরল বলার ভঙ্গি আছে, যা পাঠক ও কবির মধ্যে ব্যবধান সহজেই অপসারিত করে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে "হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য"র কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা দরকার। কোথায়-কোথায় তিনি নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি—বা সর্বাংশে পারেন নি—সেটাই প্রথমে আলোচনা করা উচিত। নানা বিষয়ে লেখা কবিতা রয়েছে এখানে। কবির স্বরূপ ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক, সৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রক্রিয়া, নিজেকে ছেড়ে যাওয়া ও ফিরে আসা, নারী ও প্রেম, মৃত্যু, সাধারণ অর্থে জীবন—গভীরতর অর্থে অস্তিত্ব, শিল্প ও প্রকৃতি ও পাপ, নরক ও শিল্প—ইত্যাদি চিন্তা-সূত্রের উপরেই বাহাত্তরটি কবিতার বেশির ভাগ লেখা। আর-কিছু ছোটো-ছোটো কবিতা রয়েছে এ-রকম গুরুগম্ভীর কোনো বিশেষ সংজ্ঞার্থ দিয়ে যাদের উপর লেবেল এ'টে দেয়া যায় না, অথচ যে-কবিতাগুলি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ: 'সাময়িকতা', 'পরস্ত্রী', 'অন্তিম কৌতুক', 'অন্তর্পঞ্জী' ইত্যাদি।

প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ, শিল্প ও অস্তিত্বের সম্বন্ধ, অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ—এই বিষয়গুলি নিয়ে লেখা কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তার দুর্বলতা ধরা পড়ে: এই সব প্রায়-দার্শনিক বিষয় তাঁর কাছে বিশেষ স্পষ্ট বা সত্যি নয় বলেই মনে হয়। অর্থাৎ এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা বলে মনে হয় না। চিন্তার দুর্বলতার প্রশ্ন এইখানে আসছে এই জন্যে যে, যে-ধরনের বোধের গভীরতা বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে মানুষ এই সব তাত্ত্বিক ভাবনায় আক্রান্ত হয়, ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হয়, তার পরিপূর্ণ নিদর্শন আমরা পাই বোদলেয়ার, রিলকে বা ইয়েটস-এর কবিতায়। তাঁদের কবিতায় দেখা যায় যে মানুষ শুধু কবি হিসেবেই বোধের এমন গভীরতায় পেঁছতে পারে যেখানে সাধারণত আনাগোনা করেন ভাববাদী দার্শনিকরা বা মিস্টিকরা। সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের অনুভবের

ক্ষমতা ও মেধা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রতিনিয়ত ব্যয় করি; কখনো-কখনো সেই সম্পর্ক বা সম্পর্কজাত অনুভবের মাধ্যমেই আমরা কিছুটা তীব্রতায় পেঁছিই—কিন্তু ঈশ্বর, অস্তিত্ব, শিল্প, প্রকৃতি এ-সব আমাদের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা, ভাবনা বা আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। যাঁদের তা হয় তাঁদের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিস্তৃত ও শোষণলিপ্সু। আর সেখানেই আসে চিন্তার সরলতার কথা—কেননা এই সব জটিল ও পরিব্যাপ্ত চিন্তা ভাসা-ভাসাভাবে শুধু অনুভব করলেই কবিতায় রূপান্তরিত হয় না—তাদের প্রকাশ করতে গেলে প্রয়োজন হয় সুসংবদ্ধ চিন্তাশীলতা ও দর্শনকে চিত্রকল্পে ও প্রতীকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শক্তি চট্টোপাধ্যায় হয়তো সচেতন, কিন্তু এদের চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা তাঁর নেই। অতএব তিনি যখন এ-সব নিয়ে লেখেন, তখন তাঁর রচনা সে-সব 'বিষয়ে' লেখা হয়ে দাঁড়ায়, আর নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন বোদলেয়ার ও রিলকের ভাবনা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে। যেমন 'পাতাল থেকে ডাকছি' কবিতাটি, যার বাচনিক ও চিন্তার ভঙ্গি বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এই কবিতার 'বিষয়': প্রকৃতি (মানুষের/কবির জীবন) ও শিল্পের সম্বন্ধ। বোদলেয়ারের কাছে এটা ছিলো জটিল ও জরুরি একটি সমস্যা। এই সম্বন্ধে এই উনিশ শতকি ফরাশি কবির বক্তব্য ছিলো যে জীবনের নারকীয়তা থেকে উত্থিত হয়েছে একটি মৃণালে একটি ফুল—পাপ থেকে জন্ম নিয়েছে উদ্ধারের আর্তি, শিল্পের মূর্তি ধরে এসেছে ত্রাণ। প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক কোনো-কিছুকে বোদলেয়ার ঘৃণা করেন—'শিল্প' বা 'শিল্পকৌশল'ই হচ্ছে তাঁর অন্বিষ্ট। প্রকৃতি, তাঁর কাছে, স্থূলতার প্রতীক। বিকৃতি, গ্লানি, ক্লেদ, স্থূল দৈহিক সম্পর্ক—যা তৃপ্তি দেয় না, শুধু অর্থহীনতা ও জ্বালা বাড়ায়—এই সব দিয়ে তৈরি বোদলেয়ারের মানসভূমণ্ডল: অথচ এই পঙ্কে নিমজ্জিত থেকে—বা আছেন বলেই—তিনি স্বপ্ন দ্যাখেন 'প্রিয়তমা সুন্দরীতমা'র যে 'উজ্জ্বল উদ্ধার' এবং শিল্পের মর্মরপ্রাসাদের। 'পাতাল থেকে ডাকছি' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শনও তা-ই। জৈব জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেন—

বামে বা দক্ষিণে আহা প্রেম দুঃস্থ পাংশু রসাতল
উপস্থ ব্যাধির পোকা, কৃমি, পূয (ভুল), রক্তপাত বুকে
আমারে ভালোই বাসে।

—নরক! নরক!—

অথচ তাঁরও দৃষ্টি নিবদ্ধ শিল্পের সৌন্দর্যে: এই নরক এই পাতালই রূপান্তরিত হবে শিল্পে—

'ভীষণ সৌন্দর্য, দ্যাখো পাপ আহা অত্যুজ্জ্বল পাপ
স্ফটিক হে আদিনাগ পলালমণ্ডিত (ভুল) কেশমালা
শ্বেততম উষ্ণ চর, হে স্ফীতি হে মহান প্রলয়
আসন্ন কোরক বিশ্বে এই-ই মাত্র ভাস্কর্য পাতাল।

(হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৯)

এক পোল ভালেরীর 'আদিনাগের' উল্লেখ ছাড়া এখানে বিশেষ কোনো চিত্রকল্প বা মানসিকতা নেই যা বুদ্ধদেব বসু-র বোদলেয়ার-অনুবাদে পাওয়া যায় না।

লেখায় অন্যের চিন্তা, চিত্রকল্প ও সাধারণ অর্থে স্বরগ্রামের (tone) ব্যবহার থেকে অবশ্য এমন-কোনো সিদ্ধান্তে পেঁছনো যায় না যে যিনি সেগুলি ব্যবহার করছেন তাঁর কবিতা কোনো অংশে দুর্বল। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যবহারের মধ্যে কোনো নূতনত্ব বা নিজস্বতা

আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। অনেক সময় অন্যের ভাষায়ও নিজের ভাবনা ভাবা যায়, কিন্তু টুকরো-টুকরো ভাবনাগুলি মিলে যেন নিজস্ব কিছু দাঁড়ায়, সেটাই অভিপ্রেত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাগুলিতে সেই অর্থে নিজস্বতার অভাব রয়েছে; কিন্তু যখনই তিনি বোদলেয়ারের চিন্তাসূত্র ধরে নিজস্ব কোনো বোধে উপনীত হয়েছেন, তখনই সেই পঙক্তি-গুলি কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেমন:

এই স্পর্ধা পুণ্যে নেবে ছেনে
এত বড়ো কারিগর। গেল ভেঙে রহস্যে নবীন
নিয়ে যাবে যেন নিশা প্রলোভে (ভুল) পাখিরে
কুলায়-উষ্ণতা থেকে দেশান্তরে বিরহে বিনাশে
অক্ষয় নিদ্রায়।

(পাতাল থেকে ডাকছি/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৯)

কিংবা

সুদীর্ঘ লোহার গন্ধ নেড়ে দেয় মগজের খড়,
হেমন্ত, যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো—
মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে।

(তুমি যেন ধর্ম/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩৮)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আরো কিছু কবিতা (যেমন: 'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে', 'দেবদূত', 'দেবতার গ্রাস' ইত্যাদি) রাইনের মারিয়া রিলকের 'অর্ফিয়ুসের প্রতি উদ্দিষ্ট সনেটগুচ্ছ'র কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু রিলকের কবিতাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরো অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, মনে হয়। তার একটা কারণ হয়তো চিন্তাসূত্রের (থিম) দিক থেকে বোদলেয়ার শিল্প ও প্রকৃতি বিষয়ে যেভাবে ভেবেছেন তার চাইতে রিলকের ভাবনার ধরনটা সব মানুষের আরো অনেক কাছাকাছি। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে যে-ধরনের বাঁচা ও পাপবোধ থেকে বোদলেয়ারের চিন্তা উৎসারিত হয়েছিলো সেটা হয়তো আমাদের কাছে সুদূর। শিল্প জীবন থেকে উত্থিত—এ-কথা মেনে নিয়েই এদের সম্বন্ধ কী —তা নিয়ে জরমান ভাববাদীরা ও লেখকরা প্রচুর ভেবেছেন। কিন্তু তাঁদের ভাবনা ছিলো পুঁথিঘেঁষা সাহিত্য-সমালোচনার মতো—আর বোদলেয়ারে এসে সেই ভাবনা মূর্ত হয়েছে কেননা তিনি এর দেহ দান করেছেন একটি খ্রীস্টীয় পুরাণের সাহায্যে। নরক ত্রাতা ও স্বর্গ মিলে এক চিরন্তন নাটক সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। যেখানে নরক ও নরকবোধ আছে, সেখানেই আছে 'উজ্জ্বল উদ্ধারের' স্বপ্ন—বা অন্তত পক্ষে তার জ্ঞান। সে-কথা ভেবেই এলিয়ট তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে বোদলেয়ার তাঁর সমস্ত পাপের পশরা নিয়েও এই যুগের শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান কবি। অথচ বোদলেয়ার খ্রীস্টধর্মকে একটু ভিন্নভাবে ব্যবহার করেছিলেন, কেননা যিশুকে তাঁর কবিতায় খুব একটা দেখা যায় না। অথচ খ্রীস্টধর্মের যে-অংশটি বিশেষভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে তা হচ্ছে অত্যাচারিত মানবপুত্রের কাহিনী: লাঞ্ছিত নির্যাতিত ও নিরপ-রাধ যিশুও অর্ফিয়ুসের মতোই একটি আদিরূপাত্মক চরিত্র। অখ্রীস্টান হ'য়েও আমরা ব্যক্তিগতভাবে খ্রীস্টধর্মের করুণার দ্বারা বিচলিত হই, তা যিশুরই জন্যে। খ্রীস্টধর্ম বলতে যে সুসংবদ্ধ, আনুষ্ঠানিক ও ঐতিহাসিক ধর্ম রয়েছে তা আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়—এবং স্বর্গ ও নরকের রূপকও আমাদের ততটা মুগ্ধ করে না। নরক বলতে যদি-বা নিজের মতো করে বীভৎস স্নায়ুপীড়িত একটি জগৎ আমরা বুঝে নিই, তাহলেও

খ্রীস্টান স্বর্গ আমাদের কাছে অত্যন্ত দূরবর্তী থেকে যায়। তাছাড়া বোদলেয়ার বড়ো বেশি ক'রে পারী নগরের সঙ্গে জড়িত। তিনি তাঁর অস্তিত্বের সমস্যার নারকীয় জীবনের রূপক সংগ্রহ করেছেন পারী নগরীর নিচুতলার জীবন থেকে—তৎকালীন ফরাশি নাগরিক সংস্কৃতির মূল্য তাঁর কাছে অনেকখানি। সেই সংস্কৃতি এখন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরবর্তী ও তারিখমলিন। অপরপক্ষে রিলকেও এই একই চিন্তাসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন, যদিও একটু অন্যভাবে: অস্তিত্বের, অজ্ঞানের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ, কবির সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ—রিলকের কবিতায় তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা আছে। একদিক থেকে রিলকের কাব্যতত্ত্ব এই সনেটগুচ্ছে নিহিত রয়েছে। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন পৌত্তলিক পৃথিবীর পুরাণ—খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্ববর্তী অর্ফিয়ুস পুরাণ—যা সৃষ্টির অন্ধকার অজ্ঞান মুহূর্তের গল্পরূপ: অর্ফিয়ুসের পাতালপ্রবেশ, নির্গমন ও বীণাবাদন। অর্ফিয়ুসের প্রতীক হিশেবে তিনি ব্যবহার করেছেন বৃক্ষকে, যে-বৃক্ষ মানুষের গুহাবাসের আমল থেকেই কোনো-না-কোনো প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেদিক থেকে অর্ফিয়ুসপুরাণ অনেক বেশি প্রাথমিক, আদিম ও আদিরূপাত্মক—সরাসরি আমাদের বোধের শিকড় ধরে টান দেয়।

জল্পনা শেষ করে এবার মূল কথাটি বলতে চাই: আমার মনে হয় এই সব কারণেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় বোদলেয়ারকে যতটা না নিজস্ব করে নিতে পেরেছেন, রিলকেকে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে যদিও রিলকের প্রতিধ্বনি রয়েছে, তবু এই বইটির সবচেয়ে সুন্দর পঙ্‌ক্তির কয়েকটি হচ্ছে:

বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে:...

(পাবো প্রেম কান পেতে রেখে/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩৫)

এখানে 'অর্ফিয়ুসের প্রতি উদিষ্ট সনেটগুচ্ছ' ও বৃক্ষের চিত্রকল্প সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য লক্ষ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অর্ফিয়ুসের, কবির ও গায়কের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বৃক্ষকে—অন্ধকার পাতাল ও আলোকিত আকাশের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ও রক্ষা করে বৃক্ষ। পাতাল পৃথিবী ও আকাশ—এই তিনটি পৃথিবীকে অনায়াসে ছুঁয়ে আছে বৃক্ষ, এবং মাটির অন্ধকার শরীর থেকে তুলে আনছে প্রাণৈশ্বর্য : তার মূল প্রোথিত অজ্ঞানে, অর্ধজ্ঞানে, আর তার দেহ ও ডালপালা ছড়ানো রয়েছে আলোয় জ্ঞানে চৈতন্যে। গাছ একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সৃষ্টি—কবি ও কাব্য। কবির প্রতীক হিসেবে বৃক্ষ অত্যন্ত যথার্থ। কেননা কবিও—অর্ফিয়ুস ও গাছের মতো একইভাবে—অচৈতন্যের অন্ধকারে, নিজের গভীরতম জটিলতম দেশে প্রবেশ করেন এবং ফিরে-আসার সময় তুলে আনেন আশ্চর্য সব জিনিস, যা দিয়ে তৈরি হয় তাঁর গান ও কবিতা। তাঁর ইউরিদিকে কখনোই পাতালের গণ্ডী ছাড়াতে পারেন না—কবির সত্তার মূল তাই স্বতঃই পাতালে নিমজ্জিত। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই দর্শন ও বিশেষ চিত্রকল্পর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগতভাবেই আক্রান্ত, এবং অংশত রিলকের প্রতীক ও চিত্রকল্পই তাঁর নিজের চিন্তার মূলে নাড়া দিয়েছে, যার ফলে তাঁর অনেক কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজস্বভাবে গাছের চিত্রকল্পের ব্যবহার পাওয়া যায়। 'অতিজ্জীবিত', 'বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে', 'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে', 'দেবদূত' প্রভৃতি কবিতায় দুইরকম ব্যবহারই পাওয়া যায়। লক্ষ করা যাক 'দেবদূত' কবিতার আরম্ভ—

যে-বৃক্ষ নির্মাণ করে সেই বীজ অনন্যবাহিত কর হতে

তোমাতেই ফিরে যায়, গাঁথা বুকে বাগানের দাগ।
সেই বৃক্ষ তুমি, তব কণিকারে কেমন প্রভেদ
দেবে? বিস্ময়ের মাঝে দুই চিত্ত সমভগ্ন ভূমি।

(হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩৯)

এইখানে বৃক্ষ বা বীজের চিত্রকল্পের ব্যবহার হুবহু রিলকের ধরনে। তবে পুরো কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে একটা স্বচ্ছতার অভাব চোখে পড়ে—বা, বলা যায়, কিছুটা সংযমের অভাব যা রিলকের লেখায় বর্তমান।

অন্য-এক ধরনের কবিতা পড়লেও রিলকের কথা মনে পড়ে; যেমন দেবতা বা দেবদূতকে উদ্দিষ্ট কবিতাগুলি। লক্ষ করেই দেখা যাক:

স্মরণে মেলে না সব, যা পেলে দেবতা যেতো ম'রে।
তার রক্তে মেখে হাত, আমি কোথা লুকাই দেবতা,
জানো সব, বোঝো সব, তবু কেন ঐশ্বর্যে গভীর
মনস্কামনার ফুল, বলে, হায় অ-ফোটা কোরক!

(তুমি যেন ধর্ম/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩৮)

শেষ পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিলে বুদ্ধদেব বসু-কৃত রিলকের অনুবাদ বলেই মনে হতে পারে কবিতাটিকে—যদিও কাব্যভাষা (diction) পুরোপুরি মেলে না, আর যদিও কোনো বিশেষ কবিতার অনুবাদ এটা নয়। কিন্তু সব সত্ত্বেও পরিমণ্ডলটি কেমন যেন রিলকের। এখানে স্মরণীয়, অধুনালুপ্ত 'রণণ' (ভুল) পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় রিলকে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রিলকের 'এপিটাফ' তর্জমা করেছিলেন। দেবদূত বা দেবতাকে উদ্দেশ করে অনেক কবিতা লিখেছিলেন রিলকে ('ডুইনোর বিলাপ' ইত্যাদি)—সেই সব স্তব ও বিলাপের আক্ষরিক প্রভাব বা ভাবচ্ছায়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কবিতায় বিদ্যমান।

এখানে আবার মনে করতে অনুরোধ করি এই নিবন্ধের প্রথম কথাটি: সেখানে বলেছি যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমি বিশেষ একটি ধরন দেখেছিলুম, যা মনে হয়েছিলো অসামান্য ও নিজস্ব। যে-কবিতাগুলিতে সেই ধরনটি সম্পূর্ণভাবে নেই, এতক্ষণ কেবল সেগুলি নিয়েই আলোচনা করা হলো। এই জন্যই করা হলো, যে তাঁর নিজস্ব ধরন বুঝতে হলে যা তাঁর ব্যক্তিগত নয়, সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজের ধরনের লেখা সম্বন্ধে বলা যায় যে সেগুলির উৎকর্ষ বিশেষভাবে চিত্রকল্প ও প্রতীক -নির্ভর। তাঁর কবিতায় শব্দ দেহ বা অনুষঙ্গ হারিয়ে শুধুমাত্র চিন্তায় পরিণত হয় না। বস্তুশরীরের প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক মমতা আছে, যা তাঁকে বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকগুলিকে একসঙ্গে বা পৃথক ভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে। এমনকি শীতল কোমল কঠিন ইত্যাদি বিশেষণ পর্যন্ত আমাদের ত্বক স্পর্শ করে। যেমন:

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন
বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে
নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।

(জরাসন্ধ/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩)

সংযত অথচ অনুরণনময় এ-রকম পঙ্‌ক্তি খুব কমই পড়েছি আমি। কিন্তু লক্ষণীয় যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এইখানে তাঁর নিজের গলায় নিজেরই কথা বলছেন, কোনো বৈদেশিক কবিতার প্রতিধ্বনি ছিটোচ্ছেন না। কোমল, কঠিন, শীতলের পর-পর ব্যবহারও লক্ষণীয়:

একদিক থেকে মনে হয় যে লেখাটি বুঝি শব্দ হিশেব করে তৈরি হয়েছে। 'অর্থ হয়' কথাটিও লক্ষণীয়; কেননা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিপরম্পরা ধরে প্রথম দুটি বাক্য থেকে পরের বাক্যের বক্তব্য তৈরি হয় না; তবু 'অর্থ হয়' কথাটি আমরা মেনে নিতে পারি, কেননা অর্থটি সুর ও অনুষঙ্গ-গত। এইখানেই আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ধরনটি পাই।

এই ক্ষমতা আছে বলেই তিনি কম কথায়, উদ্দেশ্যমূলক বা এমনকি আপাত অর্থপূর্ণ কোনো বাক্য রচনা না-করেও একটি মনোভাব তৈরি করতে পারেন। যেমন:

শুয়ো না কখনো দিনে মৃত ঝরা বাতিটার পাশে।
ও কার চোখের জল ও কার মুখের মতো ম্লান ও
প্রতিকূল হাওয়া এসে দাঁড়ালেই শুরু বালি খসা
খুঁজি সে-সোনালি চুল চুল চুল তখনো আকাশে।

(প্রতিকৃতি/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ২)

যে-কোনো পাঠক স্বভাবতই এই ছত্র ক-টিতে গোছানো কোনো অর্থের অভাব অনুভব করবেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে সে-রকম কোনো অর্থের দিকে এই কবিতাটি যেতেই চাচ্ছে না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে একটি ছত্রের বক্তব্য অন্যটির প্রয়োজনে আসছে না, তবু মরা ঝরা বাতি, বালি-খসা দেয়াল, ম্লান মুখ, আকাশ, হালকা ও উড্ডীন গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি চুল ও নিরন্তর সন্ধানের চিত্রকল্প দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমন-একটি অর্থে পৌঁছুতে পেরেছেন যার সত্যতা আমরা অনুভব করি কিন্তু হয়তো গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারি না। এইভাবে তাঁর অনেক কবিতাই আপাত অর্থের পাশ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অর্থে পৌঁছয়। এই অর্থ আমাদের আভিধানিক যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ নয়—অভিজ্ঞতার, মুহূর্তের অসংবন্ধ উপলব্ধির অর্থ।

এইখানে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না কবিতার দুটি ধরন সম্বন্ধে কিছু জনান্তিক উক্তি। প্রায়ই যে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে তার কারণ আমরা আমাদের চেনা কবিতাকে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই ভাগ করার মূল সূত্রটি হচ্ছে অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ। এক ধরনের লেখায় দেখা যায় কোনো-কিছু ঘটে যাবার পর, অভিজ্ঞতালব্ধ হবার পর, সেই বিষয়ে আমাদের সুসংবন্ধ চিন্তা—কখনো সেই অভিজ্ঞতাজাত অনুভূতিকে নিয়ে 'শান্তভাবে' নাড়াচাড়া (ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে বলেছেন 'emotion recollected in tranquillity'), কখনো ব্যাখ্যা করা, কখনো নিজের কাছে পরিষ্কার করা। এই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট যুক্তিপরম্পরা থাকে, যাকে বলে 'বক্তব্য' তাও থাকে—কবিতাগুলিকে হয়তো ভালোভাবেই গদ্যস্তবকে (paraphrase) খুলে দেখানো যায়। এই বক্তব্যসংবলিত কবিতার, অবশ্যই, অন্যান্য অর্থের দিক থাকে—এবং দ্ব্যর্থবোধেরও অভাব হয় না। কিন্তু অন্য এক ধরনের কবিতাও আছে যার সারাংশ ব'লে কিছু নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এই দ্বিতীয় ধরনের। এই ধরনের কবিতায় না থাকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য, না থাকে কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা, না থাকে কোনো অন্তরাখ্যান।[১]

অভিজ্ঞতার কাছে আপ্রাণ সৎ থেকে এই কবিরা চেষ্টা করেন কোনো দূত বা যোজক (ইন্টারমিডিয়ারি) বাদ দিয়েই অভিজ্ঞতার কাঁচা মুহূর্তটিকে তুলে ধরতে। প্রতীক, চিত্রকল্প

[১] "হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য" (১৩৬৭)-র ৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: 'নানা সময়ের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পদ্যাংশ দিয়েছি। পুরানো-দিনে প্রণীত কখনো বা এদেরই পরিপূর্ণ দেহ ছিলো। বাহুল্য বলা যে, এ-সকল অংশ ছাড়া অবশিষ্ট অগ্রাহ্য করি। নানা সময়ে নানা পদ্য শুরু করেছিলাম—এগোয় নি। লিখিত টুকরোগুলোর কয়েকটি তুলে দিয়ে নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ করেছি মাত্র।' আর

বা আদিরূপ—এদের তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করেন, সেটা দেখেই আমাদের নিজেদেরই একটি অর্থ তৈরি করে নিতে হয়। সে-অর্থ অনেক সময় স্পষ্ট বা স্বচ্ছ নয়—কিন্তু সব সময়েই আমাদের চেতনার সবচেয়ে বেশি দিককে উত্তেজিত করে। কখনো-বা অর্থ স্পষ্ট হয়, যেমন:

আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ
সাধ হয় মাথা তোলে ফাঁসা মাথা একাকার মাথা
গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মূত ফুল রক্তপাত
আগায় দুপাড় পিছে...স্তম্ভ লাল ছিলা লাল লাথি
ভাঙে ঈশ্বরের মুখ...

(জন্ম ও পুরুষ/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ১৩)

এখানে (প্রায় জিগমুন্ড ফ্রয়েডের অনুমোদন-করা) যৌন শব্দের ব্যবহার ও যৌনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং তারই পাশাপাশি লক্ষ করা যাক নিচের কবিতাটি:

কাঠগুলো শ্মশানে পুড়লে চিতা। তবে আমায় পোড়াবে
অমন রুপোলি স্রোতে। পুরুষেরা কখনো চণ্ডাল হয়।
ভালো। রাশি-রাশি মহিলা, আমায় চিতার
উপর বেঁধে তোমরা উল্লাস কোরো সমস্ত রাত।
জ্যোৎস্নার রেখাটি দ্যাখো দূরে অশ্রুবিন্দুর মতো কাঁপতে
লেগেছে। তোমরা আর কখনো জ্যোৎস্না দেখবে না জানো।

আমার বন্ধুরা সব ছায়াহীন হেঁটে অন্যদেশে চ'লে গেলো।

(অন্তিম কৌতুক/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৩৬)

আগের পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে শেষ পঙ্‌ক্তিটির বিশেষ কোনো সম্বন্ধই বোধহয় নেই, অথচ সেটিও আমাদের মনে কোথাও নাড়া দেয়। আমরা ভেবে নিতে পারি নানা রকম অর্থ—এবং আমাদের ভাবনার স্বাধীনতা কবি বিশেষ একটি অর্থের ছক দিয়ে নষ্ট করেননি, কেবল বিশেষ একটি মনোভাব বিশেষ একটি পরিমণ্ডল আমাদের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এ ছাড়াও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আরো-একটি জিনিশ লক্ষণীয়। সেটি হচ্ছে তাঁর সাধারণ ও তথাকথিত অশালীন শব্দের প্রয়োগ : প্রাত্যহিক জীবন, বিশেষত অ-নাগরিক জীবন থেকে তিনি তাঁর প্রতীক ও চিত্রকল্প সংগ্রহ করেছেন। তাঁর ভালো কবিতার মধ্যে একধরনের সহজ ভাব ও স্বচ্ছতা আছে। লক্ষণীয়, 'সাময়িকতা', 'দক্ষিণ দিক্‌দেশ', 'পরস্ত্রী', 'চতুরঙ্গে', 'শবযাত্রী সন্দিগ্ধ' ইত্যাদি কবিতা। একেবারে গ্রাম্য জীবন থেকে নেয়া চিত্রকল্পের খুব ভালো ব্যবহার রয়েছে এই কবিতায় (সুনিভৃত, সুনিভৃতে, পৃ ২৩):

রক্তের ফোঁটার মতো শোলপানা পুকুরের বুকের ভিতরে
-চোখের পাতার মতো নড়ে, খেলা করে সারাদিন...

বা এখানে (প্রত্যাবর্তিত, পৃ ২০)—

মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার পাখি একা

---

"সোনার মাছি খুন করেছি"-র (১৩৭৪) ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন : 'আমি পারতপক্ষে, পরিমার্জনা স্বীকার করি না—যেমনভাবে চিত্র ও সংগীতময় পঙ্‌ক্তি আসে, ঠিক তেমনভাবেই কাগজের উপর বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।' এই দুটি উক্তি মনে রাখলে বোধহয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ধরণ কী, সে-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সরা
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।'

নিচের ক-টি পঙক্তিতে তাঁর প্রতীক নির্বাচন অত্যন্ত বাঙালি—

'তুমি তো নিয়েছো স্বর্ণ, গোক্ষুরের মতো হিংস্র যুবা,
সামান্য পদ্মেরা আছে, পদ্মপাতা, পদ্মজা মৌমাছি,
এবং অজস্র তুচ্ছ প্রাকৃতিক স্নেহচিহ্ন লোভনীয় দেহে।
(তরণী এবং যাত্রী চলেছে/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ২২)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে যে-ধরনের কবিতা লিখতে পারেন তা একই সঙ্গে দুরূহ ও উন্মোচনময়। অভিজ্ঞতার মুহূর্তটি তৈরি করা শক্ত বলেই অস্বচ্ছতার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি—আর সেক্ষেত্রে কবিতাটির মূল সুর বলে কোনো-কিছু থাকে না। সাধারণ অর্থে এখানে অর্থ নেই বলেই বিক্ষিপ্ত হলে এ-ধরনের কবিতা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে। অথচ কবিতাটি যখন একেবারে অনুভূতির কেন্দ্র থেকে উত্থিত হয়, বিশেষ কোনো অনুভূতির ঐকিকতা দ্বারা যখন আপাতবিচ্ছিন্ন অংশগুলি গ্রথিত হয়, তখন আমাদের তীব্রভাবে সাড়া না-দিয়ে উপায় থাকে না।

এই বিক্ষিপ্ততা বিচ্ছিন্নতা দ্বারা তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে" (আষাঢ় ১৩৭৩) আদ্যোপান্ত আক্রান্ত। একদিক থেকে এটা যেন কোনো কবির একটি নোটবই: 'উৎক্ষিপ্ত কররেখা' কবিতার পাদটীকায় (হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য/পৃ ৫৭) শক্তি চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'নিস্তব্ধ অলিখিতের দিকে নির্দেশ' করা। একসঙ্গে নানা রকম অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত পঙ্‌ক্তি—চেষ্টা করেও তা থেকে কোনো ঝাপশা অর্থ আঁচ করে নিতে পারিনি।

ঈয়াকের দুধ থেকে লজেন্স সম্পূর্ণ হলে পরে
বড়োরাও চুষে থাকে—আমরা গিয়েছি আরো দূর
খেলাচ্ছলে দেখিয়েছি—"ঐ গাছে দাগ মারো দেখি—
বাহাদুর, তুমি কাটো ঐ গাছ—ও যেন আমার,
যৌনতায় সাড়া দেয় রূপসীর (ভুল) উরুর (ভুল) মতন! (পৃ ২৯)

হয়তো এখানে অর্থের কথা উত্থাপন করলে অনেকের মনে হতে পারে যে আমি আগে যা বলেছি তার সঙ্গে এখনকার কথার কোনো সংগতি নেই। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রতীকী বা পরাবাস্তব কবিতারও যে-গ্রন্থনসূত্র থাকে (এমনকি 'স্বয়ংক্রিয়' রচনাতেও, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেন 'পর-পর আসা, পরিমার্জনাহীন চিত্র ও সংগীতময় পঙ্‌ক্তি'), এখানে তার একান্ত অভাব। যে-কোনো শিল্পকর্ম একটি নিজস্ব ও সুসংবদ্ধ প্রকরণ (form) তৈরি করে নেয়—কিন্তু এখানে তা নেই। আমার বরং মনে হয়েছে, যেমন করে একজন চিত্রকর তাঁর খাতায় বিভিন্ন স্কেচ জড়ো করে রাখেন পরে বড়ো ছবিতে ব্যবহার করবেন বলে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তা-ই করেছেন। তাছাড়া বইটির আরেকটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে জীবনানন্দর ব্যবহার: বইটির নামও জীবনানন্দরই কবিতা থেকে নেয়া এবং এখানে প্রচুর পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দর ধরনে লেখার মতো করে লেখা, যার অভিপ্রায় আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, যেমন—

তাল-সুপারির দেশে তুমি গেছো নাকি? নিনেভ-সাপ্রিরা?

একা সব পথ তুমি ঘুরেছো নির্জন?
তুমি ভালোবাসো তাই
আমি দীর্ঘদিন ঘুরে লোকের সমাজে
নিজেকে করেছি সংঘ-বান্ধব-বিহীন—
এরই নাম বিষণ্ণতা। (পৃ ২৮)

ভূটান বা সিকিম-সীমান্তের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অসংলগ্ন চিন্তাসূত্র বলে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলেও এটা কেমন যেন অস্বস্তিকর থেকেই যায়।

পাঠকের অস্বস্তি দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো"তেও (আশ্বিন ১৩৭৩) কম নেই। বইটির অধিকাংশ কবিতার অধিকাংশ চরণই যেন কেবল অন্ত্যমিলের খেলা দেখাবার জন্য লেখা। একটি ছোটো কবিতা আদ্যোপান্ত লক্ষ করা যাক:

জ্যোৎস্নার বল্লম হাতে চ'লে গেছি একদা সুদূর
কুয়ালালামপুর
সেখানে তোমার
নামোচ্চারণ করে ভিন্‌দেশি হাবশি সর্দার
চিঠিও লিখেছে একশত
সে তোমারে ভালোবাসে যতো
আমি তারে ভালোবেসে মরি
সর্বোপরি
কুয়ালালামপুর
ভিন্‌দেশি সর্দার একা সংগোপনে করেছে মধুর!
(জ্যোৎস্নার বল্লম হাতে/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পৃ ২০)

আস্ত কবিতাটি পড়ে আমার একবারও মনে হয়নি যে এর একটি ছত্রেরও কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য আছে বা এ-সব পঙ্‌ক্তির একটির সঙ্গে আরেকটিরও কোনো যোগ আছে—কি অর্থগত, কি বা অনুষঙ্গগত। কিংবা ধরা যাক এই পঙ্‌ক্তিগুলো:

কাঁকড়ার গর্ত দেখে মনে হয় ভয়াল তিমির
পিঠে নীল কার্বঙ্কল
তুমি তিতুমীর
তুমি পল্‌
ফসফরাসের কাঁথা গড়ো তাঁতঘরে
রাত দ্বিপ্রহরে
তুমি ডাকো—"কানাই, কানাই"—
হ্যান্ডলুম-হাউসে নক্‌সা নাই।
(ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পৃ ৫৪)

এ-সব সম্বন্ধে কী বলা যাবে?

আরেকটি ব্যাপারও চোখে পড়ে। যে-শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে লিখতে পেরেছিলেন 'যোনির মাড়ির খিল হাট করা, বেহায়া পাংশুতা' (জন্ম এবং পুরুষ, পৃ ১৩), তিনি এখানে প্রেম সম্বন্ধে লিখেছেন:

তখনো ছিলো অন্ধকার　　　　তখনো ছিলো বেলা

হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা

(হৃদয়পুর/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পৃ ২৩)

শব্দের দিক থেকে এই বইতে প্রচলিত ও অনুমোদিত কাব্যভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো-কখনো—যেমন 'হৃদয়পুর', 'ব্রিজ—যমুনার জল', 'কেতকী' ইত্যাদি কবিতায়—যে-অনুভূতির ব্যবহার তাও সাধারণ ও সামাজিক, মোটেই ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু আমার মনে হয় বইটিতে এক ধরনের খেলা করার ভঙ্গি আছে; হয়তো-বা বাঁকা হেসেই পুরোনো কবিতার ভাষা ও ভাব ঠাট্টাচ্ছলে নেয়া হয়েছে—ছন্দ-মিলের দক্ষতার মধ্য দিয়ে মাঝে-মাঝে লুকোনো হাসির বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটে যায়। 'জুলেখা ডবসন', 'বসন্ত আসে' ইত্যাদি কবিতা কেবল তো মজা করতেই চাচ্ছে। 'গোপন শিক্ষা', 'অবনী বাড়ি আছো', 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে', 'ফাঁদের মতো প্রেম', 'অন্ধকারের বন্ধনে'—এ-রকম কিছু কবিতাতেই কেবল বোধের গভীরতা পাই। অন্তত সেগুলিকে খেলাচ্ছলে লেখা বলে মনে হয় না। যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয়, সেটা এই : কেবল কতগুলো বিদ্যুতের মতো তীব্র ও তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ছাড়া এই বইতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখার ধরনটাই অনুপস্থিত—বা বলা যায় নিজের ভোল তিনি একেবারেই পালটে ফেলেছেন। কোনো-কোনো কবিতা নষ্ট করেছে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা; উদাহরণ হিশেবে বলা যায় 'আমি কেবলই বাতাপি' কবিতাটি। তাছাড়া অনেক রাবীন্দ্রিক বাগ্বিধির পরেই বিদ্যুতের মতো অতর্কিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব চিত্রকল্প ভেসে হাজির হয়:

তবু আমার হয়নি ছুটি প্রাসাদ-চূড়ে মোরগঝুঁটি
দুলছে পবনবেগে
দূর বাগানের কেতকী ফুল হয়তো এখন ফুটে আকুল
শেষ শ্রাবণের মেঘে।

(কেতকী/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পৃ ২৯)

"হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য"তে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে-মানসিকতা ছিলো, বা জীবনের গভীর দিকগুলি সম্বন্ধে সেখানে তাঁর যে-সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছিলো, "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো" কাব্যগ্রন্থে সেটা অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতি যে নেহাতই সাময়িক, সেটা সুখের কথা, কারণ তাঁর "সোনার মাছি খুন করেছি"তে (আষাঢ় ১৩৭৪) উপলব্ধির সেই গভীরতা ফিরে এসেছে। উদ্দেশ্যহীন ছন্দমিলের খেলা, ঠাট্টার সুর, নামকরণের চালিয়াতি, আসর-বিনোদের হালকা ভঙ্গি—এই বইতে নেই; নেই অসংলগ্নভাবে বাংলাদেশের সীমান্তে বিচরণ, বিদেশি কবিরাও পেছনে পড়ে রয়েছেন, ইতিপূর্বে যাঁদের গলায় কথা বলতে গিয়ে প্রথম কাব্যগ্রন্থে খানিকটা নিজস্বতার অভাব ঘটেছিলো। উপলব্ধির গভীরতা বা তীব্রতা এসেছে নিজেকে নিয়ে নানাভাবে চিন্তা করার ফলে—সার্বিক বা বৈশ্বিক অর্থে অস্তিত্ব বা 'সাহিত্যিক' সমস্যার আলোচনা নয়। ব্যক্তিগতভাবে নিজে বা নিজের কাছে সৎ থাকা বা প্রেমের সঙ্গে সম্পর্ক—এই নিয়েই কবি ব্যস্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে যে কোনো অখণ্ড বা একরকম চেহারা থাকে না সেটাও তাঁর কবিতার একটি বিষয়বস্তু। এটা উল্লেখযোগ্য যে এই বইটির অধিকাংশ কবিতারই 'বক্তব্য' আছে। তাঁর প্রথম বইয়ে শুধুই অভিজ্ঞতার মুহূর্তটিকে তৈরি করে দেবার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিলো; এখানেও অংশত তা রয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সেই মুহূর্তটি সম্বন্ধে মন্তব্য বা কখনো-কখনো মূল্যায়ন। উদাহরণ হিশেবে প্রথম কবিতাটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কবিতার নাম: 'সে বড়ো সুখের সময়, সে বড়ো আনন্দের সময়

নয়'। বিষয়বস্তু: বাড়ি ফেরার ইচ্ছে, পথের নানা বিপদ, ওলোটপালোট অনিশ্চয়তা এবং হয়তো শেষ অবধি বাড়ি না পেঁছনো। কবি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দেখছেন অনিশ্চয়তা, কেননা সমস্ত কিছুই বাইরে যা দেখায় আসলে তা নয়, এবং কোনো বস্তুই তার স্বভাবে স্থিত নয়—ঢাকার ভিতরে রয়েছে আরো ঢাকা এবং মৃত্যু হচ্ছে এই এককেন্দ্রীয় বৃত্ত গুলির মধ্যবিন্দু।

কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার
কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান,—ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু—সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়!

(সে বড়ো সুখের.../সোনার মাছি খুন করেছি, পৃ ১১)

সেই মৃত্যু অনিবার্য, 'পলেস্তারা মুঠো করে বটচারার মতন' অপেক্ষা করে থাকে।

জাগতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই কবিতাটিতে রয়েছে। আবার তার সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে একটি বিশেষ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, সেই অভিজ্ঞতার মুহূর্তে—যখন মানুষের অবচেতনেই এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে পারে।

ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতরে বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
"হ্যান্ডস্ আপ্"—...

(সে বড়ো সুখের.../সোনার মাছি খুন করেছি, পৃ ১১)

যাত্রাস্থল, যাত্রা, গন্তব্যস্থান বিষয়ে নানা জপল্পনা ও প্রত্যাবর্তন—এইসব 'থিম' বা চিন্তাসূত্র বইটির অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। এই চিন্তাসূত্রটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একেবারে গোড়া থেকে ব্যবহার করেছেন। 'যৌবন থেকে বামে' ('যেখান থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসি'/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ১০) 'দক্ষিণ দিক্‌দেশ' ('বাতাস আমায় আবর্তে নিয়ে চললে সমস্ত দিন'/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, পৃ ৮) ইত্যাদি কবিতা আমাদের সহজেই মনে পড়ে যায়। "হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য", "ধর্মে আছো জিরাফেও আছো", "অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে"—পূর্ববর্তী তিনটি বইয়ের প্রচুর গাড়ি, স্টেশন ও পথের উল্লেখ আছে—'অনন্ত নক্ষত্রবীথি'...তো এক অর্থে ভ্রমণবৃত্তান্তই। "সোনার মাছি খুন করেছি"র মধ্যে রয়েছে নিজের প্রথম দিকের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার দূরত্ব যাচাই করে দেখার চেষ্টা। নিজের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাকেই নিজে ব'লে সনাক্ত করতে চাচ্ছেন; বা অন্যভাবে বলা যায়, নিজের কোনো বিশেষ চেহারাকেই তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের অন্তঃস্থল বলে বোধ হয়েছে। সেই স্বরূপ থেকে তিনি যাত্রা করেন পৃথিবীর দিকে : নানা প্রতিক্রিয়ার ফলে, অনেক অদলবদল হয়, তারপর আবার চলে মিলিয়ে দেখা—সম্ভব হলে আত্মার বা স্বরূপের কেন্দ্রে ফিরে আসার চেষ্টা চলে। 'একদা এবং আমি', 'অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ', 'যেতে-যেতে', 'আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা', 'পুনর্বিবেচনা'—এই প্রত্যেকটি

কবিতাতেই যাত্রা, পথ, ভ্রমণ, প্রত্যাবর্তন বা তার উৎকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। 'অলৌকিক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ'-এ একটি রূপক যেন গড়ে উঠতে থাকে, কেননা কবি, ট্রেন, স্টেশন, গন্তব্যস্থল, পাশের দৃশ্যের প্রতীক এমন একটানা ও সপ্রাণভাবে ব্যবহার করেছেন যে তার আড়ালে পুরো উৎকাঙ্ক্ষাটির একটি তীব্র নির্মিতি ঘটে চলে। তাঁর যাত্রাপথের বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব:

রিলিফ ম্যাপ-এর ছবির মতন চারপাশ ছুটে চলেছে
অকারণ কুকুর উঠলো ডেকে
"এই তো সময়—এই তো সময়!"
প্ল্যাটফর্ম দৌড়ে গেল পিছনে পুলিশের মতো... (পৃ ১৮)

অথচ তাঁর নিরন্তর যাওয়া-আসা 'রাতের ট্রেনে চোরের মতো', 'দেশনায়কের মতো' শুধু মানুষের কাছে পৌঁছবার জন্য, কেননা

মানুষের কাছে যেতে হলে কোন্ ইস্টিশনে নেমে যেতে হবে
সঠিক জানা নেই আমার। (পৃ ১৭)

এই কবিতাটিতে যেমন রয়েছে অতীত-পরিক্রমা, স্মৃতিচারণ, তেমনি 'একদা এবং আমি'তে রয়েছে বর্তমান নিজের কাছ থেকে নিজের দূরত্ব মেপে দেখা,—যদিও কবি বলছেন,

একেক দিন তোমার কাছে থেকে দূরে যাই, দূরে থেকেও কাছে—
এমন সস্তা কবিত্বের কেন্দ্রে আমি বন্দী নই। (পৃ ১৩)

আর রয়েছে নিজের সঙ্গে স্বীয় আত্মার ও দেহের —আত্মার আবাসের—সম্বন্ধ মূল্যায়ন। নিজের দেহের কাছে কবি বন্দী; তাঁর অন্য এক সত্তা, সেও আছে পাশে—'যেখানেই যাই—তুমি আছো, এঁটে আছো আমার শরীরের নানান জোড়ে'। কিন্তু তিনি মুক্তি চান না—চান না যে 'এমন দারুণ দেহের জোড়গুলো একে-একে খুলে' যাক। কেমন করে দেহের জোড়া ও কোষগুলো ভাঙচুর হয়, কেমন করে তার ছিঁড়ে-খুঁড়ে মিলিয়ে যায়, তার খুব ভালো একটি বর্ণনা আছে এখানে—দেহের জোড়গুলো 'খুলে ছড়িয়ে পড়বে আমারই চতুর্দিকে—দেয়ালের ক্ষয়-লাগা/পলেস্তারার মতন'। 'মৃত্যু থেকে পার নেই,/যেন তালকানা পাখি উড়ে এসে পড়বেই ফাঁদে'—এই জটিলভীষণ অভিজ্ঞতার মুহূর্তে—যেখানে দেহ, আত্মা ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবি এত স্পষ্ট —দূর ও নিকট এক হয়ে যায়। যেহেতু তিনি কোথাও নিজেকে ছাড়িয়ে যান না, তাই সমুদ্রতীরে পৌঁছেই তাঁর পাহাড়-পর্বতের কথা মনে হয়।

'যেতে-যেতে' বা 'আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা' কবিতা দুটিতেও এই গতির প্রতি পৌনঃপুনিক দৃষ্টিপাত ঘটেছে, যেন কবি এ-সম্বন্ধে কিছু জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছেন। থেমে না থাকা, পেছনে না তাকানো, পথের দোষগুণ বিচার না করা—'যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে'—এই হচ্ছে 'যেতে-যেতে'র বিষয়বস্তু। অন্য কবিতাটিতেও তাই : 'দাগ-মারা, ঘা-গর্তে পেছোল (ভুল) উলুকঝুলুক আধ-বাসনার/আসল কথা, সঙ্গে যাওয়া'। 'হলুদ নদী সবুজ বন' কবিতাতেও তিনি অনুভব করেন গতির বা 'অংশ গ্রহণ করার' প্রয়োজন : 'পথের মধ্যখান ছেড়ে পাশে সরে যাওয়া, খানাখন্দে লাফিয়ে পড়া'। তার কারণ : 'অনেক দিন হলো একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি'। আর বইটির সবশেষ কবিতা 'উড়ন্ত সিংহাসন'-এও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। গতির প্রয়োজনকে কালের গতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মনে হয়েছে, 'বহুদূর যাওয়া চলে'—

ভিতরে-বাহিরে কত পথ পাই,
সকলের দাবি :

আমাতে প্রথম এসো
পদচিহ্ন রেখে যেয়ো কিছু— (পৃ ৫৫)

আরো লক্ষণীয় : বেশিরভাগ যাত্রার কবিতাই শেষ হয়েছে মৃত্যুতে বা এক ধরনের ঔদাসীন্যে।

বইটির আরেকটি চিন্তাসূত্র হচ্ছে বিভক্ত সত্তা। 'পাখি আমার একলা পাখি'তে উপনিষদ্-এর দুই পাখির আখ্যান ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় : ব্যক্তি এক. কিন্তু সত্তা দুই; দেহবন্দী আত্মা ও মুক্তআত্মা—এই দুই পাখিতে মিলেই একটি সম্পূর্ণ পাখি : 'পাখি আমার একলা পাখি, একলা-ফেকলা দু-জন পাখি'। একটি পাখি যেমন 'সারা জীবন খাঁচার মধ্যে'—তেমনি সৃষ্টিও এক 'হলুদ পর্দা'য়। 'সব শরীরটা ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা' তাই, সেই ঠোঁটের ঠোকরেই হয়তো মুহূর্তে পর্দা ছিঁড়ে যাবে —'তার পরে লুট'। লক্ষণীয় হচ্ছে সব-কিছু ছিঁড়ে, ভেঙে বেরোবার ইচ্ছাটি। বার-বার আনা হয়েছে আবৃত বস্তুর চিত্রকল্প : পর্দায় ঢাকা জগৎ, স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়া, সিন্দুকে মোহর, বাসনা-কাঠি ঘেরা ন্যাংটো শরীর। তারই সঙ্গে প্রতিতুলনা হিসেবে রাখা হয়েছে, প্রথম স্তবকে, পর্দা ছিঁড়ে হরির লুঠের দৃশ্য; দ্বিতীয় স্তবকে সামুদ্রিক, শারীরিক চিত্রকল্প: 'টুকরো সমুদ্দুর-লেগুনে—নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ/ আধভেজা ফুল-শায়ার মতন'; তৃতীয় স্তবকে : 'মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে/নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্ঠে আলিবাবার'। আর তারই সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে রাখা হয়েছে সংক্ষিপ্ত কোনো ক্রিয়ার ইচ্ছা : যেমন, দাঁতে সুতো কেটে কোনো-এক সামুদ্রিক মোহে অংশ নেয়া, 'সেই শায়াতে জড়িয়ে আছে/জল, জেলি, লোভ রক্ত আমার'; বা সিন্দুক ভেঙে মোহর ছড়ানো বা একটি সোনার মাছি 'ছোটো, সুন্দর, উজ্জ্বল কোনো-কিছু; নাকি স্ত্রীলোকের ছোটো অলংকার) মাড়িয়ে দেয়া।

কিন্তু তবু, বাসনা-কামনার এই আলোড়ন সত্ত্বেও, বন্দীদশার অসুবিধে সত্ত্বেও, 'লাগছে ভালো', কেননা 'হলুদ পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে একমুহূর্ত সময় লাগবে'। সবচেয়ে জরুরি হলো 'দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা'—কেননা আস্বাদনের ক্ষমতা (বা ঠোঁট এখানে ঠুকরে ছেঁড়ার উপায়) যদি ঠিক থাকে তাহলে অন্য সবকিছুই হয়তো সহ্য করা যায়—সব-কিছুর মধ্যে থেকেও গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়।

এখানে 'নীল ভালোবাসায়' কবিতাটি বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। কেননা বইটির নামে যে-প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে, "পাখি আবার একলা পাখি'তে যে-বিষয়টিকে কেবল ছুঁয়ে-যাওয়া হয়েছে, এখানে তারই বিস্তৃত ব্যবহার রয়েছে। কবিতাটির 'থিম' : সোনার মাছি খুন করা। 'সোনার মাছি' কীসের প্রতীক হতে পারে, সেটা একবার ভেবে দেখা উচিত, বিশেষত বইটির নামকরণে বা একাধিক কবিতায় যখন এই প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এর প্রয়োগ নিশ্চয়ই সুচিন্তিত ও সযত্ন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে যে 'সোনার মাছি' সুন্দর উজ্জ্বল সবলতার প্রতীক। কানে পরার এক ধরনের ছোটো গয়নাকেও 'সোনার মাছি' বলে; সেদিক থেকেও সুন্দর পাতলা শাদা কানের পাতায় ছোট্ট একটু সোনার আভাসও সৌন্দর্য ও সারল্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্তত 'নীল ভালোবাসায়' কবিতাটিতে তার প্রয়োগ সেইরকমই। এখানে কবি সারল্য বা পবিত্রতাকে—যা সুন্দর অথচ স্পর্শভীরু ও ভঙ্গুর—বাঁচাতে চেয়েছিলেন, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খুন করতে হলো। কেননা তাঁর হাতে 'হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো'। অতর্কিতে তার মন জেগে উঠলো নষ্ট করবার, পবিত্রতাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবার একটি উৎকাঙ্ক্ষা, কারণ এই

সারল্য বা পবিত্রতা তাঁকে অনেক কিছুতে বাধা দেয় ('আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস তোর কোটরে,')। এই পবিত্রতাবোধ তাঁকে কারণে-অকারণে ভাবায়, তাঁর স্বাধীনতা হরণ করে নেয় : 'খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই'। কিন্তু খুন করেছেন বলেই, ছেড়ে এসেছেন বলেই কবি এখন 'দীর্ঘতম জীবন' সোনার মাছিকে জড়িয়ে ভোগ করছেন। 'সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না' বলতে খুব সম্ভবত তিনি বোঝাচ্ছেন যে সারল্য বা পবিত্রতা ব্যক্তিগত ব্যবহারে কখনো-কখনো চরিত্রচ্যুত হতে পারে, কিন্তু চিন্তার জগতে তা অম্লান হয়েই থাকে, ব্যবহারে ক্ষয় পায় না।

'সোনার মাছি' প্রতীকটির আরো-একটি অর্থ সম্ভবত প্রেম। প্রেমের সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সব কবিতাতেই দ্ব্যর্থবোধক। একটি বিশেষ পর্যায়ে তিনি আর প্রেমের সমস্ত দাবি মেনে নিতে পারেন না, বা প্রেম যে-রকমের সুখ দিতে পারে, তা তিনি চান না।

> তোমার কাছে একধরনের পোশাক চেয়েছিলাম আমি
> তখনই যবের শীষের মতো পথভ্রষ্ট অনিশ্চয়তা এসে
> আমাদের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলো :
> ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও—
> তোমাদের নিজেদের দুঃখভোগ করতে দাও।
>
> (পশ্চাদ্‌ভূমি/সোনার মাছি খুন করেছি, পৃ ৫১)

অতএব তিনি যদিও প্রশ্ন করেন 'তখন তোমার শস্য শরীর ভরে কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম', তবু উত্তরটাও তিনি নিজেই জানেন, 'কারণ ছিলো—কারণ আছে'। যদি 'নীল ভালোবাসায়' কবিতাটিতে 'সোনার মাছি'কে প্রেমের প্রতীক বলে ধরে নেয়া যায় তাহ'লে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কবি প্রেমকে হত্যা করেছেন। অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিমুহূর্তে যে-বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা যে-দাবি জানাতে পারে, তাঁর পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়। অতএব 'খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই'। আর প্রেম, বা মানুষের সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্ক, প্রতিদিনের ব্যবহারে মলিন হতে বাধ্য, অথচ প্রেমের চিন্তা, তার আদর্শ, তার কল্পরূপে কোনো গ্লানি লাগে না।

'স্মৃতি' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। "ভস্ম অবশেষ" বা 'পশ্চাদ্‌ভূমি'—দুটি কবিতাতেই এক পরিসমাপ্ত ভালোবাসার ছায়া পড়েছে; —এই পরিসমাপ্তি হয়তো তাঁর স্বেচ্ছাকৃত, অথচ তবু মৃত ভালোবাসার জন্য তাঁর মনে বিষাদও রয়ে গিয়েছে। সেই জন্যেই হয়তো প্রায়ই তিনি পুরোনো চিঠির চিত্রকল্প ব্যবহার করেন।

যে জিনিসটা না-বলে দিলেও যে-কারু চোখে পড়ে, তা হচ্ছে তাঁর ছন্দনৈপুণ্য, আঙ্গিককৌশল এবং প্রাণবন্ত চিত্রকল্প। অন্তত এই বইটিতে কোনো পুঁথি-ঘেঁষা 'সাহিত্যিক' ভাব নেই। আশপাশের পৃথিবী, নিজেদের ও অন্যদের বাঁচার ধরন, বিশেষ তাৎপর্য ও সজীবতা নিয়ে দেখার ক্ষমতা আমরা সাধারণত কুড়ি বছরেই হারাই—কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় এখনো অত্যন্ত সজাগ, স্পর্শাতুর, উৎসুক, ও লিপ্সাময়। অন্তত এই বইটিতে পুনরাবৃত্ত একঘেয়ে চিত্রকল্প বা প্রতীকের একটি রীতি-পদ্ধতি তিনি তৈরি করেননি। তা না-করেই বরং প্রত্যেকটি কবিতায় নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধরনের কিছু প্রতীক ও চিত্রকল্প প্রয়োগ করেছেন। অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পদ্যপ্রবন্ধ না লিখে সেই মুহূর্তটি তৈরি করে দেবার, সরাসরি উপস্থাপিত করে দেবার যে চেষ্টা তাঁর প্রথম বইতে ছিলো, এখানে তা আরো অনেক সার্থক-

ভাবে সম্ভব হয়েছে, অথচ প্রথম দিকের সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবটি অনুপস্থিত। তবে আঙ্গিক সম্বন্ধে একটা কথা হয়তো নেহাত অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'যেতে-যেতে' বা 'আমিও একদিন' কবিতাদুটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বলার ভঙ্গি মনে করিয়ে দেয়। কিংবা 'এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' পড়তে-পড়তে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশকে। যে-কবিতাগুলো তাঁর সত্যিকার ও নিজস্ব ভঙ্গিটিকে স্পর্শসহভাবে সরাসরি উপস্থাপিত করে, তাদের পাশে অন্তত এই কবিতাগুলিকে অত্যন্ত মলিন ঠেকে। 'নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই, শস্ত্র হয় মন'—শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কবিতার বইতে বলেছিলেন। তাঁর সশস্ত্র যুদ্ধ এই দু-তিনটি কবিতা ও মধ্যবর্তী দুটি বইয়ের অসংলগ্নতা বাদ দিলে সত্যিই বাংলা কবিতার পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, কৌতূহলোদ্দীপক ও উত্তেজক।

# ভাঙা আয়না

## সুধাংশু ঘোষ

বেসক্যাম্প থেকে মোটর চলার উপযুক্ত রাস্তাটা পাহাড়ের অঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে এক জায়গায় এসে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। উত্তরে চলে গেছে চুড়োর কাছের অফিসবাড়ির দিকে। সেখান থেকে আরো উত্তরে গেছে খনির সীমানায়, ক্রাশিং প্লান্টে। বেসক্যাম্পের রাস্তাটা যে-বিন্দু থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে, সেখান থেকে আর একটা রাস্তা দক্ষিণে মাইল দুই চলে গেছে। দুমাইল দক্ষিণে অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন টুকরো শহর। এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। শো খানেক কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে।

শীতের সময়েই নতুন টুকরো শহরে উঠে যাবার জন্য বেসক্যাম্পের অনেকের প্রতি নির্দেশ এসেছিল। শহুরে প্রাত্যহিকতার আশায় কেউ কেউ টাউনশিপে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বেসক্যাম্প ছেড়েছিলেন ওপরে যাবার নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে। কারো কারো দ্বিধা ছিল। জঙ্গলে হলেও এক জায়গায় কিছুকাল বাসের পর তখনই অন্যত্র যেতে তাঁরা হয়ত অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। অবশ্য যেতে হল, যাঁদের প্রতি নির্দেশ এসেছিল তাঁদের সবাইকেই অল্প আগেপরে নতুন টুকরো শহরে যেতে হল।

অমল টাউনশিপে যাবার নির্দেশ পেয়েছিল, সুনন্দ পায়নি। এখানে আসার পর থেকে এ-পর্যন্ত অমল এবং সুনন্দ কাছাকাছি ছিল। অতটা দূরে যাবার প্রশ্ন ওঠায় অমলের প্রথমে মোটেই ভাল লাগেনি। ভেবেছিল রাঘবনকে বলবে টাউনশিপে তার কোয়ার্টারের পাশে সুনন্দকে একটা কোয়ার্টার দেবার চেষ্টা করতে। বলবে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। সুনন্দরও এ-নিয়ে কাউকে অনুরোধ করতে অনিচ্ছা। তাছাড়া টাউনশিপে কোয়ার্টার বাড়লে তার প্রতিও তো নির্দেশ আসবে ওপরে উঠে যাবার। শুধু প্রথম দফায় তাকে যেতে বলা হয়নি; দুদিন পরে তো বলা হবেই।

সুনন্দ যাচ্ছে না বলে প্রথমে অমলের একটু দ্বিধা থাকলেও, হয়ত অন্য একটা কারণে সে পাঁচ মাইল দূরে যেতেই চেয়েছিল। সেই কারণটা তার নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল না। আসলে কারণটাকে স্পষ্ট হতে, নগ্ন হতে দিতে চায়নি অমল। তাহলে তো নিজেকে নতুন করে ছেলেমানুষ মনে হত, সুনন্দর কথায় নাবালক।

মেয়েদের অভিমান স্বাদু, পুরুষমানুষের অভিমান হাস্যকর। এসব জানে অমল। এমন আরো অনেক কিছু জানে। কিন্তু কোনো ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে জড়ালে তত্ত্বকথা-গুলো আর টানটান থাকে না। নতুন টাউনশিপ নয়নতারার কোয়ার্টার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এবং দূরে বলেই নির্দেশ পেয়ে সেখানে যেতেই চেয়েছিল—এই সত্যিটাকে অমল নগ্ন করে দেখতে চায়নি।

এক শনিবার রাত্রির অভিজ্ঞতার পর নয়নতারার কাছাকাছি থাকতে অনিচ্ছা, এই সত্যি কারণটা কূটকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছিল বলে অমলের দেরি হচ্ছিল। তাই অন্য অনেকে ওপরে উঠে যাবার বেশ কিছুদিন পরে অমল গিয়েছিল। তার সামান্য জিনিস একটা জীপে চাপিয়ে যখন টাউনশিপে পৌঁছেছিল, তখন শীতের শেষ।

দূরে বন্ধু কিনা জানে না, কিন্তু সময় বড় শত্রু।

শীতের শেষে অমল টুকরো শহরে এসেছিল। তারপর গ্রীষ্মের দুমাস কেটে গিয়ে এখন বর্ষা। কাজ কমেছে। যথেষ্ট অবকাশ। প্রতি সপ্তাহে কাজ আরো কমে না গেলে বরং ভাল ছিল, রাত্রির সঙ্গে দিনগুলোও এমন দুঃসহ হত না।

টাউনশিপের ঘরগুলো বেসক্যাম্পের ঘর থেকে বেশী মজবুত। বেসক্যাম্পের ঘরের মতো কাঠের বেড়া না, পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল, ওপরে অ্যাসবেস্টস। দুখানা করে ঘর। শোবারঘরের বাইরের দিকের জানলাটা বেশ বড়, কাঁচ দিয়ে ঢাকা। অমলের পুরোন রঙ-জ্বলা পর্দাগুলো বাতিল হয়ে গেছে।

শোবারঘরের বড় জানলার স্বচ্ছ শার্শির মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখা যায়, বিছানায় শরীর রেখেও দেখা যায়। সেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। একবার নামলে আর থামতে চায় না। কখনো পুরো সপ্তাহ ধরে বিরামহীন। তখন আর বড় জানলার শার্শির স্বচ্ছতার কোনো দাম থাকে না। নিচে নেমে আসা ধোঁয়ার মতো মেঘ আর ঘন কুয়াশায় সব ঢেকে যায়। নিজের ঘর ছাড়া চরাচরে অন্য কিছু আছে বুঝবার সুযোগ মেলে না। শুধু পাথুরে মাটি না, কারো কারো মেজাজও সেই বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে যায়।

তখন দিনের বেলায়ও সময় মারাত্মক শত্রুর মতো কোনো তেতো অভিজ্ঞতা পানসে করে দেয় জল মিশিয়ে। কয়েক মাস আগের এক শনিবার রাত্রির তীব্র অনুভব আর তীক্ষ্ণ-মুখ থাকে না। এত তেতো কেন লেগেছিল সেদিন, সহজে বুঝতে পারে না।

বড় খুশীখুশী ছিল সেদিন নয়নতারা। ইদানীং এক-একবার অমলের মনে হয়েছে, নয়নতারার খুশী না থাকার কি কোনো কারণ ছিল। অথবা অখুশী থাকার মতো ঘটেছিল কি কিছু। কয়েকজনকে সে ডেকেছিল সেদিন সন্ধ্যেয়। তাঁরা সহকর্মী, প্রতিবেশী। সবাই এসেছিলেন। শীতের উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় কয়েকজন জমিয়ে বসে এলোমেলো সংলাপে সানন্দে মগ্ন ছিলেন। শুধু অমল কোনো কিছুতে যোগ দেয়নি। কেন যোগ দিতে পারেনি। তার কি মনের প্রসার নেই। সে ভেবেছিল, নয়নতারা একা তাকেই শুধু ডেকেছে। কেন ভেবেছিল। আরো কয়েকজনকে ডাকাই কি স্বাভাবিক না। যখন দেখল একা নয়, তার অত তেতো লাগার কি কোনো যুক্তি ছিল। অমন চুপচাপ থেকে, সবার আগে হঠাৎ চলে এসে, সে-ই কি অপমান করেনি নয়নতারাকে, এবং তির্যকভাবে অন্য সবাইকে।

কিন্তু, মুশকিল এই, তাকে একা ডাকেনি ভেবেও যে কোনো সান্ত্বনা নেই!

টাউনশিপের নির্জন কোয়ার্টারে বর্ষার ঋতুতে বিরামহীন বৃষ্টি আর ঘন কুয়াশায় সব কিছু মুছে গেলে, শোবারঘরের বড় জানলার শার্শির স্বচ্ছতা অর্থহীন হয়ে এলে, দিনের বেলায়ও প্রায়শই এমন ভাবনায় ডুবে যাচ্ছিল অমল। তবু, অনুভবের ধার মরে গেলেও, কোথাও গভীর পরতে একটা কাঁটা ছিল।

যে-নিস্পৃহতা এলে সেই কাঁটা অবলীলায় তুলে ফেলা যায়, তা এখনো পুরোপুরি আসেনি অমলের।

এখানে গাড়ি না হলে দূরে যাওয়া কঠিন। মুণ্ডারা ছাড়া আর কেউ এখানে হেঁটে দূরে যাওয়া-আসা করে না। অমল অফিসার নয়, তার হেফাজতে গাড়ি নেই। তবে রাঘবনের জীপ অমল পেতে পারে, সহজেই পেতে পারে। জীপ নিয়ে পাঁচ মাইল নেমে গিয়ে, আসল রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে একটু বেঁকে যাওয়া কিছু কষ্ট নয়। এর মধ্যে পাঁচ মাইল নেমে, আসল রাস্তা ধরে আরো অনেক দূরে গিয়েছেও কয়েকবার। শুধু বাঁয়ে একটা বাঁক নেওয়া হয়নি। বস্তুত যখন অবলীলায় বাঁয়ে ওই বাঁক নেওয়া যায় সেই বয়েসে এখনো পৌঁছয়নি অমল।

কাজে মন্দা এলেও কাজ কিছু ছিল। প্রতিদিন অন্তত অফিসবাড়িতে যেতে হচ্ছিল একবার। দিনগুলো তবু কাটছিল। দিনগুলো দুঃসহ হলেও রাত্রির মতো মারাত্মক ছিল না।

পাহাড়ের ওপর টুকরো শহর তৈরি করা হয়েছে। তার অনেক অপূর্ণতা। সব রাস্তা মসৃণ হয়নি, স্নানেরঘরে এখনো জল আসেনি, গোটা দশেক কোয়ার্টারের জন্য রাস্তায় একটা করে জলের ট্যাপ, সেখান থেকে জল টানতে হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এক-একদিন। তবু আনকোরা শহর, ছবির মতন। নতুন বলে তার কোনো ত্রুটি এখন চোখে লাগে না। হাওয়ায় বেশ শহুরে শৌখিনতা।

তথাপি অমলের মনে হচ্ছিল, টাউনশিপে বৃষ্টির ঋতুতে রাত্তির আসে এই অরণ্যের আদিমতার স্বাদ নিয়ে। এমন রাত্রিতে নির্জনঘরে ঘুম না এলে শুধু যন্ত্রণা। ভয়ংকর একা লাগে। কয়েক পা গেলেই কাছের কোয়ার্টারে যে অন্য কারো, তার কোনো সহকর্মীর দেখা মিলবে, এই চেতনা লুপ্ত হয়।

ঘুমের জন্য অমল নানাবিধ ফন্দিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। রাত বাড়লে বিছানায় গিয়ে সব ভাবনার গলা টিপে রাখতে চেয়েছে। পারেনি। পারা যায় না। ভাবনার সুতো ছেড়ে দিয়েও দেখেছে, ঘুম আসেনি। কাছের কথা ভেবেছে, দূরের কথা ভেবেছে। দূরের মেঘাহাতুবুরুকে অনেকেই মেঘাতিবুরু বলে। নামটাকে ঘুড়ির মতন উড়িয়েছে। মেঘাতি-বুরু যেন মেঘ আর হাতির পাহাড়। বৃষ্টির সময় মেঘ অনেক নিচে নেমে এসে শালের অরণ্যশীর্ষ ছুঁয়েছে, আর ধূসর মেঘের রঙের হাতির পাল নামছে ঢাল বেয়ে। তারা উপত্যকায় নেমে গেলে পাহাড়ের উতরাই শান্ত। পুরো দৃশ্যটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ চোখের মধ্যে তিলে তিলে তৈরি করেছে। তখনো ঘুম আসেনি। কখনো ঘুম এলেও অজস্র বিচিত্র স্বপ্ন।

দুএকটা রাতের অভিজ্ঞতার কথা অমল কোনোদিন কাউকে বলতে পারবে না। নিজের কাছ থেকে লুকোতে পারলেও বাঁচা যেত। এমন রাত্রিতে নির্জন অন্ধকার ঘরের বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে প্রথমে কারো চুলের গন্ধে তার নেশা হয়েছে। তারপর কারো শুধু বিশেষ উচ্চারণে চিহ্নিত কথা নয়, কারো শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকা নয়,—কারো শরীর, কারো ঢেউয়ের মতন শরীর তাকে অতলের দিকে অনিবার্য টান দিয়েছে। তখন পাঁচ মাইল দূরকে দূর মনে হয়নি, ভেবেছে এখনই হেঁটেই পার হওয়া যায়। পাহাড়টাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে পাঁচ মাইল নেমে-যাওয়া পথটাকে না জানলে, সার্ভেঅরের চোখ দিয়ে দেখলে ভার্টিক্যাল ড্রপ্ তো মাত্র বারশো ফুট, পায়ের তলার বিন্দু থেকে ভারবাঁধা সুতো সোজা গভীরে নামিয়ে দিলে মাত্র তো বারশো ফুট দূর!

এমন অভিজ্ঞতার পর কখনো আবার মনের পরতে বিঁধে থাকা ধারাল কাঁটাটার অস্তিত্ব বিষয়ে পূর্ণ চেতনা ফিরে এসেছে, চুলের গন্ধের নেশা কেটে গেছে। উথালপাতাল অস্থিরতা শান্ত হয়ে এলে, ঘরের অ্যাস্‌বেস্টসের চালে বাচ্চা বেড়ালের আকারের গেছো ইঁদুরের ছুটোছুটির শব্দ শুনেছে। অবশেষে ঘুম এসেছে ভোরের একটু আগে।

এমন এক রাত্তিরের পর সকালে বিছানা ছেড়ে অমল কোনো কাজ খুঁজে পেল না। অফিসবাড়িতে অনেক বেলায় গেলে চলবে। তার আগে শুধু দাড়ি কামাতে হবে, কুকারে চাপাতে হবে কিছু, স্নান সারতে হবে। এগুলোকে আজ ঠিক কাজ মনে হল না। হঠাৎ খেয়াল হল, চাল নেই। রেশন আনতে ভুলে গিয়েছিল। চাল ফুরিয়েছে শুনে কাল

অ্যান্দ্রিয়াস বলেছিল তাদের হাঁড়িয়ার জন্য আলাদা করে রাখা চাল থেকে কিছু পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায়, শুকমতী তো চাল নিয়ে এল না।

বেসক্যাম্পে থাকতে সে আর সুনন্দ রান্না করার ঝামেলা এড়াবার জন্য একটা মতলব করেছিল। একটি রান্না করার লোক রাখতে চেয়েছিল দুজনের জন্য। অফিসবাড়ির দরোয়ান অনন্তরাম আশাও দিয়েছিল, একটি ভাল লোক খুঁজে দেবে। অমল ওপরে উঠে আসায় কিছুই হয়নি।

হিটার থেকে গরম জলের কেটলি নামাবার সময় অমল দেখল, কুকারটা বেশ নোংরা হয়ে এক পাশে পড়ে আছে। আজ আর হয়ত কোনো কাজে লাগবে না।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে লোহার চেয়ারটা টেনে বারান্দায় এসে বসল। সকালবেলা বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ নীল, আশীর্বাদের মতো। সকালের প্রথম রোদ পড়েছে সামনের কোয়ার্টারের শাদা রঙের অ্যাস্‌বেস্টসের চালে, আশপাশের কয়েকটা শালগাছের পরিচ্ছন্ন পাতায়।

চোখ দিয়ে কয়েকটা ক্ষিপ্র কাঠবেড়ালীকে অনুসরণ করে এখন অমল একটা বিচিত্র গিরগিটিকে দেখছিল। আশ্চর্য বহুরূপী। কোয়ার্টারটার সামনের রাস্তার দুপাশেই কয়েকটা ইটের স্তূপ সাজান রয়েছে। একজন কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার বলেছিলেন, ইটগুলো খারাপ। কনট্রাক্টর কম্পানি ঠকাচ্ছিল। ইটগুলো তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। অমল অবশ্য বুঝতে পারছিল না কেন খারাপ। এই ইটের একটা স্তূপের ওপর গিরগিটিটা বসেছিল। লম্বায় প্রায় একফুট। কণ্ঠার ত্বক নিয়মিত এবং লেজটা মাঝে-মাঝে নড়ছিল। একটু আগে বসে-ছিল কাল রাত্তিরে ঝড়ো হাওয়ায় খসে পড়া বড় একটা পাতার ওপর। তখন গিরগিটিটার রঙ সবুজ ছিল। এখন ইটের স্তূপের ওপর বসে হালকা হলুদ।

খানিকক্ষণ থেকে অমল আরো একটা জিনিস দেখছিল। একটা ছোট কাঠবেড়ালী অথবা দ্বিতীয় একটা গিরগিটি অথবা অন্য কিছু। ইটের স্তূপের পাশে মাটিতে থেকে থেকে পাক খাচ্ছিল। চায়ের কাপটা মেঝেয় রেখে অমল বারান্দা থেকে নেমে এল। ইটের স্তূপের কাছে আসতে নিমেষে উধাও হল গিরগিটিটা। দেখল, একটা আহত কাঁকড়াবিছে আহ্লাদে না, যন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। শোখানেক পিঁপড়ে ছেয়ে রয়েছে তাকে। তার গায়ের কটাশে রোঁয়া কুচিকুচি করে কাটতে চাইছে পিঁপড়েগুলো, তার থেঁতলানো জায়গাটায় গিয়ে বেশী জমেছে নিঃশব্দ উল্লাসে।

কাঁকড়াবিছেটার অঙ্গে এমন আঘাত কী করে লাগল। সম্ভবত কাল রাত্তিরে ঘটেছে ব্যাপারটা। কাল রাত্তিরে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ছিল। যত্নে সাজানো কাছের কোনো ইটের স্তূপ কি ভেঙে পড়েছে। অথবা ওর মতন আর একটার সঙ্গে কামড়াকামড়ি, ছেঁড়া-ছিঁড়ি করেনি তো! অমল বুঝতে পারল না।

একটা শুকনো সরু ডাল কুড়িয়ে এনে অনেক চেষ্টায় পিঁপড়েগুলোকে তাড়াল। পেটের তলায় রাখতে ডালের ডগাটা জড়িয়ে ধরল বিষাক্ত বিছেটা। ডালটার অপর প্রান্ত ধরে অমল সন্তর্পণে তুলে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে খানিক দূরে। একটা পাথরের চাঁইয়ের কোলে নামিয়ে রেখে এল। চাংড়াটার তলায় ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করুক। এমন যন্ত্রণা দেখলে খারাপ লাগে, প্রীতম সিংয়ের কথা মনে এলেও খারাপ লাগে।

ইতিমধ্যে রোদ কড়া হয়ে উঠেছিল। অ্যান্দ্রিয়াস অথবা শুকমতী এল না। ওরা হয়ত বুঝতে পারেনি, অমলের আজই চাল দরকার। এখন নিজে বেরোলে চাল সংগ্রহ করা যায়,

কিন্তু ইচ্ছে করছিল না।

দাড়ি কামিয়ে অমল গাল থুতনি মোলায়েম করল, তখনো শুকমতীরা কেউ এল না। আয়নায় দেখল, চোখ দুটো লালচে, একটা চোখ একটু বেশী লাল। আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মুখের আদল যেন বদলে যাচ্ছে। তা কি হতে পারে, চেহারা কি বদলায়। একা ঘরে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পুরুষমানুষের লজ্জা হওয়া উচিত। আয়নাটা সরিয়ে রেখে, জামাটা গলিয়ে অমল দরজা বন্ধ করে বাইরে এল। আর-এক পেয়ালা চা খাবে।

টুকরো শহরটাকে দুভাগ করে কেটে চওড়া রাস্তাটা দক্ষিণে চলে গেছে। সেই বড় রাস্তার পশ্চিমে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে সম্প্রতি তিনচারটে দোকান হয়েছে। তার মধ্যে একটি ভরতচন্দ্র গিরির চায়ের দোকান। অনেক সাধনার ফসল। ভরতের পাশে সাহুর দোকান, সেখানে সব সময় সব থেকে বেশী ভিড়। শাড়ি থেকে তেল, পেঁয়াজ থেকে শাম্পু সব পাওয়া যায়। শহর সম্পূর্ণ হলে এখানে বাজার বসবে। এখনই রবিবারে মুণ্ডারা মুড়ি, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বেচতে আসে।

ভরতের দোকানে অমল একটা বেঞ্চে বসল। সামান্য দাঁত দেখাল ভরত, অমল আসার জন্য বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করল না। ভরত বদলে গেছে। যাকে বলে দুটো পয়সার মুখ দেখছে বোধহয় এখন। নয়নতারা বিষয়ে অমল তাকে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করেনি।

দোকানে আরো দুচারটে লোক ছিল। মজুর। বাবুরা বিশেষ আসেন না এখানে। পরে দোকানের রূপ বদলালে আসবেন। ভরত ঝুরিভাজার মতন একটা জিনিস তৈরি করে, সেটার কিছু খ্যাতি হয়েছে। অনেক বাবুকে অমল দেখেছে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই ঝুরিভাজা কিনে নিয়ে যেতে।

ভরতের কাছে হয়ত মুরগির ডিম আছে। ফেরার সময় ডিম এবং সাহুর দোকান থেকে রুটি আর মাখন নিয়ে যাবে ভাবছিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল অমল। আকাশ এখনো নীল। বৃষ্টির ঋতু কি শেষ হল। কেমন করে হবে। আরো তিন মাস ধরে চলবে বৃষ্টি। একটা অচেনা পাখি উড়ে গেল একটু দূর দিয়ে। এখানে পাখিটাখি তেমন চোখে পড়ে না। ব্লাস্টিংয়ের শব্দে দূরে চলে গেছে। দুপুরের রোদ্দুরে সব কিছু পুড়ে যেতে থাকলে অমলের মনে হয়েছে, কাক না ডাকলে শূন্যতার বোধ নিখাদ হয় না। অথচ, কী আশ্চর্য, এই ক'বছরে এখানে একটিও কাক দেখেনি, কখনো কাকের ডাক শোনেনি। কোনোদিন এখানে একটা কুকুরও দেখেনি অমল। এখানে কাক আর কুকুর নেই। এদিকটায় ব্লাস্টিংয়ের শব্দ থামলে, শহর সম্পূর্ণ হলে ওরা আসবে।

একটা বছর সাতের মুণ্ডা ছেলে অনেকগুলো কাঁচা সবুজ শালের পাতা এনে ভরতকে দেখাল। ভরত গুনে দেখল, পঁচিশটা। ছেলেটাকে আরো আনতে উৎসাহ দিয়ে জানাল, একশোটা হলে চারটে পয়সা দেবে। লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হল ছেলেটা। অমলের আরো এক কাপ বিস্বাদ চা শেষ হলে যখন উঠবে ভাবছে, ছেলেটা আবার এল। তার এক টুকরো নোংরা কাপড় পরা দেখেছিল। এখন সেই কাপড়ে জড়িয়ে এক বোঝা সবুজ পাতা নিয়ে এসেছে। নিজে উলঙ্গ, ছোট কালো শরীর বেয়ে ঘামের ছড় নামছে।

পাতাগুলো নিয়ে ভরত তার হাতে পয়সার বদলে কিছু ঝুরিভাজা দিল, যার দাম দুপয়সার বেশী হবে না। একবার শুধু ভরতের মুখের দিকে লুকিয়ে তাকিয়ে কোনো

কথা না বলে চলে যাচ্ছিল ছেলেটা। অমল 'এই এই' করে ডাকল। ঝুরিভাজা চিবোতে-চিবোতে ছেলেটা ফিরে দাঁড়ালে অমল তার দিকে একটা দশপয়সা ছুঁড়ে দিল। উঠে গিয়ে তার হাতে দেবার বাসনা হয়েছিল, তবু ভরতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য ছুঁড়ে দিল দূর থেকে।

ভরত অবশ্য এবংবিধ ছেলেমানুষিকে মোটেই প্রশ্রয় দিল না। বরং একটু করুণার হাসি লুকোল তার মুখে নিবন্ধ অমলের দৃষ্টি থেকে।

অমল ভাবছিল, নয়নতারার কোয়ার্টারে রান্নার কাজ ছেড়ে ভরত নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তার দোকানের রূপ বদলাবে।

ঘরে ফিরবার সময় বড় রাস্তায় প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে দেখা। রাস্তাটা দক্ষিণে প্রস্‌পেক্‌টিং ক্যাম্পের দিকে গিয়েছে। সেখানে রাঘবনের কোয়ার্টারে যাচ্ছিল প্রীতম। অমল ভাবল, ডিমরুটি রেখে দিয়ে আজ ইচ্ছে করলে দাক্ষিণী খাদ্যের স্বাদ নেওয়া যায়। শুধু প্রীতমকে বলতে হবে রাঘবনের স্ত্রীকে জানাতে। সে-কথা অবশ্য বলল না। প্রীতমকে বলল, রাঘবনকে নিয়ে এই পথে যাবার সময় অমলকে যেন জীপে তুলে নিয়ে যায়। অমল প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আজ আর হাঁটবে না প্রস্‌পেক্‌টিং ক্যাম্প পর্যন্ত।

সেদিন সন্ধ্যের আগে শুকমতী এসেছিল। চায়ের জন্য দুধ এবং হাঁড়িয়ার চাল নিয়ে এসেছিল। ছোট-ছোট অথচ মোটা লাল চাল। ওরা বুঝতে পারেনি, সকালেই অমলের চালের দরকার ছিল।

শুকমতী বুঝতে পেরে লজ্জিত হল। একটু পরে লজ্জা কেটে গেলে হেসে বলল, আগে জানলে সে সকালেই আসত এবং অমলের সম্মতি থাকলে রান্না করেও দিত। অমল একবার বলুক না, সে রোজ এসে রান্না করে দিয়ে যাবে। বাঙালীদের রান্না এমন কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়।

শুকমতী অমলের কাছে বড় বেশী সহজ। এসে দুচার মিনিট না বসে, কয়েকটা মন্তব্য না করে যায় না। তার সঙ্গে কথা বলা অমলের পক্ষে সহজ নয়। মুণ্ডাদের ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু বাঙলা শব্দের মিল থাকলেও, শুকমতী বাঙলা ভাল জানে না, অমলও মুণ্ডাদের ভাষায় কথা বলতে পারার মতন শেখেনি। শুকমতীর হিন্দিও সব সময় বোঝা যায় না। অ্যান্ড্রিয়াস অবশ্য হিন্দি ছাড়া দুচারটে ইংরেজি শব্দও জানে।

শুকমতী অন্য কাউকে দুধ দিতে গিয়ে এমন করে না। আর সবার সামনে অত্যন্ত মিতবাক থাকে। এমনকি সুনন্দর বারান্দায়ও এক মিনিটের বেশী দাঁড়াতে দেখেনি তাকে।

অথচ অমল যেন তার কাছে অ্যান্ড্রিয়াসের মতন। অথবা শুকমতীও কি ভাবে, অমল পুরুষমানুষ হলেও এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি!

অ্যান্ড্রিয়াসের বোনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অমল এইসব ভাবছিল।

## আট

দুতিন দিন বৃষ্টি ছিল না। আবার শুরু হয়েছে। ঝিরঝির বৃষ্টি, থামছে না, বাড়ছেও না। মসলিনের মতন হালকা বৃষ্টিকে বেশী আমল দেওয়া যায় না। কমছে কিনা কিছুক্ষণ দেখে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরোতে হয়, কাজ করতে হয়।

সন্ধ্যেয় অমল হাওয়ায় উড়েউড়ে আসা বৃষ্টির গুঁড়ো চোখে মুখে চুলে মেখে প্রস্‌-পেক্‌টিং ক্যাম্পে রাঘবনের কোয়ার্টার থেকে ফিরছিল। টাউনশিপ এবং প্রস্‌পেকটিং ক্যাম্পের মাঝখানে বিরাট একটা হ্রদ। উত্তর-দক্ষিণে এপার থেকে ওপারে প্রায় দেখা যায় না। পূব-পশ্চিম একটু চাপা। টাউনশিপকে দুই অংশে কেটে বড় রাস্তাটা দক্ষিণে প্রস্‌-পেক্‌টিং ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে হ্রদের পূবপাড় ঘুরে। সেই জীপ চলার মতন রাস্তাটা দিয়ে অমল হেঁটে টাউনশিপে ফিরছিল।

হ্রদটায় কয়েক মাস জল থাকে। এখন অবশ্য বৃষ্টির জল জমেছে। হ্রদটাকে গভীর করা হচ্ছে, সারা বছর জল থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হ্রদের দক্ষিণে প্রস্‌পেক্‌টিং ক্যাম্প, পূবপাড়ে রাস্তা, উত্তরে বড় স্কুল ও সত্যিকার হাসপাতাল তৈরি হবে, পশ্চিমে এখনো ঘন জঙ্গল। হ্রদটার ওপর দিয়ে একটা সুন্দর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনার কথা অমল শুনেছে। পূবপাড়ের অর্ধবৃত্তের মতন রাস্তাটা নাকি রাত্তিরে উদ্ভাসিত হবে টাংস্টেন আলোয়। তখন বিলাস-ভ্রমণের কেন্দ্র হবে জায়গাটা। এখন অবশ্য এই রাস্তায় আলো নেই।

পাথরকুচির ওপর নিজের ভারী জুতো নিয়মিত পড়ার শব্দ শুনছিল অমল। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। অন্ধকার ঘন হবার আগে টাউনশিপে পোঁছবার ইচ্ছেটা কাজ করছিল। আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছিল টাউনশিপের কয়েকটা কোয়ার্টারে। এই ফাঁকায় এখনো অন্ধকার স্বচ্ছ। দূর এখনো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট।

হ্রদের পশ্চিম পাড়ে জঙ্গলের কিনারে এক আশ্চর্য দৃশ্যে অমলের চোখ আটকে গেল। যেন গভীরতর অন্ধকারের কয়েকটা বড়-বড় চাঁই উন্মত্ত ক্ষিপ্রতায় পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যাচ্ছিল একটু দূরে। অমল একা আসছিল, পুরো এলাকাটা নির্জন। সিরসির ভয় সঞ্চারিত হল শরীরে। দাঁড়িয়ে পড়ায় জুতোর শব্দ থেমে গিয়েছিল। তখন হ্রদের ওপার থেকে কিছু দুর্বোধ্য শব্দও হাওয়ায় উড়ে এল। অন্ধকার পাতলা হলেও ঝিরঝির বৃষ্টির জন্য দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তবু দৃষ্টিতে ধার এনে সেই দৃশ্যের পাত্রপাত্রীদের অমল চিনতে পারল। চার-পাঁচটা বুনো মোষ। কেন যে এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে বুঝতে পারল না।

অমলের আতঙ্ক কেটে গেল। দাঁড়িয়ে দেখল, প্রতি মুহূর্তে দূরের দৃশ্যটা আরো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মেঘ খুব নিচে নেমে এসেছে। এখনই দৃশ্যটা অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। এর মধ্যে বৃষ্টি একটু বেড়ে গেল। আবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে অমল ভাবছিল: এত ব্লাস্টিংয়ের আওয়াজ, এত জীপট্রাকের গর্জন, হাজারখানেক লোকের এত আনাগোনা, তবু এই অঞ্চলের অরণ্যের আদিমতা প্রায়ই অন্ধকার বিবর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে আসে।

হ্রদের পাড় থেকে টাউনশিপে উঠে এসে অমল ভরতের দোকানের দিকে গেল। আরো একটু চা খাবে। বেসক্যাম্প ছেড়ে এসে চা খাওয়া বেড়ে গেছে। আশ্চর্য, দোকানের কাছে আসতে বৃষ্টিটা থামল। অবশ্য বৃষ্টির জন্য অমলের তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না। তার গায়ে বর্ষাতি ছিল। সাহুর দোকানে বড় বেশী আলো, চোখে বিঁধছিল। বেশ লোকের ভিড়। মজুররা ছাড়া বাবুরাও অনেকে এসেছেন। কেনাকাটা করতে সাহুর দোকান ছাড়া গতি নেই। সেখানেই বেশী লোক। ভরতের দোকানে জনদশেক বসেছিল, সামনে সবুজ শালপাতায় ঝুরিভাজা, আলুর চপের মতন একটা কিছু এবং চায়ের কাপ।

অমল বর্ষাতি খুলে ভেতরে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল।

শনিবারের সন্ধ্যে, আজ সপ্তাহের মজুরি পেয়েছে শ্রমিকরা। বৃষ্টিটাও থামল এই

মাত্র। সব মিলে বেশ উৎসবের আবহাওয়া। ভরত একটা বাচ্চা ছেলেকে রেখেছে দোকানে। সে চা দিয়ে গেল। চায়ে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে মুখ বিকৃত করে অমল বাইরের দিকে তাকাল। সামনের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে একটি তরুণ মুণ্ডা মজুর যাচ্ছিল, হাতে বাঁশি, তার পেছনে তিনটি মুণ্ডা তরুণী। হাঁটতে হাঁটতেই সে বাঁশিটা বাজাচ্ছিল এক-একবার। পেছনের মেয়ে তিনটি পা ফেলছিল নাচের ভঙ্গিতে। চারজনই হাসছিল শব্দ করে। ঘরে আজ নিশ্চয়ই হাঁড়িয়া মজুত। মেয়ে তিনটি আজকের জন্য কেচে রাখা পরিচ্ছন্ন শাড়ি পরেছে। তাদের চুলে সযত্নবিন্যাস।

কলকাতা-কটক-পাটনা থেকে আসা কিছু শ্রমিক ফাঁকা জায়গায় জটলা করছিল। তাদের একজন মেয়ে তিনটির উদ্দেশে দুচারটি রসাল মন্তব্য করল। একজন একটি মেয়ের শাড়ির কোণ ধরে একটু টেনে ছেড়ে দিল। একটা বিশ্রী গোলমাল পাকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে দেখতে আশপাশ থেকে অনেক মুণ্ডা মজুর রুখে এল।

ব্যাপারটা অবশ্য গড়াতে পারল না বেশী দূর। অমল এবং শহর থেকে আসা অন্য কয়েকজন শ্রমিক ছুটে এল। মুণ্ডাদের মধ্যে দেখা গেল কয়েকজন খুব চেনা—গুমিদা, বুধনী, ম্যাথু। গোলমাল মিটে গেল, সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল অপরাধী দুজন।

মিটে গেল, তবু অমলের খুব খারাপ লাগছিল। একটা অবশ্য সান্ত্বনার কথা ছিল। শহর থেকে আসা অন্য মজুররাও অপরাধী দুজনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু বাবুরা এসে শ্রমিকদের অশান্তি মেটান নি।

কোয়ার্টারে ফিরে আগের এক অশান্তির কথা ভাবছিল অমল। সেবার এর থেকে অনেক বেশী অশান্তি হয়েছিল। তখনই প্রথম সুনন্দর কাছে তার সমাজদর্শনের ব্যাখ্যা শুনতে হয়েছিল।

হোলির দিন এই হাজারখানেক নির্বাসিত লোকের মধ্যের নানাবিধ স্তরবিন্যাসের পাঁচিল ভেঙে পড়েছিল। উৎসবের উল্লাসে প্রায় হন্যে হয়ে উঠেছিল সবাই। বেলা বাড়লে কন্ট্রাক্টর কম্পানির একজন অফিসার একান্তভাবে শুধু তার ঘরে এসে উৎসবে মত্ত হবার জন্য একটি মুণ্ডা মেয়ের ওপর জোর করেছিল। মেয়েটার ক্ষুব্ধ অভিযোগ ছড়িয়ে পড়লে মারাত্মক অশান্তি শুরু হয়েছিল।

মুণ্ডা মেয়েদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা অনেক কম। তবু সেবার অজস্র অরণ্যচারী পুরুষ মুণ্ডা ধনুক আর বিষাক্ত তীর নিয়ে হানা দিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু একটি প্রদেশ থেকে আসা লোকরা, যাদের মাথায় পাগড়ি, গোঁফদাড়ি ওপর দিকে টেনে বাঁধা। কারণ অফিসারটি ছিল ওই প্রদেশের। তীর ছোঁড়ার সময় তারা শ্রমিক এবং অফিসারদের আলাদা চোখে দেখে নি। আলাদা করে নি বলে সুনন্দ বড় দুঃখ পেয়েছিল। হানাহানি কোন্ পথ ধরলে সে দুঃখ পেত না তাই বুঝিয়েছিল অমলকে, তার সমাজদর্শন বিশ্লেষণ করেছিল।

কয়েকদিন ধরে আতঙ্কে ঝিম মেরে ছিল পুরো অঞ্চলটা। ছায়ার মতন ঝাঁক ঝাঁক মুণ্ডারা এসেছিল, যাদের আগে কখনো দেখা যায় নি। শহর থেকে একদিনের পুরোন খবরের কাগজ আসছিল ভয়ঙ্কর সব বিবরণ বয়ে। তার কিছু অতিরঞ্জিত, কিছু সত্যি। সব খবর অবশ্যই মিথ্যে ছিল না। অমল নিজেও তো একাধিক তীরবিদ্ধ মৃতদেহ দেখেছে।

প্রীতম সিং দুদিন তিন রাত্তির বেসক্যাম্পে অমলের কোয়ার্টারের পেছনের বারান্দায় একটা বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তখন তাকে কাঁকড়াবিছেয় কিছু করল না। তখন হুল ফোটালে নাটক আরো জমজমাট হত।

সৈন্যরা এসে টহল দিতে শুরু করায় হানাহানি থেমেছিল। প্রায় পনের দিন ছিল সৈন্যরা।

রাত্তিরে আবার বৃষ্টি নামল। ঝিরঝির বৃষ্টি না, আকাশ ভেঙে নামল। শুনেছে, বৃষ্টি গান করে। সেই গানে ঘুম পায়। অথচ অমল লক্ষ্য করেছে, বৃষ্টির ধ্বনিতরঙ্গে তার ঘুম আসে না। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুমের মধ্যে মধ্যরাত্রিতে বৃষ্টি নেমেছে। তখন বিরামহীন ধ্বনিতরঙ্গের আঘাতে জেগে উঠবে, তখন কাছের ও দূরের, আজকের ও অতীতের সব কিছু পরস্পরের সঙ্গে মিশে একাকার হবে।

তখন নিজের কোনো একান্ত গোপন প্রতিজ্ঞাও মেনে চলা কঠিন। ফাটল বেয়ে নেমে আসা কালচে রক্তের মতন মাটিগোলা জলের সঙ্গে সব ভেসে যায়।

ভোরের দিকে বাইরেটা একটু স্বচ্ছ হয়ে এলে বৃষ্টি থামল। শীত-শীত করছিল অমলের। আরো কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে এক ঝটকায় উঠে পড়ল। হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে চোখমুখ ধুয়ে এল। দুধে প্রচুর মরা পিঁপড়ে ভাসছে। ভাল করে ঢেকে রাখে নি। এক পেয়ালা দুধছাড়া চা করে জানলার পাশে বিছানায় এসে বসল। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে জানলার একটা কাঁচের পাল্লা খুলে দিল। ভোরের হাওয়া আসুক ঘরে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া এল, তার সঙ্গে জানলার দিকে এগিয়ে এসে বাঁয়ে সরে গেল অনেক কাল ভুলতে না পারার মতন একটা দৃশ্য। ছায়া-ছায়া অন্ধকার ছিল তখনো। কোনো কোয়ার্টারের দরজাজানলা খোলে নি। বাইরেটা একেবারে নির্জন। শুধু একটা মুরগিকে ঘিরে অনেকগুলো ছানা ভিজে মাটিতে অস্থির ঠোঁট বসাচ্ছিল। ডানদিক থেকে এসে একটা বুনো মোষ জানলার পাশ দিয়ে মন্থর পায়ে বাঁয়ে চলে গেল। তার একটা চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এসে দু ইঞ্চি নিচে ঝুলছিল। কাল সন্ধ্যেয় হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে এতটা বীভৎসতা আন্দাজ করা যায় নি।

বুনো মোষই হবে। অন্তত চেহারা দেখে অমলের তা-ই মনে হল। কিন্তু টাউনশিপের রাস্তায় কোয়ার্টারের সারির মাঝখানে, ছায়া-ছায়া অন্ধকার থাকলেও, একটা আস্ত বুনো মোষের চলে আসা কি স্বাভাবিক। একটা চোখে দৃষ্টি না থাকলেও, আর একটায় তো আছে। নাকি এমন বন্যই দেখতে শুকমতীদের এবং হরোমটো গ্রামের অন্য মোষগুলো। এমন ভয়ঙ্কর চেহারার মোষের দুধ মিশিয়ে চা খায় নাকি অমল!

সোমবার সকালে অমল অফিসবাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। রাঘবনের হেফাজতে আজ জীপ নেই, অন্য কেউ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে নিয়েছেন। রাঘবন নিশ্চয়ই আজ অন্য কোনো অফিসারের গাড়িতে যাবেন। অমল কেমন করে যাবে ভাবছিল। এখান থেকে অফিসবাড়ি অন্তত চার মাইল। হাঁটতে উৎসাহ পাচ্ছিল না। অফিসার ছাড়া অন্য কর্মীদের আনা-নেওয়া করার জন্য একটা বাস এসেছে। প্রায় অবিশ্বাস্য দাম দেওয়া হয়েছে সেটার জন্য। শুনেছিল, এমন বাস নাকি এদেশে কয়েকটি মাত্র আছে। অথচ কোনো রহস্যজনক কারণে বাসখানা এখানে এসে পৌঁছবার পর প্রায়ই অচল হয়ে বেসক্যাম্পে পড়ে থাকে। আজও সেই বাস আসবার সময় চলে গেছে অনেকক্ষণ।

একখানা জীপ আসছিল। অমলের কোয়ার্টারের সামনে এলে গতি কমে গেল। ভেতর থেকে একজন চিৎকার করে ডাকল: 'মিত্তির, যাবে নাকি?'

বারান্দা থেকে লম্বা লাফ মেরে একটু দৌড়ে অমল আবার লাফিয়ে জীপে উঠল।

ইলেকট্রিক্যাল সেকশনের গাড়ি। দাস, মহাপাত্র, আচার্য ও আরো দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার বসে ছিল। আচার্য বলল, 'তোমাদের গাড়ি কী হল, মিত্তির?'

অমল তাদের গাড়ি কেন আসেনি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল, দেখল ক্যাশিয়ার মুখার্জিবাবু তাঁর কোয়ার্টারের সামনে থেকে ছুটে এসে জীপ থামালেন হাত তুলে। মুখার্জিবাবু অমলের দিন পনের আগেই টাউনশিপে এসেছিলেন। এখন একমুখ হেসে জীপে উঠতে এলেন। এই বয়েসে এতটা হেঁটে তাঁর পক্ষে অফিসে যাওয়া কঠিন। জীপটা পেয়ে গিয়ে খুব খুশী।

মুখার্জিবাবু অমলদের মতন একলাফে উঠতে পারেন না। ডান হাতে জীপের পেছনের একটা রড ধরেছেন, ডান পা শূন্যে, বাঁ পা তখনো রাস্তায়, সেই মুহূর্তে দাস অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বলল, 'গাড়িতে জায়গা হবে না। অত চাপাচাপি করে যাওয়া যায় না মশাই।'

মুখার্জিবাবুর নীল শিরা-জাগা মাখনের রঙের হাত জীপের অঙ্গ থেকে খসে গেল, শূন্যের পা আবার নেমে গেল রাস্তায়। দাসের ইঙ্গিতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

অমল দেখছিল, বিষাক্ত সাপের ছোবল খেয়ে মুখার্জিবাবু চমকে দাঁড়িয়ে, চওড়া উজ্জ্বল কপালে সকালের রোদ চিকচিক করছিল, সারা মুখ এবং সেই কপাল নীল হয়ে আসছে বিষের যন্ত্রণায়, একমাথা শাদা চুল এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছিল। ক্রমান্বয়ে তাঁকে আরো দূরে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল জীপটা।

দাসের দিকে অমল তাকাল। শাদা শার্টপ্যান্ট পরা একটা সংক্ষিপ্ত শরীর বসে আছে। মুখে অস্বাচ্ছন্দ্যের বিবর্ণতা। একটা হিলহিলে পিচ্ছিলতা জামায় না-ঢাকা অঙ্গে। পচা অহঙ্কার বেয়ে-বেয়ে পড়ছে। মুখার্জিবাবুর তুলনায় কী সামান্য, কী ছোট! বস্তুত কোনো তুলনা হয় না। লোকটার প্রতি প্রীতি অসম্ভব, করুণাও হয় না। ঘৃণা করা পাপ, তবু ঘৃণা ছাড়া আর কোনো অনুভব অবয়ব পায় না।

মুখার্জিবাবুর বয়েস ষাট। এত বয়েসের আরো দু-একজন আছেন এখানে। তাঁকে এখনো চাকরি করতে হচ্ছে, কারণ তাঁর মেয়েরা বড়, ছেলেরা ছোট। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেরা এখনো সমর্থ হয়নি। তাঁর বড় মেয়ের বয়েস হবে দাসের। কতকাল আগে বি-এস্‌সি পাশ করেছিলেন মুখার্জিবাবু। ইংরেজি, বাঙলা হাতের লেখা ছাপার মতন, এই বয়েসেও লিখতে গিয়ে হাত কাঁপে না। বাড়ি ছিল পূব বাঙলায়। বেঁচে থাকা যে এত কঠিন দেশ-বিভাগের আগে বুঝতে পারেন নি। একদা তাঁর সঙ্গে প্রচুর গল্প করার অভ্যেস ছিল অমলের। অফিসের কাজ বিষয়ে দায়িত্ববোধ, ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে থাকার কষ্ট, রাত্তিরে নির্জন অন্ধকার ঘরে তীব্র মৃত্যুচেতনা, এই তিন মিলে মুখার্জিবাবু।

এখানে চাকরি নিয়ে আসবার আগেই দাসকে চিনত অমল। টালিগঞ্জে তার এক বন্ধুর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দোকান আছে। দাস সেই বন্ধুটির পাড়ায় থাকত। আড্ডা দিতে যেত তার দোকানে। সেখানেই শিখেছিল, দুটো তার জুড়ে দিলে আলো জ্বলে। দোকানের মালিক দোকানের নামছাপা কাগজে দাসকে সার্টিফিকেট দিয়েছিল চাকরিবাকরির সুবিধের জন্য। সুবিধে হয়েছে, দাস এখানে অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছিল বলে আরো সুবিধে হয়েছিল।

আরো সুবিধে আছে। দাসকে নিজের নাম সই করা ছাড়া কখনো আর কিছু লিখতে হয় না।

বনাই-কিয়নঝড় পর্বতমালায় সঞ্চিত লোহার ঐশ্বর্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্তরের যে-হাজারখানেক লোক এসেছে, প্রথম প্রথম তাদের প্রত্যেকের প্রতি অত্যন্ত স্নিগ্ধ ছিল অমল,

একটা একাত্মতার বোধ ছিল। প্রতিদিন সেই বোধ আরো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই অরণ্যে আগে থেকেই বিষ ছিল; আরো বিষ এসেছে দূর শহর থেকে।

অমল নিজেও তো অফিসার নয়। তবে কেন আচার্য তাকে ডেকে নিল। অমল না উঠলে আরো ছড়িয়ে বসতে পারত ওরা। মুখার্জিবাবুর উদ্দেশে দাসের ওই মন্তব্যের পর সবাই এখন কেমন চুপচাপ। শুধু দাস কিছুই ঘটেনি এমন ভাব আনবার জন্য মহাপাত্রের সঙ্গে জলো রসিকতা করছিল। অমল না থাকলে কি মুখার্জিবাবুকে ফেলে আসার পরও ওরা পুরোপুরি সহজ হতে পারত।

জীপটা থেমেছিল। বেসক্যাম্পের দিকের রাস্তাটা এখানে এসে এই রাস্তায় মিশেছে। এখানে একটা পরীক্ষাঘাঁটী রয়েছে। সব গাড়িকে দুমিনিট দাঁড়াতে হয়। একটি খাকিপরা লোক উঁকি মেরে দেখে গাড়ির মধ্যে কী আছে, তারপর ছেড়ে দেয়।

ঘৃণা করা পাপ, অমল জানে। এমন বোবা পুতুলের মতন বসে থাকাও অন্যায়! এতক্ষণ ভাবছিল, কিছু একটা করা উচিত। অথচ কিছু করতে পারছিল না। এখন গাড়িটা থেমে আছে দেখে অমল হঠাৎ লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। নামবার সময় বেশ জোরে কিন্তু যেন নিজেকেই বলল, 'এত চাপাচাপি করে যাওয়া যায় না।'

তার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য পেছনে মোটেই না তাকিয়ে সোজা খাকিপরা লোকটির গুমটির মধ্যে ঢুকে গেল অমল। তখনই জীপটা ছাড়া পেয়ে সামনের রাস্তা ধরে ঈষৎ ঢালে নেমে গেল। লোকটি আশ্চর্য হয়ে অমলের দিকে তাকাল: 'হঠাৎ নেমে পড়লেন কেন, মিত্তিরবাবু?'

অমল বলল, 'এখানে একজনের জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ভুলে গিয়েছিলাম।'

গুমটির বাইরে এসে টাউনশিপের রাস্তাটার দিকে তাকাল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কেউ নেই, মুখার্জিবাবু না, অন্য কেউ না। টাউনশিপের দিক থেকে আরো জীপ নিশ্চয়ই আসবে। মুখার্জিবাবু তার একটায় আসতে পারলে ভাল, না হলে এতটা পথ হাঁটতে হবে। হয়ত অপেক্ষা করছেন, অথবা হাঁটতে শুরু করেছেন, এখনো দৃষ্টির সীমায় আসেন নি। প্রসপেক্‌টিং ক্যাম্প থেকে রাঘবন আজ বোধহয় আলি সাহেবের গাড়িতে আসবেন। সেই গাড়িটায় জায়গা পেয়ে যেতে পারেন মুখার্জিবাবু।

বেসক্যাম্পের দিক থেকে বাঁক ঘুরে একটা জীপ ওপরে উঠে আসছিল। কাছে এলে দেখল, ড্রাইভারের পাশে সুনন্দ। গুমটির গোড়ায় জীপটা থামলে সুনন্দ হৈ-হৈ করে উঠল, 'কী রে অমল, হেঁটে মারছিস, কিছু জোটেনি?'

অমল বলল, 'মুখার্জিবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'তার মানে?'

'মানে বোঝাতে হলে তো তোকে অনেক কিছু বলতে হয়।'

'তা বলতে বাধা কী? এ তো তোর নয়নতারার ব্যাপার না।'

একটু হেসে অমল একটা পা জীপের ওপরে তুলে দাঁড়াল। মুখার্জিবাবুকে গাড়িতে উঠতে না দেওয়ার ঘটনাটা বলল সংক্ষেপে। লক্ষ্য করল, সুনন্দর ইয়ার্কির মেজাজ বদলে যাচ্ছে। অমলের মুখ থেকে সুনন্দ চোখ নামিয়ে আনল জীপের ওপরে রাখা পায়ে। আবার মুখের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁট একদিকে টেনে বলল, 'মাঝে-মাঝে যদি ব্যবহার না করিস তো জুতো পরিস কেন?'

অমল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? উঠে আয়।' সুনন্দ খেঁকিয়ে উঠল।

অমল আবার টাউনশিপের রাস্তাটার দিকে তাকাল: 'আর একটু অপেক্ষা করব না?'

'কী যে অর্থহীন কথা বলিস! মুখার্জিবাবু ঠিক অন্য কোনো গাড়ি পেয়ে যাবেন। ডেকে তুলে নেবে। সবাই তো দাস না। আর হেঁটে গেলেই বা কী? পৃথিবীটা কেমন একটু মালুম হওয়া ভাল। তুই কখনো হেঁটে যাস নি? আমাকে যেতে হয় নি? উঠে আয়।'

বোকার মতন অমল উঠে বসতে জীপ ছেড়ে দিল। ইদানীং অমল বুঝতে পারছিল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই মুখার্জিবাবুর বিষয়ে তার ভাবনার তীক্ষ্ণতা কমে এসেছে। খানিক আগে দাসদের জীপে বসে মনে হচ্ছিল, তার বুঝি জ্বর আসবে। এখন শরীর প্রায় ঠান্ডা।

সিগারেট ধরিয়ে সুনন্দ বলল, 'অন্য একটা ঘটনার কথা তোকে তাহলে বলি। তোদের টাউনশিপে তখনো কেউ যায়নি। আমার ঘরের পাশে রাস্তার দুধারে মুখোমুখি ছিল মুখার্জিবাবু আর ইঞ্জিনীয়ার জয়সোয়ালের কোয়ার্টার, তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। মুখার্জিবাবু রোজ খবরের কাগজ আদ্যন্ত পড়েন। দুদিন না খেলে তাঁর চলে, কাগজ না পড়লে চলে না। তাঁর কাগজটা রোজ জয়সোয়াল পড়তে নিত। নিজে নিতে আসত না, মুখার্জিবাবু সংবাদের সমঝদার পেয়ে সন্ধ্যের পর সানন্দে তাঁর কাগজটা দিতে রাস্তার ওপারে যেতেন। প্রায়ই সন্ধ্যের পর আমার বারান্দা থেকে দেখতাম, জয়সোয়াল আর তার বউ তাদের বারান্দায় পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে, জয়সোয়ালের হাতে খবরের কাগজ, বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে মুখার্জিবাবু উৎসাহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোঝাচ্ছেন। কেউ একটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত না। জয়সোয়ালের বউয়ের বয়েস হয়ত মুখার্জিবাবুর ছোট মেয়ের সমান। তবু বউটা চেয়ারে বসেই থাকত, সম্ভবত স্বামীর পদমর্যাদার কথা ভেবে। জয়সোয়ালকে অনেক কষ্টে সহ্য করলেও, তার বউয়ের কাণ্ড দেখে গা জ্বলে যেত।'

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে সুনন্দ আবার বলছিল, 'একদিন ব্যাপারটা আর কিছুতেই মেনে নিতে না পেরে, আমার বারান্দার চেয়ারটা তুলে নিয়ে প্রায় দৌড়ে রাস্তার ওপারে নিয়ে ঠিক মুখার্জিবাবুর পেছনে রেখে বললাম, বসুন। বলেই জোর পায়ে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, মুখার্জিবাবু খুব বিব্রত হয়ে, কী করবেন বুঝতে না পেরে যেন আপত্তির সঙ্গে চেয়ারটায় বসে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই পা ধরে গিয়েছিল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেহাত ক্লান্তিতে বসে পড়লেন। সেই থেকে জয়সোয়াল আমার সঙ্গে কথা বলে না। ও কথা না বললে যেন আমার কোঁকড়া চুল সোজা হয়ে যাবে!'

অমল বলল, 'আমাকে তখন কিছু বলিস নি কেন?'

'তুই বোধহয় ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলি। না হলে নিশ্চয়ই বলতাম। জয়সোয়াল এখানে এতবড় ইঞ্জিনীয়ার কেন জানিস তো? আগে তো কোথায় ড্রেন ইন্সপেক্টর ছিল। সেবার হোলির হাঙ্গামার সময় সৈন্যরা এসে নোংরা যাবার মোটা পাইপ দাঁতনকাঠি ফেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। নোংরা মেশানো জল সরছিল না। জয়সোয়াল বলে দিয়েছিল কোথায় পাইপের জোড় খুলতে হবে। জোড় খুলে শ'খানেক দাঁতনকাঠি তুলে ফেলার পর আবার সব ঠিক। তখন থেকে জয়সোয়াল এত শ্রদ্ধার পাত্র।'

এসব সুনন্দ বলছিল খুব মুখরোচক কিস্‌সা হিসেবে। অথচ অমল ভাবছিল, সুনন্দর অনেক মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে অপরিশীলিত। কিছু ভাল লাগছিল না অমলের, সব বড় বিস্বাদ মনে হচ্ছিল।

## নয়

এখানে দিনযাপন আগে এত ক্লান্তিকর ছিল না। প্রচুর কাজ থাকলেও আজকাল সময় কাটতে চায় না। এখানকার প্রাত্যহিকতার রঙ বদলায় নি, বরং উজ্জ্বলতর হয়েছে। তবু এত ক্লান্তি। আসলে অসুখটা মনে। অমল বুঝেছে, বিস্ময়বোধ চলে গেলে এমন হবেই। হাত বাড়িয়ে নতুন কিছু ধরতে না পারলে শূন্যতায় তলিয়ে যাবার অস্বস্তি আসবেই। বস্তুত নতুন কোনো সত্যির দরজা খুলে না গেলে, বন্ধদ্বারলগ্ন হাত খানিক অসহিষ্ণুতার পর ক্লান্তিতে ঝুলে পড়বেই।

শুধু মাঝে মাঝে কিছু ছেঁড়াছেঁড়া ঘটনা মনে ঘা দিয়ে যায়। সামান্য দাঁত বসিয়ে যায় মাত্র। এমন না হয়ে কোনো ভয়ংকর আঘাত এলে বরং ভাল।

এই তো সেদিন স্টোরের কর্মী তপনবাবুর কোয়ার্টারের ঘটনাটা একটা বেশ কামড় দিয়ে গেল। তপনবাবু অফিসে গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন দুপুরে। মাথার কাছে জানলা খোলা ছিল। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কেউ একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল ভেতরে। টুকরোটা লেগে বাচ্চাটার কপাল কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে আতঙ্কে অন্য সব চেতনা হারিয়ে তপনবাবুর স্ত্রী কাপড় না বদলে, দরজায় তালা না লাগিয়ে, বাচ্চা নিয়ে ছুটেছিলেন ডাক্তারের কাছে।

কে ছুঁড়েছিল পাথরের টুকরোটা। সে কি জানতো একটা বাচ্চা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। ঘুমন্ত মহিলার শরীর কি তার লক্ষ্য ছিল। নাকি শুধুই খেলা। যেতে যেতে পায়ের কাছে ছড়ানো পাথরের টুকরো দেখে কুড়িয়ে নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই কি ছুঁড়েছিল। সে কি এই পাহাড়জঙ্গলের আত্মীয়, নাকি প্রবাসী সে এখানে।

রবিবার সন্ধ্যেয় নীল কাপড়ে বাঁধানো একটা বই হাতে করে কাঁচের জানলার পাশে বিছানায় বসে অমল এই সব ভাবছিল। একটু আগে টাউনশিপের প্রায় সব কোয়ার্টার খালি করে সবাই সিনেমায় গেছে। শহরের প্রান্তে একটা বড় টিনের ঘরে একটা হিন্দী ছবি দেখানো হচ্ছে। সেই ঘরে চেয়ার-বেঞ্চ কিছু নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে হয়। অনেককে অবশ্য নিজেদের ঘর থেকে লোহার ভাঁজকরা চেয়ার বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে।

প্রথম প্রথম অমলের বিশেষ করে বিকেল থেকে একটু রাত্তির পর্যন্ত ঘরের বাইরে বসে থাকার অভ্যেস ছিল। কারোনদীর তীরের তাঁবুর সামনে একটা হালকা কাঠের বাক্স ছিল, বেসক্যাম্পে ডাকঘরের গায়ে একটা জমে যাওয়া সিমেন্টের চাঁই। টাউনশিপে এসে সেই অভ্যেস প্রায় গেছে। এখন চুপচাপ সময় কাটালে শোবারঘরের কাঁচের জানলার পাশে বসে থাকে, বাইরে যায় না। জানলা দিয়ে বাইরের কিছুটা দেখা যায়। ইদানীং নিজেকে ঢেকে রাখার একটা ইচ্ছে ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হচ্ছিল।

অমলের ঘরের সামনের রাস্তায় একখানা জীপ এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের সীট থেকে নামল নয়নতারা। বারান্দায় উঠে জানলার কাছে এল, অমল তখনো বসে আছে। অমল একটু হাসল কিনা বুঝতে পারল না। নিজের মুখ তো দেখা যায় না হাতে আয়না না থাকলে। দরজাটা খোলাই ছিল। অমল উঠে দরজায় আসতে ভেতরে এল নয়নতারা। অমল আলো জ্বালল। এতক্ষণ ঘর অন্ধকার ছিল। কাঁচের জানলা দিয়ে কৃপণ আলো আসছিল।

নয়নতারা এমন হঠাৎ এখানে আসায় আশ্চর্য হয়েছিল, বলা বাহুল্য। আলো জ্বললে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হল। নয়নতারার এত ক্ষুব্ধ মুখ আগে দেখেনি।

নয়নতারা নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসে অমলকে বলল, 'বসো, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

বিছানার কোণে বসল অমল। টেবিলের ওপাশ থেকে আসা পলকহীন দৃষ্টির জন্য অস্বস্তি লাগছিল। সেই দৃষ্টি সহ্য করার অভ্যেসটাও প্রায় গেছে। অনেক দিন পরে আজ দেখা হল।

গলায় অভিযোগের ঝাঁজ এনে নয়নতারা প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলল, 'তুমি এখনো এখানে আছ বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই নিজের চোখে দেখতে এলাম।'

অর্থাৎ অমল এতদিন বেসক্যাম্পে নয়নতারার কোয়ার্টারে একদিনও যায়নি বলে অভিযোগ করছে। কিন্তু কার রাগ দেখাবার কথা। অমলের কি কোনো অভিযোগ নেই।

অমল শুধু বলল, 'তুমি আমার ঘর ঠিক-ঠিক চিনলে কী করে? আগে তো কখনো আসনি।'

'চিনতে পারা কিছু কঠিন না। ইচ্ছে থাকা চাই। কয়েকবার গিয়েছি এই রাস্তা দিয়ে। তখন গাড়ির অন্যদের জিজ্ঞেস করে অনেক আগেই চিনেছি।'

'তখন একবার আসনি কেন?'

'কেন আসব? তুমি কি কখনো গিয়েছ?' প্রায় সুনন্দর মতন মাথা ঝাঁকাল নয়নতারা।

অমল উঠে গিয়ে হিটারে চায়ের জল চাপাল। ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। টেনে-টেনে বলল, 'আমার ভিড় ভাল লাগে না। কখন তুমি একা থাকবে জানি না তো। তোমার বন্ধুরা আছেন কিনা দূর থেকে দেখবার জন্য বার বার যাওয়াও কঠিন। আমাকে তো অফিসারদের কাছ থেকে গাড়ি ধার করতে হয়।'

নয়নতারা অবাক হয়ে পুরো এক মিনিট ধরে অমলকে খুঁটিয়ে দেখল। যেন খুবই দর্শনীয়। তারপর শব্দ করে হেসে এই প্রথম চেয়ারে এলিয়ে বসল। সব জেনে ফেলেছে, অমলের সবকিছু জেনে ফেলে খুব খুশী, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এই জন্য তোমার দেখা পাচ্ছি না! আমি ভাবছিলাম অন্য কিছু। ভাবছিলাম, আমার সঙ্গই তোমার অপছন্দ।'

তখনই আবার একটু গম্ভীর হয়ে নয়নতারা বলল, 'এসব কমপ্লেক্স ভাল না, অমল। আমি কথা বলে দেখেছি, ওঁরা সবাই তোমার প্রশংসা করেন।'

অমলের খুশী হওয়ার মতন কিছু বলেনি নয়নতারা। তবু অমল হাসল। যেন এখন একবার না হাসলে নিজেকে ছেলেমানুষ প্রমাণ করা হবে। হেসে বলল, 'জল হয়ে গেছে। ব্যাগে ভাল চা এনেছ নাকি?'

নয়নতারা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'আমি চা করছি', বলে উঠে গেল রান্নাঘরসংলগ্ন বারান্দায়।

পেছন থেকে তার শরীরের ওপর একবার দৃষ্টি পড়তে অমল চোখ ফিরিয়ে আনল। বাইরে তাকাল জানলা দিয়ে। সন্ধ্যে কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন রাত্তির। রাস্তায় কেউ নেই। সামনের কোয়ার্টারগুলোর দরজা এবং এদিকের জানলা বন্ধ। কেউ বোধহয় নেই আশপাশে। লাইটপোস্ট-ঘেঁষা গাছটার পাতা হাওয়ায় কাঁপছে। জীপটার ওপরের মোটা মাটিরঙ কাপড়ে সেই পাতাগুলোর অস্থির ছায়া।

নয়নতারা চা নিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসল। বেসক্যাম্পের ঘরটার কথা অমলের মনে পড়ছিল। সেই সন্ধ্যের পর এর মধ্যে কত যেন বয়েস বেড়েছে।

নয়নতারা বলল, 'বেসক্যাম্পে তোমার কোয়ার্টার এর থেকে খারাপ ছিল না। জায়গা

কম ছিল অবশ্য। পেছনের জানলাটা দিয়ে জঙ্গলের অন্ধকার দেখা যেত। এই ঘর অনেক বেশী ছিমছাম।'

হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে নীল কাপড়ে বাঁধানো বইটা নয়নতারা তুলে নিল। রাত্তিরে মলাটের ঘননীল কেমন কালো মনে হচ্ছিল। মলাটটা আঙুল দিয়ে সরিয়ে প্রথম পাতায় চারপাশের নকশার মধ্যে সযত্নে লেখা মল্লিকা মিত্র নামটার ওপর নয়নতারা চোখ রাখল। চোখ তুলে তাকাল অমলের মুখে।

অমল হেসে বলল, 'মার আহ্লাদী মেয়ে। এ বছর শেষ পরীক্ষা দেবে। ইতিহাস।'

'বোনের গানের বই তুমি নিয়ে এসেছ কেন?'

'এমনি। ওর কি এখন গান করবার সময় আছে! কত বন্ধু। কফি হাউসে আড্ডা। গানও হয়ত করে, সব সময়, মনে মনে। অথবা হয়ত মন দিয়ে পড়াশুনো করছে।' অমল তখনো হাসছিল।

নয়নতারা বলল, 'তোমাদের টালিগঞ্জের ঠিকানাটা দিও তো। এবার কলকাতায় গিয়ে তোমাদের বাড়ি যাব।'

অমল শুধু তাকিয়ে আছে দেখে আবার বলল, 'তুমি ছুটি নাওনি কতদিন?'

'অনেক কাল।'

'একসঙ্গে ট্রেনে গেলে মজা হয়। কিন্তু তুমি তো নিশ্চয়ই থার্ড ক্লাসে ঝুলতে-ঝুলতে যাবে।'

'অবশ্যই। আপার ক্লাসে গিয়েছি শুনলে সুনন্দ আমার নাক ভেঙে দেবে।'

নয়নতারার গলার স্বর একধাপ উঠল: 'তুমি সুনন্দবাবুকে বেশ ভয় কর দেখছি।'

'তা একটু। বিশেষত তার জিভের ধারকে ভয়।'

নয়নতারা উঠে গিয়ে আবার চায়ের জল চাপিয়ে দিল। ফিরে এসে বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে। তোমার বিস্কুট নেই?'

অমল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল: 'হ্যাঁ, আছে তো। ভুলে গিয়েছিলাম। এক কাজ করতে পারি। ভরতের দোকান থেকে কিছু নিয়ে আসতে পারি। কাছেই। যাব?'

'থাক্। অত আপ্যায়নে কাজ নেই। বিস্কুটই আন।'

অমল বিস্কুটের টিন নিয়ে এলে নয়নতারা একসঙ্গে দুখানা মুখে দিল। টিনটা অমলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভরত চলে যাবার পর আর কাউকে পেলাম না। আজকাল নিজেই সব করছি। অবশ্য রান্না আমি জানি, বেশ ভালই জানি। সেদিন তুমি তো খেলেই না কিছু, কী করে বুঝবে কেমন রান্না।'

সেদিনের, সেই শীতের রাত্তিরের কথা অমল ভাবতে চায় না, ভুলতে পারলেই ভাল। সেদিনের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করল না।

নয়নতারা উঠে গেল। আবার দুপেয়ালা চা করে নিয়ে ফিরে এল। তখন অমল প্রচুর দ্বিধার পর সন্তর্পণে বলল, 'তোমার বাড়ির কথা আমি কিছুই জানি না।'

চায়ে চুমুক দিয়ে নয়নতারা বলল, 'মা-বাবা আছেন, দুই দাদা বউদি আছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। দিদি আছেন একজন, তাঁর একটি ছেলে আছে। আমি সবার ছোট।'

'তাঁদের সবাইকে ছেড়ে এখানে রয়েছ। তোমার ঘন-ঘন চিঠি আসে বলেও তো শুনিনি।'

'আমার এত দূরে চলে আসা ওঁরা তেমন পছন্দ করেন নি।' নয়নতারা আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

প্রথম দিকে সুনন্দর সংগৃহীত তথ্য অমলের মনে আসছিল। নয়নতারা কিছু অনুক্ত রাখছে। সব কথা সে বলছে না। আগেও কোনোদিন বলেনি। কিন্তু কেন? সে কি ভাবছে অমল শিশু। নয়নতারার গায়ে আঁচড় লেগেছে শুনলে কি অমল আঁতকে উঠবে। অহমিকায় খোঁচা লাগল অমলের, যেমন মাঝে-মাঝে লাগে।

তাছাড়া নয়নতারার মুখের রঙ বদলে গেছে। দু-একটা ভাঁজ পড়েছে ভ্রূসন্ধিতে। কেমন কঠিন দৃষ্টি। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এই জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেও এই সব পার হয়ে অনেক দূর দেখছে তীক্ষ্ম চোখে। প্রসঙ্গটা তোলার জন্যই অমলের খারাপ লাগল।

আবার হালকা হবার আশায় অমল বলল, 'শুধু পাতা না উলটিয়ে গান কর না একটা।'

অনেক দূর থেকে এই ঘরে নয়নতারা ফিরে এল। হাতের বইখানা টেবিলে রেখে বলল, 'আমি কি গান করতে পারি?'

'গান কে না করতে পারে? শুধু একটু সাহস চাই। একমাত্র স্নানের ঘরে না গেয়ে, কারো সামনে গাইবার সাহস চাই।'

ঘরের আলোটা জোরাল। অমল এখন একা থাকলে, কিছু না পড়লে, আলো নিভিয়ে দিত। অন্তত ঘরের মধ্যে এত আলোয় গান ভাল লাগে না। অবশ্য নয়নতারা গাইবেই না হয়ত। ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেও বাইরের আলোর আভাস জানলা দিয়ে ঘরে আসে। কিন্তু নয়নতারা সম্ভবত তা চাইবে না, আলো নিভিয়ে দিতে চাইবে না। অমল নিজেও কি তা চাইবে। অন্ধকার আসে ঢেউয়ের মতন, খড়কুটো ভাসায়।

অমল এমন করে বসেছিল, যেন গান শুনবার জন্য তৈরি, নড়ছিল না, কথা বলছিল না। নয়নতারাও মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিল কিছুক্ষণ, যেন এখনই মৃদুকণ্ঠে গান গেয়ে উঠবে। অথচ নয়নতারা দেয়ালের ওপর থেকে বিচ্ছুরিত তীব্র আলোয় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'হঠাৎ এমন গান শোনার বাসনা কেন!'

কিছু যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গেল তার কথায়, যা এতক্ষণ এই ঘরে একটু একটু করে শরীর পাচ্ছিল। বস্তুত, অমলের মনে হল, এই ঘরে এখন অন্ধকারেরর মতন, ঘুমের মতন কোনো নেশা হাওয়ায় মিশে থাক নয়নতারা চায় না।

ঘরের মধ্যে শান্ত পায়ে এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছিল নয়নতারা, আবার এপাশে ফিরে আসছিল। দেয়াল-তাকে কিছু বই, ঝোলানো কয়েকটা জামা, টেবিলে খালি চায়ের কাপের দিকে তাকাচ্ছিল, অমলের মুখেও। অমলের মুখে হয়ত তার কর্কশ কথার ছায়া পড়েছিল। নয়নতারা চেয়ারে এসে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাসল। আবার চোখ ফিরিয়ে এনে মাথা নিচু করে বলল, 'একটা গান করছি। শুনে কিন্তু হাসতে পারবে না। ছোটবেলায় দু-চারটে শিখেছিলাম।'

মিনিট পাঁচেক ধরে একটা গান করল নয়নতারা। মন্দ গায় না, তবে সন্দেহ হল, গানের গ্র্যামার হয়ত কোথাও কোথাও অশুদ্ধ, অমল ঠিক জানে না। বইটা নয়নতারা হাতে নেয়নি, কথাগুলো ঠিক-ঠিক মনে ছিল। নয়নতারা না চাইলেও, তার গানের সময় ছায়া ঘনাইছে বনে-বনে কথাগুলো নেশার মতন অন্ধকারের স্বাদ আনছিল।

বাইরে থেকে আকস্মিকভাবে অনেক কলকণ্ঠ কানে এল। প্রথমে নয়নতারা জানলায় এসে দাঁড়াল, তারপর অমল। ছবি দেখে ফিরছে সবাই। তাদের প্রসারিত ছায়া পড়েছে রাস্তায়। সেই ছায়া দেখতে-দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে সামনের রাস্তাটা আবার নির্জন হল।

সামনের কয়েকটা কোয়ার্টারে আলো জ্বলে উঠল।

জানলার দুটো বড় বড় কাঁচের পাল্লা ভাঁজ করে নয়নতারা খুলে দিল পুরোপুরি। তখনই অনেক বেশী হাওয়ার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। নয়নতারার চুল হাওয়ায় উড়ে উড়ে পাশে দাঁড়ানো অমলকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে অমল চোখ ফিরিয়ে আনল ভেতরে, নয়নতারার মুখের দিকে তাকাল। তার গানের সময়ের মতন মুখ নিচু করল নয়নতারা, ঘরের মেঝেয় কী যেন দেখছিল সযত্নে। দ্বিধাহীন না-কাঁপা হাত বাড়িয়ে নয়নতারার কোমরটা জড়িয়ে জানলার একটা সিক চেপে ধরে অমলের মনে হল, ব্যাপারটা কত সহজ। হাতের ঘেরের মধ্যে থেকে নিজের মুখ তুলে অমলকে দেখতে গিয়ে নয়নতারা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। নয়নতারার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, অমলের মুখে প্রার্থনা দেখতে পেয়েছে। একটু ক্ষণের জন্য নয়নতারার শরীরের গন্ধ এবং তাপ পেল। ঠিক তখন প্রায় শোনা যায় না এত আস্তে নয়নতারা বলল, 'চলি।' অমল দেখল, জানলার সিক চেপে-ধরা তার আঙুল আবার কত সহজে খুলে গেল। নয়নতারা খুব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় গেল, বারান্দার সামনের জায়গাটা পার হয়ে জীপে উঠে ম্লান একটু হাসল দূর থেকে। গাড়িটা ঘুরিয়ে সামনের রাস্তায় আলোর দুটো ঋজু রেখা প্রসারিত করে বাঁয়ে মোড় নিল। কোনো কথা না বলে অমল বারান্দায় পাতলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। যে-আঙুলগুলো দিয়ে জানলার সিক চেপে ধরেছিল সেগুলো তখনো কুঁকড়ে আছে দেখে আশ্চর্য হল।

## দশ

সোমবার দুপুর পার হয়ে গেলে অমল খনি এলাকা থেকে অফিসবাড়িতে ফিরে এসে দেখল, নয়নতারা বসে আছে। মুখার্জিবাবুর টেবিলের ওপাশে বসেছিল, অমলকে দেখেই বলল, 'তোমার কি এখনই কোনো কাজ আছে?'

'না।'

সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা উঠে দাঁড়াল: 'তাহলে আমার সঙ্গে একটু এসো।'

বাইরে এসে কয়েক পা হেঁটে এখানকার অত্যন্ত দরকারী সঙ্গী একটা জীপে উঠতে হল। জীপটা নয়নতারা এনেছে। স্টার্ট্ দিয়ে অমল বলল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

'ভাবছি।'

অবাক হয়ে পাশে তাকাল অমল। নয়নতারা এমন ভঙ্গিতে বাইরে এসেছে, যেন এখনই বিশেষ কাজে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিতে হবে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, কোথায় যেতে হবে ঠিক নেই। নয়নতারার মুখ নির্ভার নয়, অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের হালকা মেজাজের উজ্জ্বলতা নেই মুখে, চাপা ঠোঁটে কোনো সঙ্কল্প প্রচ্ছন্ন। অমলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, চোখ রাখছে সামনে। সামনে চোখ রেখেই বলল, 'একবার ক্রাশিং প্লান্টের দিকে চলো।'

অমলের তখনো আশ্চর্য লাগছিল। কথা না বলে গাড়ি ডাইনে ঘোরাল।

মাইন রোড ধরে এগোচ্ছিল। অমলের প্রশ্নগুলো জড়িয়ে গিয়েছিল জীপের চাকায়, বার বার শুধু পাক খাচ্ছিল।

নয়নতারা সব কুয়াশা মুছে দেবার মতন বলল, 'মুখ ভার করে ভাববার দরকার নেই। কোনো কাজে যাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে একটু বেড়াব বলে এসেছিলাম।'

এক ফাঁকে অমলের মুখ দেখে নিয়েছে, বোঝা গেল।

রবিবার রাত্তিরে অমন হঠাৎ চলে যাওয়ার কী কারণ ছিল, অমলের জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ইচ্ছেটাকে অবশ্য আমল দিল না। অমন হঠাৎ চলে যাবার কারণটা আসলে হয়ত দুর্বোধ্য নয়। নিজের মধ্যে ভাল করে খুঁজলেই হয়ত ব্যাখ্যা মিলতে পারে। তেমন করে খুঁজবার সাহস নেই অমলের, উজ্জ্বল দিনের আলোয় তেমন করে খুঁজে দেখবার রুচি নেই।

খানিকটা রাস্তার দুপাশেই অনেক উঁচু গাঢ় লাল রঙের পাথরের দেয়াল। রাস্তাটায় নীল পাথরের গুঁড়ো ছড়ানো। সুড়ঙ্গের মতন রাস্তাটা। তবে ওপরে এক চিলতে আকাশ দেখা যায়। এমন আশ্চর্য পথ অমল শুধু এখানে আর ছবিতে দেখেছে।

সুড়ঙ্গটা ছাড়িয়ে এলে সেই জায়গাটায় চোখ পড়ল যেখানে একদা একটা ঋজু শালগাছ ছিল। গাছটাকে কাটতে গিয়ে একটা লোকের মৃত্যু হয়েছিল। প্রচুর অশান্তি হয়েছিল তাই নিয়ে। দড়ি বাঁধা থাকলেও কাটা গাছটা কীভাবে যেন ঘুরে এসে লোকটাকে মারাত্মক ঘা মেরেছিল। ঢাল বেয়ে অনেক নিচে গড়িয়ে যাবার পর তার রক্তাক্ত অনড় শরীর তুলে আনা হয়েছিল। মুণ্ডারা ব্যাপারটাকে নিখাদ দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চায় নি। গাছের দেবতা বিষয়ে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল।

জীপটা ক্রাশিং প্লান্টের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসে থামল। জায়গাটা ক্রাশিং প্লান্টের মুখ পর্যন্ত প্রসারিত। পাহাড়ের অঙ্গ কেটে এমন বিরাট চত্বর তৈরি হয়েছে, না হলে ডাম্পারগুলো ঘুরবার জায়গা পেত না। বাঁ দিকে কালচে রক্তরঙের পাথরের দেয়াল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, তার গায় নানাবিধ বিচিত্র শিরা দেখা যায় ঢেউয়ের মতন।

জীপ থেকে নেমে দুজন হাঁটছিল হালকা ধূসর বাড়িটার দিকে। এমন রোদ্দুরে মসৃণ কালো আস্‌ফল্‌টের চত্বরের ওপর দিয়ে এই প্রথম অমল নয়নতারার সঙ্গে হাঁটছিল। জোর হাওয়ায় নয়নতারার হালকা রঙের শাড়িটা উড়ছিল। অনেক দিন আগে এমন রোদ্দুরে নয়নতারাকে প্রথম দেখেছিল। সেদিন অবশ্য এমন করে তার শরীরে রোদ পড়েনি। সেদিন মাথার ওপরে রোদ্দুরে মাজা খোলা আকাশ ছিল না। সেদিন বড়জামদা স্টেশনের দিক থেকে বেসক্যাম্পে এসেছিল একটা জীপের মধ্যে বসে।

ক্রাশিং প্লান্টের মুখে এসে অমল বলল, 'আমরা কি ভেতরে যাব?'

'চলো না যাই। যাইনি তো কখনো ভেতরে। বাইরে থেকে দেখেছি কয়েক বার।'

ঢুকতে গিয়ে দুপাশে দুটো প্রাথমিক জ্য ক্রাশার। বিরাট কঠিন চোয়াল। এখন চুপ-চুপ তৈরি হয়ে রয়েছে পাথরের চাঁইগুলো চেপে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। কয়েক মাস পরেই শোভেলের হিংস্র দাঁত খাদ থেকে অনেক রকম ধাতু মেশানো পাথরের চাঁই কামড়ে তুলে নিয়ে ডাম্পারের মধ্যে ফেলবে। একটির পর একটি ডাম্পার সেই চাঁইগুলো বয়ে নিয়ে এসে ঢেলে দেবে চোয়ালের গহ্বরে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ক্রাশিং প্লান্টের বিভিন্ন অংশ ধাপে-ধাপে ছ-সাত তলা নেমে গেছে। বাড়িটার মধ্যে দুপাশেই লোহার সিঁড়ি আছে নিচের দিকে নামবার। শরীরে রক্তবাহী শিরার মতন পুরো প্লান্টটায় ওপর থেকে নিচের দিকে কনভেঅর বেল্‌ট প্রসারিত। জ্য ক্রাশার থেকে চওড়া কনভেঅর বেল্‌ট লোহার টুকরো বয়ে নিয়ে যাবে আরো একটা ক্রাশারে যেখানে টুকরোগুলো আবার গুঁড়ো হবে, শুধু চোয়ালের চাপে না, তার সঙ্গে তীব্র গতিতে পাক খেয়ে। আরো নিচের কয়েক তলায় অজস্র মিহি ও মোটা ইস্পাতের জালে ছেঁকে ফেলার পর টুকরোগুলোকে কনভেঅর বেল্‌ট বয়ে নিয়ে যাবে ক্রাশিং প্লান্টের বাড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ের উতরাই ডিঙিয়ে দূরের উপত্যকায় যেখানে রেললাইন হয়েছে, যেখানে সারবেঁধে ওয়াগনগুলো

এসে দাঁড়াবে।

এখন সব শান্ত। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার ওত পেতে বসে আছে।

কয়েক মাস পরে কাজ শুরু হলে, কঠিন চোয়ালের চাপে চাঁইগুলো গুঁড়িয়ে গেলে ধুলো উড়বে। সেই ধুলো প্লান্টের বাড়ির মধ্যে থেকে শুষে নেবার জন্য অনেক যান্ত্রিক কূটকৌশল করা হয়েছে।

এসব খুঁটিয়ে দেখবার মেজাজ ছিল না অমলের। সব দেখতে হলে বিকেল কেটে গিয়ে রাত্তির হয়ে যাবে। তাছাড়া ক্রমান্বয়ে এমন নিচে নেমে গেলে, সোজা দীর্ঘ লোহার সিঁড়ি-গুলো বেয়ে আবার ছ-সাত তলা ওপরে উঠে আসা কি নয়নতারার খুব সহজ হবে। অমল নিজেও ক্লান্ত ছিল।

যখন মনে অনেক প্রশ্ন, যদিও নয়নতারা সঙ্গে-সঙ্গে নামছে, এ-সবই অর্থহীন। বরং এখনই কাজ শুরু হয়ে গেলে, প্রচন্ড গর্জনে পুরো বাড়িটা কাঁপতে থাকলে, দেখা যেত কেমন লাগে। কিন্তু অস্থির পায়ে কেন এমন অতলে নামছে নয়নতারা। অমলেরও অস্থির লাগছিল।

নয়নতারাই হঠাৎ বলল, ‘আর নামব না। চলো ওপরে উঠি।’

দুজনই খুব হাঁপিয়ে গেল ওপরে উঠে আসতে। ওপরের চত্বরের প্রান্তে একটা রেলিং ধরে দূরের উপত্যকার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। পড়ন্ত বেলার রোদ থেকে সরে দাঁড়াল ছায়ায়।

দূর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে অমল দেখল, নয়নতারা আগের মতন পলকহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই আবার নয়নতারা নিজের পায়ের ওপর চোখ রাখল। রেলিংয়ের ওপর একটা হাতের আঙুল অল্প কাঁপছিল। আবার চোখ তুলে, যেন অনেক দ্বিধার বালাই ঝেড়ে ফেলে বলল, ‘কাল রাত্তিরে তোমাকে সব বলিনি, অমল। আমার আরো আত্মীয় ছিল, তোমাকে বলিনি। তোমাকে বলা যায় না। আমার বয়েস তোমার, কিন্তু তুমি আমার মতন পুড়ে যাওনি, আঁচ লাগেনি তোমার গায়। তুমি এখনো কত ভাল! এক সময় তোমার ঠিক বিপরীত আমার ভাল লাগত। চকচকে ইস্পাতের ছুরির মতন ধার আমাকে মুগ্ধ করত। তখন বুঝিনি ইস্পাত এত কঠিন হয়, তার ধার একজনকে ফালা-ফালা করে কাটলে ছুরিতে রক্ত লাগলেও তখনই সেই রক্ত মুছে ফেলা যায়, আবার অল্প পরেই অন্য কাউকে কাটবার জন্য তার তীক্ষ্ণতা বাড়ে।’

অমল চিৎকার করে বলতে চাইল: তুমি অনেক ভেবে এমন জটিল করে কথা বলছ। এমন নাটুকে ভাষায় কি কেউ কথা বলে! তুমি ভাবছ, এখনো আমার কৈশোর কাটেনি, তোমার গায়ে আঁচড় লাগার কথা সহজ করে বললে আমি আঁতকে উঠব। কিন্তু তুমি জাননা যে আমি তোমার সে-কথা শুরু থেকেই জানি এবং সে-কথাকে কোনোদিন আমি দাম দিইনি।

চাপা গলায় শুধু বলতে পারল, ‘আমি শিশু না!’

অমলকে সম্ভবত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, রোদে-পোড়া তামাটে স্বেদাক্ত মুখে আকস্মিক রক্ত সঞ্চরণের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। ঠিক কেমন দেখাচ্ছিল জানে না। হাতে অথবা সামনে আয়না না থাকলে তো নিজের মুখ দেখা যায় না। শুধু নয়নতারার তাকানোর ভঙ্গিতে বুঝতে পারছিল, তার মুখ এই মুহূর্তে স্বাভাবিক নেই। তার মুখের অস্বাভাবিকতার কী মানে করল নয়নতারা, জানে না। তবে নয়নতারার চাপা ঠোঁট আলগা হয়ে হাসির ইঙ্গিতে কাঁপছিল, প্রচুর স্নিগ্ধতা এসেছিল চোখে, যেন ক্ষিপ্ত শিশুকে আর খ্যাপাবে না, এখন শান্ত করবে, চুলের মধ্যে বারবার আঙুল চালিয়ে ঘুম পাড়াবে।

সত্যিই প্রায় হন্যে হয়ে অমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, যেন চূড়ান্ত কোনো কথা। কিছু বলা হল না। তখনই রেলিংধরা তার হাতের ওপর নয়নতারা একটা হাত রেখেছে। তীব্র কথাগুলো নিঃশব্দে খেলা শেষ করে ফণা গুটিয়ে সাপুড়ের টুকরির মধ্যে ঢুকে গেল। শুধু, সাপুড়ের টুকরির মধ্যে যেমন, একটা সিরসির অনুভব পাক খাচ্ছিল শরীরমনে।

নয়নতারা হাত সরিয়ে নিয়ে সহজ গলায় বলল, 'তুমি কি শিগগির ছুটিটুটি নেবে, অমল?'

'ছুটি? কেন? এখন তো ছুটির আমার দরকার নেই। তুমি কি ছুটি নেবে?'

কোনো জবাব না দিয়ে নয়নতারা একেবারে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ঠোঁটে হাসি লেগে থাকলেও অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল। তাই হয়ত মুখ ফেরাল অন্য দিকে। আবার অমলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপর শরীরের ভার রেখে বলল, 'ফিরি চলো।'

অমল আর একটাও কথা না বলে গাড়ির দিকে এগোল। গাড়িটা এমনভাবে ঘোরাল যেন গাড়ি চালানোর বিষয়ে মা'র উপদেশগুলো সযত্নে পালন করছে। নীল পাথরের গুঁড়ো ছড়ানো রাস্তাটায় এসে দেখল, পাতলা অন্ধকার। দুপাশের উঁচু গাঢ় লাল দেয়ালের ওপরের ফালি আকাশ থেকে সূর্যটা অনেক দূরে সরে গেছে।

মাইন রোড ধরে লাফাতে লাফাতে অফিসবাড়ির সামনে এসে অমল বলল, 'এখন কোথায় যাবে?'

নয়নতারা বলল, 'তোমাকে টাউনশিপে পৌঁছে দিয়ে আমি বেসক্যাম্পে চলে যেতে পারি। রায়ের কাছ থেকে আজ আমি জীপটা ধার নিয়েছি। তোমার কি এখন অফিসে কোনো কাজ আছে?'

অফিসে অমলের এমন কিছু কাজ ছিল না। নয়নতারার সঙ্গে চলে গেলে কেউ কোনো গাফিলতি বুঝতে পারত না। অমলের কাজ তো সবই প্রায় বাইরে, খনি এলাকায়। কিন্তু রায়ের নামটা নয়নতারার মুখে শুনে, জীপটা রায়ের কাছ থেকে নিয়েছে শুনে, কেমন তেতো লাগল। বলল, 'অফিসে আর একবার যাওয়া উচিত।'

'বেশ তো। তুমি তাহলে নেমে পড়ো। আমি চলি।'

নয়নতারার গলা অন্যরকম মনে হল। পরক্ষণেই ভাবল, ভুল শুনেছে। অমল জীপ থেকে নেমে এল। অফিসবাড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল, নয়নতারা তখনো এদিকে চেয়ে ঠায় বসে আছে, ড্রাইভারের সীটে সরে যায়নি। অমলকে ফিরে তাকাতে দেখে নয়নতারা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে স্টার্ট্ দিল, একটা লাফ মেরে জীপটা ছুটে গেল দক্ষিণে।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অমল। নয়নতারার চোখে কেমন আশ্চর্য কষ্টের ছায়া ছিল!

## এগার

বৃষ্টির ছাঁট আসছিল একটু একটু। আজ সকাল থেকে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি। জোরে নামছে না। জোরে নামলে বরং ভাল ছিল, আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারত। খনি এলাকায় যাচ্ছিল অমল। খাদে নামতে হবে। একটা একমুখো সুড়ঙ্গের মতন অ্যাডিটের মধ্যে ঢুকতে হবে। কাজ আছে। ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ। সকাল থেকে এ পর্যন্ত

তো তিন-চার দফায় বৃষ্টি নামল।

আজ সুনন্দ ছিল সঙ্গে। একটা সান্ত্বনা। অনেক দিন তার সঙ্গে খনি এলাকায় যায়নি। ড্রাইভারের পাশে রাঘবন বসেছিলেন, পেছনে সুনন্দ আর অমল। রাস্তার দুপাশে কালচে রক্তের মতন নোংরা জল ছড়াচ্ছিল জীপের চাকা।

কিষেণচাঁদের পদোন্নতির কথা আজই শুনেছে। অমলের আশ্চর্য লাগছিল। কোনো ডিপ্লোমা নেই। প্রথমদিন খনি এলাকায় গিয়ে তো অমলের মনে হয়েছিল, সেদিনের আগে কিষেণচাঁদ কখনো রেঞ্জিং রড ছোঁয়নি। অথচ এর মধ্যে সার্ভেঅর হয়ে গেল। এখনো অ্যাসিসটেন্টই রয়ে গেল অমল এবং সুনন্দ। নিজের কথা না হয় ছেড়ে দিল, কিন্তু সুনন্দ কয়েকবার ফেলের পর পাশ করলেও আসল কাজে অন্য সবার থেকে ভাল। তাছাড়া সুনন্দ তেতো মন্তব্য করে অশান্তি ডেকে আনলেও, অফিসারদের সঙ্গে অমলের থেকে অনেক বেশী যোগাযোগ রাখে। রায়ের এক দূর সম্পর্কের ভাই এখানে কাজ করে। সে তো সুনন্দর বন্ধুর মতন। তার সঙ্গে তো প্রায়ই রায়ের কোয়ার্টারে যায়, রায়ের বউকে বউদি বউদি করে। তবু সুনন্দ কেন এখনো অ্যাসিসটেন্ট রয়ে গেল।

রাঘবন গোটা চারেক কাঠি নষ্ট করলেন। সিগারেট ধরাতে পারছিলেন না। সুনন্দ একটিমাত্র কাঠি দিয়ে অবলীলায় ধরিয়ে নিয়ে নিজের সিগারেটটা সামনে এগিয়ে দিল রাঘবনের সুবিধের জন্য।

আগের থেকে বেশী ছাট আসছিল। সুনন্দ অমলের পাশে সরে এসে একমুখ ধোঁয়া উড়িয়ে রাঘবন যাতে না শুনতে পারেন এমন ফিসফিস করে বলল, 'তোর পাখি উড়ে গেল রে।'

অমল কিছু বলল না। কী নিয়ে রসিকতা হচ্ছে বুঝতে পারে নি।

'কী রে, কথা বলছিস না যে!' সুনন্দ অভ্যেসমতো খেঁকিয়ে উঠল।

অমল এবার সুনন্দর মুখের দিকে তাকাল: 'কী বলছিস, বল্।'

সুনন্দ চোখ গোলগোল করে বলল, 'তুই কিছু জানিস না নাকি?'

এতক্ষণে একটা চমক লাগল। একটা সন্দেহ অমলের মনে স্পষ্ট হচ্ছিল। শুধু বলল, 'না।'

'নয়নতারা, নয়নতারা মজুমদার কাল বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেছে।' অমলের দিকে সুনন্দ এমন চোখে তাকাচ্ছিল যেন তার মতন করুণার পাত্র আর কখনো দেখেনি।

অমল তখনো চুপ করে সুনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সুনন্দ আবার বলল, 'অফিস জানে ছুটি নিয়ে গেছে। আসলে ছেড়ে দিয়েছে এখানকার চাকরি। কলকাতায় গিয়ে চাকরি ছাড়ার চিঠি পাঠাবে।'

'তুই এত সব কার কাছ থেকে জানলি?'

সুনন্দর মুখ থেকে তার নিজস্ব বিশিষ্ট হাসিটা খসল: 'কোথা থেকে জানলাম তোকে বলব কেন? আমি তো আরো অনেকের অনেক কিছু জানি। সে সব বলি না তো তোকে। কিন্তু নয়নতারার চলে যাওয়ার বিষয় তুই জানিস না, তাজ্জব ব্যাপার। খুব তো একসঙ্গে লুদুরলুদুর করছিলি। তোকেই বলে গেল না! সোমবারেই তো তার সঙ্গে তুই বেরিয়েছিলি, আর আজ বুধবার। মেয়েমানুষ একটা জিনিস মাইরি!'

সোমবার অনেকক্ষণ ছিল নয়নতারার সঙ্গে। সেই অনেকক্ষণের প্রত্যেকটি মুহূর্তের খুঁটিনাটি অমলের এখন মনে পড়ছিল। নয়নতারা ছুটি নেবে কিনা অমল জানতেও

চেয়েছিল। কোনো জবাব পায়নি। নয়নতারার চুপ করে থাকার মানে এখন বুঝতে পারছিল। সুনন্দ এত কিছু জানে। সে হয়ত জেনেছে রায়ের ভাই অথবা বউ অথবা দুজনেরই কাছ থেকে। কিন্তু অমলের কাছে সব এমন লুকোল কেন নয়নতারা। চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বলে গেল না কেন।

অমল বুঝতে পারছিল! বুঝতে পেরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেও কপালটা গরম হয়ে উঠছিল। তার এখনো ঠিক বয়েস হয়নি, তেমন আঁচ লাগেনি তার গায়। নয়নতারার চলে যাওয়ার কথা তার পক্ষে দুঃসহ হত, তাই বলেনি। যেমন নয়নতারার নিজের গায় আঁচড় লাগার কথা অমলের পক্ষে দুঃসহ হত, তাই সরল করে বলেনি। অমলকে প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা দিতে নয়নতারা নারাজ।

ফিসফিস করলেও, হয়ত বা রাঘবনকে শোনাবার জন্যও, সুনন্দ তখনো বলে যাচ্ছিল: 'আমি তো আরো অনেক কিছু জানি। আমি জানি, তোদের টাউনশিপ তৈরির সঙ্গে-সঙ্গে নিউ আলিপুরে কার বাড়ি উঠেছে, কটকের কাছে ভদ্রাকে কার সিনেমা হাউস তৈরি হয়েছে। এসব তোকে বলি না। তোকে বলে কী লাভ। তুই বলবি, আমার শুধু খারাপ বিষয়ে রুচি।'

সুনন্দর কথাগুলো কানে আসছিল। কিন্তু অর্থহীন মনে হচ্ছিল অমলের।

সুনন্দ হঠাৎ গলার স্বর বদলে অথচ খাদে নামিয়ে রেখেই বলল, 'তোর সঙ্গে মেয়েটার কতটা জমেছিল রে? তুই এমন চুপ মেরে আছিস, যেন তোর কলজে ফেটে যাচ্ছে। দু-চার দিন তো মাত্র ঘোরাঘুরি করেছিস ওর সঙ্গে। রায়রাই তো ওকে জড়িয়ে রেখেছিল।'

সুনন্দ খানিক থেমে একটু ভেবে আবার বলল, 'নয়নতারার চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে তোর যদি কোনো ভূমিকা থাকে, তাহলে জেনে রাখিস তোর সার্ভেঅর হতে এখনো অনেক দেরি। তুই তাহলে আমার থেকেও পিছিয়ে থাকবি।'

অমল মুখ কঠিন করে বলল, 'চুপ করে থাক তো। বড় বাজে বকিস।'

নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না অমল। তার মুখে সম্ভবত কষ্টের দাগ পড়েছে। সুনন্দকে নিজের মুখের যন্ত্রণার ছায়া দেখাতে অন্তত এখন অমলের তীব্র অনিচ্ছা। বস্তুত একা থাকবার বাসনা হচ্ছিল, নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল জীপ থেকে। তা অবশ্য সম্ভব নয়। রাঘবনকে কোনো কৈফিয়ত দিতে পারলেও, সুনন্দকে পারবে না।

এখনই একমুখো সুড়ঙ্গের মতন অ্যাডিট্‌টায় নামতে ইচ্ছে করছিল। অ্যাডিট্‌টার ভেতরে নিশ্চয়ই অন্ধকার। নিজেকে ঢাকা যায়।

নয়নতারার চলে যাওয়ার আকস্মিকতায় অমল চমকে গিয়েছিল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার একখানা চিঠি এলেও অমলের আশ্চর্য লাগল। অবশ্য আশ্চর্য লাগার তেমন কারণ ছিল না। এ যাবৎ শোভনতার মুখোশটুখোশ দিয়ে মুখ এবং শরীর ঢাকা ছিল। নয়নতারার সামনেই অমল সেই মুখোশটা ছিঁড়ে হন্যে হয়ে উঠুক, নয়নতারা চায়নি। তাই যাবার আগে তাকে কিছু জানায় নি, চোখের বাইরে গিয়ে দূর থেকে চিঠি লিখেছে।

চিঠিটা নয়নতারা লিখেছে কার্শিয়াং থেকে। একাধিকবার পড়ে চিঠিটা বিছানার তলায় রেখে দিয়ে অমল জামাপ্যান্ট না বদলেই ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল সন্ধ্যের আগে। বেশ বড়ই চিঠিটা। এক জায়গায় নয়নতারা লিখেছে: আমার ডিগ্রী নেই। চাকরি করার অভিজ্ঞতাও ছিল না। অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ চাকরি দিতে চায় না। তোমাদের ওখানে

বাচ্চাদের পড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। এখানে একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে যাচ্ছি। সব ঠিক, দক্ষিণা ভাল। তাহলে দেখ অমল, আমার কত বৈষয়িক বুদ্ধি।

দাঁতে দাঁত চেপে অমল ভাবছিল, নয়নতারা প্রাপ্তবয়স্ক, সন্দেহ নেই। শুধু কেন যে ধরে নিল, অমলের এখনো কৈশোর কাটেনি!

জানলার কাছে সরে এসে বেশী আলোয় অমল আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে। সারা মুখ রুক্ষ, গালের চামড়া আগের মতন মসৃণ নেই, গাল একটু বসে গেছে, ঠোঁট দুটো পোড়া পোড়া, দৃষ্টিতে এতটুকু বিস্ময়বোধের উজ্জ্বলতা নেই, শুধু বিতৃষ্ণা। একদা তার চোখে বিষণ্ণতা দেখেছিল নয়নতারা। সেই বিষণ্ণতা এখন অবশ্যই নেই। জীপ চালিয়ে চালিয়ে হাতে অনেকগুলো কড়া পড়েছে, কপাল আগের থেকে বেশী চওড়া। অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করে অমলের নিজেকে রীতিমত প্রাপ্তবয়স্ক মনে হল। তবু কেন নয়নতারা ভাবল, এখনো অমলের কৈশোর কাটেনি।

অমল ভেবে দেখেছে, এখানকার হাজারখানেক লোকের প্রতি তার আর আগের মতন প্রীতি নেই, একাত্মবোধ নেই। চড়াই-উতরাইয়ে শালের অরণ্যের সবুজ তরঙ্গ তাকে আর আগের মতন টানে না। বনাই-কিয়নঝড় পর্বতমালায় সঞ্চিত লোহার ঐশ্বর্য খুবলে নেবার আয়োজন চূড়ান্ত পর্যায়ে এলেও সে আর আগের মতন স্বপ্নটপ্ন দেখে না। গাঢ় পিঙ্গল কঠিন পাথরের ওপর ছড়ানো অজস্র শাদা শিউলি দেখে তার চোখ আর তেমন স্নিগ্ধ হয় না।

তবে কেন প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা পাবে না অমল!

চিঠির শেষের দিকে নয়নতারা লিখেছে: চলে আসবার আগের দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তবু চলে আসবার কথা তোমাকে বলিনি। বলতে লোভ হয়েছিল, শুনে তুমি কী কর দেখবার লোভ। কিন্তু বলতে পারিনি। তোমাকে সব কথা বলা যায় না। জানি, আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ থাকবে। তবু একটা কথা শোনো, অমল, প্রতিদিন আমার লোভ বেড়ে যাচ্ছিল, তাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস পেলাম না।

আবার পায়চারি করছিল অমল। অল্প আগে অফিসবাড়ি থেকে ফিরেছে। হাতমুখ ধোয়নি। গায়ে তখনো জামাপ্যান্ট, জুতোও খোলা হয়নি। অফিস থেকেই চিঠিটা নিয়ে এসেছে। জুতোর ঘা লেগে একটা চায়ের কাপ ভাঙল। সকালে বেরোবার আগে খেতে বসে টেবিল থেকে চায়ের কাপটা মেঝেয় নামিয়ে রেখেছিল। এখন ভেঙেছে দেখে নাটুকে চালে সেটাকে জুতোর তলায় পিষেপিষে গুঁড়ো করল।

বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এইমাত্র আলো জ্বলল সামনের রাস্তায়। আবার ঘরে গিয়ে লোহার চেয়ারটা বারান্দায় টেনে এনে বসল।

শুকমতী আসছিল চায়ের দুধ নিয়ে। কাছে এসে অভ্যস্ত পায়ে বারান্দায় উঠে এল। পাত্র চাই, দুধ ঢেলে দেবে।

জল মেশাতে শেখেনি শুকমতী। উঠে গিয়ে ভেতর থেকে একটা পাত্র এনে সামনে তুলে ধরলে শুকমতী তার নির্ভেজাল দুধ ঢেলে দেবে। অথচ অমল চেয়ার ছেড়ে উঠল না। সেখানে বসেই চোখ রাখল শুকমতীর শরীরে। নতুন চোখ পেয়েছে মনে হল। সেই চোখ শুকমতীর শরীরের ঢাল এবং চড়াই চেটেচেটে দেখছিল। কেমন এক অস্বস্তিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুকমতী মুখ নামিয়ে নয়নতারার মতন নিজের পায়ের দিকে তাকাল। নয়নতারার দেয়া জামাটা আজো পরেছে। একটুক্ষণ তার শাড়ির কোণ আর হয়ত ঠোঁট ছাড়া আর কিছু নড়ল না। তারপরই লুকিয়ে একবার অমলকে দেখে নিয়ে মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল।

শুকমতী কখনো অমলের সামনে এমন করে হাসে না।

চেয়ারে ঠায় বসে থাকা অমলের ঠিক সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল। হয়ত নিজেই ভেতরের বারান্দায় গিয়ে কোনো পাত্রে দুধ ঢেলে রাখবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু আজ ঘরের মধ্যে যেতে শুকমতীর পা উঠল না। অমল আগে কোনোদিন তার দিকে এমন চোখে তাকায়নি। আজ ঘরের মধ্যে যেতে ভয় পেল শুকমতী। এখন ঘরে ঘন ছায়া জমেছে, ক্রমে চাপচাপ অন্ধকার ভেতরটাকে গিলে বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

# জনসংখ্যার বিস্ফোরণ : ভারতের সমস্যা

## শান্তিকুমার ঘোষ

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা গভীর উদ্বেগের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। জাতীয় আয় জনসমষ্টির চাইতে দ্রুতগতিতে বাড়ছে এবং তার উপর দেশের বৈষয়িক উদ্যোগ নির্ভর করে ব'লে পরিবার পরিকল্পনা নীতি অবলম্বনের দরকার হয়েছে, যাতে পিতামাতারা তাদের পরিবারের আকার সীমিত রাখতে এবং তাদের শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য বেশী ব্যয় করতে পারে।

ভারতের মোট জনসংখ্যা আজ প্রায় ৫১ কোটি ৫০ লক্ষ। এদেশে প্রতিদিন ৫০,০০০-এর বেশী শিশু জন্মায়। আমাদের লোকসংখ্যা বছরে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ বেড়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার শতকরা ২·৫। আমাদের জন্মের হার এখন বছরে প্রতি হাজারে প্রায় ৪০ থেকে ৪২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উচ্চ হওয়ায় জনসমষ্টির একটা বড়ো অনুপাত হচ্ছে তরুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানের মতো জনসংখ্যা বৃদ্ধির অল্প-হারবিশিষ্ট দেশগুলিতে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম অংশ ১৫ বছরের নীচে, ভারতে সেখানে ঐ অনুপাত দুইয়ের পাঁচের বেশী। দেশের জনসমষ্টির মধ্যে তরুণদের আধিক্যের (শতকরা ৪৭·৯) তাৎপর্য হচ্ছে লোকসংখ্যা অতীতের চাইতে আরো বেশী হারে বেড়ে যাবে।

পোষ্য শিশুরা একটা বড়ো অংশ হলে একটি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, জল-নিষ্কাশন প্রভৃতি খাতে ব্যয় থেকে বাঁচিয়ে সঞ্চয় ও মূলধন খাটানো কঠিন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে শুধু মূলধন নিয়োগের প্রবাহ কমিয়ে ফেলে তা নয়, একটি বৃহৎ শ্রমিকবাহিনীর তুলনায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ ছড়িয়ে রাখে। ফলে, উৎপাদন-ক্ষমতার ক্ষতি হয় এবং জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নীত করা সম্ভব হয় না।

জনগণের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে রপ্তানীযোগ্য সরবরাহ ক'মে যায় এবং বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। খাদ্য শস্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় যোগানের বেলা, চাহিদা ও সরবরাহের সমতা রাখার জন্য আমদানি বাড়াতে হতে পারে: লোকবাহুল্য সেক্ষেত্রে বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে সমস্যার সৃষ্টি করে। বস্তুত, ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্যের প্রয়োজন দেশে উৎপন্ন খাদ্য থেকে মেটানো সম্ভব হয়নি বলে বিদেশ থেকে ভারতকে নিয়মিত খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। অন্য দিকে, চাহিদা-যোগানের ঐ বৈষম্য দূর না করলে, খাদ্যশস্য-মূল্যের উপর বেশ চাপ পড়বে এবং তা অন্যান্য সব ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নয়ন ব্যাহত করবে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩·৮ বৃদ্ধির অর্ধেকের বেশী গ্রাস করেছে জনসংখ্যার স্ফীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালের অপরিবর্তিত মূল্যে নির্ণীত ভারতের নীট জাতীয় উৎপাদন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বেড়েছিল বার্ষিক শতকরা ৩·৫ হারে এবং দ্বিতীয় যোজনার সময় তা ছিল শতকরা ৪·০। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার হল যথাক্রমে ১·৬ ও ১·৮। তৃতীয় যোজনার সময় নীট

জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে বছরে শতকরা ২·৫ এবং জনপ্রতি আয় শতকরা মাত্র ০·১ হারে।

মাথাপিছু আয় নিরূপণে ক্রমপ্রসারণশীল জনসংখ্যার আকারে বিভাজকটির প্রতিঘাত লক্ষ্য করবার মতো; ১৯৬৯ সালের খসড়ায় বলা হয়েছে, '১৯৬৫-৬৬ সালে মাথাপিছু প্রকৃত আয় মোটামুটি ১৯৬০-৬১ সনের স্তরেই ছিল,' জাতীয় আয়ের অল্প হারে বৃদ্ধি প্রায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে শতকরা ২·৫ হারে দেশের জনসংখ্যা স্ফীতি দ্বারা। ১৯৬৬ সালের খসড়া পরিকল্পনা অনুসারে 'প্রথম যোজনা বেশ কিছু সফল হয়েছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেও কার্যসম্পাদন অসন্তোষজনক হয়নি; তৃতীয় যোজনার বিবরণ অবশ্য প্রথম দর্শনে ভালো নয়।' ১৯৭৬ সালের ভেতর মাথাপিছু প্রকৃত আয় দ্বিগুণ করার অভীষ্ট নিয়ে বৈষয়িক উদ্যোগ শুরু হ'ল ১৯৫১ সনে; ১৯৬৭ সালে তা যেখানে শতকরা মাত্র ২০ ভাগ বেড়েছে, মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার সেখানে ছিল শতকরা ৭২।

মোটামুটি ১৯২১ সন থেকে ভারতের জনসংখ্যার বিস্ফোরণ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং তা এখনো বাড়ছে। ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সালের ভেতর ভারতের জনসমষ্টি শতকরা ১২০ ভাগ বেড়েছে, ১৯২০ সালে ২৫ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ১৯৭০ সালে ৫৫ কোটি ৪০ লক্ষে পেঁৗছেছে। ১৯২০-৩০ দশকে লোকসংখ্যার বার্ষিক শতকরা বৃদ্ধির হার ছিল ১·০৬ এবং পরবর্তী দুই দশকে তা যথাক্রমে ১·৩৫ ও ১·২৪-এ দাঁড়ায়। ১৯৫০-৬০ দশকে ঐ হার হঠাৎ ১·৯৭-এ বেড়ে যায় এবং ১৯৬০-৭০ দশকে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২·৩৫ হয়। ১৯৫১-৬১ দশকে জনসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে জনসমষ্টির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৯৫১ সালে ৩১২ থেকে ১৯৬১ সনে ৩৭০-এ দাঁড়িয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিবিধ কারণে মৃত্যুর হার কমে আসার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিবিধান আগেকার উচ্চ মৃত্যুহারকে মহামারী ও অন্যান্য ব্যাধি থেকে কার্যত প্রশমিত করে। মৃত্যুর হার যেখানে ১৯২১-৩১ দশকে ৩৬·৩ থেকে ১৯৬১-৭১ দশকে ১৫·৬ হয়েছে, জন্মহার একই সময়ের ভেতর ৪৬·৪ থেকে মাত্র ৩৯·৮-এ কমেছে।

ভারতের সাধারণ প্রজননহার অর্থাৎ ১৫ থেকে ৪৪ জন্মদায়ক এই বয়ঃক্রমের প্রতি ১০০০ নারী যত শিশুর জন্ম দেয় তা জাপান, ইংলন্ডের (ওয়েলস্ সমেত) মতো দেশের অনুরূপ হারের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। ঐ হার ভারতে ১৯৬১ সনে যেখানে ১৯৫ ছিল, জাপানে ১৯৬০ সালে এবং ইংলন্ডে ১৯৬২ সালে দেখা গেছে তা যথাক্রমে ৭২ ও ৯১।

ভারতের সাম্প্রতিক কোনো বছরের শিশুজন্মগুলিকে তার ক্রম অনুসারে সাজালে অর্থাৎ জননীর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি শিশু জন্মেছে কিনা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এক সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জন্ম সকল শিশুজন্মের হ'ল শতকরা ৫৫ ভাগ, যা ঐ তিন পর্যায়ের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত। চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রমের জন্ম অন্য শতকরা ২৭ ভাগের জন্য দায়ী, বাকী শতকরা ১৮ ভাগ হচ্ছে ছয় এবং তার উপরের পর্যায়ের শিশুজন্ম। জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখলে, বোঝা যাবে যে ভারতের সমস্যাটা হচ্ছে ঊর্ধ্বতন (ধরা যাক, তিনের উপরে) ক্রমের জন্মগুলির নিবারণ এবং নীচের পর্যায়ের শিশুজন্মগুলির মধ্যে ব্যবধান বাড়ানো।

অল্প বয়সে বিবাহ ভারতে জনসংখ্যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। ১০ থেকে ১৪ বছর

বয়ঃক্রমের নারীদের ভেতর শতকরা ১৯ ভাগ বিবাহিত। পল্লী অঞ্চলে ঐ অনুপাত আরো বেশী—১৯৬১ সনে শতকরা ২২, আর শহর অঞ্চলে তা হ'ল সাত। ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সের নারীদের ভেতর বিবাহিতের শতকরা অনুপাত গ্রামদেশে ৮৬ এবং শহর অংশে ৭৯।

বিবাহের সর্বব্যাপী প্রচলন, যৌথ পরিবার, জাতিপ্রথার অস্তিত্ব ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ পরিবারগুলি অল্প বয়সে বিবাহ, বহু সন্তান-ধারণ এবং উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। সারা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে তর্ফাসিলভুক্ত জাতি। এই তর্ফাসিলী সম্প্রদায়ের শতকরা ৮৬·৬ ভাগ গ্রাম অঞ্চলের; তারা স্বেচ্ছায় সন্তানজন্মের সংখ্যা হ্রাস আদৌ অনুমোদন করে না। কাজে কাজেই, অতিপ্রজতা সমস্যার সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলি ভালোভাবে বিবেচনা করা দরকার।

ভারতে যেসব জায়গায় নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, জনসংখ্যার উপর তার প্রভাব সেই সকল স্থানে লক্ষ্য করবার মতো। যে সমস্ত অঞ্চলে কৃষি-সংক্রান্ত নতুন সুযোগ গড়ে উঠেছে, সেখানে জনসমষ্টি অসমঞ্জসভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। খেত-বাগানের সম্প্রসারণ হওয়ায় ঠিক এমনটি ঘটেছে ত্রিবাংকুর-কোচিন ও আসামে। বিশেষ করে, চা-বাগান ও নতুন কর্ষিত জমি থাকায় আসাম ১৮৭২ ও ১৯৪১ সালের ভেতর ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধিশীল রাজ্য হয়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্য হলেও, পাঞ্জাবের যে জেলাগুলিতে নতুন জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধির হার দেখা গেছে। ১৯০১ ও ১৯৪১ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ের জনসমষ্টি দ্বিগুণ এবং কলকাতার লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ১৫০ ভাগ বেড়েছিল। আয়ের দিক থেকে কম আকর্ষণযোগ্য অংশেও লোক ভিড় করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ দেখা দেয়—যা অবশ্য, প্রকৃত প্রস্তাবে, দারিদ্র্যের নির্দেশক, তার কারণ নয়। সেজন্য ভারতের পল্লী অঞ্চলে আংশিক বেকার ও ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে। জনসংখ্যার বৃত্তিমূলক বিভাজন থেকে তাই জমি ও দৌলতের তুলনায় শ্রমের প্রাচুর্য বোঝা যায়। কয়েক দশক ধরে আদমসুমারি অনুসারে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে আংশিক বেকারদের আধিক্য দেখা যায়। কৃষিজাত উপার্জন সাধারণত অন্যান্য বৃত্তিসঞ্জাত আয়ের চাইতে কম।

আর্থিক ব্যবস্থার একটা বড়ো অংশ কৃষি হওয়ার তাৎপর্য আছে। কর্মসংস্থানের দিক থেকে, দৌলতের পরিমাণ নয়, কত জমি ও জল আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা তার প্রান্তিক ধকলের চাইতে (অথবা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য চিরাচরিত মজুরির চেয়ে) কম বলে বেকারসমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেকের মতে, বছরের মধ্যে অন্তত ছ'শ মাস শ্রমিকরা কাজের অভাবে বসে থাকে। দেশে যখন শ্রমের প্রাচুর্য, জনসংখ্যা আরো বাড়তে থাকলে বর্তমান ও অতিরিক্ত শ্রমিকদের কাজের যোগান দেওয়ার দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

মূলত কৃষিপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও, মোট জনসংখ্যার নাগরিক অনুপাত ১৯০১ ও ১৯৬১ সালের ভেতর মন্দগতিতে বেড়ে শতকরা ১১ থেকে ১৮ ভাগ হয়েছে। নাগরিক লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ১৮৮১ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে বেশ শ্লথ ছিল কিন্তু গত দুই দশকে (১৯৪১-৬১) শহরের প্রসারের গতি বেড়েছে। এই দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য সম্ভবত তিনটি কারণ দায়ী। শিল্পোন্নয়নের আকর্ষণে গ্রাম অঞ্চল থেকে বেশী বহরে লোকের শহরে চলে-আসা, শহরবাসীদের স্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উদ্বাস্তুদের আগমন। দেশের জনসমষ্টির তুলনায়

ভারতের মহানগরগুলি এখনো খুব ছোট। ১৯৬০ সালে পাঁচটি সবচেয়ে বড়ো নগর মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র তিনের কিছু বেশী এবং বৃহত্তম দশটি নগর জনসমষ্টির শতকরা কেবল প্রায় ৪½ ভাগের জন্য দায়ী।

১৯৪৭ সাল থেকে দেশের শিল্পবিকাশের জন্য বেশ খানিকটা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ভারতের শ্রমিকবাহিনীর (১৫-৫৯) শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষি অংশে কর্মরত; শতকরা মাত্র ২০ ভাগ মাধ্যমিক ও প্রান্তিক অংশে নিযুক্ত।

জমির অনটন, সঞ্চয়ের নিম্ন হার, শ্রমিকবাহিনীর দ্রুত সম্প্রসারণ, মানুষের জন্য মর্যাদা ও সাম্য এবং বৈষয়িক উন্নয়নের সামগ্রিক দাবি, বিশেষ করে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—এ সমস্ত কারণে ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ আজ জরুরী হয়ে উঠেছে। সারা দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণের সমস্যা ছাড়াও, বিভিন্ন পরিবার, জননী ও শিশুদের দিক থেকে উৎকণ্ঠার কারণ আছে।

সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথে নানা বাধার মধ্যে শুধু চলাচল ও পরিবহণের অসুবিধা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য নয়, প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অভ্যাস, প্রথা, জাতিসম্পর্ক, পক্ষপাত, ধর্ম ও আচার প্রতি পদে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। অর্থ ছাড়াও অন্য অনেক কিছুর অনটন আছে। যান, শিক্ষিত নারী-চিকিৎসক, গ্রামে গিয়ে অহোরাত্র কাজ করবে এরকম শিক্ষিত ও উৎসর্গীকৃত কর্মী বাহিনীর অভাব অনুভব করা হয়। সকল ঋতুতে যাওয়া-আসার রাস্তা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার মৌল স্বাচ্ছন্দ্যগুলি নেই এমন শত শত গ্রাম আছে। বহুকাল চলে আসছে —জীবনের এরকম অভ্যাস বদলাবার ব্যাপারে অনিচ্ছা দেখা যায়।

জন্মরোধের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য না হতে পারে : সমাজের পারমার্থিক ভিত্তির চাইতে বস্তুতান্ত্রিক আবরণের উপর জোর দেওয়ার আশঙ্কা আছে। জন্মনিরোধ ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে পরিবারের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে, পরিবারের একবার ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠলে ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ এবং সমাজের সঙ্গে তার খাপ খাওয়ানো দুরূহ হবে। তাতে অবাধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জেগে উঠবে এবং পিতামাতার দায়িত্ব এড়াবার দিকে ঝোঁক দেখা দেবে। পরিবারের মধ্যে দায়িত্ব বর্জন পরে সামাজিক জীবনের সকল স্তরে দায়িত্ব এড়ানোর রূপ নিতে পারে।

সন্দেহ নেই, দারিদ্র্যের মধ্যে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। জীবনযাত্রার মান উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আকার ছোট হয়ে আসে। ইউরোপের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উৎসাহ দারিদ্র্য থেকে আসে নি। বড়ো পরিবার হতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পদমর্যাদার হানি হতে পারে এই ভয়ে অনেকে বিবাহ পিছিয়ে দিতে অথবা এড়াতে চেয়েছে। ক্ষুধা নয়, লোকের সামাজিক অবস্থা বজায় রাখা বা উন্নতি করার ইচ্ছা ছিল সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

কলকারখানা ও শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় যে, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমে আসবে (অন্তত অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা তা-ই বলে)। প্রথমত, বহু পুরুষ তাঁদের পরিবারদের গ্রামে রেখে কারখানায় কাজ করতে আসে, বিবাহিত মেয়েরাও অনেক সময় কলকারখানায় কাজ নেয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তনের ফলে বহু সন্তানের পরিবর্তে স্বল্পসংখ্যক স্বাস্থ্যবান সন্তানের বাঞ্ছনীয়তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার অভিলাষ লোকের মনে ক্রমে প্রবল হবে। তাছাড়া বিবাহের বয়স ও অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি ধীরে ধীরে শহর অঞ্চলে জন্মের হারকে প্রভাবান্বিত করবে। (প্রসঙ্গত,

আইন করে স্ত্রীলোকদের বিবাহের ন্যূন বয়স ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২০ বছরে বেঁধে দেবার প্রস্তাবের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। স্পষ্টত, পল্লী অংশের পশ্চাৎপদ ও নিরক্ষর লোকদের মধ্যে প্রস্তাবটিকে বলবৎ করা সহজ হবে না।) এদিক থেকে দেখলে মেয়েদের শিক্ষা, তাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ এবং গ্রাম ও কারখানা অঞ্চলে খেলাধূলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

জনসংখ্যার সমস্যাকে পরিমাণ অথবা চরিত্রগত গুণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য কেবল মোট সংখ্যার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতের জনসমষ্টির গুণগত বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষের উন্নতি বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যে জনসংখ্যা পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন, উচ্চতম জীবনযাত্রার মান, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যগুলি অর্জনের জন্য উপযুক্ত স্বাধীনতা ও অবসর সংরক্ষণ করতে পারে তা-ই বাঞ্ছনীয় বা অভিপ্রেত। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে তার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যবান ও উদ্দেশ্যময় জীবনযাপনের জন্য মৌল ও আবশ্যক জিনিসপত্রের প্রাপ্তি হচ্ছে একটা প্রাথমিক শর্ত। এর মধ্যে খাদ্য হল সবচেয়ে বড়ো অভাব। নির্ণীত ন্যূন ২,৩০০ থেকে ২,৫০০ ক্যালরির তুলনায় ১৯৬০ সালে ভারতের দৈনিক মাথাপিছু ভোগ ছিল ১,৯৫০ ক্যালরি। স্পষ্টত, এ দেশের কয়েক কোটি লোক পুষ্টির অভাবে পীড়িত। পরিধানের ক্ষেত্রে, একটি প্রধান তুলা ও বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে মাথাপিছু কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করা হয় বছরে কুড়ি গজের কম। বাসস্থানের বেলাও একই কথা : প্রধান নগরগুলিতে অবিশ্বাস্যরকম ভিড় ও বস্তির বিস্তার; গ্রামবাসীরা বসবাসের মৌল সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যগুলি থেকে বঞ্চিত। তার উপর, শতকরা ৭০ ভাগ ভারতবাসী নিরক্ষর। সংক্ষেপে, ভারতের একটা সংখ্যাগুরু অংশ দারিদ্র্য-রেখার নীচে জীবনযাপন করে।

এ দেশের অভিজ্ঞতা হল যে, জীবনযাত্রার সামান্য উন্নতি ঘটলে জনসংখ্যা আরো বেড়ে চলে। তার চাইতে বেশী, চিরাচরিত সামাজিক প্রথা ও নিষেধগুলির আধুনিকীকরণের (যেমন, বিধবা-বিবাহের প্রসার) সঙ্গে সঙ্গে প্রজননহার অন্তত সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে একটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ জরুরী হয়ে উঠেছে। একদিকে, বর্তমান ও সম্ভাব্য লোকসংখ্যা, জনগণের অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি এবং অন্য-দিকে, দেশের উপাদানরাশি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার হবে ঐ নীতির ভিত্তিস্বরূপ।

জনসংখ্যানীতি হচ্ছে জাতীয় সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন করে অথবা সরকারী নির্দেশের সাহায্যে দেশের জনসমষ্টির আকার ও গঠন রূপান্তরিত করার স্বেচ্ছাকৃত একটা প্রচেষ্টা। সম্প্রতি কয়েক বছরে দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির চাইতে মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল প্রয়োগ করা সহজ। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় জন্মের হার কঠোরভাবে কমিয়ে না আনলে ভারতের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নীত করা কঠিন হবে।

জনসংখ্যা সমস্যার কোনো সরল সমাধান না থাকলেও, ঐ সূত্রে যেসব পন্থা নির্দেশ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে জন্মহারের নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, বৈষয়িক উদ্যোগের একটা মূল লক্ষ্য সঙ্গত সময়ের ভেতর জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সুস্থিত করা।

জন্মহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য চারটি উপায়ের কথা বলা হয় : (১) বিরতি বা পরিহার,

(২) গর্ভনিরোধ, (৩) নির্বীজন, (৪) গর্ভপাত বা ভ্রূণবিনাশ। ভারতের একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে গর্ভপাত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিরতি অনেকেই সমর্থন করবে না; অনেকের মতে তাতে বিবাহের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিলম্বিত বিবাহ খানিকটা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু বিবাহের বয়স দশ বছর বাড়িয়ে দিলেও শিশুজন্মের সংখ্যা হ্রাস তেমন উল্লেখযোগ্য হবে না।

পশ্চাৎপদ গ্রাম্য পরিবেশে চলিত রীতিসম্মত উপায়ে গর্ভনিরোধ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম, কেননা, তার জন্য চাই জীবনযাত্রার উচ্চমান, সংজননের শারীরবৃত্ত-সংক্রান্ত কিছু জ্ঞান এবং নিদানিক পরামর্শ-ব্যবস্থা। যে-দেশে সামাজিক বীমা-ব্যবস্থা, বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি বা ভাতা, অসুস্থতাকালে সুবিধা অথবা বেকারদের ভাতা দেবার বন্দোবস্ত নেই, সেখানে পুত্রকামনা মনোভঙ্গি হিসাবে বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণের জন্য পিতা-মাতাদের নির্ভর করতে হয় কর্মরত পুত্রের উপর। মেয়েদের শীঘ্র বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

সব তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনা অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা, বৈদেশিক সাহায্য ও পরামর্শ সত্ত্বেও, ভারতের পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম এ পর্যন্ত মোটামুটি বিফল হয়েছে। জাতির জন্মহার বিশেষ কমিয়ে আনা যায় নি; তা এক উচ্চ স্তরে অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিক থেকে দেখলে আগামী দশক সংকটজনক।

# ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকটি রাজস্থানী চিত্র

**রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়**

একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে রাজস্থানী চিত্রকলার আবির্ভাব কোন্ সময়ে ঘটল? রাজস্থানী চিত্রকলার চর্চায় নামলেই এই সময়গত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মধ্যযুগের চিত্রকলার এই ধারাটি সৌন্দর্যগুণে বহু পূর্বেই আনন্দ কুমারস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পপ্রেমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'শিল্পরীতি' ও 'থীম'—এই উভয় বিষয়ের চর্চাই যে প্রয়োজন, তা কুমারস্বামীই প্রথমে লিখেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যাবেক্ষণের ফলে চিত্রকলাবিদরা স্পষ্টই বুঝলেন যে রাজস্থানী ধারার উপরে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রকলার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। নবতর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ল মুঘলশিল্পের প্রভাব। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার বিশেষ কোনো ছবি পাওয়া গেল না, যাকে পণ্ডিতবর্গ নির্দ্বিধায় 'রাজস্থানী' আখ্যা দিতে পারেন। বস্তুত, ১৫৫০-এর পূর্বে রচিত খুব অল্প ছবিই রাজস্থানে পাওয়া গেছে; এবং তা পাওয়া গেছে খুব সম্প্রতি। সুতরাং সমালোচকেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে মুঘল দরবারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে চিত্রকলা গড়ে ওঠে (Imperial Atlier) তার দ্বারা, পশ্চিম ভারতীয় রীতির শিল্পীরা প্রভাবিত হন। তার ফলে তাঁরা যে নতুন প্রকরণ গ্রহণ করলেন, তার থেকে উত্তরকালে উদ্ভূত হল এক নতুন শিল্পধারা। এটিই রাজস্থানী চিত্রকলা নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতীয় রীতিতে দক্ষ ভারতীয় শিল্পীদের উপর এই মুঘল প্রভাবের উদাহরণ হিসাবে পণ্ডিতেরা উপস্থিত করেছেন 'হামজানামা' নামক মহাগ্রন্থকে; এই গ্রন্থের ছবিগুলির মধ্যে কোথায় কোথায় দেশীয় অনুপুঙ্খের ব্যবহার আছে তা বেসিল গ্রে দেখিয়েছেন। মনে হয় হামজানামার খুঁটিনাটি কাজে সহায়তার জন্য Imperial Atlier-এর প্রধান শিল্পীদের সহায়ক হিসাবে দেশীয় ধারার শিল্পীদেরও নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই প্রাথমিক গবেষণার পরে রাজস্থানী ধারার উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান কিছুকাল স্থগিত থাকে। নবতর গবেষণা শুরু হল কয়েকটি সচিত্র পুঁথি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'এন সি মেহটা সংগ্রহে' সংরক্ষিত 'বিলহনের চৌর-পঞ্চাশিকার' একটি সচিত্র পাণ্ডুলিপি। আরও অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল: লাহোর মিউজিয়ামে পাওয়া গেল 'লোর চন্দ', প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়মে পাওয়া গেল একখানি 'গীতগোবিন্দ' আর একখানি 'ভগবৎপুরাণ' যার পাতাগুলি বিভিন্ন মিউজিয়মে ছড়িয়ে আছে। পশ্চিম ভারতীয় রীতির সঙ্গে এই পুঁথিচিত্রগুলির স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গেল, কিন্তু এগুলির পরস্পরের মধ্যে এত মিল, যে তা একটি নূতন শিল্পধারাকেই সূচিত করে। বহু মতামতের সৃষ্টি হল। আলোচনার সুবিধার জন্য পণ্ডিতবর্গ এই ছবিগুলির সমষ্টিগত নাম দিলেন 'কুলাধার গোষ্ঠী' (Kuladhar Group)। ছবির পুরুষমূর্তিগুলির মাথায় যে চ্যাপ্টা ধরনের পাগড়ি আছে, তার থেকেই এই নামের উৎপত্তি। আর একটি অদ্ভুত ধরনের জিনিস এদের গায়ের 'চাকদার জামা' যা পশ্চিম ভারতে পরিহিত হত না, প্রধানত আকবরের সভাতেই ব্যবহৃত হত। এর পর কুলাধার গোষ্ঠী সম্বন্ধে যে আলোচনা চলল, তা বহুদিক স্পর্শ করল : কালক্রম (chronology), উৎপত্তিস্থল (provenance), মুঘল

দরবার শিল্পের কোন লক্ষণ আছে কিনা, কোনো বিদেশী কলাকৌশলের ব্যবহার আছে কিনা ইত্যাদি।

এই চিত্রগুলির কাল আকবরের পরবর্তী বলে যাঁদের ধারণা,[১] শ্রীকার্ল খাণ্ডালওয়ালা[২] তাঁদের মধ্যে প্রধান। তাঁর অনুমানের প্রধান ভিত্তি চিত্রে অঙ্কিত পরিচ্ছদ, যথা 'কুলাকৃতি পাগড়ি' এবং 'চাকদার জামা'। এই জামার তলার দিকে ছ-টি সূচাগ্র অংশ আছে। আকবরের যুগেই এই পোশাক প্রচলিত ছিল, এবং হামজানামার' পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থে এই ধরনের জামা চিত্রিত হয়নি।

বেসিল গ্রে[৩], ব্যারেট[৪], আনন্দকৃষ্ণ[৫] প্রমুখ সমালোচকেরা দ্বিতীয় মতবাদের স্রষ্টা। ১৯৪৭-৪৮ সালে অনুষ্ঠিত Royal Academy Exhibition of the Art of India and Pakistan-এর পর বেসিল গ্রে 'কুলাধার' চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এগুলি পশ্চিম ভারতের প্রাক্‌মুঘল শিল্পশৈলীর নিদর্শন। পরে যখন এই শিল্পীরা মুঘল atlier-এ নিযুক্ত হলেন তখন তাঁরা প্রাচীনতম মুঘলচিত্রগুলিতে একটি মৌলিক ভাবের আমদানি করলেন, যা 'হামজানামায়' পরিস্ফুট। কাজেই গ্রের মতে চিত্রগুলির কাল ১৫৫০—১৫৮০-র মধ্যে। এই মতপার্থক্য কেবল কালনির্দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পের একটি নূতন শৈলী হিসাবে রাজস্থানী চিত্রকলার উদ্ভবকে বিচার করলে এই মতপার্থক্য সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। সুতরাং বিভিন্ন মতগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে প্রাচীন রাজস্থানী চিত্রকলার (Rajasthani Primitives) কোনো আলোচনা অসম্ভব।

## দুই

প্রাচীন রাজস্থানী চিত্রকলা সম্বন্ধে কার্ল খাণ্ডালওয়ালা তাঁর মতামত প্রকাশ করেন The Leaves from Rajasthan নামক প্রবন্ধে। এই শিল্পধারার উৎপত্তি, তারিখ এবং বিদেশী প্রভাবের প্রশ্নগুলি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। এই প্রবন্ধটি বহু বাদানুবাদের সৃষ্টি করে। পুনরালোচনায় নেমে তিনি কয়েকটি মতামতের উপর আবার জোর দেন The Problems of Rajasthani Painting নামক প্রবন্ধে। সমস্যার বিশ্লেষণ করতে গেলে, তাঁর যুক্তিগুলি দেখা প্রয়োজন।

১। শ্রীকার্ল খাণ্ডালওয়ালা বলেন যে ১৫৯০ সালের আগে রাজস্থানী চিত্রকলার কোনো স্বতন্ত্র ধারা ছিল না। পাণ্ডুলিপি চিত্রণের গুজরাটী শিল্পরীতি ও তার আঞ্চলিক রূপান্তরই এই সময় প্রচলিত ছিল। রাজস্থানী ছবিও ছিল তারই অন্তর্ভুক্ত। রাজস্থানী চিত্রকলার প্রথম প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি ধরছেন, বরদা মিউজিয়মে রক্ষিত ১৫৯০ সালের একটি চিত্রিত 'উত্তরাধ্যায়ন সূত্র'র পাণ্ডুলিপি।

---

১ Basil Gray: *Rajput Painting*, Faber.

২ Karl Khandalwala—Leaves From Rajasthan—*Marg*, Vol. IV, No. 3.

৩ Basil Gray } *The Paintings of India*, 1963.
৪ Barret }

৫ Rai Anand Krishna: Some Pre-Akbari Examples of Rajasthani Illustrations, *Marg*, Vol. XI, No. 2.

৬ Karl Khandalwala—*Marg*, Vol. IV, No. 3.

২। প্রারম্ভিক রাজস্থানী শিল্পধারা বলে যা পরিচিত তা দুটি শৈলীর সংমিশ্রণে জাত—মুঘলশৈলী এবং গুজরাটী পাণ্ডুলিপি চিত্রণশৈলী। শেষোক্ত শৈলীর প্রচলন রাজস্থানেও ছিল, গুজরাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও ছিল।

৩। তিনি মনে করেন সুলতানী আমলে, পশ্চিমভারতীয় চিত্রশৈলীতে পারস্য চিত্রকলার স্বল্প প্রভাব পড়েছিল 'দেবসেনাপদকল্প সূত্রের' চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে (১৪৭৫)। ছবির কিনারে-কিনারে পারস্য অলংকরণ দেখা যায়। এছাড়া আর কোনো স্পষ্ট উদাহরণ নেই। পারস্য শৈলীর প্রভাব হিসাবে আর্চার যে 'নিমৎনামার' উল্লেখ করেছেন, খাণ্ডালওয়ালা সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল পশ্চিমভারতীয় শৈলীতে বিদেশী প্রভাব ক্ষীণ এবং তার ফলে কোনো নতুন গতি বা ধারার উৎপত্তি হয়নি। এই যুক্তিটি লক্ষণীয়; কারণ তিনি একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলছেন যে পশ্চিমভারতীয় চিত্রকলায় বহিরাগত প্রভাবের ফলেই রাজস্থানী ধারার রূপায়ণ। এই বহিরাগত প্রভাব যদি পারস্যের না হয় তবে তা নিশ্চয় মুঘল প্রভাব। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ভারতীয় শৈলীর এক রূপান্তর ঘটার কথা লেখক বলেছেন। তাঁর মতে এই রূপান্তর কেবল আঞ্চলিক-উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য 'মহাপুরাণ' (১৫৪০)। খাণ্ডালওয়ালার মতে গুজরাটী শিল্পশৈলীর অনেক চর্বিত চর্বণের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস এই চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে প্রথম দেখা যায়; কিন্তু তবু এটি গুজরাটী ধারারই একটি বিশেষ ভঙ্গি। অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই মৌলিক প্রয়াসের ছাপ আছে। 'লৌরচন্দ' এবং 'চৌরপঞ্চাশিকা' গ্রুপে যে শৈলী দেখা যায় তারই পূর্বসূরী ১৫৪০-এর 'মহাপুরাণ' এমন কথাও খাণ্ডালওয়ালা বলেছেন। উত্তরভারতে প্রচলিত এই শিল্পধারা মাণ্ডু এবং রাজস্থানেও প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একেবারে নতুন শিল্পশৈলীর প্রারম্ভ হিসাবে এগুলিকে একেবারেই ভাবা যায় না।

তিনি শেষে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে রাজস্থানী শৈলীর প্রাথমিক বিকাশের সুস্পষ্ট চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে, কোন হৃতসূত্র (missing link) নেই। ১৫৮৩ পর্যন্ত গুজরাট রাজস্থান অঞ্চলে যে 'পশ্চিম ভারতীয় পাণ্ডুলিপি চিত্রণ' প্রচলিত ছিল, তার শিল্পরীতির উপর মুঘল চিত্রকলার অভিঘাতেই রাজস্থানী চিত্রকলার জন্ম। এর থেকেই বোঝা যায় প্রাক্-মুঘল কোনো রাজস্থানী শিল্পরীতির অস্তিত্বই অসম্ভব বলে শ্রীখাণ্ডালওয়ালার ধারণা।

এই মত তাঁর একার নয়। শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রচিত *An Outline of Early Rajasthani Painting*[৭] অনুরূপ মতের সমর্থক। শ্রীচন্দ্রের মতে ১৮৬৫ সাল নাগাদ আকবরের দরবার একটি Imperial Atlier প্রতিষ্ঠা করে। এখানে পারস্য দেশের শিল্পগুরুদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় শিল্পীরা চিত্রাঙ্কনের নতুন প্রণালী রপ্ত করেন। তাঁদের মাধ্যমে এই প্রভাব পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' চিত্রাবলীতে তার চিহ্ন মেলে। এই মুঘল প্রভাবের জন্য এবং ১৫৪০ সালে পাণ্ডুলিপিগুলি থেকে এদের রীতিগত উন্নতির জন্য বলা যায় যে 'চৌরপঞ্চাশিকা গ্রুপ' ষোড়শ শতকের শেষপাদে রচিত।

শ্রী চন্দ্র আরও বলেন যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পরিলক্ষিত শিল্প আন্দোলনের জন্মভূমি ছিল গুজরাট। উত্তরাধ্যায়ন সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপির সাম্প্রতিক আবিষ্কার তার প্রমাণ; এবং এক 'চবন্দ রাগমালা' ব্যতীত রাজস্থানে এই শৈলীর চিত্রিত পাণ্ডুলিপি রচিত হয়নি বললেও চলে। কাজেই তিনি

৭ P. Chandra: *Marg*, XI, No. 2.

ইঙ্গিত করেছেন যে 'চৌরপঞ্চাশিকা গ্রুপের' উৎপত্তি জৌনপুরে। বেসিল গ্রে প্রমুখ লেখকদের মতে 'মেবার' এই চিত্রমালার উৎপত্তিস্থল, এঁদের সঙ্গে শ্রী চন্দ্রের মতের পার্থক্য স্পষ্ট।

এই দুই সমালোচকের মতগুলি পুনরুক্ত হয়েছে, A New Document of Indian Painting শীর্ষক নিবন্ধে; সেটি লিখেছেন কার্ল খান্ডালওয়ালা, প্রমোদ চন্দ্র, মোতি চন্দ্র এবং পি. এল. গুপ্ত। এই নিবন্ধের মুখ্য উপজীব্য প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়মে রক্ষিত 'লৌরচন্দ' পান্ডুলিপি। পশ্চিমভারতীয় রীতির নতুন রূপের সঙ্গে এই পান্ডুলিপি-চিত্রগুলির সন্দেহাতীত সাদৃশ্য দেখা যায়। এর ফলে লেখকদের সামনে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। উপরোক্ত চিত্রগুলিতে 'প্রলম্বিত চোখ' বা প্রচলিত গুজরাটী পরিচ্ছদ পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়মের লৌর-চন্দে যেমন জন রাইল্যান্ড লাইব্রেরির লৌর চন্দেও তেমনি 'চাকদার জামার' ব্যবহার দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে আকবরী আমলের 'হামজানামায়' এই পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী 'নিমৎনামায়' তা অনুপস্থিত। সুতরাং ১৫২৫—১৫৫০-এর মধ্যে এই দুটি লৌরচন্দ পান্ডুলিপিকে ফেলা যাচ্ছে না। অতএব মুঘল প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল 'পাগড়ি' আর 'জামায়'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাক্-মুঘল যুগে রাজস্থানী রীতির অস্তিত্বের সপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি (লৌর-চন্দ ও চৌর-পঞ্চাশিকায় লক্ষিত রূপান্তরিত গুজরাটী রীতি) খান্ডালওয়াল ও মোতিচন্দ্র গ্রহণ করছেন। অঙ্কিত পরিচ্ছদের সাক্ষ্যে তাঁরা বলেছেন যে আরও আগে এই রীতির উদ্ভব সম্ভব নয়।

## তিন

বেসিল গ্রে, ব্যারেট, আনন্দকৃষ্ণ প্রমুখ সমালোচকরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। গ্রে এবং ব্যারেটের মতে 'কুলাধার' গোষ্ঠীর চিত্রগুলি প্রাক্-মুঘল শিল্পশৈলীর নিদর্শন। পরে যখন এই শিল্পীরা মুঘল অ্যাটেলিয়ারে নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁরা 'হামজানামা' প্রভৃতি প্রাচীনতম মুঘল পান্ডুলিপি-চিত্রগুলিতে একটি মৌলিক ভাবের আমদানি করলেন। কাজেই 'কুলাধার' চিত্রাবলী তো মুঘল দরবার শিল্প দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়ই বরং তারাই নতুন-প্রভাব-বিস্তারক।

প্রাক্-মুঘল যুগে রাজস্থানী চিত্রকলার উৎপত্তির প্রমাণস্বরূপ অন্যান্য চিত্রিত পান্ডুলিপিও দাখিল করা হয়েছে। Some Pre-Akbari Examples of Rajasthani Illustration নামক প্রবন্ধে রায় আনন্দকৃষ্ণ 'মৃগবতী' চিত্রমালার উল্লেখ করেছেন। এই পান্ডুলিপিচিত্রগুলি উভয় মতবাদেরই প্রধান ভিত্তি।[১০] A Stylistic Study of Uttaradhyana Sutra প্রবন্ধেও তিনি খান্ডালওয়ালার যুক্তিকে খন্ডন করেছেন। এখানে তাঁর মত এই যে উত্তরাধ্যায়ন সূত্রের (১৫৯১) লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রণ রীতির নয়; রাজস্থানী ধারার পরবর্তীযুগের লক্ষণের সঙ্গেও তার বিশেষ মিল নেই। এগুলি নিশ্চয়ই রাজস্থানী ধারার প্রাক্-আকবরী যুগের সৃষ্টি। তিনি আরও বলেছেন যে

৮ K. Khandalwala, M. Chandra, P. Chandra, P. L. Gupta: *Lalit Kala*, Vol. X.
৯ A. Krishna—*Marg*, XI, No. 2.
১০ A. Krishna—*Bulletin of the Museum and Picture Gallery*, Baroda, Vol. XV.

এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির সাহায্যে চিত্রিত চৌরপঞ্চাশিকা পুঁথিটির কাল, আকবরী আমলের গোড়ার দিকে নির্দেশ করা যায়; এমনকি হয়তো আরও আগে, প্রাক্-মুঘলযুগের শিল্প লক্ষণগুলির সাথে এর বৈশিষ্ট্যের তুলনা চলে। সর্বশেষে ভারত কলাভবনে রক্ষিত রাগমালা চিত্রের[১১] একটি সিরিজ সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে চাকদার জামা বা কুলাধার পাগড়ির চেয়ে বড়ো প্রমাণ হল প্রলম্বিত চোখ। পশ্চিম ভারতীয় রীতির প্রভাব যত কমতে লাগল চোখগুলিও তত ছোট হতে লাগল। উপরন্তু লেখকের মতে, রাজস্থানী ছবিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাসাদ প্রভৃতির চিত্রণে যে রীতি দেখা যায় তার সঙ্গে মুঘল চিত্রের মিল নেই, বরং সুলতানী আমলের চিত্রিত পাণ্ডুলিপির সাদৃশ্য দেখা যায়। কাজেই রায় আনন্দকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাজস্থানী রীতির প্রাথমিক যুগ মুঘল আমলের পূর্বেই নির্দেশ করা যায়।

*The Malwa Painting* নামক গ্রন্থে, কার্ল খাণ্ডালওয়ালার বিরোধী যুক্তিগুলিকে রায় আনন্দকৃষ্ণ বিধৃত করেছেন। এখানে তিনি প্রাচীন রাজস্থানী শিল্পধারার বিকাশের একটি স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। রায় আনন্দকৃষ্ণের মতে যে 'পোশাকের চিত্রণ' কার্ল খান্ডাল-ওয়ালার যুক্তি প্রধান ভিত্তি তা মেবারে প্রচলিত ছিল। মেবার থেকেই তা আকবরের দরবারে পরিচিত হয়। এছাড়াও রীতিগত দিক থেকে কতকগুলি প্রাচীরচিত্র আনন্দকৃষ্ণ উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করছেন যা পূর্বে আলোচিত হয়নি যথা—মানসিংহ তোমরের মান-মন্দিরের উপরিভাগে অঙ্কিত কিছু চিত্র (আনুমানিক ১৪৮৭—১৫১৭)। লেখকের মতে এই চিত্রগুলির সঙ্গে পূর্ব-আলোচিত 'মহাপুরাণ পুঁথিচিত্র' ও 'মৃগাবতী' চিত্রাবলীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই হিসাবে কুলাধার গ্রুপের পূর্বসূরী হচ্ছে মানমন্দিরের প্রাচীরপত্রগুলি। এবং অন্যদিকে মৃগাবতী চিত্রাবলীর সঙ্গে যেহেতু হামজানামা পুঁথিচিত্রগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয় তাই আনন্দকৃষ্ণ হামজানামার তারিখ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে চৌর-পঞ্চাশিকা গ্রুপের তারিখ হচ্ছে ১৫৫০—১৫৮০-র মধ্যে।

চৌরপঞ্চাশিকা গ্রুপের কালনির্ণয় হলেও, তাদের উৎপত্তিস্থলের প্রশ্নটি থেকেই যায়। চিতোরে আবিষ্কৃত কিছু প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে চৌরপঞ্চাশিকা গ্রুপের রীতিগত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে ব্যারেট ও গ্রের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই চিত্রগুলির উৎপত্তিস্থল নিশ্চয় মেবার।

আনন্দকৃষ্ণ সমগ্র বিতর্কের একটি পর্যালোচনা করে বলেছেন যে রাজস্থানী চিত্রকলার প্রাথমিক বিবর্তনের রূপ অস্পষ্ট নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মৌলিক বৈশিষ্ট্যধারী একটি বিশেষ চিত্রণধারা পশ্চিম ও মধ্য-ভারতে বর্তমান ছিল। এবং পশ্চিম-ভারতীয় জৈন পুঁথি-চিত্রণধারা থেকে এটি স্বতন্ত্র। এই নতুন রীতিই পরবর্তীকালে কতকগুলি ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় ও আঞ্চলিক রূপান্তর গ্রহণ করে। ফলে মেবার, বুঁদি ও মালবে কয়েকটি বিশেষ চিত্রণরীতি ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে গড়ে ওঠে।

## চার

রাজস্থানী শৈলীর বিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে-মতভেদ দেখা দিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে এখনও পর্যন্ত নতুন তথ্যের অভাবে আমরা 'কলাধার' গ্রুপকেই এই বিশেষ রীতির জন্ম-

১১ A. Krishna—An Early Ragmala Series Ars. Orientals, Vol. IV.

দায়ক বলে আখ্যায়িত করছি। ঐতিহাসিকরা এর নাম দিয়েছেন 'The Generic Group' বা আকর শ্রেণী) সেক্ষেত্রে আমাদের আরও বিশেষভাবে চিত্রগুলির গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের উপর নজর দেওয়া উচিত। উজ্জ্বল রঙের বিন্যাস, গাছ ও পাতার ব্যবহার, এবং সর্বোপরি লক্ষণীয় স্থানের সহজ বিভাগ, স্পষ্টতই লৌকিক চিত্রকলা ও পটের চিত্রণরীতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শ্রী এন সি মেহতা 'বসন্তবিলাস-পুঁথিচিত্রগুলি' আলোচনা কালে, একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে, লৌকিক চিত্রণরীতিতে অঙ্কিত কিছু প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। এবং এই সিদ্ধান্তে পেঁছান যে লৌকিক চিত্রণরীতি খুব স্পষ্টভাবে পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রণরীতিকে প্রভাবিত করেছে এই মত গ্রাহ্য হলে এটাও স্বীকার্য যে 'কুলাধার'-গ্রুপের ছবিগুলির মধ্যে, বিশেষত 'গীতগোবিন্দ'-পুঁথিচিত্রগুলির মধ্যে লৌকিক চিত্রণরীতির গঠনবৈশিষ্ট্য ও রঙের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

কুলাধার গ্রুপের চিত্রগুলির আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর স্বাধীনতা। যদিও চিত্রগুলির প্রধান কাজ পুঁথির অলংকরণ ও তার বিষয়কে কথ্য ভাষা থেকে কয়েকটি দৃশ্যে পরিণত করা, তবু এই চিত্রগুলিতে জৈন ধর্মের বাধ্যতামূলক কাঠামো অপসারিত করা হয়েছে। ফলে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথি-চিত্রের আড়ষ্টতা থেকে এগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত।

অতএব এমন অনুমান অসংগত হবে না যে রাজস্থানী চিত্রশৈলী প্রথমে পশ্চিম-ভারতীয় পুঁথি-চিত্রকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং সমগ্র গুজরাট ও রাজস্থান এই চিত্রণরীতির বিস্তৃত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ যখন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক আলোড়নের ফলে, ধর্মে ভক্তির প্রাবল্য ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতে থাকল তখনই সাহিত্য ও শিল্প-জগতেও পরিবর্তন শুরু হল। জৈন-পুঁথিচিত্রের আড়ষ্ট কাঠামো থেকে মুক্তি পেয়ে, চিত্রণরীতি নতুন প্রেরণার সন্ধান পেল তাদের সমৃদ্ধ লৌকিক চিত্রণরীতির ঐতিহ্যে। ফলে লৌকিক চিত্রণরীতিই হয়ে দাঁড়ালো রাজস্থানী চিত্রশৈলীর একটি বড় উপাদান। পরবর্তী কালে রাজস্থানী চিত্ররীতি বিভিন্ন আঞ্চলিক শৈলীতে বিভক্ত হয়ে গেল, তাদের উপর বিদেশী প্রভাবও পড়ল। কিন্তু তখনও সব ক'টি শৈলীর মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান রইল : তা এই লৌকিক চিত্রণরীতির প্রভাব। ফলে যে সচেতন শিল্পবোধ রাজস্থানী চিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে প্রকাশ পায়, তার পশ্চাতে থাকে একটি স্পষ্টত গঠিত লৌকিক শিল্পঐতিহ্য—যা কোনো মতে অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য রাজস্থানী শিল্পরীতির বিবর্তন এখনও বিবেচ্য বিষয়। বাদানুবাদ আজও অসমাপ্ত। ফলে আমরা এখনও নতুন তথ্যের জন্য অপেক্ষা করে আছি।

# সংস্কৃতি সাময়িকী

**মিল অমিলের সম্বন্ধে**

'বুকের মধ্যে জেগে উঠল গ্রীস' অথবা 'এখন তুমি পড়ছ কি হার্ট ক্রেন' ধরনের লাইন লিখে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একদিন বেশ সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিলেন। প্রকাশ্য মঞ্চেই বলা হয়েছিল যে এ কেবল খেলাধুলো, মিল মেলানোর হালকা অভ্যাস ছাড়া ওর মধ্যে নেই কিছু আর। কবি কি তখন হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন, কেমন করে পাঠকের মন এড়িয়ে গেল সৌন্দর্যময় দুঃখময় অতীতের এক কুয়াশালীন উত্থান, কেন তাঁর লক্ষ্যে এল না হার্ট ক্রেনের রহস্যে ভরা জীবনপরিণামের সঙ্গে কবিতাটিকে মিলিয়ে নেবার ইচ্ছে? এ অভিমান অসম্ভব নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে গ্রীস বা ক্রেন শব্দকে অন্ত্যানুপ্রাসে গেঁথে শক্তি নিজেই তৈরি করে দিয়েছেন ভুল বুঝবার সহজ সুযোগ।

কেন বলছি ভুল বুঝবার সুযোগ? সে কি কেবল এইজন্যে যে মিল ব্যাপারটারই ওপর অশ্রদ্ধা এখন তরুণমহলে ব্যাপক? নতুন কবিরা যে প্রায় আঙুল তুলেই বলতে চান 'এই যে, এরা মিল মিলিয়ে পদ্য লেখে', সেটা সত্যি। কিন্তু এঁদের এই অসহিষ্ণু উত্তেজনাকে সরিয়ে দিলেও ভাবতে হয়, কবিতার মিলকে আজ কতোদূর বাহারে হতে দেওয়া ভালো। এমনকি, পাঠককে তা কতোটুকু বুঝতে দেওয়া সংগত। রবার্ট ফ্রস্ট একবার আলাপচারিতে জানিয়েছিলেন যে কবিতার ভালোমন্দ তিনি চিনে নিতে পারেন তার মিলের দিকেই তাকিয়ে। মিত্রাক্ষর একজোড়া শব্দের একটি যদি অন্যটির চেয়ে বেশি মাথা তুলে দাঁড়ায় অথবা যদি বুঝে নেওয়া যায় দুটির মধ্যে কোন্ শব্দটি কবি আগে ভেবেছিলেন আর কোন্‌টি পরে, ফ্রস্ট বলবেন, তাহলেই সে-রচনা তাঁর কাছে একেবারে ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

অবশ্য মার্কিন কবিতাও ফ্রস্টের যুগে বসে নেই, বাংলা কবিতাও এই অল্পদিন আগের অলোকরঞ্জন বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ধরনে আর তুষ্ট নয়। অলোকরঞ্জনের পুরোনো কবিতায় কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হাল আমলের লেখায় ছন্দ বা মিলের প্রতি যে আসক্তি দেখতে পাই, অল্পবয়সীরা তার মধ্যে কি আর নিজেদের সমর্পণ করতে চাইবেন? এই একটা স্পষ্ট লক্ষণ আজ যে-কোনো কবিতার কাগজ ওলটালেই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে যে দশ বছর আগেও কবিতার পুরোনো চালচলনের যে শেষ চিহ্নটুকু থেকে যেত, তাকেও এখন অবজ্ঞাভরে সরিয়ে দিতে শিখেছেন নতুন কবিরা। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আড়ম্বর তো একটা বয়সে স্বাভাবিক, কবিতার কানুন ভেঙে দেবার ইচ্ছেটাও তেমনই অনিবার্য। তাই, অনেকটা ভাঙবার পর, মিলের প্রতি এই ঔদাসীন্য যে আজ ঐতিহাসিক নিয়মেই আসবে, এটা ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু তেমনি আবার ইতিহাসকে মনে রাখাও ভালো। এমন নয় যে দেশিবিদেশি কবিতায় ছন্দমিলের বিরুদ্ধে কথা এই নতুন বলা হলো। এমনকি দূর রোম্যান্টিক পর্বেও লম্বা লম্বা ঝকমকে মিলকে কোলরিজ বলেছিলেন নিচু ধরনের কাণ্ড, ফরাসিদেশে ভেরলেন লিখছিলেন কোন্ বধির শিশু বা উন্মাদ নিগ্রো বানাল এই ঝুটা মুক্তা, আর প্রায় পাশাপাশি বসে মধুসূদন একে ভাবছিলেন 'লৌহ ফাঁস'। অবশ্য এঁরা নিজেরা মিলকে ছাড়তে পারেন নি একেবারে। পরিহাস এতোটাই যে মিত্রাক্ষরের বিরুদ্ধে ভেরলেন আর মধুসূদনের জেহাদ-জাগানো দুটি কবিতাই ছিল মিলে বাঁধা।

অবজ্ঞা শুনিয়েও কেন তবু এঁরা ধরছিলেন মিল? কেন সমস্ত অবিন্যস্ত সময়কে আত্মস্থ করে নেবার প্রয়োজনে এলিয়ট তাঁর 'ড্রাই স্যালভেজেস'-এর ভিন্ন ভিন্ন চালে পালটে নিচ্ছিলেন লেখার রীতি, খোলা ফ্রী ভার্সের পাশেই আনছিলেন ছন্দেমিলে সাজানো স্তবকদল? কেন অমিয় চক্রবর্তীকে ফ্রী ভার্সের মধ্যেই অনেক সময়ে নিয়ে আসতে হয় মিল? অথবা আরো এগিয়ে এসে, এই সেদিনকার মার্কিন ফ্রাঙ্ক ও'হারা কেন সমস্ত পুরোনো দায় লঙ্ঘন করার পর হঠাৎ তবু

বাজিয়ে তোলেন অন্ত্যানুপ্রাস? 'পদাতিকে'র ছন্দোনিপুণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় মিলের জাঁকজমক যদি একেবারেই খুলে নিয়েছিলেন মধ্যপর্বে, কেন আজ আবার কখনো আলতো মিলের বিনুনি তৈরি হয় তাঁর রচনায়—যেমন ছিল এই পুজোয় 'ছেলে গেছে বনে'র মধ্যে?

নিশ্চয় এর সবটাই একরকম কারণবশত নয়। নিশ্চয় অনেক সময়ে লীলাচ্ছলেই ঘটে যায় এটা, খেলাচ্ছলেই; কেননা কবি অবশ্যই তাঁর কবিতার উপকরণ নিয়ে খেলাও করেন কখনো কখনো। আবার শব্দের সঙ্গে স্পন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেবার প্রয়োজনেও কবিকে কখনো ধরতে হয় ছন্দমিলের ভরাট আয়োজন। কখনো-বা এটা উদাসীন পাঠকের কাছে একটু সময় ভিক্ষে করে নেবার মতোই, হ্যাঁ, প্রায় এতোটাই বলা যে এইটুকু উপহার নিয়ে তাঁদের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন আজ। এ কি অন্যায়? কবিতা নিয়ে এ কি ছেলেমানুষি? পথচলতি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদিন বলছিলেন তাঁর এই ব্যক্তিগত ভাবনা : ছন্দোমিলে সাজিয়ে লিখলে যেমন মনে হয় একটা সুযোগ নেওয়া হচ্ছে পাঠকের কাছে, ছেড়ে দিলে তেমনি ভয় হয় বুঝি এড়িয়ে গেল মস্ত এক পরীক্ষা। এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিতার লাইনগুলি ফিরে ফিরে যাওয়া-আসা করে মিল থেকে অমিলে।

কিন্তু যে নবীন লেখক ভাবেন কবিতার মিল আজ কেবলই অবান্তর অলংকরণ, এবং সেই কারণে হাস্যজনক, তাঁর একটা যুক্তি নিশ্চয় আছে। সে যুক্তি কি এইরকম যে ভাঙা অবিন্যস্ত এক ব্যক্তিগত দিনপঞ্জির মধ্যে এই সাজিয়ে বলার চেষ্টা নিতান্ত এক কালাতিক্রমী আঙ্গিক? সে কি এই যে চতুর্ধারের বিপুল ধ্বংসময় চিৎকারের সামনে বড়োই নিষ্ফল এই বানিয়ে তোলা লাবণ্য? আপাতত কথাটা ঠিক। কিন্তু তবু যখন দেখি এরই মধ্যে কবিতাহীন পথে পথে প্রাত্যহিকের শ্লোগানও বেজে ওঠে ছন্দোমিলে, ভিখিরির গলায় লৌকিক প্রার্থনাতেও হঠাৎ শোনা যায় মিলের টান, তখন কথাটা আবার নতুন করে ভাবতে হয়। ভাবতে হয় যে সমূহকে স্পর্শ করবার জন্যই, ভ্রষ্ট ব্যক্তিকতাকে সম্পূর্ণতার দিকে উন্মুখ করবার জন্যই প্রাত্যহিকের রঙ কখনো বদলে যায়। ভাবতে হয় যে মানবসঙ্ঘের চেতনার আরেকটা স্তরকে ছুঁতে চায় কবিতা, যে স্তরে তার মধ্যে লীন হয়ে আছে আবহমান রিচুয়াল। এই স্তরকে গোপনে কাঁপিয়ে দেবার জন্যই কবি নিয়ে আসেন তাঁর লোকায়ত প্রতিমাভাণ্ডার, তাঁর ছন্দস্পন্দ, তাঁর মিল। প্রাত্যহিকের আবর্তের মধ্যে একটা বিন্যাস আবিষ্কার করে নেবার জন্যই কখনো কখনো তাঁর দরকার হতে পারে এই সামঞ্জস্যের পথ।

এইটে মনে রাখলে বোঝা যায়, ডিলান টমাস তাঁর কাব্যসংগ্রহে একশো-দু'লাইনের যে প্রস্তাবনা-কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি নিছক পালোয়ানির উদাহরণ ছিল না। প্রথমে একে মনে হতেই পারে এক মিলহীন রচনা, অথচ অভিনিবেশে ধরা পড়ে এর পুরোটাই জটিল মিলে বুনে দেওয়া। পরস্পর মিল দেখা যায় কবিতার ঠিক মাঝখানে ৫১/৫২ লাইনে, তার পর মিলছে ৫০/৫৩, তার পর ৪৯/৫৪, এমনি দূরে যেতে যেতে প্রথম লাইনে মিলে যায় একেবারে শেষ লাইনে। যেন বিরাট এক ফুলের মতো তার পাপড়ি মেলে দিচ্ছে কবিতাটি, কাছের শব্দ সরে যাচ্ছে দূরে, সম্পূর্ণটা জুড়ে তৈরি হচ্ছে এক জটিল অথচ নিবিড় ঐক্যের বোধ, খানিকটা গোপনে।

এইভাবে দেখলে মিলপ্রত্যাশী কবির মধ্যে সেই মনটিকে চিনে নিতে পারি, বিশৃঙ্খল বেঁচে থাকার মধ্যে যে-মন একটা সমগ্রতাকে তুলে আনতে চায়। কোন্ কবি তা না চান? এই মুহূর্তের তরুণ কবিও কি তা চাইবেন না? তার মানে এ নয় যে সেজন্যে আজ কবিকে ঘুরে যেতে হবে ছন্দমিলেরই দিকে। তার মানে কেবল এই যে তাঁর মনকে রাখতে হবে সংস্কারহীন। তাঁকে জানতে হবে যে 'মিলিয়ে কেন লেখো না' বড়োদের এই ভর্ৎসনা যেমন অন্তঃসারশূন্য, ততোটাই কুসংস্কার-ময় এই ধারণা যে মিল মাত্রেই পরিত্যাজ্য। যেমন ছন্দ থেকে অছন্দে সহজ যাওয়া-আসার পথ আজ খোলা রাখতে হয় কবিকে, একই কবিতায় ছন্দোহীন কথার চাল থেকে যেমন আলগা পায়ে চলে যাওয়া যায় ছন্দে, তেমনি আজ খুলে রাখা ভালো মিল-অমিলেরও মধ্যদুয়ার। বাহারের জন্য নয়, সমগ্রের সঙ্গে দূরবর্তী এক লগ্নতার জন্য।

শঙ্খ ঘোষ

**আরো মঞ্চ চাই**

আজ থেকে বছর পঁচিশেক আগে যখন "নবান্ন" নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হলো, তারপর থেকেই পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে অপেশাদার নাট্যদলের, প্রচলিত নাট্যরীতির সঙ্গে আধুনিক নাট্যপ্রযোজনার, তফাত স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয়ে গেল। দিন সাতেক শ্রীরঙ্গম [ অধুনা বিশ্বরূপা ] মঞ্চে বিপুলে প্রশংসার সঙ্গে অভিনয় হবার পরে বিভিন্ন পেশাদার মঞ্চের কর্তৃপক্ষ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, যে শিশু গোকুলে বেড়েছে তাকে আরো প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। ফলে নবান্ন নাটক অভিনয়ের জন্য আর কোনো পেশাদার মঞ্চ ভাড়া পাওয়া গেল না। যে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও আগ্রহ নিয়ে নবান্ন-র যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ভিতরে ভিতরে এত খাঁটি ছিল যে পেশাদার মঞ্চের মালিকানা কৌশল তাকে বিন্দুমাত্র স্তিমিত করতে পারেনি পরন্তু উপকারই করেছে পরোক্ষে। অর্থাৎ এই বাধাই নবান্ন নাটককে শহরের গণ্ডি ভেঙে গ্রামে পেঁছিতে সাহায্য করেছে। গ্রামবাংলার মানুষ এই অভিনয়কে অন্তরঙ্গ ভাবতে পেরেছে এবং দর্শকের সার্বিক উৎসাহ শিল্পীদের উদ্দীপিত করেছে। ফলত রাজাউজির পিছনে ফেলে সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষের সমাজে পেঁছে দেবার জন্য আরো নাটক তৈরী হয়েছে, পেশাদার থিয়েটারকে পিছনে ফেলে একটি নাট্যদল, যার নাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তার আসন বিছিয়েছে। জন্ম নিয়েছে গণনাট্য।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিচেতনায় শিল্পবিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘও একসময়ে নিভন্ত হয়ে এলো। একই অস্ত্রের বারংবার প্রয়োগে যেমন অস্ত্রের ধার নষ্ট হয় তেমনি করে এক বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গণনাট্যের সৃজনশীলতাও ক্ষয়ে আসতে লাগলো। যেহেতু শিল্পের অন্বিষ্ট মুক্তি তাই শিল্পের তাগিদে, মুক্তির সন্ধানে উক্ত সংঘের কিছু শিল্পী-কর্মী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলো এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এক কোষ থেকে বহু কোষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ভিন্ন ভিন্ন নামে কিছু নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠলো এবং গণনাট্যের প্রচল রীতি ভেঙে অন্যাসুরে কিছু বলবার চেষ্টা চললো। এই ধরনের দলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় নব্যরীতিতে বিশ্বাসী এইভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল এবং বোধহয় সেই কারণেই 'নবনাট্য' নামকরণ, যদিও এর মূল উৎস অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

মোটকথা যেভাবেই হোক না কেন ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নব্যরীতির নাট্যপ্রযোজনার প্রবণতা এসেছে এবং সে ব্যাপারে 'বহুরূপী'-র দান অসামান্য। তাঁদের সচেতন শিল্পপ্রয়াস এবং সযত্ন প্রচেষ্টা বাংলা থিয়েটারের মান উন্নয়নে সহায়তা করেছে। নাট্যবস্তু নির্বাচন এবং প্রযোজনার কৌশলে নবত্ব সূচিত হয়েছে। ফলে পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে অপেশাদার নাট্যসংগঠনের বিরোধ তো কমেই নি পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শকের মধ্যে যদিও এখনও দুটো দল স্পষ্ট তথাপি সামগ্রিক বিচারে অপেশাদার নাট্যপ্রযোজনার প্রতি আগ্রহীর সংখ্যা ঢের বেশি। এতৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে উক্ত দলগুলির অর্থনৈতিক অসাফল্যের অন্যতম কারণ মঞ্চসমস্যা। পরিসংখ্যানে দেখা যায় শহর ও মফস্বল মিলিয়ে তাবৎ বাংলাদেশে অপেশাদার নাট্যসংগঠনের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক বিভিন্ন অফিসের প্রমোদ বিভাগ। অর্থাৎ বছরে একবার বা দুবার নেহাতই শখে এবং আনন্দের জন্য নাট্যানুষ্ঠান করেন—সাধারণ ক্ষেত্রে শিল্পগত কোনো দায়িত্ব তাঁরা অনুভব করেন না। আর একদল আছেন যাঁরা অফিসের বাইরে পাড়ায় ঐরকমই শৌখিনতার অভিনয়-টভিনয় করে থাকেন। এই দুই দলের কথা এই আলোচনা থেকে বাদ দিলেও অন্ততপক্ষে হাজার দেড়েক দল আছে যারা সৎ নাট্য আন্দোলনের কথা ভাবে এবং সেইভাবে কাজ করার সাধ্যাতীত চেষ্টা করে। হয়তো একথা ঠিক যে এই দলগুলিও সব প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রযোজনা করে না তথাপি সৎ থিয়েটারের চেষ্টা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের আলোচনা এই শেষোক্ত দলগুলির সমস্যা নিয়ে।

বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলিতে কোথাও কোথাও দু-একটি মঞ্চ আছে কিন্তু সেগুলির বেশির ভাগই অভিনয়োপযোগী সমৃদ্ধ নয়। অর্থাৎ সেগুলি সাধারণত কমিউনিটি হল, পাবলিক লাইব্রেরি হল, রেলওয়ে ইন্সটিট্যুট ইত্যাদি। ফলে সেখানে কখনো-সখনো অভিনয়াদি হলেও নিয়মিতভাবে হওয়া আদৌ অসম্ভব। একমাত্র কলকাতা শহরেই পেশাদার মঞ্চ ছাড়া আরো কয়েকটি মঞ্চ আছে (তার মধ্যে দু-তিনটি প্রথম শ্রেণীর এবং চার-পাঁচটি একেবারেই নিকৃষ্ট) যা

মোটামুটিভাবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুত্তম নয়। এই সমস্ত মঞ্চগুলি একত্র করলেও নাট্যসংস্থাগুলির তুলনায় এত কম যে কোনো দলের নিয়মিত অভিনয়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। পেশাদার মঞ্চগুলি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিনগুলিতে নিজেদের অভিনয়ের ব্যবস্থা রাখে এবং ছুটির দিন বাদ দিয়ে সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র সাধারণত এই চারদিন বাইরের দলগুলির জন্য ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করে। এরই মধ্যে আবার একটি মঞ্চ শুধুমাত্র অফিসের প্রমোদবিভাগ এবং তথাকথিত শৌখিন দলগুলিকে (অর্থাৎ যাদের শিল্প-টিল্প ইত্যাদি বিষয়ে মাথা ঘামাবার দায় নেই, টিকিটপত্র বিক্রি করবে না) ছাড়া ভাড়া দেন না। অন্যান্য পেশাদার রঙ্গালয়গুলিও যদিও এই নীতি মেনে চলতে মনেপ্রাণে আগ্রহী তথাপি অভাবে গ্রুপ থিয়েটারকেও ভাড়া দিয়ে থাকে। একমাত্র দক্ষিণ কলকাতার মুক্তঅঙ্গন মঞ্চ যেহেতু মিনিয়েচার থিয়েটার তাই অফিসের প্রমোদবিভাগ ঐ মঞ্চ ভাড়া নিতে অনিচ্ছুক সুতরাং অপেশাদার দলগুলি ওখানে ভিড় করার সুযোগ পায় এবং উক্ত চারদিন অভিনয় করে থাকে। যেটুকু যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা থিয়েটারে হচ্ছে তার অনেকাংশই মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে হতে পারছে। কিন্তু এই বিপুলসংখ্যক নাট্যসংস্থাগুলির তুলনায় তার কতটুকু হওয়া সম্ভব?

মুক্ত অঙ্গন ছাড়া পেশাদার মঞ্চগুলির ভাড়া সাধারণ ক্ষেত্রে সাত-আটশোর নিচে নয়। এছাড়া gate keeperদের চার্জ, মঞ্চকর্মীদের টিপ্স, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সহযোগে এক-একটি নাট্য-প্রযোজনার দরুন খরচ পড়ে প্রায় হাজার-এগারোশো টাকা। এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা এই ধরনের অপেশাদার নিরীক্ষামূলক নাট্যসংস্থার ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। এতৎসত্ত্বেও কোনো নাটকে যদি দর্শকসমাগম বেশি হতে থাকে তবে তাদের পক্ষে মঞ্চ ভাড়া পাওয়া কঠিন হয়। পেশাদার মঞ্চের বাইরে যে দু-একটি প্রথম শ্রেণীর মঞ্চ তৈরী হয়েছে সেগুলির ভাড়া হাজার টাকার কম নয়। সুতরাং ঐ অনুপাতে আনুষঙ্গিক খরচও বেড়ে যায়। ফলে এক-একটি প্রযোজনা প্রায় চাঁদ ছোঁয়ার সামিল। তদুপরি আছে সরকারী রসিকতা। যেমন কোনো পেশাদার দল যদি কলকাতার বাইরে কোথাও অভিনয় করতে যায় (অবশ্যই তিনশো মাইলের বেশি দূরত্ব হওয়া আবশ্যিক) সেক্ষেত্রে রেলওয়ে কনসেশন অর্থাৎ একপিঠের ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ পেতে পারবে কিন্তু অপেশাদার দলের ক্ষেত্রে নৈবনৈব চ। পেশাদার রঙ্গালয়ের জন্য বরাবরের মতো প্রমোদকর রহিত কিন্তু অপেশাদার দলের ক্ষেত্রে উক্ত কর দেয়। বহু আন্দোলন করে আপাতত এইটুকু করা গিয়েছে যে কলকাতার নাট্যসংস্থাগুলি যদি রেজিস্টার্ড হয় এবং রবীন্দ্রভারতীর অনুমোদন পায় তবে সাময়িক-ভাবে প্রমোদকর রহিত করা যাবে কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগে অডিটার কর্তৃক পরীক্ষিত হিসাবপত্র দাখিল করে রিনিউ করিয়ে না নিলে পূর্বে প্রমোদকর জমা রেখে অভিনয় করতে হবে; অবশ্য অনুমতি দেওয়া না দেওয়া কর্তৃপক্ষের বিচারাধীন। এছাড়া আছে চল্লিশটাকা করে কর্পোরেশনের থিয়েটার ট্যাক্স। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেক চেষ্টায় একটা 'টোকেন মানি' দেবার ব্যবস্থা করা গিয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ অবলুপ্তি এখনো সম্ভব হয়নি। অপেশাদার দলের ক্ষেত্রে প্রতিটি অভিনয়ের আগে কালেক্টর এবং কর্পোরেশনের লিখিত অনুমতি আবশ্যিক অন্যথায় দরজা খোলানো যাবে না। এরকম উদাহরণ অজস্র দেওয়া যায়, তাতে রচনা নিতান্তই ভারাক্রান্ত হবে। অনেকের ধারণা এই অপেশাদার দলগুলি নেহাতই শৌখিনতার তাগিদে থিয়েটার করে থাকেন ফলে বছরে যে কটি অভিনয় করেন তাতে নানান ধরনের রসবৈচিত্র্য আনতে পারেন, নিয়মিতভাবে পেশাদার ভঙ্গীতে এ-ধরনের থিয়েটার চলে না বা চালানো সম্ভবও নয়। এই চিন্তা সর্বাংশে সত্য নয়। কিছুকাল আগে পর্যন্ত লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা মঞ্চ অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করে সে কথা প্রমাণ করেছেন। এমনকি সেজন্য তাঁদের বিষয়নির্বাচন এবং প্রযোজনার মানও বিন্দুমাত্র শিথিল করতে হয়নি। শালখের শিসমহল থিয়েটার চতুর্মুখ গোষ্ঠী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। সম্প্রতি নান্দীকার সংস্থা রঙ্গনা নামক একটি নতুন রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে চালাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও চালাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। সুতরাং এই উদাহরণেই বোঝা যাচ্ছে নতুন কালের থিয়েটারের প্রতি দর্শকের ভালোবাসা ও আগ্রহ যথেষ্ট। এবং এই ধরনের আধুনিক থিয়েটারের জন্য যদি আরো অনেক মঞ্চ গড়ে ওঠে তাতে বাংলা নাট্যশিল্প শ্রীবৃদ্ধই হবে সন্দেহ নেই। আদ্যিকালের বস্তাপচা ভাবালুতা,

সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কল্পিত সমস্যা এবং পঞ্চাশ বছর আগের হাতুড়ে থিয়েটারী প্যাঁচে বাজার মাত করার প্রবণতা এখনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বর্তমান। অপেশাদার দলের ভাড়ার টাকায় পেশাদার মঞ্চের এই পুরোনো চালিয়াতি রমরমিয়ে দামামা বাজাচ্ছে। 'একটি দেশ ও জাতিকে যদি তার থিয়েটার দিয়ে চেনা যায়' তবে আমাদের দেশের এই তথাকথিত পেশাদারী থিয়েটার যে তার দেশ ও জাতিকে ভুল চেনাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। মোটকথা কলকাতা এবং শহরতলীতে আরো অনেক মঞ্চ গড়ে ওঠা দরকার।

আরো মঞ্চ কেন গড়ে উঠছে না জানি না। কলকাতা কর্পোরেশনে কেশবচন্দ্র বসু মহাশয় যখন মেয়র ছিলেন তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কর্পোরেশনের উদ্যোগে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ তৈরী হবে বলে মাননীয় মেয়র মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর নিজের হাতেই স্থাপন করেছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে সে চিন্তা ফাইলেই আবদ্ধ হয়ে রইল জানি না। যুক্তফ্রন্টের সময়ে জনশ্রুতি শোনা গেল বিভিন্ন পার্কে কলকাতা কর্পোরেশন অন্ততপক্ষে দশটি মুক্ত অঙ্গন গড়ে দেবেন নতুন থিয়েটারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। বর্তমান মেয়র আহূত এ-বিষয়ের উপর অন্তত দুটি আলোচনাসভায় আমি নিজে উপস্থিতও ছিলাম কিন্তু বলতে পারবো না কেন এই পরিকল্পনা পূর্বের মতো ফাইলচাপা পড়লো। কলকাতার তিনটি প্রথম শ্রেণীর দল যুক্তভাবে বাংলা-নাটমঞ্চ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলার জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করে কর্পোরেশনের কাছে কিছু জমির জন্য আবেদন করেছিলেন —যতদূর শুনেছি তাঁরা সে জমি পাননি। অভিনেতৃ-সঙ্ঘও নাকি একই কারণে আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রসদন মঞ্চ ভাড়া দিয়ে প্রতি বছরে দেড় থেকে দুলাখ টাকা লাভ হয় শুনেছি। যেহেতু এ-মঞ্চের ব্যক্তিগত মালিকানা নয় সুতরাং মুনাফার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এই উদ্বৃত্ত টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কোন খাতে ব্যয় করবেন? বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে রেজিস্টার্ড দলগুলিকে সপ্তাহের কয়েকটি দিন যদি স্বল্পমূল্যে ভাড়া দেওয়া যেত, এবং বাকি দিনগুলি যেমনভাবে ওঁরা চালাচ্ছেন সেভাবেই চালাতেন তাহলে তো অন্তত বছরের শেষে টাকা উদ্বৃত্ত হতো না এবং অল্প ভাড়ায় গ্রুপ থিয়েটারগুলি এই প্রথমশ্রেণীর একটি মঞ্চে নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতেন।

কলকাতা সংগীত নাটক আকাদেমি থেকে যে ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর পাশ করে বেরুচ্ছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? তাঁদের জন্য সরকার কি কোনো মঞ্চ তৈরি করেছেন যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে জীবিকানির্বাহ করতে পারবেন? দায়িত্বহীনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানের অভাবই তো একমাত্র যোগ্যতা বলে বিবেচিত হতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য এই দুটি লেবেল বুকে এঁটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন গর্বে পদচারণা করছেন। দিল্লীতে শ্রীযুক্ত আলেকেজি সাহেবের পরিচালনায় জাতীয় নাট্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছুকাল। সেখান থেকে যাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারছেন বিভিন্ন প্রাদেশিক থিয়েটার পরিচালনার জন্য তাঁদের নির্বাচন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যেহেতু সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই সুতরাং ওই ব্যবস্থা এখানে অচল। সারা ভারতবর্ষের তুলনায় বাংলাদেশে কিছু কম থিয়েটার-শিল্পের চর্চা হয় না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণের কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক বাংলা নাট্যশিল্পের অপুষ্টির অন্যতম কারণ যে মঞ্চের অভাব তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন পার্কে ছোট ছোট মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ গড়ে দেওয়ার প্রস্তাবটি কি কলকাতা কর্পোরেশন পুনর্বিবেচনা করতে পারেন না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-বিষয়ে তাঁদের উদার হাত প্রসারিত হলে শিল্প-রসিক জনসাধারণের হাত তাতে মিলবেই এবং এই সমবেত আগ্রহ ও চেষ্টায় একদিন সার্থক শিল্পের সেতুবন্ধ গড়ে উঠবে পরন্তু নবনাট্য আন্দোলন যদি তার শিল্পচেতনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তবে পর্বতও একদিন মহম্মদের কাছে হাজির হবে, বাংলাদেশে এ দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অদৃষ্টপূর্ব নয়।

শ্যামল ঘোষ

**তিনজন সাম্প্রতিক গল্পকার**

আজকাল—হয়তো এটাই স্বাভাবিক—ছোটোগল্পের আখ্যানভাগ আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতোৎসারিত হয় না; কেবল যে ঘটনা থেকেই ঘটনা বেরিয়ে আসবে লাটাই থেকে সুতোর মতো তারপর নানা রকম প্যাঁচ খেলবে, এ-রকম এখন আর সহজে হয় না; কেবল যে কাহিনীর জোরেই গল্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এমন নিটোল ছিমছাম ভালো গল্প হাতে গোনা যায়। কাহিনীটা আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই ছল, নিছক একটা বাইরের ভোল, ছদ্মবেশ। ভিতরে আছে ফিশফিশ কথা, কানাকানি, বঙ্কিম কটাক্ষ। আছে নেপথ্যভাষণ, স্বগতোক্তি, নিজের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ। হয়তো গল্পগুলো বলতে চাচ্ছে একেবারেই অন্য কথা—হয়তো, এমনকি, গভীর কথা। আছে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো, অনেক মারপ্যাঁচ, এমনকি জালিয়াতি, স্বমতপ্রচার, জগৎ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী। সাতপল্লা উর্বর পলিমাটি, কাহিনীটা আসলে হচ্ছে এই রকম—পাঠক পড়তে-পড়তে বীজ ছিটিয়ে দেবেন, ধান হবে। স্বতঃস্ফূর্তির বদলে এইজন্যই হয়তো আড়ষ্ট, কৃত্রিম, খঞ্জ গল্পের এত বাড়াবাড়ি আজকাল। কিন্তু এটাও তো সম্ভব যে ভিতরে গভীর বাণী থাকলো, তবু গল্প এগিয়ে গেলো অনায়াস, চেষ্টাহীন, দূরযাত্রী। অর্থাৎ অনেক সময় আমরা চাপিয়ে দিই অর্থ, সিন্ধুবাদের ঘাড়ে বুড়োর মতো; কিংবা, দর্জির তৈরি রেডিমেড জামার মতো, কী বলবো তা আগে থেকেই তৈরি থাকে, গল্পটাকে ঐ জামার মাপে করতে গিয়ে ছেঁটে দিতে হয়। ধরুন, প্রচার করবেন বস্তাপচা উনিশ শতকী ফরাশি কলাকৈবল্যবাদ, শিল্প ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন, ব্যাধি ও শিল্পের গোপন সম্বন্ধ—ফলে আপনার সব গল্পের সব পরিস্থিতি হয়ে উঠলো বানানো, বাসি, মেকি; সব চরিত্র হলো জামার মাপে লোকের মতো ছাঁচে ফেলা; সব গণ্ডগোল, মৃত, নির্জীব ও রক্তহীন। কিন্তু জীবন—সে এগোয় অন্যভাবে, সব তত্ত্বকথার গণ্ডদেশে সে চপেটাঘাত কষায় অনবরত। নির্ভাবনার পালে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে যাঁরা গপ্পো জমান তাঁদের কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়—কিন্তু তাঁদের কথা আমরা এখানে ভাবছি না। কেননা আমার হাতের কাছে আছে তিনটি বই : বাসুদেব দাশগুপ্তের (না কি দাসগুপ্ত? মলাটে ও নামপত্রে যথাক্রমে 'স' ও 'শ' আছে) 'রন্ধনশালা' (মে ১৯৬৫), 'মতিনন্দীর গল্প' (চালচিত্র, রথযাত্রা ১৩৭৬), 'দেবেশ রায়ের গল্প' (লেখকের নিবেদন ভাদ্র ১৩৭৬-এর)। আর এই বই তিনটি প'ড়ে বেশ খটকা লাগলো আমার। সমস্যাটা দাঁড়ালো, আগেই যেমন বলেছি, এইরকম : আমার আত্মপ্রকাশের প্রকরণ ছোটোগল্প, এবং আমার আছে বলবার কথা। কিন্তু আমি তো শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সেই ঈশ্বর মহাশয় নই যে পোড়ো বাড়ি ও ঝোড়ো হাওয়ার মতো প্রকরণ ও বক্তব্যকে বেমালুম খাপে-খাপে মিলিয়ে দিতে পারি। আমাকে লিখে-লিখে টের পেতে হয় কী করতে চাচ্ছিলুম, আর কী হয়ে গেলো। গলায়-গলায় ভাব যখন না-হয়, তখনই আস্ত গল্পটা মাধ্যম আর বক্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এই তিনটি বই সেই ধর্মযুদ্ধের সাক্ষী। আর সেইজন্যই আমার কাছে অত কৌতূহলোদ্দীপক।

২

মতি নন্দীর গল্পের জগৎ নিম্নমধ্যবিত্তের বাংলাদেশ। অস্বস্তিকর, দম-আটকানো, বুকে-চেপে-বসা, অবক্ষীয়মাণ মধ্যবিত্তের জগৎ; অনিকেত, নিরবলম্ব, স্বপ্ন-ভেঙে-যাওয়া; তবু আছে সংস্কার—'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী'। কিন্তু এই বিবরণ অনেকক্ষেত্রে দেবেশ রায় ও বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্প সম্বন্ধেও সত্য। অর্থাৎ এ থেকেই একজনকে আরেকজনের চাইতে আলাদা করা যায় না। অথচ পাঠক তবু লক্ষ্য করবেন এঁদের প্রত্যেকের প্রি-অকুপেশন এক-এক রকম। দেবেশ রায় তাঁর 'উদ্বাস্তু' গল্পে আমাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছেন—সত্যব্রত আর সত্যব্রত নেই, অণিমা মোটেই অণিমা নয়—এমনকি ভীত ও আর্ত মানুষগুলির নাম ও পরিচয় সব তিনি কেড়ে নিয়ে একেবারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। হাসির গল্পের ভঙ্গিতে লেখা, আছে অতিশয়োক্তি, বাড়াবাড়ি এমনকি পুরো গল্পটার ইচ্ছেই হয়তো একেবারে বাস্তবের সীমানা পেরিয়ে যাবার—অথচ অবাস্তবও সর্বাংশে নয়—আর সেইজন্যই যখন আমরা সর্বশক্তিমান পুলিশের তদন্তবিভাগের শেষ নির্দেশ পড়ি : 'সুতরাং নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্ম-

পরিচয় সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করুন আপনি যে, আপনি সত্যিই সে', তখন এই 'আপাতহাসির' রাক্ষুসে দাবির বিরাট হাঁয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মুখের হাসি কি-রকম শুকিয়ে যায়, হাত-পা কেমন অসাড় হ'য়ে আসে। এই গল্প—সন্দেহ নেই—বানানো, কিন্তু এখানে বক্তব্য ও প্রকরণ এমনভাবে মিলে-মিশে গিয়ে ঐ অমোঘ, অনিবার্য ও বিপন্ন সমাপ্তির কল্পনা করেছে যার ফলে 'সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুটি আত্মা মাটিতে মুখ থুবড়ে' প'ড়ে থাকে। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' —দেবেশ রায়ের এই গল্প আমাদের মধ্যবিত্ত স্বার্থপরতা ও ভীরু আত্মকেন্দ্রিকতাকে খুনীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়, বিবেকের উপর পাষাণভার নেমে আসে—যদি এখনও মধ্যবিত্তের কাছে বিবেক কথাটার কোনো মানে থেকে থাকে। 'উদ্বাস্তু' গল্পটির যে এমন কামারমার্কা মোক্ষম ঘা, তার কারণ তার আধা-অ্যাবসার্ড বাড়াবাড়ি, সে-তুলনায় 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' বরং স্যাকরার ঠুক-ঠাকেই ভরপুর। রেলকামরা-ভর্তি লোকদের ভীরুতা ও স্বার্থপরতার উদ্দেশে যেভাবে টিটকিরি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাই তো ক্ষমার সাক্ষী—তাই হঠাৎ তাদের অমনভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া কেমন একটু বেমানান ঠেকে, একই সঙ্গে ক্ষমা ও দণ্ড কেমন যেন সমতাহীন মনে হয়।

দেবেশ রায়ের এই ধরনের গল্পের পাশে মতি নন্দীর গল্প বড়ো বেশি ছকে-ফেলা ব'লে মনে হয়। ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদি যে-সব বিষয় নিয়ে মতি নন্দীর ভাবনা—হয়তো এ-সব বিষয় তাঁর গল্পে প্রতীক হিশেবে পরিকল্পিত—এ-সব গল্পের আবহাওয়ায় কেমন অবাস্তবভাবে উপস্থিত। যেমন, 'গন্ডাম্বয়' গল্পে নিখিলের স্ত্রী সুমিত্রার যখন 'গর্ভপাত ঘটল', তখন নিখিল কী করলো ব'লে অনুমান করেন? নিখিল নেহাত সাধারণ চাকরি করে; ডাক্তার যখন সুমিত্রার 'নাড়ী কেটে পনেরোটি টাকা নিয়ে চলে গেলেন' তখন 'আর সতেরোটি মাত্র টাকা সংসার খরচের জন্য রইল। নিখিল হিসেব করে দেখল আট দিন বাকি অফিসে মাইনে হতে। তবে টিউশ্যানির টাকাটা আগাম চাইলে পাওয়া যাবে। এছাড়া ওষুধ কেনার একটা খরচও আছে। কুড়ি টাকা পর্যন্ত ধার অবশ্য অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে, ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। ডাক্তার বলে গেছে ভয়ের কিছু নেই অর্থাৎ আর টাকা খরচ হবে না।' এ-সব খুঁটিনাটি উল্লেখ ও পর্যবেক্ষণ দেখে পাঠক নিখিলকে যা ভাববেন বাকি গল্পের নিখিল তার সঙ্গে মোটেই মেলে না। 'সুমিত্রার পেট থেকে যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেটা' নিখিল কী করলে? কিংবা যে-ডাক্তার নাড়ী কেটে গিয়েছিলেন, তিনি পনেরো টাকা নিয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি কেন? নিখিল 'সেটা' থলিতে ঝুলিয়ে নিয়ে চললো। পরের অংশ অ্যাবসার্ড এবং এক অর্থে হাসিরও। কিন্তু তার সঙ্গে মতি নন্দীর কাঠখোট্টা ভাষা ও তিক্ত ভঙ্গি মোটেই মানায়নি। নিখিলের টাকার হিশেব, 'পেট থেকে যে-জিনিসটা বেরিয়েছে সেটা' এ-ধরনের উল্লেখ, বা 'রাঁড়ির পেট-খসানো মাল' এ-রকম সংলাপ দিয়ে গোড়ায় যে-জগৎটা প্রতিষ্ঠা করা হলো, তার সঙ্গে বাকি গল্পটা মানাতে গেলে ভির্মি খেতে হয়। 'এবং তারা ফিরে এল'—এই গল্পও শুরু হয়েছে আস্তাকুঁড়ে ভ্রূণহত্যার রক্তাক্ত সাক্ষী দেখিয়ে। মাঝখানে আছে অন্য অনেক প্রসঙ্গের মধ্যে সুব্রত মৈত্র ডি-ফিল-এর স্ত্রী রুবির জন্মনিরোধক বটিকা খাবার হিশেব। এই তিক্ত, ব্যঙ্গবহুল, নির্মম ও গ্লানিময় ভাষা ও পর্যবেক্ষণ বড়ো বেশি থাকে বলেই মনে হয় বানানো, মনে হয় আমাদের চেনাশোনা জগতের কথা নয়—নিছকই গল্প মাত্র। তিক্ততার প্রতি এই তীব্র আসক্তির জন্য মতি নন্দী অনেক সময় উটের পিঠে খড়ের বোঝা চাপাবার মতো টিপ্পনী কাটতেই থাকেন, আর গল্পের সমতা বা খেই হঠাৎ এক সময় হারিয়ে যায়।

দেবেশ রায়ের গল্প যেখানে নিছকই স্কীম্যাটিক, যেমন 'দুপুর', যেমন 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', যেমন 'পা', সে-সব ক্ষেত্রে এ-রকম একটা বানিয়ে-তোলা মেকি ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দেবেশ রায়ের এই গল্পগুলো যেমন তাঁর সার্থকতার নজির নয়, মতি নন্দীর উপরিউক্ত গল্প-গুলোও তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। কেননা মতি নন্দী লিখেছেন 'ছটা প'য়তাল্লিশের ট্রেন'-এর মতো নিশ্চিত ও নির্দ্বিধ গল্প, যাতে প্রদর্শনস্পৃহা নেই, আছে ব্যর্থ মানুষের হাহাকার, আর সেখানে এই ব্যর্থ ও হতাশ মানুষের কাছ থেকে এমনকি আত্মহত্যার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছে। বক্তব্য, বর্ণিত বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি—এই তিনের মধ্যে সংগতি ও সম্পর্কের সুষ্ঠুতা সেখানে অবিকল প্রতিষ্ঠিত।

৩

বাসুদেব দাশগুপ্তর 'রন্ধনশালা'র কোনো গল্পই রচনাভঙ্গি বা আঙ্গিক কোনো দিক দিয়েই মতি নন্দী বা দেবেশ রায়ের গল্পের সঙ্গে মেলে না। ডিমাই ৮ পাতা আকারের ৪৮ পাতার ছোট্ট বই 'রন্ধনশালা', ছাপার ভুলে ভরা, স্মল পাইকা হরফে ঠাশবুনোন ছাপা, মলাটে লতাপাতা ও মালা হাতে উড়ন্ত পরীর পুরোনো এষণা, উৎসর্গপত্রে ছেলেমানুষি; কিন্তু বলতেই হয় এই ছোট্ট অনাড়ম্বর (সত্যি অনাড়ম্বর?) বইটি সহজে ভোলবার মতো নয়। বেরিয়েছিলো যে ১৯৬৫-তে, এই তথ্য পুনর্বার উল্লেখ করি এখানে, কারণ বাংলাদেশ যে এই বইটিকে ভোলেনি তার প্রমাণ এই বইয়ের শেষ গল্প 'বসন্ত উৎসব'-এর মধ্যে মণিকার গলা টিপে হত্যা বিবরণ, যার প্রায় সমান্তর বর্ণনা আছে শ্রীসমরেশ বসুর হুলুস্থুল-তোলা 'বিবর' উপন্যাসে। কিন্তু কেবল এই জন্যই এই বইটি উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা এর ফ্যান্টাসির জগৎ সাম্প্রতিক আর-কারু রচনায় উদ্ঘাটিত হয়নি ব'লেও এই ছোটো বইটি প'ড়েই এর সম্বন্ধে ধারণা করতে হয়। এমনকি শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও ঠিক এভাবে গল্প ফাঁদতে পারেননি, এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা ভাষার বিন্যাস দু-এক জায়গায়, (সত্যিই, দু-এক জায়গায় খুব বেশি নয়) শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'রন্ধনশালা', 'রতনপুর', 'বমন-রহস্য',; 'বসন্ত উৎসব'—মাত্র চারটি গল্প। চারটিই অ্যাবসার্ড গল্প, সরাসরি বাস্তব জগৎকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে গল্পগুলিতে—প্রত্যাখ্যান, না কি ভিন্নভাবে স্বীকরণ? ফ্যান্টাসিতে ভরা এই গল্পগুলো মনস্তত্ত্ববিদদের নিত্যবৃন্দাবন, সন্দেহ নেই। ইন্দ্রিয়াসক্তি, চাক্ষুষ সব বিবরণ, অথচ কেমন ক'রে যেন চৈতন্যের মন্থন ঘ'টে গেছে গল্পগুলিতে। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আড়ালে দমবন্ধ মধ্যবিত্ত জগৎকে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেলেও ফ্যান্টাসির উল্লাসে গল্প-গুলো হৈ-হৈ করছে। আছে মুক্তি ও মৃত্যু, আনন্দ ও বিষাদ, উৎসব ও একাকিত্ব।—আর নিছকই ইয়ার্কি। সত্যি বলতে, স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসি অনেক সময় আমাদের সন্দেহ উশকে দেয় : সাহিত্যিক স্বপ্নের মতো মেকি ও দুর্বল জিনিস আর ক-টাই বা আছে, আর ফ্যান্টাসিও কতটাই বা যুক্তির জগতের সত্যিকার প্রত্যাখ্যান? কিন্তু, তবু, একটি গল্প, একটিমাত্র গল্প, 'রতনপুর', আমাদের সব সন্দেহ ও দ্বিধাকে উড়িয়ে দিতে পারে। কবিতা আর গল্পে মাখামাখি এখানে, আর তারই মধ্যে আমাদের মোহাচ্ছন্ন ও বিপন্ন চেতনায় ছেলেবেলার হারিয়ে-আসা রতনপুর সমস্ত অপ্রাপ্য পূর্ণতার প্রতিরূপ হ'য়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, এই তিনজন গল্পকারের মধ্যে মতি নন্দী যদি হন সবচেয়ে তিক্তবিতিক্ত ও নির্মম, তবে দেবেশ রায় সমাজ মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে সচেতন আর বাসুদেব দাশগুপ্ত সবচেয়ে ঐশ্বরিক (না কি যুগপৎ চৈতন্যময় ও ইন্দ্রিয়াসক্ত?)। তিনজনই আগে বলবার কথাটি ভেবে নিয়ে গল্প লিখতে বসেছিলেন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

**সাম্প্রতিক বাঙলা উপন্যাসে প্রেম এবং কাম**

উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অর্থ এই নয় যে উপন্যাসরচনার উদ্দেশ্য ভূমিসংস্কার, ধনবণ্টনে বৈষম্য দূরীকরণ, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, কি ওইজাতীয় কিছু। উপন্যাসে বাস্তবতা বলতে কী বোঝায় সেবিষয়ে সব পাঠকই সচেতন, সব লেখকও। সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়, সেবিষয়েও। সমাজতন্ত্রে মোটামুটি সকলেই বিশ্বাস করেন, মতভেদ কেবল সেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় এবং কৌশলে। অথচ উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে বিচিত্র সব ধারণা ছিল এবং আছে, এ দেশে তো বটেই, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও। এবিষয়ে সুতরাং গোড়াতেই গুটি-কয়েক কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে চীনে বা রাশিয়ায় সাহিত্যিকেরা সমালোচকেরা কখন কেন কী বলেছেন তার বিবরণে না গিয়ে, ভারতবর্ষের বা আরো সংক্ষিপ্ত পরিসর বাঙলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আলোচনা বোধহয় আমাদের পক্ষে বেশি লাভের হবে।

বাঙলা ভাষা বোঝেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা ধরা যাক সাড়ে তিন কোটি। নিরক্ষর লোক যাঁদের সংগে লিখিত সাহিত্যের যোগ নেই তাঁদের বাদ দিলে ধরা যাক সংখ্যাটি দাঁড়াবে সত্তর আশি লক্ষে। এ'দের মধ্যে যে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান থাকলে সাহিত্য-রসাস্বাদন সম্ভব, ধরা যাক তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ কি দুই লক্ষ। এই পরিসংখ্যানে কিছু এদিক ওদিক হলে ক্ষতি নেই, কারণ বিষয়টি অন্যতর।

আমাদের ঔপন্যাসিকেরা যখন লেখেন তখন স্বভাবতই সাড়ে তিন কোটি বাঙলাভাষীর মধ্যে এই এক কি দুই লক্ষ লোকের জন্যই লেখেন, অথবা ঘুরিয়ে বললে এই একদুই লক্ষ লোকই সেটা পড়ে বুঝতে পারেন। এবিষয়ে কোন ভণিতা কপটতা বৃথা। যখন বাঙালি ঔপন্যাসিক লেখেন, তখন তাঁর পক্ষে বাঙলাদেশের বিস্তৃত অধিবাসীর, নিরক্ষর বা মোটামুটি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের, কথা ভাবা পণ্ডশ্রম। তাঁর পাঠক হচ্ছেন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ। কৃষকসমাজ তাঁর পাঠক নন, শ্রমিকসমাজ তাঁর পাঠক নন, যতদিন এ'রা শুধু সাক্ষর নন, যথেষ্ট ভাষাসচেতন না হয়ে ওঠেন। এটা আশা অভিলাষের প্রশ্ন নয়, বাস্তব সত্য। বর্তমান ব্যবস্থায় ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই সমাজকে তাঁর উপন্যাস পড়ানোর প্রচেষ্টা বৃথা। যতদিন নিরক্ষরতা দূর করায় সমাজ আজকের মতোই অথর্ব হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সত্যই বাস্তব হয়ে থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে অতএব যাঁরা ভাবেন তাঁদের এটা জানা আছে নিশ্চয়ই যে অদূর ভবিষ্যতেও তাঁদের পক্ষে চাষীমজুরদের জন্য উপন্যাসরচনা অসম্ভব। সেইজন্যই সম্ভবত কিছু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী লেখক চাষীমজুরদের জন্য লিখতে না পারায় চাষীমজুরদের নিয়ে লেখার চেষ্টা করে বিবেককে শান্ত করেন। এখানেই মূল প্রশ্ন।

যাঁরা লেখেন তাঁরা চাষীমজুর নন। জন্মসূত্রে বা বৃত্তিসূত্রে কেউ কেউ চাষীমজুর হলেও যে-মুহূর্তে তাঁরা উপন্যাসরচনায় নামেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা চাষীমজুরদের জগৎ থেকে বেরিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের সাহিত্যিক আবহাওয়ায় উপস্থিত হন, মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধে নিয়ন্ত্রিত হন। যাঁরা লিখছেন তাঁরা চাষীমজুর নন, যাঁরা পড়ছেন তাঁরা চাষীমজুর নন, অথচ চাষীমজুর সেই রচনার উপজীব্য। এর পরিণতি, ফাঁপা সাহিত্য। যে সমাজের সংগে লেখকের এবং পাঠকের আত্মিক যোগাযোগ নেই সেই সাহিত্যে বাস্তবতা আসতে পারে না, তা হয় রূপকথা। বাঙলাদেশের চাষীমজুরদের নিয়ে উপন্যাসমাত্রই রূপকথায় পরিণত হতে বাধ্য, সমাজের বর্তমান বিবর্তন-পর্যায়ে। ভাষায় চরিত্রে বর্ণনায় যতই চাষীমজুর চাষীমজুর ভাব আসুক না কেন, সাহিত্যের অন্তরাত্মা যে মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধ মধ্যবিত্ত সমাজের হওয়াতে, চাষীমজুর ভাবটি আরোপিত-মাত্র হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন পল্লীজীবনবেদ লেখেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন গ্রামীণ জীবনের উপকথা লেখেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মজুরদের ইতিকথা লেখেন, তখন সেই লেখা উচ্চস্তরেই হয়, চাষীমজুরদের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাতে ফোটা সম্ভব নয়। মনীষার প্রাখর্যে, সহমর্মিতার নিবিড়তায় সহানুভূতি সম্ভব, ভালোবাসা নয়।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণে যাঁরা মার্ক্সীয় পন্থায় বিশ্বাস করেন তাঁরা কেউ কেউ হয়ত এখানে আপত্তি তুলতে পারেন। এই আপত্তি উঠবে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য শ্রমিকসমাজের নেতৃত্ব সম্পর্কে দুটি বিরোধী ধারণার জন্য। একটি ধারণা হল, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিকশ্রেণীর বাইরের বুদ্ধিজীবীরা, কারণ শ্রমিকেরা তাঁদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। অপর ধারণাটি হল, শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ করতে পারে একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাই, বাইরের নন। যাঁরা প্রথমোক্ত ধারণার অনুসারী, তাঁরা অবশ্যই একথা মানবেন না যে, চাষীমজুর না হলে চাষীমজুরদের নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, চাষীমজুরদের জন্য উপন্যাস রচনা করা যায় না। যদি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে বুর্জোয়া ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস লিখতে পারবেন না কেন?

দ্বিতীয় ধারণার অনুসারীরা বলবেন যে, পারবেন না এই জন্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন এবং সাংস্কৃতিক ইমারত গঠনের প্রশ্ন ভিন্ন। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে মননশীলতার প্রয়োগে শ্রেণীর বাইরের নেতৃত্ব কার্যকর হতে পারে কিন্তু সাংস্কৃতিক ইমারত গঠনে তা হয় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীচরিত্র কাটিয়ে ওঠা যায়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যায় না। সমাজের সংস্কৃতির ধারা শ্রেণী-

বহির্ভূত নেতৃত্বে থাকলে সংস্কৃতির বিকৃতি অনিবার্য। [বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় ধারণাটি অনেক বেশি দূরদর্শী।]

তাহলে, নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি লেখকের পক্ষে যখন চাষীমজুরদের জন্য লেখা অসম্ভব, চাষীমজুরদের নিয়ে লেখাও অসম্ভব, তখন তাঁর উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলতে কী বোঝায়? সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, অন্য কথায়, কাকে বলে? সমাজের গতি সম্পর্কে, চরিত্র সম্পর্কে ঠিক জ্ঞান থাকলেই তাকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করানো যায়, এবং যে সাহিত্য সমাজের এই গতিপ্রকৃতি সঠিক উদ্ঘাটন করতে পারে, তাকে বলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। যে মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে বর্তমান ঔপন্যাসিক লিখছেন, যে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন তাঁর কেন্দ্র, সেই সমাজ এবং সেই সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে তাঁর যেন অজ্ঞতা না থাকে। তাঁর লেখায় অর্থনীতি থাকতেই হবে, রাজনীতি থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলেই মানুষ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান জন্মায়। নতুবা তৈরি হয় চরম অবাস্তবতা।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক উপন্যাসটির উপজীব্য কলকাতা শহরে তরুণতরুণীর প্রেম। তরুণতরুণীরা আজও প্রেমে পড়ছেন, সুতরাং প্রেমবিষয়ে লেখা বাস্তবতাবিরোধী নয়। প্রেমের সঙ্গে সমাজতন্ত্রেরও কোন বিরোধ নেই। কিন্তু প্রেম বিষয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে ১৯৭০ সালে লেখক যদি কলকাতার রাজনীতি অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে, এর দারিদ্র্য, পাশবতা, উন্মত্ততা এড়িয়ে কেবল কোমল আবেশ সৃষ্টি করেন তাহলে তিনি বাস্তবতা রক্ষা করছেন না, অতএব বাস্তবের বিকৃত চিত্র রূপায়িত করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণেও সাহায্য করছেন না। ধনীর দুলাল হলেও, ধনী গৃহে ধনী বিদ্যালয়ে ধনী বিলাসব্যসনে মগ্ন হলেও, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত জীবন সম্পর্কে সংশয় না থাকলেও কলকাতা শহরে বর্তমান একটি সংবেদনশীল তরুণের জীবনে শোভাযাত্রা, গুন্ডামি, বেকারদশা, কারখানায় গন্ডগোল, কলেজে ভিড়, পরীক্ষায় নকল, জলসা-সিনেমায় ইতরতা, ব্ল্যাকমার্কেটে চাল কেনা, ওষুধে ভেজাল, রাস্তায় ড্রেনের জল ইত্যাদি তার সেই কোমল আবেশ ভেঙে ফেলতে বেশি সময় নেয় না। এই রৌরব আবহাওয়া থেকে সরিয়ে প্রেম নিয়ে লেখা বায়ুভুক লেখা। সে লেখা অবাস্তব। অতএব অসমাজতান্ত্রিক।

আবার এর বিপরীত, আজ কলকাতা শহরে প্রেম নেই আছে শুধু লাম্পট্য, প্রেমের পরিণতি হচ্ছে নিশ্চল নির্বীর্য নিষ্ক্রিয় অথবা সরব কোলাহলময় দাম্পত্য জীবন, একথাও অবাস্তব। কারণ জীবন, কলকাতাতেও এগিয়ে চলছে এবং এই এগিয়ে চলার মধ্যে একটি জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে, এই জীবনে সক্রিয়তা কোথাও না কোথাও কাজ করছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দাবি করে, জীবনের অন্ধকার দিকটিকে যেমন স্বীকার করা, তেমনই আলোকময় অংশটুকুও সজীব করে দেখানো। নেতিবাচক ইতিহাস বাস্তব নয়, যেমন অলীক স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ দর্শনও বাস্তব নয়। মানুষকে মানুষ ঘৃণা করছে এটাও যেমন সত্য, মানুষের জন্য মানুষ প্রাণ দিচ্ছে এটাও তেমন সত্য। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি আশ্রয় করা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়।

সোলঝেনিৎসিনকে যে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে রুশ সরকার অস্বীকার করেছেন তার কারণ হিসেবে বলেছেন নভস্তি প্রেস এজেন্সি : যে মুহূর্তে সোলঝেনিৎসিন কালো চশমা চোখে নিলেন সেই মুহূর্তে তিনি নিজের দেশের পুরো চেহারাটা হারিয়ে ফেললেন এবং বিকৃতভাবে দেখতে লাগলেন। নভস্তি প্রেসের নোবেল-পুরস্কারবিজয়ীর এই মূল্যায়ন ঠিক কি ভুল, তা অন্য কথা, কিন্তু নভস্তি প্রেসের এই তত্ত্বে কোন ভুল নেই। মানবতায় বিশ্বাসী হতে হবে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার এই শর্তেও, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাই গৃহীত হয়েছে। নোবেল পুরস্কারের বিচারকগণ তা সত্ত্বেও সোলঝেনিৎসিনকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন করেছেন, হয়তো বর্তমান রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় যে কোন বিরূপ সমালোচনাকেই তাঁরা মানবতাবোধ বলে গণ্য করেছেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই শরতে প্রকাশিত দুটি উপন্যাস আলোচনা করা যেতে পারে। একটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অর্জুন" আর একটি সমরেশ বসুর "বিশ্বাস"। দুজনেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। দুজনেই ভাষায় দক্ষ। দুইজনেই তাঁদের সময় সম্পর্কে, পাঠকের কী পছন্দ সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। সুতরাং এঁদের উপন্যাসের আলোচনা থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার

প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে সুনীলের মতামত স্পষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকার মতামত বিভাগে সুনীল বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানেই কমিউনিস্ট সাহিত্য, কমিউনিস্ট সাহিত্য মানে প্রচারধর্মী সাহিত্য। প্রচারধর্মী সাহিত্য সাহিত্যই নয়, প্রচারের নিগড়ে সাহিত্যের রস মারা যায়। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী সুনীলের রেজিমেন্টেশনে বিশ্বাস নেই।

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা কমিউনিজম সম্পর্কে সুনীলের নিজস্ব জ্ঞান নেই, এই সম্পর্কে তাঁর মতামত গড়ে উঠেছে প্রচলিত অস্বচ্ছ ধারণা থেকে। প্রথম কথা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কমিউনিজমের কোন বিরোধ নেই, কমিউনিজম আর রেজিমেন্টেশনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী নয়। কমিউনিজমের পথ যাই হোক, লক্ষ্য হল শোষণব্যবস্থার বিলোপ করে মানুষের পুরো স্বাতন্ত্র্যের, পুরো ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যারা বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পর্যবেক্ষণ করে মনে করি সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নেই তারা ভুল করি। সাময়িকভাবে, তা দশ বছরও হতে পারে একশো বছরও হতে পারে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে বহুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়তা করার জন্য। কমিউনিজমের পথ সম্পর্কে সুনীলের হয়তো সন্দেহ আছে, কিন্তু অন্য কোন পথ তাঁর জানা নেই, অথচ সমাজতন্ত্র তিনিও চান। অর্থাৎ সেই সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার কাল্পনিক জগতেই তিনি এখনও আছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রে কখনোই পৌঁছনো যাবে না। তাই এই পর্যায়ে শোষক-শোষিতনির্বিশেষে সকলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান গাওয়া আসলে শোষকের হাতে শোষিতদের সঁপে দেওয়া। তাছাড়া, সুনীল যাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে মনে করছেন তা-ও আপাত-স্বাতন্ত্র্য। যে দেশে অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, সেখানে অভাব দূর করার চেষ্টা না করে স্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের জয়গান গাওয়া প্রায় জলের অভাবে বাতাসের অভাবে মাটির অভাবে ফুলগাছ বাঁচাতে না পেরে লাল-নীল-হলুদ প্ল্যাস্টিকের ফুলগাছ টবে পোঁতার মতই।

সুনীলের আর-একটি ধারণা, কমিউনিজমের অর্থ মানুষের জীবনে অর্থনীতিই সব। এটা ভুল ধারণা। কমিউনিজমের বক্তব্য, মানুষের সম্বন্ধ রচনায় অর্থনীতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, রাজনীতি তার পরিপূরক। তাই বলে অর্থনীতি এবং রাজনীতিই মানুষের পুরো জীবন নয়। মানুষের অন্যান্য মূল্যবোধও আছে, তার সঙ্গে অর্থনীতি এবং রাজনীতির অবিরাম টানাপোড়েন চলে, কখনও স্বচ্ছন্দে কখনো সংঘর্ষে। সুতরাং কমিউনিস্ট সাহিত্য, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানেই পার্টির কথা বলা, ইস্পাত কারখানার উৎপাদনের কথা বলা, সমবায় সমিতির উন্নতির কথা বলা নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা অর্থ প্রচারধর্মী সাহিত্যও নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল চারপাশের জগৎকে পুরো বোঝার চেষ্টা।

যে সমাজের সঙ্গে মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই সমাজের চরিত্র ও গতির তাৎপর্যময় উদ্ভাসনে যে সাহিত্য বিশিষ্ট সেই সাহিত্যই সমাজতান্ত্রিক। যে সমাজ ক্রমশ অধঃপতনের দিকে গড়িয়ে চলেছে সে সমাজ সম্পর্কে মোহময় চিত্র তুলে ধরা যেমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়, তেমনি যে সমাজ তার গ্লানি ক্লিন্নতা অতিক্রম করার চেষ্টা করছে সেই সমাজের ক্লিন্নতার ছবি তুলে ধরার চেষ্টাও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়। সার্থক সাহিত্যিক তিনিই যিনি সমাজের গতি সম্পর্কে সচেতন। এইখানেই উপন্যাস রচনায় মননশীলতার প্রয়োজন। কেবল আবেগসম্ভূত উপন্যাস তাই মনোরম হতে পারে, মনোজ্ঞ হয় না।

সুনীল এ পর্যন্ত যে-কটা উপন্যাস লিখেছেন, "অর্জুন" সেই উপন্যাসগুলো থেকে আশাজনক-ভাবে স্বতন্ত্র। এ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসগুলোতে ছিল চার-ইয়ারী কথা, খুচরোভাবে তাদের আশা অন্বেষণ আর নৈরাশ্য। তাঁর চরিত্রগুলো ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তমনস্ক। তাঁর জগৎ ছিল কলকাতার উত্তর প্রত্যন্তের তথাকথিত ঈর্ষাকাতর ছেলেদের চোখে তথাকথিত শৌখীন মেয়ে অধ্যুষিত সাউথ, বা, পঞ্চাশের ইংল্যান্ডের ভাষায়, অ্যাঙরি ইয়াঙ ম্যানদের চোখে এস্টাব্লিশমেন্ট। সুনীলের বর্তমান জনপ্রিয়তার মূলে আছে যেমন এই গন্ডিগুলো, সাহিত্যিক অসার্থকতার মূলেও আছে তেমনি এই গন্ডিগুলোর সীমাবদ্ধতা।

এই বৃত্ত থেকে "অর্জুন" উপন্যাসের বেরুনোর একটা চেষ্টা ছিল। অবশ্য এখানেও সুনীল

তাঁর কাল্পনিক বড়োলোক ও সাউথের মেয়েদের ফিক্সশন থেকে মুক্তি পাননি। তবে সাম্প্রতিক সমাজ থেকে তিনি যে পুরোপুরি বিচ্যুত হননি, এটা আশার কথা।

"অর্জুন"-এর বিষয় এক জবরদখল কলোনির বাস্তুহারা জীবন। সুনীল যেহেতু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, সুতরাং এই জীবন তিনি দেখেছেন নায়কের ব্যক্তিগত কোণ থেকে। ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডীকরণ বা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা বাস্তুহারাদের প্রতি সরকারের অবহেলা ইত্যাদির বৃহত্তর পটভূমিতে তিনি যান নি। সামাজিকভাবে অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণ তিনি করেন নি। বাস্তুহারা সমস্যা যে বিরাট অর্থনীতি-রাজনীতির অন্তর্গত, তা সুনীলের নজরের বাইরে। স্বভাবতই বাস্তুহারার মূল সমস্যা, দেশবিভাগের শ্রেণীচরিত্র, তাঁকে ভাবায় নি। ফলে বাস্তুহারা জীবন তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য হলেও, উপন্যাসের প্রসার থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেছেন।

কিন্তু এই সীমার মধ্যে, ব্যক্তিগত দৃষ্টি থেকে দেখা বাস্তুহারাদের শোচনীয় আত্মিক ও আর্থিক দুর্গতি, "অর্জুন" উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পর পাকিস্তানের হিন্দুদের যে ত্রাসের জীবন চলছে, তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে সুনীলের কখনো কবিপ্রাণ, কখনো তির্যক, সবসময়েই পরিমিত ভাষার মারফত। পাকিস্তানের এই ত্রাসের জীবনের রোমন্থনই, যা নায়কের মন গড়ে তুলেছে, উপন্যাসটির ভিত্তি, এবং এই ভিত্তি সুনীল অতি সৎভাবেই গড়ে তুলেছেন। এই ভিত্তির উপরে কাঠামো যা তৈরি হয়েছে তা নানা কারণে আপত্তিকর হলেও, ভিত্তিটি সুদৃঢ় হওয়ার জন্যই সুনীলের এই উপন্যাস আলোচনার যোগ্য হয়েছে।

অর্জুন মধ্যবিত্ত তরুণ। দেশভাগের ফলে তার আশ্রয় হয়েছে একটি জবরদখল কলোনি। পড়াশুনায় ভালো হওয়ার দৌলতে সে উদ্বাস্তু কলোনির আবহাওয়ার অনেকটা বাইরে বটে, কিন্তু সেখানেই তার ট্র্যাজেডি। তার নজর সমাজের উপরতলার দিকে, অথচ শিকড় নিচুতলায়। লেখা-পড়ার মাধ্যমে এবং আকস্মিক যোগাযোগের ফলে সে হয়তো কলোনির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারত, কিন্তু পারে না, কেননা সে তার অতীত ও বর্তমান ভুলতে পারলেও, উপরতলার সমাজ তা ভুলতে পারবে না। সে যদি পুরো কলোনিটা, তার পাকিস্তানের অতীতকে ওপরতলার সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে পারত কোন ম্যাজিকে, তাহলে হয়ত তার জীবনে ট্র্যাজেডি থাকত না, কিন্তু সেই ম্যাজিক তার হাতে নেই। আবার উপরতলায় সে যেমন গ্রাহ্য নয়, নিচুতলাও তেমনি তার কাছে গ্রাহ্য নয়। কলোনির কোন মানুষ তার পরিশীলিত মনকে আকৃষ্ট করে না, হৃদয়কে তো নয়ই। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে অবশ্য তার শক্তি ও আশ্রয় ওই কলোনিই। তাই বুদ্ধি আর হৃদয় এই দুয়ের টানাপোড়েনে তার জীবনে সমস্যা। বর্তমান নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারে মেধাবী তরুণমাত্রেরই এই সমস্যা।

এই সমস্যার সমাধান অবশ্য আছে, যে পথে সুনীল যান নি। হৃদয়কে চেঁছে বাদ দিয়ে নিজেকে আপন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করাই হচ্ছে এর সমাধান। সুনীলের আবেগপ্রধান জীবনে বুদ্ধিশীলতার এমন প্রয়োগ গ্রাহ্য নয়। আবার বুদ্ধিকে চেঁছে বাদ দিয়ে হৃদয়কেও চেঁছে তুলে দিয়ে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে ঢুকে পাশব জীবনযাপনও অন্য আপাত-সমাধান হতে পারত। সুনীলের রোম্যান্টিক মনে তাও গ্রাহ্য নয়। ফলে তাঁর সমস্যার কোন সমাধান নেই। প্রথম দৃষ্টিতে তাই এই সমস্যার উপর উপন্যাস দাঁড় করানোর চেষ্টা সফল; দ্বিতীয় দৃষ্টিতে অবশ্য এমন সমস্যাকে স্বীকার করা নাবালকত্ব।

এই নাবালক জগতে অর্জুন তাই না পারে কলোনির মেয়ের প্রতি প্রেম অনুভব করতে, না পারে উপতলার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে। তাকে যে ভালোবাসে তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে উদাসীন, যাকে সে ভালোবাসে তার জামার সেন্টের গন্ধ শুঁকেই সে বিভোর। যে কলোনির জন্য তার দুবার জীবনসংশয় হল, সেই কলোনিতে অবশ্য তার মন টেঁকে না। সেই জীবনসংশয় আঘাতও তাকে জীবনের গতি নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে না, ব্যাণ্ডেজ-বাধা অবস্থায় তার অভিমান প্রেয়সীর সেন্ট মাখা-না-মাখা নিয়ে।

সুনীলের সব নায়কের মতোই অর্জুন ভাবতে ভালোবাসে না, তার চরিত্রের সবচেয়ে প্রবল অংশ প্রেমাকাঙ্ক্ষা। সমস্যাজর্জর সমাজে বাস করেও যে আর সব ছাড়িয়ে প্রেমাকুতির জন্য কাতর, তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করা বেশ কঠিন। সুনীল তাঁর এই উপন্যাসে যদিও-বা প্রেম-প্রেম খেলা

আর ইয়ার্কি'র জগৎ থেকে বেরুতে চেষ্টা করলেন, কী এক মায়ার খেলায় আবার সেই জগতেই ফিরে গেলেন। অর্জুনের জীবনে দুয়েকবার যে বুদ্ধিশীলতার ঝিলিক আসে নি তা নয়। উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে সরকারী ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক দলগুলোর আপাত করুণা সম্পর্কে অর্জুনের কোন মোহ নেই, কলোনি বাঁচাতে হলে কলোনির লোককেই তৈরি হতে হবে অর্জুনই সে কথা বুঝেছিল, ব্যবসায়ীর আগ্রাসন চরিত্র তার চোখেই ধরা পড়েছিল, কলোনির লুম্পেনদের বিপথ-গামিতা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এত বোঝার পরও উপন্যাসের পরিণতি আসে হাসপাতালে নায়কের প্রায় আত্মরতিতে। যদি বোঝা যেত নায়কের এই পরিণতির প্রতি লেখকের মনোভাব শ্লেষাত্মক তাহলে হাঁফ ছাড়া যেত, কিন্তু সুনীলের প্রেমবৈচিত্র্য যাঁরা লক্ষ্য করছেন তাঁরা এখনও হাঁফ ছাড়তে পারছেন না।

সমরেশ বসুর "বিশ্বাস" অবশ্য অন্য জাতের। আগেকার মতো এখানেও সমরেশ ধুরন্ধর লেখার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত নিপুণ। সুনীলের ভাষা যেমন শৌখীন, সমরেশের ভাষা তেমন তিক্ত। তাঁর চরিত্রগুলো নাবালক নয়, না বয়সে না মনে। তবে সুনীলের সঙ্গে সমরেশের এখানেই মিল, সুনীল যেমন প্রেমে বিভোর, সমরেশ তেমন কামে বিভোর। সুনীলের স্বপ্ন আর সমরেশের দুঃস্বপ্ন দুটোই অলীক যদি এই স্বপ্নকে আর দুঃস্বপ্নকেই জীবনের সর্বস্ব বলে ধরা হয়। সুনীল আর সমরেশ তা-ই ধরেছেন।

সমরেশের কামের ব্যবসায়িক সাফল্য সর্বজনবিদিত। তার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রলেপ তাঁকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে, সাহিত্যে নয়, বাজারে। কামান্ধতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয় কেন সে কথা বলা হয়েছে। সমরেশের আপাত-রাজনীতি কেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নয়, তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

তাঁর "বিশ্বাস" উপন্যাসের কাঠামো তৈরি হয়েছে, নাবালিকা হরণ না করেও নাবালিকা হরণ দায়ে জনৈক যুবকের নানা দুর্গতির উপর। কাফকার পর, অপরাধ না করেও অপরাধের গ্লানিতে ভোগা, এই যে রেওয়াজ বর্তমান বিশ্বসাহিত্যে চলছে, তারই এক রকমফের এই উপন্যাসটি। অবশ্য কাফকার সঙ্গে সাদৃশ্য ওই কাঠামোগতই, তার মালমশলা সমরেশের নিজস্ব।

এই মালমশলাটিতে সমরেশ খানিকটা বুদ্ধিশীলতার প্রলেপ দিয়েছেন তাঁর বাচনভঙ্গির সাহায্যে। কিন্তু আসলে বিষয়টি কী? নায়ক কয়েকটি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল। সে প্রেমে বিশ্বাস করে, সে কিশোরী-মনের সততায় বিশ্বাস করে। কিন্তু তার প্রেমিকা তার সঙ্গে শঠতা করে অন্যের সঙ্গে পালিয়েছে, ফলে তার প্রেমে বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসে। একটি কিশোরীসঙ্গ তার কিশোরীর সততায় বিশ্বাসও ভেঙে দিয়েছে। নায়কের অবিশ্বাসও প্রচুর। পিতৃপ্রেম মাতৃপ্রেম ইত্যাদি তার জীবনে আসে নি, তাই বাবা-মার প্রতি নায়কের মনোভাব শ্লেষাত্মক। পুলিশ-দারোগার বোধবুদ্ধিতে তার বিশ্বাস নেই, তাই উপন্যাসে পুলিশ-দারোগার প্রতি মনোভাব যথেষ্ট ব্যঙ্গাত্মক। সাম্প্রতিক বামপন্থী পার্টিগুলোর উপরও নায়কের কোন মোহ নেই, যদিও সে একজন সক্রিয় পার্টি-কর্মী। অতএব পার্টির লোকজনকেও দেখানো হয়েছে অত্যন্ত হেয় করে।

অর্থাৎ, মূলত সমরেশের বিষয় এবং সুনীলের বিষয় প্রায় একজাতীয়ই। দুজনেই রোম্যান্টিক, দুজনেই প্রেম বিশ্বাস সততা ইত্যাদি খুঁজছেন। যদিও গল্প বলার ধরন দুজনের ভিন্ন। একজন শৌখীন জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে প্রেম ইত্যাদি খোঁজেন, আর একজন ক্লিন্ন সমাজের মধ্যেই সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না। সুনীল মোটামুটি ঘটনা আশ্রয় করে গল্প বলেন, সমরেশ ঘটনা প্রায় বর্জন করেই গল্প বলেন। সুনীলের বক্রোক্তি মাঝে মাঝে আসে, সমরেশের তীব্র শ্লেষ ছত্রে ছত্রে। সুনীলের গল্পের আবহাওয়া কলেজে-পড়া তরুণতরুণীদের দিয়ে তৈরি, সমরেশের গল্পের আবহাওয়া চাকরি-করা যুবকযুবতীদের দিয়ে। কিন্তু মননশীলতার অভাবে এবং আবেগপ্রবণতার উচ্ছ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। বিষয় এক, আধারটি যদিও ভিন্নতর। বিষয়, বিশ্বাসের সন্ধান; সুনীলের আধার প্রেম, সমরেশের আধার কাম।

বলা বাহুল্য, আপাতদৃষ্টিতে সমরেশের উপন্যাস সুনীলের চাইতে গভীরতর মনে হতে পারে। কারণ সমরেশের শ্লেষের তীব্রতা। কারণ, সমকালীন জীবনের প্রায় প্রতি ব্যাপারেই, সমকালীন রাজনীতি দর্শন সাহিত্য দেশকাল সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব, যা একটা আপাত-

গভীরতার ভ্রম জাগায়। এই প্রসঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক ভঙ্গিমাটি বিশেষ পরীক্ষায় অবকাশ রাখে।

সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যে রাজনীতি অল্প অল্প ঢুকেছে, কিন্তু ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বাঙলাদেশের বর্তমান চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর থেকে। শিক্ষাব্যবস্থা, পুলিশব্যবস্থা এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে নকশালী আন্দোলন, ভুল হোক কি ঠিক হোক, সমস্ত সমাজকে একেবারে গোড়া থেকে টান দিয়েছে। সুতরাং নকশালী প্রভাব সাহিত্যে আসতে বাধ্য। কিন্তু সেটা কীভাবে এসেছে? গল্প-উপন্যাসে নায়ক এখনও কেউ নকশালী নয়, সাধারণত পরিবারের ছোট ছেলে, নায়কের ছোট ভাই নকশালী হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে মননশীলতা থাকলে নকশালী মনকে বোঝা যেতে পারত, আমাদের কোন ঔপন্যাসিক গল্পলেখকদের মধ্যে সেই মননশীলতা না থাকার ফলে নকশালতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে আসে নি। অথচ নকশালীদের আমদানি করলে যে আবেগময়তা সহজেই সৃষ্টি করা যায়, তার সুযোগ ছাড়তে আমাদের সাহিত্যিকেরা রাজি নন। সুতরাং রাশি রাশি নকশালী ছোট ভাইয়ের সৃষ্টি।

এটা শুধু নকশালী চরিত্রের ব্যাপারেই নয়। বাঙলা উপন্যাসে কোন চরিত্রই খাঁটি রাজনৈতিক নয়, তার রাজনৈতিকতা সম্পূর্ণই আরোপিত মাত্র। যথা সমরেশের "বিশ্বাস"। এর নায়ক রাজনৈতিক কর্মী। সে রাজনীতি নিয়ে ভাবে, কেবল আত্মাবহন করে না। সে বুঝতে পারছে, তিনটি দেশ ভারতবর্ষ নিয়ে খেলছে, এর তিনটি কমিউনিস্ট দল সেই খেলার নাচে নাচছে। নায়কের মনে মার্কসবাদ সম্পর্কে পুরো জ্ঞান আছে, সুতরাং সংশোধনবাদ মানতে সে রাজি নয়। এই রাজি না হওয়ার জন্য, সে মার খেয়েছে, পার্টি ত্যাগ করে নতুন পার্টিতে যোগ দিয়েছে, আবার সংশয় জেগেছে, আবার ছাড়তে যাচ্ছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙলাদেশে সর্বহারাদের কোন পার্টি নেই, সবই চালায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা। এই বিশ্বাস হারানোতে তার মনে অস্থিরতা কেননা তার সব বিশ্বাসের বড়ো বিশ্বাস রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস।

সমরেশের এই বিষয় পাঠককে ভাবাতে পারত যদি দেখা যেত, সমরেশের উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে এই রাজনৈতিক আদর্শের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর। কিন্তু, নায়কের মনে কেন যে পার্টির সংশোধনবাদ সম্পর্কে সংশয় জাগছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নেই। সাম্প্রতিক অর্থনীতি রাজনীতির কোন সমস্যা এই উপন্যাসের বিষয় নয়, উপন্যাসের কাঠামো হচ্ছে মেয়ে নিয়ে পালানো নিয়ে। সংশোধনবাদ আর মেয়ে নিয়ে পালানো—এই দুই বস্তু একবিন্দুতে মেশে কী করে? সমরেশ বলতে পারেন, ইলোপ করা ব্যাপারটা পার্টির লোকেরা যে-দৃষ্টিতে দেখেছে তা থেকেই পার্টির পাতিবুর্জোয়া চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু সমরেশ নিজেই আবার বলছেন যে, ইলোপ করা ব্যাপারটা অজুহাতমাত্র, পার্টি থেকে নায়ককে তাড়ানো হচ্ছে নায়ক পার্টির সংশোধনবাদী চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করছে বলে। উপন্যাসটিকে বলা যেতে পারত রাজনৈতিক চরিত্রের ভেতর থেকে দেখা জগৎ, যদি পার্টির সংশোধনবাদী কোন আচারআচরণ বক্তব্য কর্মপন্থা উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হতো। কিন্তু গল্পের বিষয় প্রেম আর বক্তব্য বামপন্থী দলগুলির সংশোধনবাদ, এ দুয়ে খাপ খায় না। ফলে, আমাদের সেই পূর্ব সিদ্ধান্তেই যেতে হয়, বাঙলাদেশের কোন উপন্যাসের চরিত্রই রাজনৈতিক নয়। একটি রাজনৈতিক চরিত্রের জীবন, তার দ্বন্দ্ব, তার স্বপ্ন সার্থকভাবে উপন্যাসে আসছে না। কিন্তু রাজনীতির প্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, কেননা বাঙলাদেশের বর্তমান উত্তাল অবস্থায় রাজনীতি ছাড়া কোন কিছুই ভাবা কঠিন।

সমরেশের এই রাজনীতির প্রলেপ দেওয়া উপন্যাস রচনার ধরন অত্যন্ত আপত্তিকর কেননা, রাজনীতিতে অল্প-জানা কিন্তু সহৃদয় পাঠকের মনে রাজনীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা গজিয়ে যাচ্ছে। সমরেশের রাজনীতিতে সবজান্তা ভাব, তাঁর অত্যন্ত দক্ষ ভাষা, তাঁর নিপুণ গল্প বলার কায়দা পাঠককে আরো মোহগ্রস্ত করে তোলে। এটাই চরম সমাজতান্ত্রিক অবাস্তবতা। ধরে নেওয়া যাক, বামপন্থী সবগুলি পার্টিই ভেক বামপন্থী। তাহলে প্রত্যেকটি পার্টির পিছনে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন রয়েছে, সেই সমর্থনের রহস্যটি তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? অর্থাৎ প্রত্যেকটি পার্টিই ভুল পথে এগুচ্ছে, লোককে ধোঁকা দিচ্ছে একথা যদি সত্যও হয় তা হলেও তার কোন কোন বক্তব্যে কর্মে নিশ্চয়ই এমন কিছু ইতিবাচক আছে যা লক্ষ লক্ষ লোককে টেনে আনছে। শুধু নেতিকে স্থান দিয়ে ইতিকে বাদ দিয়ে তাই সমরেশ সত্যের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক

বাস্তবতা রক্ষা করছেন না। সমাজের পক্ষে এবং সেইজন্যই সাহিত্যের পক্ষে সমরেশের বিকৃত উপন্যাস তাই সুনীলের বিকৃত উপন্যাসের চাইতে আরো বেশি ক্ষতিকারক; সুনীলের উপন্যাস যতো সহজে তরুণ পাঠক বুর্জোয়া বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, সমরেশের উপন্যাস তত সহজে পারেন না। যদিও সুনীল-সমরেশ একই গোত্রের। প্রেমের আর কামের আড়ালে সেই চিরন্তন রোম্যান্টিক বাঙালিমনের স্বপ্নের জগতে বাস করা, বাস্তবকে, বাস্তবের মূল প্রশ্নগুলোকে বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে ব্যাখ্যা করায় ব্যর্থতা, তাঁদের সাহিত্যকর্মকে পূর্ণ করে তুলতে পারছে না। যদিও অনস্বীকার্য, ঘটনাবিবরণে, চরিত্রসৃষ্টিতে, গল্পের আমেজ তৈরি করতে, ভাষার স্বাচ্ছন্দতায় দুজনেই জাত ঔপন্যাসিক। একটু সৎভাবে বিশ্লেষণ করে যদি তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজকে বুঝতে চেষ্টা করেন তাহলে তাঁদের সাহিত্য ব্যবসায়িক জনপ্রিয়তা বজায় রেখেও সাহিত্যমূল্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। সুনীলের প্রেমের আবহাওয়া অসত্য নয়, তা কিশোরকিশোরী মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সমরেশের কামের আবহাওয়াও অসত্য নয়, তা তিক্ত যুবকমনকে মোহাচ্ছন্ন করে। কিন্তু কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রেম এবং তার প্রাকৃত রূপ কাম ছাড়াও সমাজের জীবন আছে। এবং সেই জীবনেই আছে জীবনের মূল সঞ্চারক শক্তি।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

## স মা লো চ না

---

La Rifa. *By* Katia Saks. W. H. Allen. London. 21*s.*

গত কয়েক বছর ধ'রে নায়িকার আত্মকথন মারফত মহিলা ঔপন্যাসিকদের গল্প লেখার ফ্যাশান একদা ভিক্‌টোরিয়ান উপন্যাসে এই ঝোঁকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আজকালকার এই উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু কিন্তু "ভিক্‌টোরিয়ান" এই বিশেষণের বিপরীত বিন্দুতে, কেননা এগুলির প্রধান, অন্তত অন্যতম উপজীব্য নায়িকার নিজের ও অন্যদের দৈহিক প্রেমক্রিয়ার স্পষ্ট বর্ণনা। আলোচ্য উপন্যাসটিও (পেরুর এই লেখিকার পঞ্চম, ইংরেজী ভাষায় প্রথম) এই গোত্রের। এর বিবিধ উপকরণের মধ্যে আছে প্রধান বিষয় হিসেবে অবৈধ প্রণয়; খুঁটিনাটি দৈহিক বর্ণনার পেছনে বিভিন্ন যৌন মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া, যথা ধর্ষকাম, মর্ষকাম, সমকাম ইত্যাদি; আর আছে "আমি করছি", "আমি দেখছি" (ওইসব ক্রিয়াকলাপ) এই টেকনিক মারফত উত্তমপুরুষ ভঙ্গির বিষয়ানুগ ব্যবহার।

এটুকু বলেই সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার তর্ক তুলে সমকালীন হওয়া যেত। কিন্তু তা করতে চাই না, কারণ ওপরের বর্ণনা যদিও সত্য, লেখিকা নিতান্ত পর্নোগ্রাফি ছাড়াও অন্য গভীরতর অভিসন্ধি নিয়ে বইটি লিখেছেন, যদিও সে অভিসন্ধি কতদূর সার্থক, তা বিবেচ্য।

চারটি প্রধান চরিত্র। কথয়িত্রী ও নায়িকা লিলিয়ানা—অস্বাভাবিক পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বড় হবার পর তার প্রণয়ী জুলিয়ানকে বিয়ে করেছিল। বর্তমানে কিন্তু খোলাখুলিভাবেই জুলিয়ান মায়া নামে লিলিয়ানার এক তুতো বোনের প্রেমাসক্ত, এবং তাতে লিলিয়ানার কোনো আপত্তি নেই। লিলিয়ানা নিজে পাব্‌লো নামে এক ব্যক্তির শয্যাসঙ্গিনী। এই চারজন ও কয়েকটি ছোট চরিত্রকে নিয়ে (শূন্যতাময়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনযাপন করা তাদের প্রধান কাজ) টুকরো টুকরো কয়েকটি ঘটনার পর এক লটারির আসরে (La Rifa মানে লটারি) গল্পটির আকর্ষণ ঘনীভূত। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জীবনের কিছু-না-কিছু উৎসর্গ করে, যার সঙ্গে মিলিয়ে লটারির কাগজে নাম উঠবে, তার কাছে যাবে। লিলিয়ানা তার গর্ভস্থ সন্তানকে (কার সন্তান তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক তোলা হয়েছে) উৎসর্গ করে লটারির নির্দেশে স্বামী জুলিয়ানের কাছে গেল; লটারির আহ্বায়ক লীয়ান্দ্রো "আলিঙ্গনের মধ্যে অভিশাপ" উৎসর্গ করে মায়ার সঙ্গে মিলিত হ'ল। এর পরে, সমুদ্রে স্নান করার সময়ে মায়া মারা গেল—দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা তা জানা যায় না। অতএব, বলা যায়, নিয়তি হচ্ছে গল্পটির থীম্‌।

রূপকধর্মী গল্পটির বাঁধুনিতে কোনো প্লট নেই। লটারির দৃশ্যটি বাঁধুনির কেন্দ্রবিন্দু। এখানে যা কিছু ঘটছে, তা থেকে তিনটি চরিত্র প্রতীকীভাবে তাদের নির্ধারিত ভাগ্যে পৌঁছোচ্ছে। স্যাবাইনা নামে একটি মেয়ে, যে মধ্যবয়সী মহিলা কোকো'র সঙ্গে লেজবিয়ান সম্পর্কে জড়িত, তার কুমারীত্ব উৎসর্গ করে ইউয়ান লুই নামে এক যুবকের সঙ্গে মিলিত হ'ল—এতে তার অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক থেকে সুস্থ দৈহিক সম্বন্ধে মুক্তির দ্যোতনা। লিলিয়ানার লটারি স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ও তার সন্তানের যথার্থ

পিতৃত্বের ইঙ্গিত। এরই সঙ্গে তাল রেখে মায়ার লীয়াল্ড্রোর সঙ্গে জড়িত হওয়া তার জীবনের যথাযথ প্রতীক, কেননা তাকে আগাগোড়া দেখানো হয়েছে যেন এক অভিশপ্ত রহস্যময়ী নারী হিসেবে—তার মৃত্যু যেন এই অভিশাপেরই অমোঘ পরিণতি।

এই চতুরতা সত্ত্বেও, অন্যদিকে গল্পটির গাঁথুনি খুব আল্‌গা। পরস্পর এগারোটি অধ্যায়ে সাজানো ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো পরম্পরা বা প্রবাহ নেই। মনে হয়, এইভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে লেখিকা বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক—অনেকটা যেন লরেন্সীয় ভঙ্গিতে—ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যার ক্লাইম্যাক্স তিনি আনবেন লটারির দৃশ্যটিতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে টেকনিকটির যথাযথ পরিণতি হওয়া উচিত ছিল এই দৃশ্যটিতে সব ক'টি সম্পর্ককে একীভূত করা, যা না হওয়ার দরুন অনেকগুলি দৃশ্য—যেমন লিলিয়ানার সঙ্গে তার মা ও বাবার দৃশ্য দুটি—অবান্তর হয়ে গেছে (পুরোনো বনাম নতুন, ইলেকট্রা কম্‌প্লেক্স ইত্যাদির ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও।) আবার, বহু জায়গাতেই চরিত্রদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। লিলিয়ানা কেন তার স্বামীর অন্য নারীতে আসক্তি সম্বন্ধে নির্বিকার? মায়া কেন লীয়াল্ড্রোকে সহজভাবে গ্রহণ করলো? মাত্র তিনজনই বা কেন লটারিতে অংশগ্রহণ করলো? অপরিণত, অস্বচ্ছ প্ল্যান এর জন্যে দায়ী। তবে, হয়তো এক ধরনের মরমিয়াবাদ ও নিয়তিবাদের মিশ্রণ এর কতকগুলির কারণ হতে পারে, কিন্তু এই ঝোঁককে সুস্পষ্ট motive হিসেবে দেখানো হয় নি।

আত্মজীবনীমূলক কথন-আঙ্গিকের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের কথা গোড়াতেই বলেছি। এর দরুন আর একটা সুবিধা হয়েছে: গঠনে দার্ঢ্যের অভাবকে কথয়িত্রীর অতীত-স্মরণের স্বাধীনতার মধ্যে সহজে ঢাকা দেওয়া গেছে, যা প্রথম-পুরুষ কথনে অত সহজ হত না। তবে, এই ভঙ্গির একটা বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়: নায়িকার চিন্তাধারাকে অনেকটা যেন স্ট্রীম অব্‌ কনসাস্‌নেস্‌ ধরনে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে (থেকে থেকে I thought-গুলি লক্ষণীয়।) কিন্তু চেতনা-প্রবাহের ধরন অনুযায়ী তৎকালীন ক্রমপ্রবহমাণ বর্তমান চিন্তাধারাকে উপস্থাপিত না করে টুকরো টুকরো ছোট বড় আভ্যন্তরীণ স্বগতোক্তিকে মামুলী ধরনের আত্মকথনের মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়াতে খানিকটা স্ববিরোধিতা ও অসংলগ্নতা এসে গেছে, যার জন্য লেখিকার টেকনিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব দায়ী মনে হয়। তবে, এই আঙ্গিকের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে মনোজগতের ধারাকে অনুসরণ করে সময়ের প্রক্ষেপ ঘটানো, যেখানে লিলিয়ানার শৈশব ও অতীতকে তার থেকে থেকে পিছনে পিছ্‌লে যাওয়া মনের আন্দোলন অনুসরণ করে ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে মনোগ্রাহী বর্তমান ও অতীতের মন্তাজ। যেমন, তাদের এক মিলনের দৃশ্যে লিলিয়ানা পাব্‌লোকে বলছে 'Here? now?' দৃশ্যটির শেষে নতুন এক অনুচ্ছেদে তাদের প্রথম মিলনের ঘটনা দেখানো হচ্ছে, যেখানে লিলিয়ানা আবার (আসলে অনেক দিন আগে) 'Here? now?' বলছে। শব্দ দুটির পুনরাবৃত্তি অতীত ও বর্তমানের দুটি সদৃশ ঘটনাকে মন্তাজ করছে।

বইটির সবচাইতে আকর্ষণীয় গুণ তার কাব্যিক লক্ষণ। বর্ণনা-প্রধান বই; তার ঘটনা ও চিন্তা দুয়েরই বর্ণনাই—আগাগোড়া গীতি-কবিতাসুলভ বাক্‌প্রতিমা ও চিত্রবহুল। দু-একটি উদাহরণ দিই।

খুব চমকপ্রদ না হয়েও স্বকীয় ও কল্পনাপ্রবণ কয়েকটি ইমেজ:

(১) ...she found herself hurrying toward the echo that filled the

silence like a fantasy tango.

(২) ...the vast silent acquiscence of the sky.

(৩) ...my eyes sought the silver blotch of the skylight above my head. I thought, It's like emerging from the womb.

দু'টি ইম্প্রেশনিস্টিক্ ঢঙের ছবি-মাফিক বর্ণনা :

(১) Purple flashes quivering in the darkness. The sweet melancholy of a guitar. Midnight. The faint scent of mimosa.

(২) Dusk. A taste of fog in the air. Tall, swaying poplars. The shadows of seabirds. Mists. Fireflies.

কতকগুলি পুনরাবৃত্ত শব্দ ও প্রতিমা প্রতীকের প্রকৃতি ধারণ করে বইটির ভাবকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে, যেমন 'ফুল' ('সৌন্দর্য' এই অর্থে) ও 'ধুলো' ('মৃত্যু' এই ক্রিশ্চান অর্থে; 'violets and dust', 'geraniums and dust', এইভাবে সংযুক্ত অথবা একক, বিচ্ছিন্নভাবে আবৃত্ত। লক্ষণীয় যে, মায়া—যার মৃত্যুতে বইটির সমাপ্তি—আগাগোড়া ফুলকে অসাধারণ ভালোবাসে।

তবে, যত সুন্দর হোক, এই কাব্যিক লক্ষণের পিছনে কোনো গভীর আবেগ অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনা নেই, বরং আছে হাল্কা অপরিণত মনের ভাবপ্রবণতা। তা দেখা যায় sweet, imponderable, এই ধরনের মামুলী, ধোঁয়াটে বিশেষণের ছড়াছড়িতে। এই জন্যেই কাব্যিক বর্ণনাগুলি প্রায়ই শুধু লেখার জন্যে লেখাতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। যেমন, লীয়ান্ড্রোর অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে লটারির ঘোষণা করা (লেখিকা লীয়ান্ড্রোর সঙ্গে এখানে সহানুভূতিশীল)—

A game of self-abandonment...in which we shall cease to be ourselves; we shall renounce our tastes, our wills, and engage in a contest of chance. A game in which we shall risk our freedom.

সাধারণ লটারির জন্যে এত আড়ম্বরপূর্ণ ভাবাবেগের প্রয়োজন ছিল না।

অথবা, সুন্দর কিন্তু ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বর্ণনা:

Lima. The thrice-crowned city. Gold. incense, and myrrh. Lima. The city of kings. The city of geraniums and dust.

ক্রিশ্চান অনুষঙ্গগুলি, এবং ভাবের দিক দিয়ে মৃত্যু ও জাঁকজমক ও শব্দমূল্যের দিক দিয়ে শেষ দুটি বাক্যের সহ-উপস্থাপন উপভোগ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু সব মিলিয়ে শহরটিকে এভাবে কেন ইমেজের দাম দেওয়া হচ্ছে, কাহিনী থেকে তা বোঝা যায় না।

অতএব, চতুরতা ও গভীরতার প্রয়াস সত্ত্বেও বইটি গোটা শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায় নি। কিছু মনস্তত্ত্ব, কিছু দার্শনিকতা, কিছু বা সমাজতত্ত্ব, কিছু আধুনিক উপন্যাসের আঙ্গিক, কিছু বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, সব মিলিয়ে লেখিকা একটা কিছু খাড়া করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঝোঁক ঠিক করতে না পারায় ও এগুলির ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকায় এলোমেলো হয়ে গেছে: যৌন আবেদনটুকুই প্রবলতম হয়ে গেছে। নীতির দিক দিয়ে নয়, লেখিকার উদ্দেশ্য সফল হয় নি বলেই আপত্তি।

অমিতাভ সিংহ

**রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি**—অবন্তীকুমার সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা গদ্যরীতির সামগ্রিক বিকাশের বিষয়ে আলোচনাকালে অবশ্যই যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথেরই গদ্যরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ সহসা মনে পড়ছে না। শ্রীঅবন্তী সান্যালের গ্রন্থখানি প্রথমত এ কারণেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য প্রধানত যে কারণে বইখানি আমাদের চিন্তাকে চঞ্চল করে তা হল লেখকের বিশ্লেষণরীতি এবং কোনো কোনো সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা ঐকমত্য অনুভব করি। বক্তব্য শীর্ষক ভূমিকায় লেখক বলছেন : 'ভাষার রীতির রূপ পরিবর্তন যে কখনোই লেখকের খেয়াল-খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত—এইটি মনে রেখে তাঁর গদ্যরীতির রূপ-পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং চরম পরিণতির গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি।' ভাষারীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ শুধু প্রারম্ভিক অনুমানই নয়, আলোচকের নির্ভুল লক্ষ্যের নিশানাও বটে। লেখক আরো বলেছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির অন্তরঙ্গ রূপটিরই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। সে বিশ্লেষণরীতি কতখানি ফলবাহী তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সংক্ষিপ্ত প্রথম পর্ব এবং বিস্তৃততর আর তিনটি পর্বে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পরিবর্তনপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে চলতি গদ্য ও সাধুগদ্যের সমান্তরাল ধারা এবং পারস্পরিক প্রভাবের রহস্যটি লেখক বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং বলতে কি বইটির একমাত্র স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এইখানেই। 'নাটকের গদ্য', 'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি', 'অলংকরণ' এবং 'স্টাইল' এই কটি প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ছোটগল্পে, উপন্যাসে, জীবনস্মৃতিতে, আত্মকথায়, প্রবন্ধে, রচনায়, নাটকের পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষায় কবি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন, অবন্তী সান্যাল সেই সকল ক্ষেত্র থেকেই তাঁর বক্তব্যের সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, পঞ্চভূত, জীবনস্মৃতি এবং তার পরের রচনাসম্ভার—এই চারটি স্তরের দিকে সমালোচক তাঁর দৃষ্টি সজাগ রেখেছেন। এই স্তর-পরম্পরার অন্তর্গত রহস্য এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও তিনি অবহিত।

স্টাইল বা রীতি অথবা গদ্যরীতি আলোচনায় রচনার বহিরঙ্গ-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্বরূপ বিচারও আবশ্যিক। কেননা রীতির আলোচনা গভীরতা পেতে গেলেই তাকে হতে হবে ভাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। রীতিবিচার বিচ্ছিন্নভাবে শুধু রীতিরই বিচার নয়। শ্রীযুক্ত সান্যাল গদ্যের রূপকলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের বিপুল বিকাশের রহস্য অনেক সময় পাঠককে অভিভূত করে—রসগ্রাহী আলোচক সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থে অনভিভূত চিত্তে রাবীন্দ্রিক গদ্যশৈলীর গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের গতিশীলতা, সে জীবনের আক্ষেপ, আকুঞ্চন প্রসারণ, টেন্‌শন কবির গদ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে এনেছে কোন্ চাল, দিয়েছে কী বর্ণ, ফেলেছে কিসের ছায়া, তা অবন্তীকুমারের আলোচনায় আরো স্থান পেলে বুঝি পাঠক আরো তৃপ্তি পেত। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমারের কাছ থেকে আমরা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের লেখক রবীন্দ্রনাথের মনোলোকের যে পরিচয় পাই য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের জোরালো তীক্ষ্ম গদ্যের অসি-কল্প ঔজ্জ্বল্যের ব্যাখ্যায় কি সে-পরিচয়ের সাহায্য গ্রহণীয় নয়? অসহিষ্ণুতা এবং সমবেদনা, ঔদ্ধত্য এবং বিস্ময় সে-

দিনের সেই অসামান্য সদ্যতরুণের মনে যে আলোড়ন তুলেছিল তার প্রসঙ্গেই য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের গদ্য-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে। ঠিক সমপরিমাণেই সবুজপত্রের পরবর্তী গদ্যে ধরা পড়েছে আর এক গতিবেগ—যা শুধু চঞ্চলতা নয়, অসহিষ্ণুতাও নয়; বরঞ্চ যে গতিবেগকে বলা যায় তখনকার উপনিবেশ-জীবনের নানা জাড্য থেকে মুক্তিপিপাসাসম্ভূত গতিবেগ। অথচ রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতার আর এক প্রমাণ মাত্র নয়। একটা কিছু হয়েও আর একটা কিছু হয়ে ওঠা নয়। এ তাঁর জীবনব্যাপী অন্বেষার অভিব্যক্তি। শ্রীসান্যাল রবি-জীবনী প্রেক্ষাপটে রাবীন্দ্রিক গদ্যের তাৎপর্য অন্বেষণ করেন নি। আবার আর একদিক থেকেও বলা যায় গদ্যেও, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর গদ্যে বিষয় এবং রূপ পরস্পরকে আলোকিত করে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর অপূর্ণতার দিকে অব্যর্থ অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, ঠিকভাবেই তার প্রতিতুলনা আনেন "চতুরঙ্গ" উপন্যাসের সাধু-গদ্যের ক্ষিপ্রতা থেকে। কিন্তু এ আলোচনায় "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের মূল শৈল্পিক সমস্যার অবতারণা না করলে উপন্যাসটির ভাষাগত দুর্বলতা কেন শেষপর্যন্ত ঘোচেনি তা অব্যাখ্যাত থেকে যায়। চতুরঙ্গে সংলাপের ক্ষেত্রেও লৈখিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হল কেন সে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর চতুরঙ্গের মূল বিষয়ভাবনার মধ্যে নিহিত। চতুরঙ্গের কাহিনী-অংশে রয়েছে এক দ্রুত-বেগ, বর্ণাংশে রয়েছে কাব্যের স্পন্দন—পাত্রপাত্রীর সংলাপে রয়েছে জীবনের দীর্ঘবিলম্বিত লয়ের প্রতিধ্বনি, কালের যে মন্থর ছন্দ নিয়ত আমাদের ক্লান্ত করে, নিরাসক্ত করে, সংলাপের ভাষায় রয়েছে তারই নিদর্শন। এভাবে আলোচনা হলেই একথার সার্থকতা বোঝা যায় যে style is an aspect of meaning।

লেখকের আলোচনার আর একটি অসঙ্গতি হল অসতর্ক উক্তির দিকে ঝোঁক। রবীন্দ্র-নাথ নিজেই বলেছেন যে হেম-নবীন তাঁর উঠতি-কালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ভুলেছিলেন। অথচ অবন্তীকুমার বলছেন, 'হেমচন্দ্রের কাব্যভাষা ও ছন্দ তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল।' এ যদি প্রমাণিত কথা হয়, তাহলেও, এ জাতীয় গ্রন্থে তা নতুন করে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। লেখক বলেন, 'বিষয়বস্তুর মতোই গোরার ভাষা ওজস্বী ও মহীয়ান।' সে তো সামান্য কথা, কেননা, গোরা উপন্যাসের ভাষা রবীন্দ্রনাথের গোরা-কল্পনারই প্রকাশ। সমালোচকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা তিনি ভাব ও রূপের এই অন্বয়টি বিশ্লেষণ করে দেখাবেন। গোরা-র ভাষায়, তার চরিত্র-পাত্রদের সংলাপে কোন্ social milieu ব্যঞ্জিত হচ্ছে তা যেমন অনুধাবনীয়, তেমনি বিবেচ্য কেন পাত্রপাত্রীদের অনেকেরই বাগ্‌ভঙ্গিতে স্বরবৈচিত্র্যের তিন গ্রাম ধ্বনিত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে আলোচনা না এগুলে রীতি-আলোচনা Saussureএর মতো নৈর্ব্যক্তিকতায় সুদূর হয়ে পড়ে। Bally সে ক্ষেত্রে খুঁজেছেন এই নৈর্ব্যক্তিতা কেমন করে প্রাণময় ব্যক্তিগত উচ্চারণে রূপান্তরিত হয়। এই মহা-দেশিক পদ্ধতির সঙ্গে রিচার্ডের বীক্ষণ-রীতির যোগসাজসে একজন রীতিতাত্ত্বিক রীতির গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠি পেয়ে যান। দুঃখের বিষয় বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রূপরীতি ভঙ্গি এবং চাল সে পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়নি। বিশ্লেষণ যে গভীরতায় পৌঁছলে লেখক আমাদের দেখাতে পারতেন কেমন করে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসৃষ্টির প্রথমার্ধ ছিল এক ঋষিকল্প ভাষণী ভঙ্গির দ্বারা অধিকৃত, বোঝাতে পারতেন কেন কার্লাইল, নিউম্যান অথবা আর্নল্ডের মতো এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ তখনকার পট-পরিবেশে মানুষের সমগ্রতার সমস্যায় বেশি ভাবিত ছিলেন, মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক ভাবে চিন্তিত ছিলেন; তাহলেই লেখক দেখাতে পারতেন যে কেমন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যসৃষ্টির দ্বিতীয়ার্ধে আরো বেশি জটিলতার

অন্তর্বর্তী হয়ে আরো বেশি লজিক্যাল ফর্মুলেশনের জন্য চেষ্টিত হলেন। এভাবে দেখালে এবং বোঝালে শুধু যে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হত তাই নয়, তাৎপর্য পেত গ্রন্থের সর্বশেষ অথচ সর্বাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ 'স্টাইল'। হয়তো একদিন অবন্তীবাবু এই শেষতম পরিচ্ছেদের আরো গভীর এবং আরো বিস্তারিত এক চিন্তোদ্দীপক আধুনিক আলোচনা পাঠকসমাজে হাজির করবেন।

**সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**রাজার বাড়ি অনেক দূরে**—দিব্যেন্দু পালিত। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

দিব্যেন্দু পালিত প্রধানত গদ্যলেখক, তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রধান ফসল গল্প এবং উপন্যাস। কিন্তু তিনি যে কবিতাও লেখেন একথা বাংলাসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকের কাছে অবিদিত নয়। 'কবিতাও লেখেন' একথার তাৎপর্য এই যে কবিতাকে তিনি আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করেন না, যেমন কবিরা করেন। অথচ আত্মপ্রকাশের জন্য যে কবিতাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তাও মনে হয় না। মনে হতে পারে, গল্প উপন্যাসে হয়তো তিনি সম্পূর্ণ নন, তাই কবিতার হাত পেতে আবার তাদের ধরতে হয়েছে।

"রাজার বাড়ি অনেক দূরে" দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। মূলত গদ্যলেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও সংকলিত কবিতায় দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না। দিব্যেন্দুবাবু কবিতার গঠনশৈলী সম্বন্ধেও সজাগ। তাছাড়া তিনি অন্তত রীতির দিক থেকে আধুনিক। "রাজার বাড়ি অনেক দূরে"-র অনেক কবিতাই বেশ তীব্র, কোন কোন কবিতা শ্লেষযুক্ত। অবশ্য শ্লেষ এমন তীক্ষ্ণধার নয় যে পাঠককে অনিবার্যভাবে বিদ্ধ করবে, কিন্তু তার তীব্রতা নজর এড়াবার নয়। যেমন:

'তা হলে কি বেঁচে যাবো অনায়াসে, প্রজ্ঞার কৌশলে
এক মুখ ব্রণ নিয়ে; পিত্ত, অম্ল, রক্তে আরো সুখ!' (দিনযাপন: আগস্ট, ১৯৬১)

যদিও দিব্যেন্দুবাবু নিষ্ঠাবান কবি কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনই হবার নয়, বিশেষত তাঁর সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র যখন গল্প-উপন্যাস, কিন্তু তিনি যে একজন আধুনিকমনা কবি একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এ বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ '৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবারে' কবিতাটি থেকে দুটি স্তবক উদ্ধৃত করছি:

'তরল কান্নার সিঁড়ি
স্ক্রুরের মতন ঘুরে ঘুরে
কেঁপে উঠল জলপ্রপাত
৪ঠা জুন বৃহস্পতিবারে।'

এবং

'বালবের অন্ধকার হঠাৎ পিচ্ছিল হ'য়ে আমার বুকের
সমস্ত মোচড় দিয়ে অ্যালার্ম ঘড়ির মতো

বেজে ওঠে ভীষণ চীৎকারে
৪ঠা জুন বৃহস্পতিবারে।'

দ্বিতীয় স্তবকটি কবিতার সর্বশেষ পাদে অবস্থিত বলে সমস্ত কবিতাটি যেন ভীষণভাবে চীৎকার করে উঠেছে।

দিব্যেন্দু পালিত যদি কবিতা লেখা বন্ধ করে না দেন তাহলে আশা করা যায় গল্প-উপন্যাস লেখকের ভিন্নতর অনুধাবন, ভিন্নতর পর্যবেক্ষণ তাঁর কবিতায় নতুন স্বাদের সঞ্চার করবে; তাছাড়া বর্তমান গ্রন্থের কোন কোন কবিতায় যে শব্দের ভার. চোখে পড়ে তাও অপসারিত হয়ে স্বচ্ছতা দেখা দেবে।

মৃগাঙ্ক রায়

**রাজেন্দ্রলাল মিত্র**—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য ৩৲ টাকা।
**রমেশচন্দ্র দত্ত**—ডঃ সুনীল সেন। সারস্বত লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬। মূল্য ৩৲ টাকা।

Institute of Historical Studies-এর ডিরেক্টর ডক্টর শিবপদ সেন মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে উভয় লেখক শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় পাঠচক্রের (library workshop?) যোগদান করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল Historians and Historiography in Modern India। এই পাঠচক্রে ইংরেজি ভাষায় এঁরা দুজনে যথাক্রমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ দুটির মধ্যে প্রথমটি যে বাংলায় অনূদিত হয়ে 'সারস্বত' পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৫) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল বইটির ভূমিকা থেকে তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়টিতে লেখক পঠিত প্রবন্ধের উপর 'কয়েকটি নতুন বিষয় যোগ' করেছেন এবং বাংলায় প্রকাশ করেছেন। বই দুটির পত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৩৯ ও ৪২। মলাটের স্কেচ দুখানি ভালো।

শিশিরকুমার মিত্রের "রাজেন্দ্রলাল মিত্র" (১৮২২-১৮৯১) নামের পুস্তিকাটিতে রাজেন্দ্রলালের Historiography-র বিশেষ রূপটি ধরা পড়েনি। বহু মুদ্রাকরপ্রমাদ, তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল। চোখে পড়ল reference-হীন তথ্যসংগ্রহ। সবচেয়ে যা পীড়িত করল বেশি, কোনো গ্রন্থকারই কোথাও ভুলেও একবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেন নি।

প্রথমেই যে তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ল তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি:

পৃষ্ঠা—১　Nathaniel Halhead—নয়—Nathaniel Brassey Halhead।
পৃষ্ঠা—২　অনঢ়—নয়—অনড়।
পৃষ্ঠা—৩　আকাঙ্খা—নয়—আকাঙ্ক্ষা।
পৃষ্ঠা—৩　শ্রীজন্মেজয় মিত্র—নয়—জনমেজয় মিত্র।
পৃষ্ঠা—৪　আরম্ব—নয়—আরম্ভ।
পৃষ্ঠা—৫　'তৎকালীন জমিদার পুত্রদের শিক্ষার জন্য'—নয়—৮ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক নাবালক জমিদার পুত্রদের জন্য।
পৃষ্ঠা—৫　Wards Institution-এ ১৮৫৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে—নয়—১৮৫৬ সালে,

মার্চ মাসে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে রাজেন্দ্রলাল......।

সমালোচকের কর্তব্য হিসেবে আরো কিছু তথ্যগত ত্রুটি দেখাতেই হবে যদিচ গ্রন্থপঞ্জী বিন্যাসের রীতি প্রশংসনীয়:

পৃষ্ঠা—৩১ (সম্পাদিত গ্রন্থপঞ্জী)

5. Notices of Sanskrit Manuscripts (First Series) 9 vols. 1870-88—নয়—(1871-88)।

পৃষ্ঠা—৩১ (সম্পাদিত গ্রন্থাবলী)

2. Chainaya Candrodaya Nataka by Kavi Karnapura 1853 —নয়—1854, May 18।

পৃষ্ঠা—৩২ 5. Agni Purana 1873-74—নয়—(1873-78) তিন ভল্যুমে বার হয়।

পৃষ্ঠা—৩২ 6. Taittiriya Aranyaka 1871—নয়—1872 হবে।

পৃষ্ঠা—৩২ 7. Taittiriya Pratisakhya of Krishna Yajurveda 1871—নয় —1872 হবে।

(বাংলা গ্রন্থসমূহ)

3. শিবাজীর চরিত্র—নয়—শিবজীর চরিত্র, অর্থাৎ যবনপ্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবনবৃত্তান্ত।

সমালোচনা দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হচ্ছে দেখে আমি এখানে থামলাম। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন।

রমেশচন্দ্রের লেখক ডক্টর সুনীল সেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার। তিনি তাঁর গ্রন্থরচনায় আরও একটু অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, আমাদের দেশে ছাপার অক্ষরে কিছু মুদ্রিত হলেই তা অথরিটি হয়ে যায়। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সেদিক থেকে বড়ো কঠোর। তাই সুনীলবাবুর বইটি পড়ে বেদনা বোধ করেছি।

তাঁর বইটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছেন:

"মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত, রমেশ দত্ত এই পরিবারের [ রামবাগান দত্ত পরিবার—সমালোচক ] গৌরব।"

সত্যিই কি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) এই পরিবারের গৌরব? যশোরের কপোতাক্ষ নদতীরের দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনকে টেনে এনে রামবাগানের দলে বসানো তাঁর কাছে অভিনব ঐতিহাসিক আবিষ্কার বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু এই অতি-পরিচিত তথ্য শিশুতেও জানে। তরু দত্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন মধুসূদন দত্ত তাঁদের পরিবারের কেউ নন। রামবাগানের দত্তবংশে মধুসূদন নামে কেউ ছিলেন না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন নীলমণি দত্ত (রামবাগান দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা) ইংরেজ-(?) নবীশ হিসাবে নাম করেছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর আত্মকথায় নীলমণি দত্তকে 'well known to many prominent Englishmen of the day' বলেছেন—এর দ্বারা ঠিক 'ইংরেজনবীশ!' বোঝায় কিনা জানি না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আরো আছে:

'নীলমণির বড় ছেলে রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন'। —এ তথ্যই বা তাঁকে কে দিল? রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৪১

সালে ১৭ এপ্রিল মাসিক একশো টাকা বেতনে স্থায়িভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫১ সালের ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। তার পরের পংক্তিতে পাচ্ছি:

'নীলমণির দৌহিত্র ঈশানচন্দ্র প্রথম যুগের ডেপুটি কালেক্টর'।

ঈশানচন্দ্র নীলমণির দৌহিত্র নন, পৌত্র।
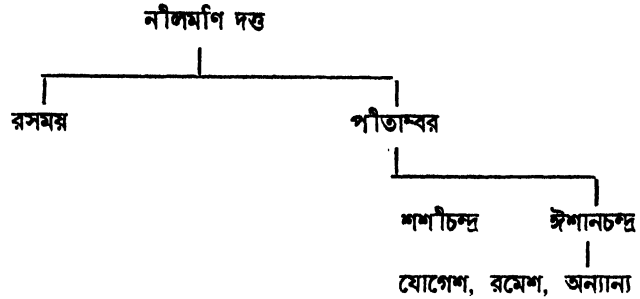
—সুনীলবাবু এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করলেন না কেন, জানা গেল না। বইটির একটি বড়ো ত্রুটি, "সে যুগে" "ইতিপূর্বে" "তখন" শব্দের অতিপ্রয়োগ। ইতিবৃত্তমূলক রচনায় আমরা প্রামাণিক ও পরীক্ষিত সন-তারিখ চাই, ইতিবৃত্ত-রচয়িতার কর্তব্য সেগুলি ঠিক-ঠিক বসিয়ে দেওয়া। সুনীলবাবুর এই রীতি রক্ষা করা দরকার ছিল। তিনি রমেশচন্দ্রের রচিত *The Peasants of Bengal* (1874) সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যা লালবিহারী দে সম্পাদিত *Bengal Magazine*-এ প্রকাশিত, সেই 'An Apology for Pubna Rioteers'-এর উল্লেখ করেন নি। (পৃঃ ৫)

সুনীলবাবু লিখেছেন 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের লেকচারার নিযুক্ত হয়ে রমেশচন্দ্র গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।' অথচ আমরা দেখছি তিনি তাঁর কন্যা বিমলাকে লিখেছেন—

> "You will be glad to learn that the London University College has created a chair in Indian History and has appointed me to that chair." (রমেশচন্দ্র দত্ত—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯)

সুনীল সেন অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছাত্র—তিনি বার্কের নির্গম তত্ত্ব (drain theory), রমেশচন্দ্রের পর তার প্রভাব প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্বভারতী পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর ভবতোষ দত্তের 'রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস' প্রবন্ধটির কোনো উল্লেখ করেন নি। এই সূত্রে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক বি. এন্. গাঙ্গুলির *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory* বইখানির উল্লেখ থাকলে ভালো হত।

গ্রন্থশেষে যে জীবনীপঞ্জী দিয়েছেন তার কোথাও উল্লেখ নেই যে রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন। থাকলে ক্ষতি ছিল না। গ্রন্থপঞ্জী অংশে ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত তালিকার সঙ্গে তাঁর কিছু অমিল দেখা যায়। এ অমিল যোগেশচন্দ্র বাগল প্রদত্ত তালিকার সঙ্গেও—এগুলির উল্লেখ করে দিলাম।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. ইতিহাস

পৃঃ ৪১—England and India (1786-1885), London, 1887
ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশবাবু লিখেছেন—1897

খ. অর্থনৈতিক ইতিহাস

পৃঃ ৪১—The Economic History of India in the Victorian Age, 1837-1900, London, 1904
ব্রজেন্দ্রবাবু ও যোগেশবাবুর মতে পাণ্ডুলিপিতে আসল নাম ছিল—India in the Victorian age—An Economic History of the People (1837-1900).

ইতিহাসের বই বলেই এত কথা লিখতে হল।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

**সারেং বৌ**—শহীদুল্লা কায়সার। নওরোজ কিতাবিস্তান। ঢাকা। মূল্য ৩·৭৫ পয়সা।

মাঝে মধ্যে পূর্ব-বাংলার শিল্পসাহিত্যের কোন প্রয়াস যখন হঠাৎ হাতে এসে যায় তখন নিজেকে রীতিমত ভাগ্যবান মনেই করি। সম্প্রতি শহীদুল্লা কায়সারের "সারেং বৌ" উপন্যাসখানি আমার হাতে এসেছে।

"সারেং বৌ" উপন্যাসের সূচনায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক সংকেতে কিছুটা আলোকপাত করেছেন—'...বঙ্গভূমির পূর্বউপকূলে যাদের জন্ম, পৃথিবী যাদের দেশ, সমুদ্র যাদের অন্ন,...কণ্ঠে যাদের সাগরকল্লোল,—ঝড় ওদের ঘর ভাঙে, দরিয়ার বান ভাসিয়ে নেয় ওদের সবকিছু, তবু সাগরের ডাকে মন ওদের আনচান, কেননা ধমনীতে ওদের সেই নির্ভীক আদি-নাবিকের রক্ত'—সমুদ্রমেখলা পূর্ববঙ্গের নিম্ন অঞ্চলের দ্বীপবাসিত মানুষের শোক-জীবন এবং তাদের সংগ্রামের আলেখ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে "সারেং বৌ"-কে। উপন্যাসের শেষে ঝটিকা এবং বন্যায় উপদ্রুত এইসব দ্বীপবাসিত মানুষের দুর্দশার যে দীর্ঘ-বিস্তারী চিত্র লেখক এঁকেছেন—তা-ও পাঠকের কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ। উপন্যাসের বিষয় সংক্ষিপ্ত, কাহিনী-অংশ সামান্য, চরিত্রের সংখ্যাও অল্প। থইথই নদী আর 'সাগরের পানিতে ঘেরা' এক ভূখণ্ডে উপন্যাসের মূল পটভূমি কেন্দ্রিত। এই জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম বামুনছাড়ি। তার চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে আরো কিছু ভূখণ্ড—কদুরখিল, পিয়ালগাছা, মাদারটেক। এদের সমষ্টি-জীবনের আদানপ্রদান ও সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এক প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত জনপরিবেশ। 'সমুদ্র ওদের জীবিকা, সমুদ্র ওদের জীবনের গান'—এই সূত্রেই এই জনসমষ্টির এক বৃহদংশ পরম্পরাক্রমে নাবিক সারেঙ। এমন এক সারেঙ-এর জীবনকাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসের নায়ক বামুনছাড়ি গ্রামের কদম, যে সারেঙ-এর কাজ নিয়ে জাহাজে দূরসমুদ্রে পাড়ি দেয়। ঘরে আছে তার বৌ নবিতুন আর মেয়ে আকৃতি। অনিশ্চিত নাবিক-জীবন। কদম মারামারির এক চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে বিদেশের জেলখানায় দিন কাটায়। নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে না আসায় অপেক্ষাক্রান্ত নবিতুন

নাবালিকা আক্কিকে নিয়ে দুঃসহ দারিদ্র্যে চারপাশের নিষ্ঠুরতা এবং লোলুপতার ভেতর কায়ক্লেশে বেঁচে থাকার সংগ্রামে মরণপণ করে। কদম ফিরে আসে বহুদিন পড়ে। তার ফিরে যাবার আগে আসে বন্যা। নিষ্ঠুর নদীসমুদ্রের চক্রান্তে ভূখণ্ড ভেসে যায়। তবু, শেষ পর্যন্ত পরিকীর্ণ মৃত্যু আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দুটি জীবনের পুনর্মিলন ঘটে। এবং প্রমাণিত হয় শতবিপদেও জীবন অবিনাশী। লেখক তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন। যে কারণে কাহিনী সংক্ষিপ্ত বিস্তারের মধ্যে সার্থক পরিমিতি পায়। দূরসমুদ্র এবং দ্বীপবাসিত জীবনের টানাপোড়নে কাহিনী সর্বত্র সচল এবং বেগবান। তাই পাঠকের মনোযোগ কখনো শিথিল হয় না। তবে কদমের সমুদ্র-জীবনের চেয়ে নবিতুনের গৃহলগ্ন জীবনসংগ্রাম এবং লাঞ্ছনার ছবি দীর্ঘায়ত এবং অধিকতর জীবন্ত হয়ে ওঠায় "সারেং বৌ" নামকরণটি তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে।

বিষয়বিন্যাসে ও চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে লেখক মাঝে মাঝে নাটকীয়তার সাহায্য নিয়েছেন। উপন্যাসে নাটকীয়তার অনুপ্রবেশ কতদূর পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অসহায় নবিতুনকে বিপথগামিনী করার ব্যাপারে কুটনী সগির মার প্ররোচনা এবং এক সম্পন্ন লম্পটের নবিতুনের প্রতি লোলুপতা, কদমের পাঠানো মনি অর্ডারের টাকা রহস্য-জনক কারণে নবিতুনের হাতে না পেঁছুনো, বিদেশের জেলে কদমের লাঞ্ছনা, ইত্যাদি টুকরো টুকরো ঘটনা এবং চরিত্রের কার্যকলাপ সর্বদা উপন্যাসের সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে থাকেনি। আসলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আবেগভূয়িষ্ঠ হওয়ায় উপন্যাসে যে নিরপেক্ষতা সাধারণভাবে আকাঙ্ক্ষিত তা কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এ উপন্যাসের মুখ্য গুণ কাহিনীবয়নে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে নায়িক-নায়িকার চরিত্রের রূপারোপে। স্বামিসান্নিধ্যবিরহিত এবং দারিদ্র্যলাঞ্ছিতা নবিতুন বাস্তবের ধূলি-মলিনতায় সর্বদা জীবন্ত। গৃহকাতর সারেঙ কদমের জীবনতৃষ্ণা এবং সমুদ্রজীবনের বিষণ্ণতা লেখক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর বিশেষ করে গ্রামজীবনের চিত্রায়নে লেখক নিপুণ। বামুনগাছির গ্রাম্যজীবন, সন্নতপ্রকৃতি, মাটি আর মানুষের উষ্ণতা লেখকের তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয়বাহী। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে "সারেং বৌ" নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এ উপন্যাস পশ্চিম বাংলার পাঠককে যে কারণে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করবে,—তা হ'ল মাটি ও মানুষের প্রতি,—এককথায় দেশভূমির প্রতি লেখকের তীব্র মমতা।

**প্রসন্ন সেন**

**দূরের কলাবতী**—সমীর দাশগুপ্ত। কবয়ঃ। কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

একেবারে হাল আমলের কবিরাও অর্ধচেতন বা অচেতন ভাবে বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। তবু উল্লেখ করতে হল এ কারণে যে, পূর্বোক্তদের পঠন, মনস্কতা ও সততা নিয়ে কোনো কোনো মহলে প্রশ্ন উঠেছে—এবং যা অবান্তর নয়। 'মৌলিকতা' শব্দটি অনেক পরের কথা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ "দূরের কলাবতী" কোনো অর্ধশিক্ষিত মেজাজের কবির লেখা নয়।

এই গ্রন্থের ইষ্ট বোধহয় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সমীর দাশগুপ্ত উচ্চকণ্ঠ নন। প্যাঁচ প্রভৃতিও তাঁর কবিতায় কম। তিনি বয়স্ক। বেশ সহজভাবেই লিখতে পারেন তিনি,

(১) কথাটা হয়তো খুবই সামান্য
মনে না-পড়লে কারো ক্ষতিই বাড়বে না
তবু মনে না-পড়ার অস্বস্তি তো আছে (গল্পই নয় মোটে)

(২) এই শাদা দুপুরের মুখের উপর
দুটো বিরাট কালো চোখ এ'কে দিতে পারলে
আমার ঘুম আসত। (মা)

ঘর-গেরস্থালি-মায়া-মমতার টান সমীর দাশগুপ্তর কবিতায় খুব বেশি। বার বার ক'রে এ-সবই তাঁকে স্বস্তিকর পরিবেশে নিয়ে আসে। ছেড়ে আসা পূর্ব বাঙলা নিয়ে বেশ কিছু কবিতা, কাব্যাংশ আছে। তবে, খুব কিছু নতুন ভাবে সে দুঃখকে তিনি ফোটাতে পারেন নি। তা ছাড়া অতিক্রান্ত শৈশবের স্মৃতিচারণ সব সময়ই কবি-ধরা ফাঁদ। সবাই এতে পা দেন, পা দিতে ভালোবাসেন। সমীর দাশগুপ্ত-ও ব্যতিক্রম নন। তাঁর এ-জাতীয় কবিতাবলীতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতার কেমন একটা টান এসে পড়েছে, ফলে কিছুটা অগোছালো, শ্লথ, ছাড়াছাড়া বাক্যবিন্যাসের বাহুল্য দেখা দেয়।

"দূরের কলাবতী"-র মুক্তি তা হলে কোথায়? প্রথমত ঐতিহ্যের আত্মীকরণে। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতার রূপায়ণে। এবং সর্বপ্রধানভাবে, আন্তরিক ও সতেজ কিছু কবিতা রচনায়। সমীর দাশগুপ্ত আন্তর্জাতিকতাকে আত্মস্থ করে অঞ্চলবর্তী হতে চেয়েছেন। পারা না পারা অন্য কথা। এই প্রয়াস খুব কম কিছু নয়।

মন্তব্যের যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা যায়—

মগ্ন আনীল লুই আর্মস্ট্রং গানে
মিয়াকি মল্লার বুঝি বৃষ্টিঝড় তোলে,
প্রাচীন বাতাস চলে
কার মন উপবনে
দীর্ঘ অভিসারে
বরিশাল ঘাট থেকে নিউ অর্লিন্স কৃষ্ণনগরে? (জন্মদিনে)

মার্জিত কবিভাষা তৈরিতে সমীর দাশগুপ্ত যে পরিমাণে সফল হয়েছেন, তা লক্ষণীয়। আশা করি, পরবর্তী পর্যায়ে শৌখিন ভ্রাম্যমাণ মেজাজ থেকে তিনি আর একটু মুক্ত হবেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বর্ষ ৩২ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭

# জনৈক ইম্‌মর‍্যালিস্টের চিঠি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

...তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হওয়ার যে কারণগুলি আছে তার মধ্যে সব চাইতে বড়টি হয়তো এই যে আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। এ-কথা হয়তো সত্যি নয় যে আমি এখনই স্থবির যখন না লিখলেও চলে, বরং এখন আরও উৎসাহ সহকারে লিখতে ইচ্ছা রাখি, কিন্তু উৎসাহের চালটা যেন বদলে যাচ্ছে। এখানে একটা গল্প মনে পড়ছে : একজন সম্পাদক আমাকে না-জানিয়েই তাঁর পত্রিকায় প্রথম সংখ্যাতেই আমার গল্প থাকবে এরকম বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে তাঁর অনুরোধ রাখতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমার উত্তর দিতে দেরি হয়েছিল; তাতে তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে যা বলেছিলুম, সেই কৈফিয়ৎটা মনে আসছে। দেখো, মানুষের বয়স হলে তার মাথার চুল পড়ে যায়। তখন তাকে বুড়ো ঈগলের মতো দেখায় না? তেমন ঈগলের ডানায় যদি তেমন জোর না থাকে, কিন্তু বুকে যদি কিছু সাহস থাকে তখনও তবে তাকে জীর্ণ-পালক ডানা বিছিয়ে দূরে দূরে আকাশে ভাসতে দেখা যায়। আমি মানুষের মধ্যে ঈগল জাতের—এরকম বলার কোন চেষ্টা আমার নেই। এখানে, অবশ্য, লক্ষ্য করো আমার উচ্চাশা বড়জোর ঈগল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানের আকাশে সেও কি তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ নয়? সেই তাদের তুলনায়, সেই জাম্বো, ইলিউশন, মিরাজ, ফ্যান্টাম আচ্ছন্ন আকাশে? এবং রবি ঠাকুর না বললেন, আমরা অনুমান করতে পারি 'আমার দোয়েল পাপিয়া কোয়েল', দূরে হতে যারা গড় করে, ঈগলও কোন রকমে কাকুতি জানিয়ে তাদের দলেই ভিড়ে পড়তে চায় সেই বিকট হাড়গিলের বাচ্চারা যখন আকাশে ওড়ে। হায়, ঈগল, তোমার দিন গিয়াছে।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখি। তোমার রাজনৈতিক মত কি আমি তা জানি না, এবং তোমার রাজনৈতিক মত যাই হ'ক তা আমার দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কারণ তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ় যোগসূত্র তার কোনটিই রাজনীতি নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব রাজনৈতিক মত পোষণ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। সুতরাং তোমার সে মত আমার থেকে পৃথক হলেও আমার কাছে তুমি অমিত্র হয়ে যাও না।

এবং আমার এ মতও আমার ইম্‌মর‍্যালিস্ট হওয়ার ফল বলতে পারো, যেমন আমার

উদাস ভঙ্গিও যাকে ভাসতে ভালো লাগা বলেছি। একটু ঘুরিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে পারি: মতবিশেষে আমার আসক্তি নেই, দূর থেকে দেখে সব মতকে সমান অস্পষ্ট, আর্থের হিসাবে সমান ব্যর্থতাযুক্ত মনে হয়; কোন মতই আমার ঠাণ্ডা হয়ে আসা রক্তকে গরম করে না, কোন মন্ত্র জপেই আমি আর পারে যেতে চাই না। এক সময়ে ইউরোপে ক্রাইস্টমন্ত্র জপের উদগ্রতা ছিলো। এক সময়ে অনেক সভ্য মানুষও সে উদগ্রতাকে অভ্রান্ত মনে করেছে। তারও আগে অগ্নিযজ্ঞে অনেকের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিলো এবং তাদের কালে তাদেরও এমন কিছু বর্বর মনে করা হয় নি। কিন্তু অগ্নিতে নিজের সন্তানকে আহুতি দিয়ে, কিংবা স্প্যানিশ ইনকুইজেটর্ জেনারেল যাদের খোঁটায় বেঁধে পোড়ালেন তাদের তেমন পুড়িয়ে—তাঁরা কি ভেবেছিলেন ভুল করছেন? আদৌ না। তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা, প্রয়াস, চিন্তা সব কিছুকে অভ্রান্ত মনে করতেন। এমন কি মায়া-সভ্যতার সেই কাহিনী অনুসারে যারা দেশের সুন্দরতম যুবকটিকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিতো তারাও অনেক ভেবেচিন্তে যুক্তি দেখিয়ে তা করতো। আগুনে মানুষ পুড়িয়ে মারার সব কাহিনীর পিছনে একটা সু-উচ্চ মর‍্যাল-পারপাস্ থাকে, যা মর‍্যালিস্ট না হলে গ্রহণ করা যায় না।

কথায় কথায় মনে হলো, তুমি নিশ্চয় জানো পৃথিবীর শেষ ক্যানিব্যালদের খোঁজ পাওয়া যায় নিউগিনিতে। অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের মত এই যে তাদের নরমাংস ভক্ষণের মূলে ক্ষুধাকাতরতা নেই, তারিয়ে তারিয়ে জিহ্বার স্বর্গে পৌঁছানোর ইচ্ছাও নেই, বরং কতগুলো স্পিরিচুয়াল ভ্যালুজকে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা থাকে। ভালো কথা, ইউক্যারিস্ট ওয়েফার সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয় জানা আছে।

উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নেই, বরং এই উদাহরণগুলো সম্বন্ধে এ-কথা বলা যাক এগুলোকে উল্লেখ করার এই একমাত্র যুক্তি যে এগুলি তীক্ষ্ন, সহজে চোখে পড়ে আগুনের দরুন। নতুবা আমাদের উচিত সাহিত্য, এবং আরও সাধারণভাবে কান্তিবিদ্যার অধিকারে, নিজেদের কথাকে ধরে রাখা। এমনকি যে রিলিজিয়াস এবং/অথবা সোশ্যাল মরালিটির হাই-সিরিয়াস ওভারটোন ভলতেয়ার ও টমাস মানকে বাস্তুচ্যুত করে, পাওলো ভেরোনিজকে হোলি ট্রিবিউন্যালের কাঠগড়ায় হাজির করে তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় কারণ তা ইতিহাসের গোবরগাদার উপযুক্ত।

আমি এইমাত্র রান্নাঘরে গিয়েছিলুম দ্বিতীয় চায়ের কাপ সংগ্রহ করতে। তোমার কথা ভাবছিলুম তখন চোখে পড়লো পুরনো ক্যালেন্ডারের ছবিটায়। রান্নাঘরের দেয়াল আমার পুরাতন ভৃত্যর ক্যালেন্ডার প্রদর্শনী, এবং অলিখিত সংবিধানে তাকে এই স্বাধীনতা দেয়া আছে। ক্যালেন্ডারের কথা বলি: ভারতবর্ষের ম্যাপ, যেখানে কাশ্মীর ও তিব্বত থাকার কথা সেখানে যুদ্ধের হাউই-জাহাজ উড়ছে; বোঝা যায় রাউলপিণ্ডির কাছে ওটা ট্যাঙ্ক ও বোমার ব্যাপার; যেখানে বাংলাদেশ থাকার কথা সেখানে একটা লাল চাকতির মধ্যে এয়ার-মার্শ্যাল অর্জন সিং-এর ছবি যাঁর কাঁধের কাছ থেকে একটা জেট বিমানপোত বর্মা মুখে ধাবিত; এই চাকতির নিচে আরও দু'টি ইন্টারলকড্ বঙ্গোপসাগরের দিকে ঝোলানো চাকতির মধ্যে যথাক্রমে জেনারেল জে. এন. চৌধুরী এবং অ্যাডমিরাল বি. এস. সোমান; সোমানের চাকতির নিচে ডান দিকে ছোট ছোট কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ; গুজরাটের দিকে পিঠ রেখে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী জুড়ে লালবাহাদুর; তার ডাইনে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহার জুড়ে ওয়াই. বি. চ্যবন; নিচে কুইম্বাটোরের দিক পিঠ, পুনার কাছাকাছি মাথা, লাল ভেলভেটের জামা ও সাদা কংগ্রেসি ক্যাপ পরা জহরলাল নেহরুর ছবি—যিনি এক শ্বেত

কপোত উড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে আছেন; কপোতটি উড়তে উড়তে শাস্ত্রী ও চ্যবনের মাঝামাঝি পৌঁছেছে। চিত্রকরের সোশ্যাল এথিকস-জ্ঞান এত প্রবল যে পাছে আমরা ভুল করি সেজন্য প্রত্যেকটি ছবির নিচে ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিপরিচয় দেয়া। তুমি হয়তো এতক্ষণে ঘামতে শুরু করেছো, কিন্তু একেই বলে দেশপ্রেমকে চিবিয়ে ফেলা। দেশপ্রেম হয় অশ্লীল, এরকম মতবাদ শুনি নি এমন নয়, কিন্তু এখনও পৃথিবীর তিন শ' কোটি মানুষের অনেক সংখ্যক লোক দেশপ্রেমকে উন্নতধরনে এথিক্যাল মনে করে থাকে।

কিন্তু রান্নাঘরে চা সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে যা তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম তা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' সম্বন্ধে। মাইকেল মধুসূদন যে একজন বিশেষ কালচার্ড ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই। এরকম বলা হয়ে থাকে কৃত্তিবাস যে সেন্টিমেন্ট্যাল চোখের জল ফেলা কাব্য দিয়ে বাঙালী জাতকে জারিত করে রেখেছিলেন; বক্ষ্যমান কবি তাঁর মেঘনাদ-বধে নতুন মানবতার জোয়ারে সে সেন্টিমেন্ট্যাল জগৎ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সেই মাইকেল মধুসূদনের লেখা। আপাতদৃষ্টিতে এক সিনিক সমালোচকের ভঙ্গিই তাঁর। মদ্যপানকে গৌণত এবং মুখ্যত জমিদারশ্রেণীর সাডিস্টিক প্রজা-ললনা ধর্ষণ যার তিরস্কারের বিষয়। আমাদের বুঝতে দ্বিধা হয় না একটা হাই মর‍্যাল পারপাস ছিলো এই প্রহসনের। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী? মদ্যপান সম্বন্ধে এ কি মাইকেলের আত্মগ্লানি? মদ্যপানকে তখন কি ধিক্কৃত করা হতো প্যারীচরণ প্রমুখের মদ্যপান নিবারণ সমিতি সত্ত্বেও! মাইকেল মধুসূদন, হরিশ মুখোপাধ্যায় (দু' দিকের দুই দিকপাল) প্রভৃতির অকালমৃত্যুর কারণ মদ্যপানও নয় কি? তৎকালে এবং কিছু পরবর্তীকালেও কোন্ কোন্ মস্তিষ্কজীবী মদ্যপানে বিরত ছিলেন তা খোঁজ করা বিস্ময়কর হতে পারে। কিন্তু নারীধর্ষণ? এরকম চিত্র যে শুধু মাইকেলে আছে এমন নয়। 'টেল অব টু সিটিসে'র কথা মনে করো। এবং অনেক এ-দেশীয় যাত্রা এবং নাটকে তা পাবে। ম্যাডাম ডেফার্জের বোন সেরকম উৎপীড়িত না হলে গল্পটার চরিত্রগুলোর দাঁড়ানোর পা থাকে না। এখন দেখা যাক এটা কী ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো গড়শ্রীখণ্ডের জমিদার কর্নভিনসিং নয় কেননা জমিদার কখনও তেমন নির্দোষ হয় না। অর্থাৎ মদ্যপান নেই, নারী-ধর্ষণ নেই। বলেছিলুম আমি: বেচারা জমিদার, কলকেতা থেকে অতদূরে হয়তো সে মদ্যপান করে তার স্টাডির একান্তে গোপনে, মাতলামোর সুযোগ নেই বলে আমার চোখে ধরা পড়ে নি। আর ধর্ষণের সাধ হতে পারে, তেমন সুন্দরী নারী কোথায় বলো প্রজাদের মধ্যে? এটা একটা তীব্র রকমের সত্য, যদি ভেবে দেখো, সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড আছে, এবং সে স্ট্যান্ডার্ডে গৌর বর্ণ, সুগঠিত চোখ, মুখ, নাক, কাজে ক্ষয়ে যায় নি, পায়ে হাজা ধরে নি, এমন হাত-পা থাকে; এবং, একটু বিচার যদি করো, এই সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড আমরা ভারতীয়রা প্রায় দু' হাজার বছর ধরে মানছি, এখনও মেনে আসছি কারণ ওটাতে প্রভুজাতির মহিলাদের চেহারার ছাপ থাকে। সুতরাং আসল ব্যাপারটা কী ঘটে? উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ-নারীরা যতগুলি ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেণীতে পরস্পরকে নষ্ট করে, তার ক্ষীণাংশও নিজের শ্রেণীর বাইরে আসে না সে ব্যাপারে।

এটা ডিকেন্সের জানা উচিত ছিলো বে-আইনি নর-নারী সংসর্গ মারকুইসদের সমাজে ঘটে কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মাডাম পম্পিডা পাওয়া যায় এবং যেতো। এখনও আমাদের চোখ খোলা থাকলেই দেখতে পাবো লালো আলোর জেলায় যারা থাকে তারা উচ্চ শ্রেণীর কাছে আকর্ষণের নয়, উচ্চ শ্রেণী এখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং নিজেদের শ্রেণীর

# আমার দিনগুলো

**পবিত্র মুখোপাধ্যায়**

প্রজ্বলিত চিতার আগুনে
ঝলসে যায় এক-একটি দিন
আমার দিনগুলো ঝলসে যায়
প্রজ্বলিত চিতার আগুনে

আমি কিছুই ধরে রাখতে পারি না

কেই বা ধরে রাখতে পারে মণির উজ্জ্বলতা, স্বপ্নের দ্যুতিময় আলিঙ্গন
দুঃখের হন্তারক যে বিস্ময় তার ভ্রূণকে?
কেই বা ধরে রাখতে সমর্থ অন্তর্গত শুভ্রতা, তরঙ্গসংকুল জাগরণ?
কোন্ সমুত্থিত কৃষ্ণহাত মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয় নিরন্তর উত্তোলিত
আনন্দ—ওই অস্থির সমুদ্রের উষ্ণতা?

একটি নিষণ্ন পাখি
স্থির বসে থাকে অনন্তে

আমার দিন
তার শরীর ঝলসে যায়—সিল্কমসৃণ অবাধ্য চুলগুলো জিহ্বার তাপে
কুঁকড়ে যেতে থাকে

আমার দিন
তার শুভ্র সুন্দর আঙুল দগ্ধ সরীসৃপের মতন কী বীভৎস আর ভয়ংকর

আমার দিন
তার উন্নত রাজটিকাখচিত ললাটফলক আধপোড়া বহুমূল্য পুঁথির মতন
পরিত্যক্ত সম্ভাবনা

হায়রে আমার আতরমাখানো দিন
মস্লিন-জড়ানো দুঃখীর সঞ্চিত ঐশ্বর্য

# ফুল কি বীজের সব স্মৃতি ভুলে যায়!

দিব্যেন্দু পালিত

পর পর ঘুম আসে। ঘুম, নাকি মৃত্যুর কোরক!
আমি ফুটে আছি ভ্রমে; অবশ নাভিতে মাথা—
টের পাই স্মৃতি।
জীবন একদা এসে কিছু তাপ দিয়েছিল—ঘুম ও আরাম—
অলজ্জ শিশুর মতো আমি ছুঁয়ে থাকি ক্লেদ। ফুল কি বীজের
সব স্মৃতি ভুলে যায়?
বয়স কি ভোলে সেই বিপন্ন আরাম?

হিসেবমতন সব ঘটে যায়। পর পর ঘুম
অস্থির বিকল্প থেকে খুঁজে আনে অপার্থিব, ঈপ্সার মুখোশ।
মধ্যরাত জেগে ওঠে রাগী মহিষের মতো, ধুলো ওড়ে, ধুলো—
রক্তের গুঁড়োর মতো—
শান্ত্রীর বুটের শব্দ, সার্চলাইট, চুলচেরা বাঁশি,
ছুরির ফলায় দূর আলো পড়ে ভ্রূণে, অবয়বে—
মুখোশ আমাকে দেয় শূন্যতা অদ্ভুত, কাঁচা ঘাতকের মতো।

পর পর ঘুম আসে। ঘুম, কিংবা, মৃত্যুর কোরক!
আমি ফুটে থাকি ভ্রমে—
শিশুর বয়স এসে ছেঁড়ে লতাপাতা।
কেমন বিশ্রাম তার! সন্নিহিত কোণ, তবু ভুল জ্যামিতির
বিশ্বাসহন্তা নিয়ে—অবশ নাভিতে মাথা, চুলে ম্লান ধুলো—
বিস্মৃত স্মৃতির মধ্যে ডুবে যাই পর পর ঘুমে।

# অথচ পাখিরা

আশিস সান্যাল

হিংস্র জাগুয়ারের পদশব্দে জেগে উঠলাম।

চেয়ে দেখলাম
আকাশের পশ্চিম কিনার ঘেঁষে
একঝাঁক নীলরঙ অন্ধকার
ছুটে চলেছে
শব্দময় প্রত্যূষের দিকে।

তৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর
কেঁপে উঠলো।
রক্তের অবিস্মরণীয় স্তব্ধতার মধ্যে
ত্রস্ত হরিণীর
অসহায় কণ্ঠের আর্তনাদ
ভয়ানক প্রতিশব্দে
ছড়িয়ে পড়তে থাকলো।

অথচ পাখিরা
সেই যুগান্তকারী সংবাদ ঠোঁটে করে—
আলো থেকে অন্ধকারে
অন্ধকার থেকে আলোতে
অবিরাম ছুটে চলেছে।

# আমাকে দাও ভাষা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

স্রোতেও আলো পড়েছিলো, নদীর চর তো ভ'রেই ছিলো,
ক্ষণকালীন চরের শেষে বন;
সভার শেষে একলা ছিলাম, হয়তো কিছু ভেবেছিলাম,
অচেনা এক দুঃখে ভরা মন;
আবছা ভুবন বনের আড়ে, সূর্য ডুবছে চুপিসাড়ে,
দু'দিক ছাড়াও চোখ রেখেছি জলে;
ঝাপসা কিছু স্মৃতি ছিলো, ক্কচিৎ-কখন দূর নিখিলও
কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছে হাওয়ার ছলে;
জানি না আজ কী আসন্ন, আমার যা এই কিসের জন্য
বিলীন বর্ষযাপন;
দিন তো ফুরোয়, তবু প্রতীক্ষা, পরিপার্শ্বই দেবে কি দীক্ষা?
পরিপার্শ্ব কাঁপছে, এ কোন্ কাঁপন!

চাই না তোমার ঝাপসা ভুবন, এখন আমার খুব প্রয়োজন
আমার নিজের ভাষা;
রাত কেটে যায় কার দীনতায়, কানায়-কানায় নদী গুমরায়,
আমাকে দাও ভাষা;
একলা আমার রাত ভোর হয়, কাঁপছে সময়, তীব্র সময়,
আমাকে দাও ভাষা।

# হত্যা

বার্ণিক রায়

তোমাকেই আমি হত্যা করি প্রত্যেক মুহূর্তে,
আমার রক্তের মধ্যে হত্যা হাসিমুখে
মাথা নাড়ে শিমুলের গাছে।
হত্যার আনন্দ লাল একশ পতাকা তুলে
সমারোহ করে চারিদিকে,
রক্ত কৃষ্ণচূড়া ওড়ে চৈত্রের রোদ্দুরে।
হত্যার আনন্দে দেখি আকাশে বেলুন।

দুঃস্বপ্নের ঘুম ভেঙে পড়ে আছি
শূন্য বায়ুস্তর থেকে জলের অতলে।
পৃথিবীর সব গাছ উপড়ে পড়ে গেছে জলে,
গাছের পাতার পচাগন্ধ স্রোতের শ্যাওলায়।

অধিকার, হত্যা, প্রশ্ন সময় ব্যাকুল
ওদিকে বালির নদী বয়ে যায়,
ঢেকে দেয় অরণ্যের চুল॥

# কবিতার সময় নয়

বাসুদেব দেব

আমার শরীরের একটা খণ্ড ছিটকে যাবে নৈঋত আকাশে
ঘিলুর সামান্য অংশে ঈশানের পিঙ্গলতার খুব কাছে
কালো শাড়ির জরির পাড়ে আমার দূষিত রক্তের ছিটে
রাস্তার খোদলে শ্লেষ্মা-মেশানো অশ্রু আমারই
এর মাঝখান দিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশের হৃৎপিন্ডের দিকে
তুবড়ির মত ছুটে যাবে একটা অদ্ভুত পুরোনো কান্না
মাধ্যাকর্ষণের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে আবার
আবার খুঁজে ফিরবে শিশুর বুক সরল পথ শীতের রোদ

পরমানবিক সংঘাতে যে রকম সূর্যকিরণ ঠিক সে রকম
যে কোন একটি বোমার আঘাতে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
ছিটকে পড়বে চতুর্দিকে রক্তমাংস অত্যন্তই নিম্নমধ্যবিত্ত
ঠিকরে আসা চোখের মণি রক্তমাখা হাত কুয়াশার ভিতর থেকে
ফুটে উঠতে চাইবে যেন একটা লালশালুক
অর্থহীন কালো বর্ডারের মাঝখানে

আমারই ছায়ার ভিতর থেকে গড়িয়ে আসছে সে
একটি উদ্যত মোরগপুচ্ছ
উদ্ধত ও বিস্ফোরক
আমারই পিছে পিছে

# তুমি ঐভাবে

**দেবী রায়**

বনশ্রী, তুমি ঐভাবে স্পষ্ট—তাকিয়ে থেকো না
আমার চোখে
বিচারকের মতো—ঐ তীব্র চাহনি বুকের গভীরে
দ্রুত চলে গিয়ে, তুলে আনে আমার সমুদয় পাপ!
অনায়ত্ত এই মুখ, সব কিছু তখন স্বীকার করে
জ'ড়িয়ে ধ'রে নিবিড় এই হাত—
তোমার শুভ্র-পদযুগ-এ, ভিজে যায় চোখ অশ্রুজলে!

বনশ্রী, তুমি ঐভাবে সরাসরি তাকিয়ে থেকো না
আমার চোখে
হাজার মানুষের ভিড় ও মিছিলে—মাথা নিচু করেও
আমি লুকাতে পারি নি এই অপরাধী মুখ
শত জনতার ঠিক মাঝখানে ভেসে ওঠে—ঐ গম্ভীর,
তোমার মায়াময় দু'চোখ

বনশ্রী, আমি আজ এখন অ—নেক শান্ত হয়েছি
দুপুর রৌদ্রে, টো-টো করে সেই একটানা ঘোরা—
অস্থির বাউন্ডুলেপনা, একে একে প্রায় সব ছেড়েছি
মানুষের মতো ভেবেছি এবার, মানুষ হ'বো—
এবার তুমি সঘন—যুগ্মভুরু না হেনে, এখন ব'লো
সহিষ্ণু-চোখে:
'আচ্ছা, এবারের মতো তোমায় আমি ক্ষমা করলাম!'

# বেঁচে থাকা

**অভ্র রায়**

পকেট থেকে কাগজের বাণ্ডিলটা, আর চিঠিখানা বার করতে করতে বললাম, আজকে আমার—

আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন। হাফ-শার্টপরা, ঘাড়ে রুমালের ফেট্টি, চোখে চশমা। ঠোঁট দুটো পান খেয়ে খেয়ে কালচে খয়েরি। তিনি আমায় বসতে বললেন। তাঁর সামনে একগাদা মোটা মোটা খাতা, ছড়ানো ছিটোনো কাগজের বাণ্ডিল। রেক্সিনে মোড়া প্রকাণ্ড একটা টেবিল। গ্লাশ ভর্তি সবুজ টলটলে জল।

তিনি একবার মুখ তুলে চশমার কাচ মুছলেন। কী ফরসা মুখটা। আমার চোখে চোখ রাখতেই আমি আরো কিছু বলবার জন্যে তৈরি হলাম। একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত বুকের মধ্যে তিরতির করছিল। কিন্তু না। নিতান্ত ঠাণ্ডা একটা চাউনি। সেইভাবে আমাকে দেখতে দেখতে প্রায় আধ গ্লাশ জল খেয়ে ফেললেন তিনি। বাকিটা ঢেকে আবার মুখ নামালেন। অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমার গলাটা শুকিয়ে ছিল, জল দেখে এখন তেষ্টাটা বেশি করে পেল যেন। কিন্তু ঠিক এখনি, তাকে জল খেতে যাবো কথাটা বলতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। তাছাড়া, ভেবে দেখলাম এখন হয়তো আমার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমার পিছনে বেশ ভরাট গলার এক ভদ্রলোক খুব জমিয়ে গল্প বলছিলেন। উত্তর-পাড়ার কে এক নুটুবাবুর নাকি আজ সাংঘাতিক এক ফাঁড়া কেটে গেছে। গাড়িটা ঠিকমত ব্রেক না মারলে আজই নাকি তার ভবলীলা খতম হয়ে যেত। আরে বাপু, সবতার একটা বয়েস আছে। আগে লাইফ, তারপর তো অন্যকিছু। ইলেকট্রিক ট্রেনে আজকাল ছেলে-ছোকরারাও লাফিয়ে ওঠে না—আর তুমি বাবা রিটায়ার করবে আজ বাদে কাল; ঘরে তোমার ডবল জামাই আসবে আর দুদিন পরে। আর তুমি কিনা তড়াং করে ইয়াং সাজতে গেলে। ছ্যা ছ্যা, মরবার টাইম হলেই মানুষের এই সব ভীমরতি ধরে আর কি।

ফ্যাসফ্যাস করে এক নিবারণবাবু হাপর টানার মত করে বললেন, আমাদের আগর-পাড়ায়? গত সনে কি হল? জোয়ানমদ্দ ছেলেটার একটা ঠ্যাং-ই কেটে বাদ দিতে হল শেষে! সেদিন আমি আবার কালীঘাটে যাবো বলে বেরিয়েছি। সঙ্গে বাড়ির ওন্নাঁরাও রয়েছেন। এক্কেবারে চোখের সামনেই দেখলাম ঘটনাটা। হাত ফসকে একেবারে রানিং ট্রেনের নীচেয়! আঃ। বসাগলায় প্রায় কোরাসে আর্তনাদ করে উঠলেন নিবারণবাবু। দেখা যায় না মশাই, সে দৃশ্য। যখন টেনে তোলা হল কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে বেচারা। এখনো যেন চোখের ওপর ভাসছে সব। উঃ, ভোলা যায় না যেন—। আবেগে নিবারণবাবুর গলায় বিচিত্র সব বিস্ময়সূচক শব্দ হচ্ছিল।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বোধ হয় নুটুবাবুর বন্ধু সেই প্রথম বক্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার আরম্ভ করলেন। আর বলবেন না। কার কপালে যে কি লেখা আছে, তা কেউ জানে না। আসলে দিনকালই পড়েছে অন্যরকম। মানুষ খাটছে অথচ উপযুক্ত খাদ্য পাচ্ছে না। যা খাবেন তাতেই ভেজাল। তা শরীরে শক্তি পাবেন কোত্থেকে! ভাঙা

শরীর নিয়ে ধুকতে ধুকতে দৌড়ঝাঁপ করতে গেলে ত পা পিছলে পড়বেই মানুষ।

তার কথা শেষ হবার আগে আরো দুজন এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ শুরু করল। এবারে প্রসঙ্গটা একটু মোড় ফিরে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট হয়ে গেল। বিবরণের চেয়ে বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকল সবাই। শেষ পর্যন্ত তাদের আসরটা কেমন নীরস আর উত্তেজনাহীন মনে হতে লাগল।

বারান্দা থেকে তখন এক ছকা-দাকে নিয়ে হুল্লোড় শুরু হয়েছে পুরোদমে। পরশুদিন এক 'মেরিজান' তাকে নাকি খুব ভাল পেমেন্ট দিয়ে গেছে। টিপসটা জগবন্ধুবাবুর। সবার ওপরে তার গলা। কিছু পাতি ছাড়ো ব্রাদার, একটু সালসা-টালসার ব্যবস্থা করি। এবার তোমাকে জ্যাকপট না ভিড়িয়েছি ত জগা মল্লিকের নামে কুকুর পুষো তুমি। অবশ্য এ মাসে চোট খেয়েছ অনেকগুলো—তাও লাইফেরই ধর্ম। এক যাবে, এক আসবে। সুযোগ পেলেই শালা ফুর্তি করে নাও। জগা মল্লিকের কথা শেষ না হতেই আরো দু-তিনজন হাঁকডাক করতে করতে এগিয়ে এল। যাত্রাদলের সখীর অনুকরণে কে একজন—একটু পায়ের ধুলো দাও প্রভু, বলে হয়ত ছকাদার পায়েই পড়ল। তাদের হাসির শব্দ, চীৎকার এ ঘরের মানুষগুলোকেও নাড়া দিচ্ছিল যেন।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ভদ্রলোক তখনো মুখ নীচু করে কি সব লিখে চলেছেন। আমি এবার টেবিলে কনুই রেখে একটু ঝুঁকে বসলাম। তিনি যেন এবার হঠাৎ আমায় নজর করে দেখলেন। লেখা ছেড়ে আবার জল খেলেন। পকেট থেকে একটা তোয়ালে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে—বসুন, আমি আসছি—বলে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন তিনি। বসে বসে একঘেয়ে লাগছিল। জানলার কাছে, বা বারান্দার দিকে যাবার কথা মনে হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুপচাপ বসে রইলাম।

বারান্দাটা দেখছিলাম। মোজাইক করা চকচকে মেঝে। হয়ত একটু আগেই কেউ মুছে দিয়ে গেছে। এটা শেষ তলা। ঘোরানো কাঠের সিঁড়িটা বারান্দার সঙ্গে মিশে শেষ হয়েছে। একটা লোক হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে ধুপ ধাপ করে মইয়ে চড়ার মত উঠে আসছিল। বারান্দায় পা দিয়েই তার চলার বেগটা যেন বেড়ে গেল। চলতে চলতেই সে কোথায় কাঠের বাক্সটা লক্ষ্য করে পিচকিরি দিয়ে পানের পিক ফেলল এক অদ্ভুত কায়দায়। তারপর আরও হন্তদন্ত হয়ে প্রায় লাফ দিয়ে আমার সামনে থেকে সেই মোটা খাতাটা টেনে নিল, যে-খাতাটায় সবাই এসে হিজিবিজি কি সব লিখে যাচ্ছিল। বেশ মনোযোগ দিয়ে তার নিজের ঘরটা দেখে সেও লিখল খসখস করে। তারপর খাতাটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল সে। কিছুই পরোয়া না করা নিশ্চিন্ত নির্ভয় একটা চলার ভঙ্গি।

আবার চুপচাপ বসে থাকা। বারান্দার সোরগোলটা কখন থেমে গেছে। আমার পিছন দিক থেকেও কোন সাড়া শব্দ আসছিল না। শুধু দূর থেকে একটা মেয়ের মিষ্টি গলার আওয়াজ। থেমে থেমে খুব স্পষ্ট করে পর পর ইংরেজী সংখ্যা পড়ে যাচ্ছে সে। শব্দটা টং টং করে ঘড়ির ঘণ্টার মত বাজছিল যেন।

সামনে খোলা সেই মোটা খাতাটার হিজিবিজি লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম। নীল, কালো, বেগনি, সবজে অনেকরকম রঙের আঁচড়কাটা লেখাগুলো। এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ এলোমেলো আঁকিবুকিগুলোর দিকে তাকিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। কয়েকটা বেশ সহজেই পড়া যায়। কয়েকটা ছবির মত। দু-একটা কোন ট্রেড মার্কের সাঙ্কেতিক

চিহ্নের মত। অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে লেখাগুলো কেমন নীল, সবুজে, কালো, বেগনি পোকার মত মনে হতে লাগল।

দেখতে দেখতে সত্যিই একটা খয়েরি রঙের পোকা বেরিয়ে এল কোত্থেকে। একটা চলন্ত বিন্দুর মত পোকাটা ঘুরছিল, ছেঁড়া ময়লা রেক্সিনের ওপর। গুড়ি গুড়ি একবার ডান দিকে ঘুরে সোজা এগোল ওটা। হুড়মুড় করে দৌড়োতে দৌড়োতে একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। টেবিলের ওপর সেই একটুখানি জলেই তার শরীরটা প্রায় ডুবে গেল। তবুও হাল ছাড়ল না পোকাটা। জল থেকে শরীরটা টেনে হিঁচড়ে বার করার চেষ্টা করতে লাগল। জলে ভেজা সরু সরু ঠ্যাংগুলো ভিজে চুপসে কুৎসিত লাগছিল দেখতে।

আর দেখতে পেলাম না। মেদপুষ্ট মসৃণ হাত একখানা আমাকে আড়াল করল। আমার বাঁ দিক থেকে কোনাকুনি শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে খাতাটা টেনে নিল। পরনে ফিকে ফিরোজা রঙের শাড়ি, লাল রঙের জামায় ঢাকা বাহু—লালে-ফিরোজায় ঢাকা উন্নত নিটোল মাংসপিণ্ড ক্রমশ আমার চোখের সামনে নুয়ে পড়ছিল। হঠাৎ বাতাসে যেন কি এক সুগন্ধ। এক স্পর্ধিত যৌবনের তৃপ্তিকর আড়াল সহসা।

তারপর পোকাটাকে যখন আবার দেখলাম, জলের মধ্যে চুপসে স্থির হয়ে আছে ওটা। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ওটা বোধ হয় মরেই গেল। এই টেবিলটার কোনো ফাঁকে ফোকরে হয়ত ওর জন্ম হয়েছিল। টেবিলের ওপরেই অনেকটা খোলামেলা জায়গায় হাত পা ছড়িয়ে ও মরল। ওর শুকনো শবটাও হয়ত এই টেবিলের ধুলোর সঙ্গে মিশে থাকবে।

বেলা বাড়ছিল ক্রমশ। বসে বসে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম। আমার এক-দম ভাল লাগছিল না আর।

অবশেষে সেই ভদ্রলোক এক সময় ফিরে এলেন। এইবার আমার কাগজপত্তর সব খুঁটিয়ে দেখে একটা মোটা রেজিস্টার বের করে বললেন, এই ঘরগুলো ফিল-আপ করুন। নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ। একটা ঘরে আমার শরীরটা মাপা হল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন। দামী পর্দা আর সুইং ডোর ঠেলে একজন গম্ভীর মানুষের কাছে গিয়ে আমায় অনেকগুলো শপথ করতে হল।

এবার একটা লোককে ডাকলেন তিনি। আমায় বললেন, ব্যস হয়ে গেল। যান এর সঙ্গে, এ আপনার জায়গা দেখিয়ে দেবে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

এই সেই ঘর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। অনেকগুলো সারি সারি মানুষ। মেয়ে, পুরুষ, টেবিল, টাইপরাইটার, র‍্যাক, বাস্কেট দিয়ে ঠাসা ঘর একখানা। মাথার ওপর সারি সারি সিলিং ফ্যান আর আলো। আলোগুলো দুলতে দুলতে ঝুলছে। কয়েকটা ফ্যানের মোটরের মধ্যে নীল নীল ফুলকি। জোনাকির মত। মাথার ওপর সবুজ কাচ ঢাকা স্কাই-লাইট। তার খুপরির মধ্যে কি একটা পাখি ফরফর করে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

ভরদুপুরে আলো জ্বালানো মানুষ, কাগজ আর ফার্নিচারে ঠাসা ঘরখানাকে প্রেত-পুরীর মত অদ্ভুত লাগছিল। ভয়ে আমি ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম—এই মানুষ-গুলো আর এই ঘরটার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ভেবে। প্রথমে আতঙ্ক, তারপর আনন্দ, অবশেষে অসীম নৈরাশ্য। এইখানটায় এসে আমায় রোজ বসতে হবে। হয়ত শেষ দিন পর্যন্ত। রোদ্দুরজ্বলা বাইরের দুপুরটার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। মাথার ওপর ঝোলানো ম্লান আলোগুলো এইরকম বিপজ্জনক অবস্থায় দুলবে। হয়ত রোজ দুলবে।

আমি যাঁর পাশে বসেছিলাম তাঁকে সবাই জানকীবাবু বলে ডাকছিল। একমাত্র তিনিই আমায় দেখে হাসলেন। বিষণ্ণ ম্লান হাসি। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। বয়েস। একটা রুল-কাঠ পাঞ্জাবির মধ্যে ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বললেন, ছেলেমানুষ। আমি খুব অবাক হলাম। কারণ হাসতে গিয়ে তিনি নিজেই ছেলেমানুষের মত নাল ছিটোলেন আমার হাতে।

জানকীবাবুর মুখটা শুকনো। বাদামী। মাথাটা নড়লে ঘাড়ের মধ্যে দুটো লম্বা শিরা সাপের মত কিলবিল করে। কাঁধের হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু। পাঞ্জাবির দুটো ধার দুটো লাটিমের মত জেগে উঠেছে। কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় তেল রগড়ে রগড়ে হাত পা যেন পুরোনো রবার ক্লথের মত পিছল। চোখ দুটো ঘোলাটে।

—আসুন, একটু কাজ করা যাক। জানকীবাবু এতক্ষণ চেয়ারের ওপর পা তুলে একটা দলা পাকিয়ে বসেছিলেন। এইবার পা নামিয়ে ঝিমধরা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে খাড়া হয়ে বসলেন। খুব সাবধানে পা বাড়ালেন তিনি। কারণ আমি একেবারে তাঁর গায়ে গায়ে বসেছিলাম। আমার অসুবিধে দেখে বললেন, কটা দিন একটু বসার অব্যবস্থা হবে। সামনের মাস থেকে আপনি ঐ চেয়ারটায় বসবেন। আঙুল দিয়ে এক বৃদ্ধকে দেখালেন তিনি। জগদীশবাবু। এই মাসই ওঁর শেষ। সামনের মাস থেকে উনি আর আসবেন না, আপনি ঐখানটায় বসবেন। একটা লম্বা হাই চাপতে চাপতে কথাগুলো শেষ করলেন জানকীবাবু। নিশ্বাস ফেলে গরম চায়ে চুমুক দেয়ার মত একটা তৃপ্তিকর শব্দ করে আবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

জগদীশবাবুকে দেখছিলাম। বেঁটে কালো মানুষটা—মাথায় একগাছিও চুল অবশিষ্ট নেই। নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে প্রকাণ্ড একটা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা জগদীশবাবুর। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সামনের মাস থেকে উনি আর আসবেন না।

জানকীবাবুর বাঁ হাতের তর্জনীটা ছককাটা খাতাটার ওপর গুঁড়ি মেরে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। ডান হাতে ধরা লাল পেন্সিলটাও। তাঁর শরীরটা যেন শিথিল হয়ে এল। আমি চমকে উঠলাম তাঁর মুখের চেহারা দেখে। মাথাটা নোয়ানো, মুখটা বিকৃত। চোখ-দুটো বোজা। সরু ঘাড়ের ওপর কিলবিল করা শিরা দুটো শান্ত। জানকীবাবু ঘুমুচ্ছেন। কিন্তু কী বিশ্রী ঘুম! মৃত মানুষের চেয়েও বীভৎস লাগছিল তাঁকে দেখতে।

একটু পরে ঢুলতে ঢুলতেই সহসা তিনি চোখ খুললেন। হাতের তেলোয় কসের ধারটা মুছে নিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলেন। আমার খুব অবাক লাগছিল। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থার মধ্যে তিনি কি রকম আপোস করে নিয়েছেন। এই রকম একটা অবস্থায় পেঁছোলে বোধ হয় মানুষের সব দুঃখ, কষ্ট, কৌতূহল আর উৎকণ্ঠার ধার কমে যায়। বেঁচে থাকাটা একঘেয়ে হয়ে গেলে হয়ত যে কোন মুহূর্তে একটু হাওয়া বদলও করে আসা যায়।

জানকীবাবুর মুখের দিকে এমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করছিল। তিনি আমার বোকামি দেখে একটু হাসলেন। তারপর খুব মিশুকে মানুষের মত আমার বাড়ি-ঘরের খবরাখবর জানতে চাইলেন। দেশ কোথায়? ক ভাইবোন? কে কি করে? বাবার পেশা। একটা ছেঁড়া কাগজ কাঠির মত পাকিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আমার কথাগুলো শুনছিলেন তিনি। আরামে তাঁর চোখদুটো আবার বুজে আসছিল।

হঠাৎ কাঠিটা ফেলে দিয়ে টেবিলের নীচে থেকে একটা মগ বের করে বললেন, একটু বাইরে থেকে আসি। পরে কথা হবে।

ডান দিকে সামনের টেবিলে বসেছিলেন পঞ্চাননবাবু। তিনি অনেকক্ষণ থেকেই আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসছিলেন। আঙ্গুলের ডগা জিভে লাগিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক পরিষ্কার করছিলেন মাঝে মাঝে। এবার আমার দিকে চেয়ে এক গাল হাসলেন, কি, কেমন লাগছে সব। বলতে ইচ্ছে করল, দারুণ খারাপ। মুখে বললাম, মন্দ কি। পঞ্চাননবাবু চোখ নাচিয়ে বেশ রসিকতার সুরে বললেন, দুদিন যাক, দেখবেন একেবারে মজে যাবেন। একদিন না এলে কেমন আইঢাই করবে মন। আমাদের লাইফের তো মশাই এখন এই ধ্যানজ্ঞান। বিয়ে করেছেন নাকি? অ্যাঁ?

পঞ্চাননবাবুর শেষ প্রশ্নটা কেমন খাপছাড়া। কিন্তু পরেরটা আরও অদ্ভুত। মুখ নামিয়ে গোপন কথা বলার মত করে বললেন—ঐ জানকীর কাছাকাছি বেশি বসবেন না। যতটা পারেন গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে থাকবেন। ও বারমেসে পেটের রুগী, ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ কিন্তু ওটা। আমার কাছে শুনেছেন সে সব আবার বলে বসবেন না যেন, বুঝলেন। আমি ঘাড় নেড়ে তাঁকে আশ্বাস দিতেই তিনি ফিক করে আবার হাসলেন।

বাঁ দিকের কোণ থেকে দু-তিনটে মেয়ে একসঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল। প্যান্ট-কোট পরা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের এক ভদ্রলোক ওদের হাত দেখছেন। পঞ্চাননবাবু বললেন, আমাদের কেষ্টবাবু। একেবারে কলির কেষ্ট মশাই। কাজে কম্মে কিন্তু একেবারে ঝানু লোক। সেদিকে কেউ খুঁত বার করতে পারবে না। ওরকম মুখমিষ্টি আলাপী লোকও বড় একটা দেখা যায় না। তবে ঐ একটু যা দোষ।

—কি দোষ? আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম।

—কি দোষ, অ্যাঁ? বুঝবেন, বুঝবেন, সবই বুঝবেন আস্তে আস্তে—আপনাদের তো এই সব বোঝবার বয়েস মশাই—বলে চোখ দুটো কুঁচকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। জানকীবাবু তখন একটা ছায়ামূর্তির মত আমার পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ফ্যানের শোঁ শোঁ শব্দটা ঘন হয়ে বাজছিল। মনে হচ্ছিল সারা ঘরটার মধ্যে ঘুমের আমেজ দিচ্ছে শব্দটা। আলোগুলো কেমন ঝাপসা। দিনের বেলায় জ্বালানো ফুলঝুরির মত নিষ্প্রভ। খস্ খস্ করা শব্দ, টুকরো টুকরো কথা,—আচমকা দু-এক পশলা হাসি সবই যেন ঘুমের ঘোর মাখা। সবাই যেন ঝিমোচ্ছিল। ঝিমোতে ঝিমোতে কাজ করছিল।

জানকীবাবুর আঙ্গুলগুলো আবার খাতার ওপর চলে বেড়াচ্ছিল। শিরা দুটোও আবার জেগে উঠে কিলবিল করছে। জগদীশবাবু খাতা ফেলে খাড়া হয়ে বসেছিলেন। তাঁর গোল গোল চোখ দুটোয় যেন এক গভীর সন্দেহের দৃষ্টি। সবার মাথার ওপর দিয়ে শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। মুখে দু-এক দিনের বাসি দাড়ি ঘামে আর আলোয় ভেজা কদমফুলের মত চকচক করছিল।

জগদীশবাবু কি ভাবছেন কে জানে। সামনের মাস থেকে তাঁকে আর আসতে হবে না। তাঁর জীবনে আসছে অখণ্ড, অনন্ত ছুটি। উনি কি তাই ভাবছেন? কে জানে, হয়ত এসব কিছুই ভাবছেন না। এমনিই অসাড় হয়ে বসে আছেন।

বাইরে প্যাসেজে খুট্ খুট্ করে কে হেঁটে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সে কাকে ডাকল, এই নীলিমা। নীলিমা বিস্মিত গলায় সাড়া দিল—কি রে কল্পিতা, তুই এখন এলি? সেই কখন বেরিয়েছিস—বেশ চালাচ্ছিস কিন্তু বাবা। আজ কোথায় গিয়েছিলি রে? নীলিমার

গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে রহস্য মিশল।

কল্পিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—জানিস লালবাজারে দুটো লরিতে ধাক্কা লেগেছে। একটা বুড়ো ফিরিঅলা মধ্যিখানে পড়ে একেবারে স্যান্ডউইচড্। আমার না—ভীষণ খারাপ লাগছে।

নীলিমার হাসিটা নিভে গেল দপ করে। কল্পিতাও চুপ। খুটখুট করে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে ওরা আবার কথা বলল। কথাগুলো স্পষ্ট নয়। ভারি অস্বস্তি লাগল আমার। আমি উৎকর্ণ হয়ে ওদের কথা শুনছিলাম। শেষটা শুনতে না পেয়ে একটা চাপা উৎকণ্ঠা কাঁটার মত বিঁধছিল।

ঘরের ভেতরটা আগের মতই অলস, নির্জীব। জগদীশবাবুর মুখটা থমথমে। চোখ দুটো পাথরের মত। সম্ভবত লালবাজারে চাপাপড়া মানুষটার কথা ভাবছিলেন তিনি। ভুরুর ওপরে, থুতনির নীচেয়, নাকের পেটিতে অজস্র ঘামের কণা চিকচিক করছিল তার।

বেলা প্রায় শেষ। বিকেলের মরা আলোটা স্কাইলাইটের কাচে ঘন সবুজ হয়ে ফুটছিল। ফরফর করে সেই অদৃশ্য প্রাণীটা খুপরির মধ্যে বসে একবার পাখা ঝাপটাল। ঘরের কোণে, আলমারির আড়ালে ছায়া জমল। চেয়ারগুলো এক-এক করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত ঝিমানো পায়ে গুড়ি গুড়ি বেরিয়ে পড়ছিল সবাই। আমি যাবো কিনা জিজ্ঞেস করতে জানকীবাবু বললেন,—বসুন, এক সঙ্গে যাবো। খুব তাড়া আছে নাকি?

—নাঃ, তেমন কিছু নেই—ঠিক আছে, চলুন এক সঙ্গেই—। জানকীবাবুকে বললাম। অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। শান্তা এতক্ষণে হয়ত রীতিমত অধৈর্য হয়ে পড়ছে। দত্তদের ডিস্‌পেনসারী থেকে পিকিং ডায়ার্স, ওইটুকু সীমানার মধ্যেই কতবার পায়চারী করছে সে। পার্কে ঢুকবে না, সেখানে এখন গিজগিজ করছে মানুষ। হাতে ঘড়ি নেই। নিশ্চয়ই দত্তদের ডিস্‌পেনসারীর বড় দেয়াল ঘড়িটায় ও সময় দেখছে বার বার।

অবশেষে প্রায় সবাই যখন উঠে গেছে জানকীবাবু তখন খাতা বন্ধ করলেন। জগদীশবাবু নেই। জানলার দিককার রুবু শাড়ি-পরা মেয়েটি যেতে যেতে ফিরে এল। বন্ধ ড্রয়ারটা কয়েকবার টেনে দেখল, চাবি ঠিকমত লেগেছে কি না। কেমন অদ্ভুত এক কায়দায় যেন নেচে নেচে ও শাড়ির কুঁচি, পাড়ের পাট ঠিক করতে লাগল। গোড়ালি দিয়ে পিছনের পাড়টা মাড়িয়ে, শরীরটা কখনো পিছনে, কখনো পাশে বেঁকিয়ে, একটু বসার ভঙ্গি করে আবার টান টান হয়ে তারপর দেহটা মুচড়ে আবার পেছনটা দেখতে লাগল—সব মিলিয়ে যেন এক নিঃশব্দ নাচের ভঙ্গি। ফাঁকা ঘরের চারদিক জুড়ে এখন শুধু বাতাসের শব্দ। তার মধ্যে ঠুকঠুক করে খুব জোরাল শব্দ তুলে ও বেরিয়ে গেল এক সময়।

শান্তা নিশ্চয়ই আজ তার কমলারঙের শাড়িটা পরে এসেছে। বিকেলের রোদ্দুরের সঙ্গে কেমন আশ্চর্য মানিয়ে যায় রঙটা। আমি একদিন বলেছিলাম, কমলা রঙটাই আমার পছন্দ। কেন বলেছিলাম, কোন প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছিল, ঠিক মনে নেই। শাড়িটা পরে ও বলেছিল,—এই রঙটা? তখন বুঝতে পেরেছিলাম, ও আমার পছন্দমত রঙের শাড়ি পরতে শুরু করেছে। শুক্রবার দেখেছিলাম? সেটা বোধ হয় আবীর রঙ। পরশু ছিল গোলাপী। আজ নিশ্চয় সেই কমলা রঙটা পরে এসেছে ও।

জানকীবাবু শিরাবেরকরা হাত দুটো হঠাৎ টান টান করে লম্বা একটা হাই তুললেন। চোখ দুটো আঙুলে চেপে চেপে রগড়ালেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন,—কি?

খুব দেরি হয়ে গেল নাকি? কিন্তু কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি টেবিলের তলা থেকে মগটা বার করলেন আবার। একটু হেসে বললেন,—আর একটু বসুন, এই যাবো আর আসবো। কেমন?

আমার সম্মতি বা আপত্তির কোন প্রয়োজনই ছিল না তাঁর। অথচ এমনভাবে কথাটা বললেন যেন আমার মত নিয়েই তিনি বাইরে যাচ্ছেন। ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার বলি,—আমার জন্যে একজন অপেক্ষা করছে বাইরে। কিন্তু জানকীবাবুর স্বভাব অনুযায়ী—কে দাঁড়িয়ে আছে? কেন দাঁড়িয়ে আছে? ইত্যাদি বিরক্তিকর প্রশ্নগুলোকেও এড়িয়ে যেতে চাইলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও খারাপ লাগছিল। কাঁটা দুটো যেন রেগে যাওয়া শান্তার ভুরুর মত কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আজ বলে এলেই ভাল হত, প্রথম দিন, একটু দেরিও হতে পারে। স্কাইলাইটের খুপরির মধ্যে যেন শব্দ হল আবার। হয়ত পাখিটা গলা বাড়িয়ে দেখছে এখনো। অথবা ওপরের আকাশে কিছু দেখতে পেল কিনা কে জানে।

—কি ভাবছেন? এক হাতে মগ, অন্য হাতে পেটে দড়ি বাঁধা একটা সাবানের টুকরো নিয়ে জানকীবাবু ঢুকলেন। মুখটা, হাত দুটো কনুই পর্যন্ত জলে ভিজে শপ শপ করছে। টেবিলের তলায় মগ আর সাবান রেখে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ হাত বেশ রগড়ে রগড়ে মুছলেন। তারপর কাপড়টা আঁট করে পরে, জামাটা টেনে টেনে সোজা করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি? চলুন এবার যাওয়া যাক আস্তে আস্তে।

বাইরে প্যাসেজটা খাঁ খাঁ করছে। একটু আগেই এখানে অনেকগুলো মানুষের রাজ্য ছিল। সকালের খবরের কাগজের মত তারা পরস্পরের কাছে আকর্ষক আর উত্তেজনাময় হয়ে বসেছিল। এখন কেউ নেই। চেয়ারগুলো ফাঁকা। ফাঁকা জায়গায় ফ্যানগুলো ঝড়ের মত ফুঁসছে। আর টেবিলের তলা, আলমারির আড়াল থেকে যেন অন্ধকার ফুলে উঠছে। জানকীবাবুর রুগ্ন ছায়াটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর জুতোর গোড়ালিতে বোধ হয় লোহা লাগানো। নিস্তব্ধ বারান্দায় তাঁর পায়ের শব্দটা হাতুড়ির মত বাজছিল। শব্দটা এক অশরীরী সঙ্গীর মত সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সঙ্গে নামতে লাগল।

যখন আমি এখানে এসেছিলাম, আমার বুক কাঁপছিল। আনন্দে, কৌতূহলে, উৎকণ্ঠায়। কখনো বা এক অকারণ হতাশায় মুষড়ে পড়ছিলাম। অথচ এখন মনে হচ্ছে সেই অনুভূতিগুলো সব অসাড় হয়ে গেছে। জমানো ভাবনাগুলো ফুরিয়ে বুকটা ফাঁকা। মনে হচ্ছিল এই অবরোধের বাইরে গিয়ে নতুন করে নিশ্বাস নিতে না পারলে আমি স্বাভাবিক হতে পারবো না। বাইরের রাস্তাটা আমার জন্যে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে যেন। চেনা অচেনা কত অজস্র মানুষের ভিড়ে শহরটা গমগম করছে এখন।

হয়ত অনেক দেরি হয়ে গেল আমার। শান্তা কি এতক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? না করলে কিছুই করার নেই এখন। কাল দেখা হবে নিশ্চয়ই। নয়তো পরশু। ও হয়তো সত্যিই আমার ওপর রেগে যাবে। রাগলেই বা আমি এখন কী করতে পারি?

এখন অনেক কিছুই বোধ হয় বদলে নিতে হবে আমাকে। সময়-অসময়, পছন্দ-অপছন্দ, সব কিছুই। একটা নতুন রুটিন না বানালে এই অবসন্ন বিস্বাদ মেজাজটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। না হলে, দমচাপা এক নীরবতার মধ্যে অসহায় স্মৃতিজীবীর মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে, আমরা নিঃশেষ হয়ে যাবো।

# ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক সহযোগ : সূচনাপর্ব

**সৌরীন ভট্টাচার্য**

সহযোগিতা শব্দটি একালের প্রতিনিধিত্বমূলক। যে দায়ে মানুষ একদিন সভ্যতার আদিম-কালে সমাজ গড়েছিল, ঠিক তেমনিই ন্যূনতম অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে আজকের মানুষ সমাজাতিরেকী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। আজ কোন ব্যক্তি একক তো নয়ই—এমনকি কোন রাষ্ট্রও আজ আর সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভরতার দাবি করতে পারে না। একাধিক রাষ্ট্রের মিলনে গড়ে ওঠে বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠী, সামরিক জোট, প্রায় সকল রাষ্ট্রের সম্মিলনে তৈরি হয় জাতিসঙ্ঘ। আজকের পৃথিবীর যে কোন প্রত্যন্তের কোন ঘটনা নানা ঘটনাপরম্পরার জনক হতে পারে। হতে পারে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতময় এক জটিল আবর্তের রচয়িতা। শ্যাম-কম্বোজ থেকে হোয়াইট হাউস, গুজরাট থেকে রাবাত আজ সবই একসূত্রে বাঁধা। আরব-ইস্রায়েলের যুদ্ধে গুয়াতেমালার বাজারে জিনিসপত্রের দাম চড়ে। এই ব্যাপকতা, এই বিশ্বমুখিনতা এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিধিলিপি।

এই যেখানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সেখানে অর্থনৈতিক জীবনধারাও এর সমতুল হতে বাধ্য। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে প্রকট চরিত্রলক্ষণ হল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার অর্থনৈতিক দূরত্ব। এ বিশ্ব আর্থিক হিসাবে মোটামুটি দুটি শিবিরে বিভক্ত—উন্নত ও অনুন্নত বা অবোন্নত। মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয়, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার প্রভৃতি কিছু কিছু নিরিখ পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন যার বিচারে দুটি অর্থনীতির আর্থিক দূরত্বের কিছু আন্দাজ পাওয়া সম্ভব হয়। মাথাপিছু জাতীয় আয় সেই হিসাবে বেশ একটা নির্ভরযোগ্য নিরিখ। এই বিচারে আমেরিকা এবং ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ-গুলিকে যদি উন্নত বলে আমরা ধরে নেই তাহলে আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার অগণিত দেশ এবং নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিকে অনুন্নত বলে মানতে হয়। এশিয়ার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অবশ্য জাপান।

সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতির এক মৌল সমস্যা এই অনুন্নত দেশগুলিকে নিয়ে। কালের হাতে এই দেশগুলি কেবলই মার খেয়েছে। এদের অধিকাংশের ইতিহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায় গেছে বিভিন্ন পশ্চিমী শক্তির দ্বারা অধিকৃত ঔপনিবেশিক শাসনের। সেই কলঙ্কিত যুগের শেষ সব দেশে এখনো হয় নি। যাদের নামেমাত্র হয়েছে তাদেরও এখনো নানাভাবে জের টানতে হচ্ছে সেই উপনিবেশ-শাসনের। অথচ একথাও ঠিক যে আজকের দুনিয়ার ভাগ্য এক গভীরতর অর্থে জড়িত আছে এই অনুন্নত দেশগুলির ভাগ্যের সঙ্গে। পৃথিবীর স্থলভাগের বৃহত্তর অংশ জুড়ে এই দেশগুলির আয়তন। সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এই দেশগুলির বাসিন্দা। কিন্তু পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ এদের ভাগে পড়ে। এ দেশগুলির ভবিষ্যৎ অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্বের ভবিষ্যৎকে। কিন্তু এদের সমস্যারও অন্ত নেই। মোটের উপর এদের জাতীয় আয় কম। সেইসঙ্গে প্রায় অনেক দেশেই জনসংখ্যা তুলনায় বেশি। সুতরাং মাথাপিছু জাতীয় আয় আরো কম। এই সামান্য জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হয় দৈনন্দিন ভোগ্যদ্রব্যের পিছনে। সঞ্চয় হয় নামমাত্র। এই সামান্য সঞ্চয় মূলধনের পক্ষে অপ্রচুর। অতএব জাতীয় আয় কম থেকে যায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন তাই সম্ভব হয় না এ দেশগুলিতে। শিল্পপ্রকরণও তাই এদের অনাধুনিক। আর শিল্পোন্নয়ন যে দেশে ব্যাহত, স্বভাবতই সে দেশের অধিকাংশ লোক জীবনধারণের জন্য কৃষিনির্ভর। কৃষিও এসব দেশে একান্ত অনগ্রসর। চিরাচরিত প্রথার কৃষিকার্যে জমির ফলন প্রয়োজনের তুলনায় গৌণ। এই এক অবিরল দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে এই বিশ্বের তৃতীয় দুনিয়া।

অর্থনৈতিক বিচারে অনুন্নত হলেও বর্তমান বিশ্বব্যাপারে এইসব দেশের ভূমিকা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দু'রকম কারণই এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, সমগ্র পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অধিকাংশই এবং আধুনিক যন্ত্রযুগের অপরিহার্য সামগ্রী খনিজ তেল—এর প্রায় সমস্ত সরবরাহ এই দেশগুলির দখলে। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি প্রগতির পথে চলতে চলতে এমন এক সংকটের মুখোমুখি হয় যখন আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা ও জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্যের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে পড়ে। তখন আভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপন্ন সকল দ্রব্যের বিক্রয় আর সম্ভব হয় না। জিনিসপত্রের দাম পড়তে থাকে। শিল্পোৎপাদন সঙ্কুচিত হতে বাধ্য হয়—এবং এ-সবের প্রায় অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দেয় ব্যাপক বেকারী। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে উন্নত দেশগুলির প্রসঙ্গে কেইন্স্-প্রস্তাবিত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির নীতি অনেকটা কার্যকরী হয়েছে। বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা এইভাবে অন্তত অনেকদূর পর্যন্ত কমান গেছে। তবে পর্যাবৃত্ত মন্দা ছাড়াও ঐসব দেশের অর্থনীতির আরো একটি মূল সমস্যা রয়েছে। তা হল মূলধনের প্রাচুর্য। এই ধারণাটিকে একটু তলিয়ে বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে। শিল্পোন্নত দেশগুলি ক্রমবৃদ্ধির গতি অনুসারে এমন এক স্তরে উপনীত হয় যখন আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগের প্রত্যাশিত লাভ খুব কমে যায়। বিশেষ করে অনুন্নত দেশের ঘাটতি-মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনীয় পরিমাণের বিনিয়োগ সেখানে অনেক বেশি লাভের হারের সুযোগ করে দিতে পারে। তাই উন্নত দেশগুলি অগ্রগতির ঐ স্তরে পেঁছে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সন্ধান করে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগক্ষেত্রের। এখানেই নিহিত আছে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথা। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ-ক্ষেত্রের সন্ধানে একাধিক উন্নত দেশের রেষারেষিও প্রায় অনিবার্য। পশ্চিম ইয়োরোপের এই অর্থনৈতিক চরিত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই প্রকট হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূলগত কারণ এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইয়োরোপের দেশগুলি কিছুকাল থতমত খেয়ে থাকলেও তারা অচিরে নিজেদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করে নিয়েছিল। আর এই সময়কার সবচেয়ে উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মূলধন-রপ্তানীকার। মূলধন রপ্তানীর রীতিপ্রকৃতি ও অভিসন্ধিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের নিশ্চয়ই অনেক তফাৎ আছে—তবে তার মৌল সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বদল হয় নি। এ সবই মূলত ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনীতির কথা। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক নিয়মকানুন ভিন্নতর; বর্তমান আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে অনুন্নত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির শিল্পসামগ্রী ক্রয়, কাঁচামালের সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবি রাখে। কাজেই এই তৃতীয় দুনিয়ার বিষয়ে উদাসীন হওয়া উন্নত দেশগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। এই অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক

ও সামরিক কারণ। গত অর্ধশতাব্দী ধরে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ এক বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভালোমন্দ যাই হোক, এ-কথা আজ তর্কাতীত যে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। এবং আত্মরক্ষার তাগিদেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বিভিন্নরকম অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক জোটে আবদ্ধ। পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার ধনতান্ত্রিক কাঠামের স্থায়িত্বের পক্ষে সমাজতন্ত্রের এই অগ্রগতি বিপজ্জনক। বিশেষ করে সদ্যস্বাধীন অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের জোটভুক্ত করায় পশ্চিমী দেশগুলির আগ্রহও স্বাভাবিক। কারণ, অর্থনৈতিক দুরবস্থাই যে রাজনৈতিক বিপ্লব-সংঘর্ষের মূল এ ধারণা পশ্চিমে বদ্ধমূল। তাই এই অনুন্নত দেশগুলির স্বাভাবিক সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা পশ্চিমের আশঙ্কার কারণ। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে। সাম্যবাদের বিস্তার এবং তজ্জনিত পশ্চিমী শঙ্কা—এর দারুণ মূল্য কোরিয়া দিয়েছে, ভিয়েতনাম দিচ্ছে, কম্বোডিয়াতেও সেই একই ঋণ শোধের পালা চলেছে। একালে সমস্ত পশ্চিমী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে আমেরিকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন লক্ষ্য তাই সর্বদা সজাগ। তার প্রথম প্রার্থনা এ দেশগুলি মার্কিন জোটভুক্ত হোক, অন্তত কমিউনিস্ট কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য যেন না দেখায়; কাজেই নামেমাত্র হলেও এদের জোট-নিরপেক্ষতা মার্কিন স্বার্থের অনুকূল। জোট-নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে মার্কিন অর্থনীতির বিপুল প্রসারে এ-দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথ তাহলে দুর্গম হবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই ঐতিহাসিক বিরোধ এই আপৎকালেও সমানভাবে বিদ্যমান। দক্ষিণ-এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি তাই দম ফেলবার ফুরসৎ পাচ্ছে না।

দ্বিতীয়যুদ্ধোত্তর বিশ্বে এশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চীনে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। আমেরিকার সরাসরি সহযোগিতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট বাহিনীর হাতে জাতীয় চীনকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। ১৯৪৯-এর পর থেকে আজ দুই দশকের মধ্যেই চীনের আত্মপ্রতিষ্ঠা আমেরিকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামী দেশগুলির প্রতি তার সক্রিয় সহানুভূতি আমেরিকার অর্থনৈতিক-সামরিক স্বার্থের প্রতিকূল। তাই দক্ষিণ-এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির নীরব সাক্ষী হওয়া আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব।

ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন উৎসাহ আরো নিগূঢ়। এ কথা ঠিকই যে ভারতে এক্ষুনি একটা বড় রকমের কমিউনিস্ট বিপ্লবের আশঙ্কা আমেরিকাও করে না। তবে চীনকে বাদ দিলে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত। প্রকৃতিজ সামগ্রীর এখানে বিপুল সম্ভার। নবলব্ধ স্বাধীনতার জোরে সমগ্র এশিয়ায় তার রাজনৈতিক সম্ভাবনাও প্রচুর। এবং অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি জোট-নিরপেক্ষতা। প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণতন্ত্র সরকারীভাবে স্বীকৃত। কাজেই এ-দেশের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ ফলের দিক থেকে দূরস্পর্শী হতে পারে। সমগ্রভাবে পশ্চিমী চিন্তায় এ-বোধ প্রবল। কিন্তু এত বড় একটা দেশে কোনরকমের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করতে গেলে উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। শিল্পে অপরিণত ধনতান্ত্রিক কাঠামো আর কৃষিতে অবসন্ন সামন্ততন্ত্রের রেশ—এই ভিত্তিতে একটা দেশের পক্ষে কোন স্থায়ী রাজনৈতিক চেহারা অর্জন সম্ভব নয়। কাজেই পশ্চিমী শক্তির তরফে এ-কথা ঠিকই উপলব্ধি করা হয়েছিল যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদেরও একটা দায়ভার নিতে হবে।

স্বাধীনতার পর-পরই ভারতীয় বৈদেশিক নীতি তখনো এতটা মেরুদণ্ডহীন হয়নি। পঞ্চাশের শুরুতেই ভারত কোরিয়ার সমস্যায় তার সাবলীল জোর দেখিয়েছে। জোটনিরপেক্ষতার রাজনীতির যে একটা স্পষ্ট ভূমিকা আছে তা তখন প্রমাণিত হতে চলেছে। পশ্চিমী শক্তির পক্ষে ভারতের এই স্বাবলম্বন সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এবং এই রাজনৈতিক সাবালকত্বের সঙ্গে যদি ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তাহলে এক আত্মনির্ভর শক্তি হিসেবে ভারতের বিকাশলাভে আর কোন বাধা থাকে না। কিন্তু এত বড় একটা বৈদেশিক বাজার হারাবার ঝুঁকি নেওয়া পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না, শুরু হল এদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের চেষ্টা।

এ তো গেল যোগানের কথা। এই প্রক্রিয়ায় একটা চাহিদার দিক ছিল। পঞ্চাশের দশকে যখন ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার শুরু তখন তার পিছনে দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস। স্থানীয় সকল রকম শিল্পের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মূলত বিদেশী-মূলধন-পুষ্ট কিছু কিছু আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। অর্থনীতির বেশির ভাগ অংশই অসংগঠিত। কৃষি শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ। অথচ বনজ সম্পদে, খনিজ সামগ্রীতে আর অনাবাদী জমিতে এক দারুণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নয়নের পালা শুরু যে-দেশের তার পক্ষে অংশত বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য প্রার্থনা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। এর মধ্যে দোষেরও কিছু নেই। কারণ, একথা ঠিক যে ভারতের মত দেশ, যেখানে ইস্পাত প্রভৃতি ভারি শিল্পের প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণের সামগ্রীর প্রচুর সরবরাহ তার পক্ষে শিল্পোন্নয়নের পথ একান্ত অপরিহার্য ছিল। কিন্তু এসব আধুনিক শিল্পের উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের তখন বড়ই অভাব এদেশে। আর্থিক মূলধনের অভাব তো ছিলই—তার সঙ্গে ছিল উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কারিগরি দক্ষতার দারুণ অনটন। মূলধন, যন্ত্রপাতি ও কারিগরি দক্ষতার আংশিক অভাবপূরণের ক্ষেত্রে ভারত চেয়েছিল বিদেশী সাহায্য। এ চাওয়া সুস্থ চাওয়া হতে পারত যদি অগ্রসর রাষ্ট্রগুলির দিকে হাত বাড়ান একদিন সকলের অগোচরে হাত পাতার রূপ না নিত। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে সে দুর্ঘটনা ঘটতে দেরি হল না।

তার অনেক কারণ ছিল। প্রথমে অর্থনৈতিক কারণের কথাই ধরা যাক। জীবনের অন্যান্য নানা ব্যাপারের মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতেও একটা মাঝামাঝি রফা করার দায় আছে। একমাত্র বাতুল ছাড়া এমন কথা কেউ বলবে না যে ভারতে শিল্পোন্নয়ন আদৌ দরকার নেই, কৃষিকার্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। অথবা কৃষিকার্য নিতান্ত অবান্তর, শিল্পোৎপাদনই একমাত্র লক্ষ্য। শিল্পের ব্যাপারেও তেমনি কোন চূড়ান্ত পথ পরিক্রমার স্থান নেই বাস্তব পরিকল্পনায়। শুধুমাত্র ভারি শিল্পের প্রবর্তনা যেমন একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, তেমনি চরকা-তাঁত ভিত্তিক হাল্কা যন্ত্রপাতির উৎপাদনও আমাদের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রগত লক্ষ্য হতে পারে না। কাজেই পরিকল্পনায় এই রফার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশে মূলধন গড়ে তুলতে গেলে বর্তমান ভোগের ভাগে কিছু ঘাটতি পড়বেই। আগামী দিনের স্বাচ্ছন্দ্য রচনা করতে গেলে বর্তমানের স্বস্তি কিছুটা ত্যাগ করতে হবেই। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল এই যে কতটুকু বর্তমানে ছাড়ব, ভবিষ্যতে কতটুকু পাবার আশায়? এই প্রশ্নের বাস্তবানুগ সমাধানের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে একটা পরিকল্পনার সার্থকতা। কিন্তু ভারতীয় পরিকল্পনায় এই সিদ্ধান্তটা তেমন মগ্নভাবে বিচার করে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। দেশকে শিল্পোন্নত করতে হবে। আধুনিক শিল্পের প্রবর্তনাব্যতিরেকে দেশের অর্থনৈতিক

মেরুদণ্ড দুর্বল থাকে, কাজেই রাতারাতি ভারি শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা হল। কৃষিতেও আপাত উৎপাদনের লক্ষ্যের বদলে গ্রহণ করা হল বড় বড় বহুমুখী নদী পরিকল্পনা—যার জন্য প্রয়োজন অনেক মূলধনের এবং যার সমাপ্তির সময় অতিদীর্ঘ। দেখতে দেখতে দেশে সরকারী খরচ-খরচার বান ডেকে গেল। কিন্তু এদেশ মূলত গরীব। যাদের হাতে দুটো কাঁচা পয়সা এল তারা মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খাদ্য ও বস্ত্রের উপরে তা ব্যয় করল। ফলে কৃষির উপরে চাপ এল। কিন্তু কৃষি অনুন্নত ও অসংগঠিত বলে সে চাপের মোকাবিলা করতে পারল না। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়ল। কৃষিক্ষেত্রের অর্ধসামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের সুযোগে বাড়তি মুনাফা জমিদার-মিলমালিক-মধ্যস্বত্বভোগী এই শ্রেণীর হাতে গেল। গ্রামের শ্রেণী-দূরত্ব বাড়তে থাকল। কৃষির মূল্যবৃদ্ধি অচিরে শিল্পেও ছড়িয়ে পড়ল। দেশে দারুণ আকারের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। এইভাবে একটা সমস্যা থেকে আর এক সমস্যায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে ১৯৬৬তে এসে দেড় দশকের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করতে হল।

এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। এই ভূমিকায় ঈষৎ সূক্ষ্ম কিছু সমাজতাত্ত্বিক অবদানও ছিল। কথাটা প্রায় অনুচ্চার্য হলেও এ-কথা ঠিক যে ভারতকে তার স্বাধীনতা খুব রক্তের দামে অর্জন করতে হয়নি। ১৯৪৭এর ক্ষমতা হস্তান্তর আমাদের কাছে প্রায় পড়েপাওয়া জিনিসের মত এল—অন্তত যাঁদের হাতে স্বাধীন দেশের শাসনভার পড়ল তাঁদের কাছে তো বটেই। তাঁদের শ্রেণী-চরিত্রও এমন যে আবাল্য তাঁদের অধিকাংশ বিদেশে, (বেশির ভাগই ইংলন্ডে) শিক্ষিত, পেশায়, জীবিকায়, মননে ও মনোভঙ্গিতে তাঁরা অনেকেই ইংলন্ডের নির্ভুল অনুকার। তাঁদের জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্রপ্রীতি, পার্লামেন্টারি প্রথার প্রতি অনুরাগ সবই ইংলন্ডের উপহার। কাজেই ইংরেজ চলে গেল বটে, কিন্তু যাঁদের রেখে গেল তাঁদের মন পড়ে রইল ওদেশেই। এদেশের সমস্যাগুলোকে কোনদিন তাই এদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হল না। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কোন কোন দ্রব্যের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল, শ্রম আর মূলধন, উৎপাদনের এই দুই সহায়কের মধ্যে আমাদের প্রাচুর্য কোনটায় আর ঘাটতি কিসের সর-বরাহে, এদেশের আচার-ব্যবহার-রীতিনীতি-লোকের মেজাজ কোন ধরনের উৎপাদন আর টেকনোলজির পক্ষে সহায় এসব কোন প্রশ্নের বিচার করা হল না সুস্থভাবে। তারই ফল ভারতের মত অতিজনসংখ্যা ও বেকারির দেশেও অটোমেশনের জন্য হাহাকার।

এসব তো গেল শাসক-স্তরের কথা। ভারতের এই দারুণ দুর্ঘটনার দায়ভাগ অনেকাংশে আমাদেরও—অর্থাৎ যারা সাধারণ মানুষ তাদের। উগ্র জাতীয়তাবোধে আমরা যত পীড়িত হই, তীব্র জাত্যভিমান আমাদের তত জাগায় না। তাই জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা অসাড়ে সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার এত তারতম্য করি। আর সে তারতম্যে সাদা চামড়া নির্বি-চারে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পায়। ইংরেজ খুব দুশমন, কেননা সে আমাদের পরাধীন করে রেখে-ছিল, এ বোধ আমাদের চৈতন্যে যত প্রকট, ঠিক তেমনি প্রবল এ ধারণাও যে কি বিজ্ঞান-সংস্কৃতিতে, কি কারিগরি দক্ষতায়, কি শিল্পনৈপুণ্যে ইংরেজ বা সাধারণভাবে সাদা চামড়ার দেশের লোক সবাই আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। তাই এদেশে প্রস্তুত কোন সামগ্রীর বিদেশী খ্যাত কোম্পানির নামাঙ্কনে আমাদের ভক্তি বাড়ে, সে জিনিসের কাটতি বেশি হয়। দেশী যন্ত্রপাতি দিয়েই যেখানে কাজ চলে যায়, সেখানেও বিদেশী যন্ত্রপাতি না হলে আমাদের শিল্পের মান বাঁচে না। দেশী কারিগর যে-কাজ যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারে, সে-

কাজেও বিদেশী সহযোগী না হলে মন খুঁতখুঁত করে। এদেশের কোন সমস্যার সমাধানে বিদেশী বিশেষজ্ঞের দেওয়া রিপোর্ট আমরা মাথায় তুলে রাখি, দেশী বিশেষজ্ঞদের চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করি না। চৈতন্যের রাজ্যে এই যে বিদেশী অধিকার, বস্তুজগতে প্রভাব বিস্তারের এই তো প্রকৃষ্ট ভূমি। পশ্চিমী মূলধন আমাদের অর্থনীতিতে ঠিক এই সুযোগটাই গ্রহণ করেছে।

বিদেশী মূলধন মোটামুটিভাবে এদেশে আসতে শুরু করেছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়া থেকেই। গত দুই দশকে আমরা যত মূলধন পেয়েছি সেগুলোকে উৎসের হিসাবে সাজালে আমরা নিচের মত একটা ভাগ করতে পারি :

(ক) বিদেশী সরকারী সূত্রে প্রাপ্য ঋণ (loan) ও মঞ্জুর (grant) ;
(খ) বিশ্বব্যাঙ্ক, এইড্ ইন্ডিয়া কন্সর্টিয়াম্ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্য ঋণ;
(গ) ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রভৃতি থেকে প্রাপ্য ঋণ ও সাহায্য;
(ঘ) বিদেশী বেসরকারী সরাসরি বিনিয়োগ।

এর মধ্যে (ক)—(গ) সূত্রে প্রাপ্য মূলধনের প্রকৃতি ও পরিমাণ অর্থনৈতিক ছাড়াও আরো নানাবিধ কারণের উপর নির্ভর করে। তবে (ঘ) সূত্রে প্রাপ্য মূলধন মূলত অর্থনৈতিক নীতি-নির্ভর। আপাতত এই বেসরকারী সরাসরি বিনিয়োগ-এর স্বরূপ ও ফলাফলই আমাদের আলোচ্য।

আমাদের প্রথম পরিকল্পনার খরচের পরিমাণ খুব নিচু পর্দায় বাঁধা ছিল। বিনিয়োগের মূল ক্ষেত্র সে সময় স্থির হয়েছিল কৃষি। খাদ্যের ব্যাপারে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করা এবং দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার কিছু সমাধান এই ছিল প্রথম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। পর পর দুতিন বছর ভালো বৃষ্টি হল। পরিকল্পনাও মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। তারপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল লক্ষ্যের মধ্যে নেওয়া হল ভারি শিল্পকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার খরচের পরিমাণও অনেক বাড়ান হল। এই পরিকল্পনার শুরুতেই ১৯৫৬-৫৭ সালে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার দারুণ অভাব দেখা দিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রায় আমাদের সঞ্চয় ছিল ৯০২·৪ কোটি টাকা; ১৯৫৬-৫৭তে সেটা কমে দাঁড়াল ৬৮১·১ কোটিতে; আর ১৯৫৭-৫৮তে আরো কমে আমাদের সঞ্চয় দাঁড়াল ৪২১·২ কোটি টাকাতে।

পশ্চিমী শিল্পপতিরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের এই সুযোগ গ্রহণ করল। এদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারলে ঐ খাতে যে মূলধন আমাদের দেশে আসবে তা আপাতত আমাদের স্থিতিপত্রে (balance of payment) আয়ের খাতে জমা পড়বে। অর্থাৎ ঐ পরিমাণে অন্তত আমাদের স্থিতিপত্রে ভারসাম্যের অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। আমাদের দিক থেকেও এ সুযোগ লোভনীয় ছিল। আর তা ছাড়াও আমদানী শুল্ক ইত্যাদি ধার্য করার ফলে এদেশের সংরক্ষিত বাজার পশ্চিমী মূলধনের তরফ থেকে আরো আকর্ষণীয় মনে হল। কাজেই মূলধনের যোগান ও চাহিদার পূর্ণ মিলন হল ঐ সময়ে।

সরাসরি বিনিয়োগ এদেশে মোটামুটিভাবে যে চেহারা নিল তা মূলত সহযোগিতার। একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে থাকল ভারতীয় ফার্মের সঙ্গে বিদেশী ফার্মের। জানুয়ারি, ১৯৫৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪-র মধ্যে মোট ২০০০এর কিছু বেশি চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ৫৭৪টি, মুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ৩৩৭টি আর পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ২৯৪টি। এরাই আমাদের প্রধান শিল্পসহযোগী। বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গেই আমাদের চুক্তির সংখ্যা সর্বাধিক।

বেসরকারী বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভঙ্গি কি ছিল সেটা অনুধাবনযোগ্য। এ বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রথম ঘোষিত নীতি হল ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি। ১৯৪৯এ তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সংবিধান পরিষদের ভাষণেও সেই একই নীতির অনুরণন। তাতে বলা হল যে:

(*i*) the participation of foreign capital and enterprise should be carefully regulated in the national interest by ensuring that major interest in ownership and effective control should, save in exceptional cases, always be in Indian hands and that the training of suitable Indian personnel for the purpose of eventually replacing foreign experts will be insisted upon in all such cases;

(*ii*) there will be no discrimination between foreign and Indian undertakings in the application of the general industrial policy;

(*iii*) reasonable facilities will be given for the remittance of profits and repatriation of capital consistent with the foreign exchange position of the country;

(*iv*) in the event of nationalisation, fair and equitable compensation will be paid.

এই ঘোষণার মধ্যে বেশ একটা বাস্তব-বোধের পরিচয় ও সুস্থ বলিষ্ঠতার ভাব ছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই সুর বদল হতে লাগল। তারপর বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিদেশী বিনিয়োগকে স্পষ্ট উৎসাহ দেওয়া হল এবং কারণ হিসেবে বলা হল যে:

(*i*) finance brought into collaborations from abroad would be free from political strings unlike govt. grants and loans;

(*ii*) the outflow of returns on imported equity capital would be more flexible than on foreign loans and could be more easily adjusted to our payments circumstances;

(*iii*) the import of know-how would educate our countrymen in industrial techniques and take the country towards technological self-dependence.

এ তো গেল যে-সব কথা খোলাখুলিভাবে বলা হত। কিন্তু বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের উৎসাহদানের পিছনে সম্ভাব্য কারণ আরো কিছু ছিল—যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা চলে না। বিদেশী মূলধন চাই, কারণ দেশী মূলধনে কুলোচ্ছে না। কিন্তু বিদেশী মূলধনের উপর বেশি নির্ভরশীল হতে গেলে দেশী শিল্পপতিদের রক্তচক্ষু দেখতে হয় —কারণ বিদেশী মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ'টে ওঠবার জোর আমাদের শিল্পে ছিলও না, থাকবার কথাও না। আর বিদেশী বেসরকারী শিল্পের সঙ্গে হাত মেলালে বিদেশী

সরকারী ঋণ ও মঞ্জুর মেলবার সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই রফা হল সহযোগের। দেশী শিল্প-পতির সঙ্গে প্রবাসী শিল্পপতিকেও মালিকানার অংশীদার করতে হবে। আর এ ছাড়া অন্য উপায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদেশী মূলধন পাবার সম্ভাবনাও বেশি ছিল না।

আমাদের শিল্পে বিদেশী সহযোগিতার জয়যাত্রা শুরু হল সরাসরিভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। সহযোগিতাগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা সম্ভব—(১) আর্থিক সহযোগিতা ও (২) কারিগরি সহযোগিতা। আর্থিক সহযোগিতায় বিদেশী সহযোগী সরাসরি একটি ভারতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করতে পারে অথবা সে যন্ত্রপাতি (plant and machinery), প্ল্যান, ছক ইত্যাদি যাবতীয় কারিগরি প্রয়োজনীয় যোগান দিতে পারে এবং বদলে তার প্রাপ্য শেয়ারের অংশ নিতে পারে। কারিগরি সহযোগিতার সহযোগী ভারতীয় কোম্পানিকে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সঙ্গে দক্ষ, অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং বদলে সে বিশেষজ্ঞের মাইনে অথবা ট্রেড্‌মার্ক, পেটেন্ট ইত্যাদি বিক্রয় করলে তার বিনিময়ে রয়্যালটি পেতে পারে। সহযোগিতার আর-একটি মধ্যপন্থা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে তাও মূলত আর্থিক সহযোগিতার পর্যায়ে পড়ে। কারিগরি সহযোগিতার বিনিময়ে বিদেশী সহযোগীর প্রাপ্য রয়্যালটি এবং অন্যান্য পারি-শ্রমিক সে ভারতীয় কোম্পানির সমমূল্যের শেয়ারেও পেতে পারে। অর্থাৎ এটা হল বিদেশী ট্রেড্‌মার্ক ও পেটেন্টকে মূলধনে রূপায়িত করার এক উৎকৃষ্ট পন্থা। শুধুমাত্র রয়্যালটির বিনিময়ে বিক্রয় করলে ট্রেড্‌মার্ক পেটেন্ট-এর ঐ মূলধন চরিত্র থাকত না—অন্যান্য দ্রব্যের মত ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রীমাত্র হত।

ট্রেড্‌মার্ক ও পেটেন্ট-এর মূলধনে রূপায়ণের ব্যাপারটিকে আরো একটু অনুসরণ করা যেতে পারে। "ইকনমিক টাইম্‌স্‌" পত্রিকার রিসার্চ ব্যুরোর তরফ থেকে এই সহযোগিতার চুক্তিগুলোকে নিয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছিল। তাদের ফলাফলে[১] প্রকাশ যে ট্রেড্‌মার্ক ও পেটেন্ট ইত্যাদির জন্য রয়্যালটির কোন সাধারণ সূত্র চুক্তিগুলো থেকে দাঁড় করান সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই রয়্যালটির হার গ্রোস অথবা নীট বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রয়্যালটির হার বিক্রয়ের ২% বা ৩%। যদিও নিচের দিকে ০·৫% আবার উপরের দিকে ৫% পর্যন্তও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রয়্যালটির উপর আয়কর ধার্য। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই আয়করের হার ছিল ৬৩%; তারপর থেকে কমিয়ে এই হার করা হয়েছে ৫০%। এই তথ্যের বিবরণীর তলায় তলায় যে কথা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় তা হল এই যে বিদেশী ট্রেড্‌মার্ক ও পেটেন্টের প্রয়োজন মেনে নিলেও স্বীকার করতে হয় যে এ খাতে আমাদের খরচ আর কমান সম্ভব ছিল। কারণ, সব রকমের ট্রেড্‌মার্ক ও পেটেন্টের জন্য মূল্য দিতে হয় না। যে-সব পেটেন্ট বেসরকারী গবেষণার ফল কেবলমাত্র তাদের জন্যই আমরা মূল্য দিতে বাধ্য। আর যে-সব পেটেন্ট কোন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গবেষণাকেন্দ্রের আবিষ্কার এবং যাদের ফলাফল বিভিন্ন গবেষণা পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত তার জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে সার উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা সরকারী তত্ত্বাবধানে হওয়ায় এই শিল্পের পেটেন্ট আমরা বিনা মূল্যেই পেতে পারি। কিন্তু, রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ শিল্প, বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও যন্ত্র-পাতি এসব বিষয়ের গবেষণা প্রধানত বেসরকারী তরফে হয়েছিল। কাজেই এদের পেটেন্ট পেতে গেলে মূল্য দিতে হবে। তাই আমাদের সহযোগিতার চুক্তি যদি এদিকে নজর রেখে

[১] *The Economic Times*, Bombay. November 30, 1964.

সম্পন্ন হত তাহলে আমরা শেষোক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে পেটেন্ট আমদানীর নীতি এড়াতে পারতাম। কিন্তু বাস্তবে আমাদের যা ঘটেছে তা ঠিক এর বিপরীত। ১৯৬২ সালের শেষপর্যন্ত আমাদের মোট সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে ৭৩৫·৫ কোটি টাকার। এর মধ্যে ম্যানুফ্যাক্‌চারিং সর্বাগ্রগণ্য, তার পরিমাণ ৩২৭·৪ কোটি টাকা। ম্যানুফ্যাক্‌চারিং-এর মধ্যে আবার যন্ত্রপাতি ও তার সরঞ্জাম, ধাতু ও ধাতব দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি রাসায়নিক ও অনুষঙ্গী দ্রব্যাদি মিলে সহযোগিতা হয়েছে ১৯৭·৩ কোটি টাকার, অর্থাৎ ৬০%এর কিছু বেশি। সহযোগিতার চুক্তি যেহেতু সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ, তাই এদিকে সরকারী নজর আরো বিচক্ষণ হওয়া প্রয়োজন ও সম্ভব ছিল।

বৈদেশিক সহযোগিতার আলোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বৈদেশিক মূলধনের অংশগ্রহণের চরিত্র বিশ্লেষণ। সাধারণভাবে বলা যায় যে আর্থিক সহযোগিতায় বিদেশী শিল্পপতি দেশী ফার্মকে হয় শেয়ার কিনে তার মূলধন বৃদ্ধির সাহায্য করতে পারে অথবা সরাসরি সে দেশী ফার্মকে ঋণ দান করতে পারে। এ দুই পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ মালিকানা এবং অন্যান্য দিক থেকে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেয়ার কিনলে—তা ইকুইটি কিংবা প্রেফারেন্স শেয়ার যাই হোক না কেন, প্রবাসী শিল্পপতির তা থেকে ডিভিডেন্ড আয় তো হবেই, উপরন্তু স্থানীয় ফার্মের উপর মোট মূলধনে শেয়ারের অনুপাত অনুসারে তার মালিকানার অধিকার বর্তাবে। কিন্তু সমমূল্যের ঋণ পেলে স্থানীয় ফার্ম সে অর্থ তার নিজের ইচ্ছা, সুবিধা এবং প্রয়োজনমত ব্যয় করতে পারে। এবং বদলে বিদেশী শিল্পপতির আয় হবে শুধু ঐ ঋণের উপর অর্জিত সুদ—চুক্তির বিধি অনুসারে। মূলধন ঋণ মারফৎ গ্রহণ করলে আমাদের তরফ থেকে স্বাধীনতা অনেক বেশি থাকে—তখন আমরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি ঐ অর্থে বিশ্বের যে কোন শস্তা বাজার থেকে ক্রয় করবার সুবিধা পেতে পারি। কিন্তু ইকুইটি শেয়ারের মধ্যে যেতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী সহযোগী ঐ বিনিয়োগের সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগর ইত্যাদি যোগান দেবার বাধ্যবাধক চুক্তিও করিয়ে নেয়—যদিও সেই আনুষঙ্গিক যোগানের জন্য আমাদের অবশ্য রয়্যালটি ইত্যাদির দাম দিতেই হয়। কাজেই একথা সহজে অনুমেয় যে বিদেশী সহযোগীর স্বার্থের অনুকূল হল এদেশের বিনিয়োগে ভারতীয় ফার্মের একুইটি শেয়ারে অংশগ্রহণ।

শুধু তাই নয়, স্বাভাবিক কারণে বিদেশী সহযোগীরা চাইবে এদেশের কোম্পানিগুলোতে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণকে নিরঙ্কুশ করতে। শতকরা ৫০%এর বেশি একুইটি শেয়ার অধিকার করতে পারলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। অনেক গবেষকের মতে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করলে আমাদের কোম্পানিগুলোতে বিদেশী সহযোগীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণের জন্য ৫০% শেয়ারও দরকার হয় না। অনেক সময়ে ৪০% ভাগ শেয়ার হলেই চলে। কারণ আর্থিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব সহযোগীদের কারিগরি সহযোগিতা আছে, তাদের বিশেষজ্ঞেরা ঐসব ফার্মের নীতিনির্ধারণ-সভায় বসবার অধিকার পান এবং সর্বোপরি আছে বিদেশী বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর আমাদের অসন্দিগ্ধ আস্থা। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণ সম্বন্ধে ভারত সরকার সতর্ক থাকলেও সে পথ একেবারে বন্ধ করা হয়নি। ১৯৪৮-এর শিল্পনীতিতেই বলা হয়েছিল যে বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে কখনো কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন কি সর্বতোভাবে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি মিলবে। এবং শিল্প লাইসেন্স প্রথা চালু হবার পরেও অন্তত ৯টি ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি মিলেছে। আর সাধারণভাবে

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণের নীতি হিসেবে বলা হয় যে এরকম চুক্তিও অনুমোদিত হবে যদি নিচের শর্তগুলি পূরণ হয়:

(*i*) the project is in a high priority industrial field involving a difficult technology where India has made little or no progress to date;

(*ii*) the foreign exchange needs of the project exceed 50% of the total equity so that other sources of foreign exchange would have to be made available if majority equity participation is denied; or

(*iii*) the foreign collaborator agrees or offers to export a substantial part of the production of the new enterprise.

"ইকনমিক টাইম্‌স্"-এর রিসার্চ ব্যুরোর গবেষণায়[২] প্রকাশ যে তাঁদের আলোচিত ১৩১টি কোম্পানির মধ্যে ৮৮টি ইকুইটি শেয়ারের বিনিময়ে বিদেশী মূলধন পেয়েছিল। এইভাবে প্রাপ্য মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫·৩ কোটি টাকা। এই কোম্পানিগুলির মোট বিক্রীত শেয়ারের মূল্য ছিল ১২৭·২ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বিদেশী মূলধনের অংশগ্রহণ ছিল প্রায় ২০%। এর মধ্যে অন্তত ৬টি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণ ছিল।

মোটের উপর দেখা গেছে যে ঋণদান ও ইকুইটি শেয়ার ক্রয় করার মধ্যে বিদেশী মালিকের ঝোঁক সর্বদাই ইকুইটি শেয়ারের প্রতি। তার কিছু সাধারণ কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে লন্ডনের রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব ইন্টারন্যাশ্‌নাল অ্যাফেয়ার্স-এর গবেষক মাইকেল কিড্রনের মতামত উল্লেখযোগ্য। তিনি *Foreign Investments in India* নামে গ্রন্থ রচনার সময়ে ভারত পর্যটনে এসেছিলেন এবং এখানকার বহু শিল্পপতি ও সরকারী-বেসরকারী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'বিদেশী সহযোগ' বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে ঋণ ও ইকুইটির মধ্যে শেষোক্তের প্রতি যে বিদেশীর মোহ তার পিছনের মূল কারণগুলি হল:

(১) এতে করে চড়া দামে পুরনো যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা চলে:
(২) সরকারী কর এড়ান সম্ভব হয়;
(৩) বাজারের সংরক্ষণ ও বিস্তার সম্ভব:
(৪) ইকুইটি বিনিয়োগ বেশি লাভজনক:
(৫) ভারতীয় সরকারের এতে উৎসাহ ছিল:
(৬) কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিজেদের প্রভাবাধীন রাখা চলে;
(৭) ব্যাঙ্ক ঋণ পাবার সুবিধা হয়।

কিড্রনের এই মন্তব্য পুরোপুরি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করবার মত তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এর মধ্যে (১) এবং (৫) নম্বর কারণ আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ভারতের বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য দু'টি স্মরণযোগ্য।

আমাদের শিল্পে বৈদেশিক সহযোগিতা আমন্ত্রণের সময়ে বলা হয়েছিল যে এতে আমাদের ঘাটতি স্থিতিপত্রের কিছুটা সুবিধা হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট কিছু পরিমাণে মোচন হবে। আর দ্বিতীয় কারণ যেটা দেখান হয়েছিল সেটাও কম জোরাল নয়।

[২] *The Economic Times*, Bombay. November 30, 1964.

ভারতের মত এত বড় একটা দেশ যখন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথ গ্রহণ করছে তখন তার পক্ষে প্রাগ্রসর দেশগুলির কাছ থেকে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করা সমুচিত এবং এমনিভাবে আমাদের কারিগরি কর্মীর মধ্যে বিদেশের উন্নতমানের টেকনোলজির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিতে পারলে তার ফল দূরপ্রসারী হতে পারে। যুক্তি হিসেবে দুটোই খুব সুস্থ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ফল হিসেবে এই সহযোগিতার পথে দেশের অর্থনীতির কী লাভ হল দেখা যাক।

প্রথমে ধরা যাক বৈদেশিক মুদ্রার কথা। শুধুমাত্র বৈদেশিক মূলধনের আমদানী-রপ্তানীর আভ্যন্তরীণ হিসাব থেকে আমরা নিচের তালিকাটি পাচ্ছি:

**বৈদেশিক মূলধন—আভ্যন্তরীণ হিসাব, ১৯৪৮-৬১**

| | | |
|---|---|---|
| **বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষয়** | | |
| মূলধন পরিশোধ | ১৪১·১ | কোটি টাকা |
| বিদেশে প্রেরিত লাভ | ৩৮১·০ | ,, ,, |
| রয়্যালটি ও অন্যান্য পারিশ্রমিক | ১৯৬·৩ | ,, ,, |
| মোট | ৭১৮·৪ | কোটি টাকা |
| **বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তি** | | |
| অর্থের হিসাবে গ্রোস বিনিয়োগ | ৬০·২ | কোটি টাকা |
| দ্রব্যাদির হিসাবে গ্রোস বিনিয়োগ | ১৮৬·৯ | ,, ,, |
| মোট | ২৪৭·১ | কোটি টাকা |
| বিকলন-স্থিতি (debit balance) | ৪৭১·৩ | ,, ,, |

উৎস: Michael Kidron—*Indo-foreign Financial Collaboration in the Private Sector.*

অর্থাৎ প্রায় দেড় দশকের প্রচেষ্টার ফলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে যা পেলাম তার তিন গুণেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হল। এই হিসাবটাকে একটু উল্টে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ কি অর্থে দেশীয় অর্থনীতির উপর চাপ হয়ে দেখা দেয়। কাজেই বিদেশী মূলধন আমন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আরো সজাগ হওয়া উচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতেও ব্রিটিশ মূলধনের প্রায় এই একই চরিত্র ছিল। তখন না হয় দেশ পরাধীন ছিল। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে না হয় আমাদের কোন হাত ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতালাভের এক দশকের মধ্যেই আমাদের সতেজ পররাষ্ট্রনীতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এরকম মেরুদণ্ড-বিহীন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে দাদাভাই নৌরজির ড্রেন থিওরি এই সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এ-কথা নিশ্চয়ই মনে রাখা দরকার যে তখনকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার পরিমাণগত ফারাক বিস্তর। তবুও এ আশঙ্কার কথা। কারণ কোন দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখবার পক্ষে স্বাবলম্বী অর্থনৈতিক শক্তি প্রাথমিক শর্ত। বহির্বিশ্বে ভারতের মূর্তি ম্লান হয়ে যাচ্ছে বলে চারিদিকে যে আর্তনাদ শোনা যায়, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই অর্থনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেই তার মূল নিহিত।

উপরের তালিকায় যে হিসাব দেখান হয়েছে তার মধ্যে বিদেশী সরকারী সূত্রে প্রাপ্য এবং বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্য দু'রকম মূলধনই মিশে রয়েছে। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্য

মূলধনের প্রভাব আমাদের স্থিতিপত্রে কি রকম হয়েছে সেটা অংশত বোঝা যাবে নিচের তালিকাটি থেকে।

**বাণিজ্যিক স্থিতিপত্রে সরাসরি বেসরকারী বিনিয়োগের মোট অবদান**

(কোটি টাকা)

| | ১৯৫৬ | ১৯৫৭ | ১৯৫৮ | ১৯৫৯ | ১৯৬০ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক. বর্ষশেষে মোট বিদেশী বিনিয়োগ | ৪৭৮·২ | ৪৯৬·১ | ৫০০·৪ | ৫১১·৫ | ৫৬৬·৪ | — |
| খ. বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্য মূলধন (নীট) | ২৪·৯ | ১৭·৯ | ২·৪ | ১১·০ | ৫৩·৩ | ১০৯·৫ |
| গ. লাভ, ডিভিডেন্ড, রয়্যালটি ইঃ | ২২·৮ | ২৬·২ | ২৫·৫ | ৩০·১ | ৩৬·৩ | ১৪০·৯ |
| ঘ. (খ.—গ.) | +২·১ | −৮·৩ | −৭·৬ | −১০·১ | +১৭·৩ | −৩১·৪ |

উৎস: K. K. Subrahmanian: *Foreign Private Investment and Balance of Payments.*

এ তালিকা থেকেও দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশী বিনিয়োগ মূদ্রাসঙ্কট মোচনের দিক থেকে আমাদের পক্ষে ভালো হয় নি। পাঁচ বছরের সহযোগ চেষ্টার ফল হয়েছে—৩১·৪ কোটি টাকা। তব এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে বিদেশী বিনিয়োগের সার্বিক ফলাফল বিচারের পক্ষে শুধুমাত্র স্থিতিপত্রের উপর মোট প্রভাব দেখা একদেশদর্শী হতে পারে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা উচিত যে এই বিনিয়োগের ফলে আমাদের স্থিতিপত্রে কারেন্টে অ্যাকাউন্টে কি ফল হচ্ছে, এবং সব মিলিয়ে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আবহাওয়াতেই বা কি ফল দাঁড়াচ্ছে। এসব বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। তবে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজন অংশে পরিবেশন করা হল। কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলাফল প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল যে ভারত লাভজনক লগ্নীর পক্ষে এক প্রশস্ত ক্ষেত্র। U.K. Board of Trade-এর তরফ থেকে পরিচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে ১৯৬২তে ভারতে ব্রিটিশ লগ্নীর গড় লাভের হার ছিল ৯·৪%। এই হার অন্য অনেক দেশের চেয়েই বেশি। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ এই পাঁচ বছরে ভারত লাভ, সুদ ও ডিভিডেন্ড বাবদ বিদেশে পাঠিয়েছে মোট ১৩৫ কোটি টাকা।

সহযোগিতার নীতি থেকে আমাদের দ্বিতীয় প্রত্যাশিত ফল ছিল এদেশে কারিগরি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার বিস্তার ও উন্নত দেশগুলির টেকনোলজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়। আশা করা হয়েছিল যে কয়েক বছর বিদেশী দক্ষ কর্মীর সহযোগিতায় কাজ করে ধীরে ধীরে আমাদের কর্মীরা শিল্পোৎপাদনের কারিগরি দায়িত্ব নিজেরা বহন করতে পারবেন। বিষয়টিই এমন যে এর ফলাফলের কোন সংখ্যাগত বিচার হতে পারে না। আর গুণগত বিচার অনেকাংশে মনোভঙ্গিনির্ভর তো বটেই এবং সেই পরিমাণে তা হয়ত বস্তুনিষ্ঠ নয়। এসব কথা মেনে নিয়েও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ বিষয়ে যত লেখক লিখেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ মতামতের বিস্তর ভেদ সত্ত্বেও সবাই প্রায় একমত যে স্থানীয় কর্মীর মধ্যে কারিগরি দীক্ষার সম্প্রসারণে কিংবা এদেশে আধুনিক টেকনোলজির সার্থক রূপায়ণে আমাদের সহযোগিতার নীতি মূলত ব্যর্থ। অনেকেই অনেকরকমভাবে এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে এ পর্যন্ত সবাই একমত যে বিদেশী সহযোগীর তরফ থেকে এক মৌলিক অনীহা এবং আমাদের তরফে এক আত্যন্তিক শৈথি-

বোধই এর মূল কারণ। বিদেশী শিল্পপতি যখন এদেশে বিনিয়োগ করতে আসছে সে মূলত লাভের জন্যই আসছে—কাজেই কারিগরি বিদ্যার সম্প্রসারণ অথবা আধুনিক টেক্‌নোলজির বিস্তার এ নিয়ে তার মাথাব্যথা হবে না এটা অনুমেয়। কিন্তু আমাদের তরফে যে অকল্পনীয় শৈথিল্য, চিন্তা এবং বিচারশক্তির শোচনীয় অভাব (স্পষ্ট দুর্নীতিপরায়ণতার কথা উল্লেখ না করেই বলছি) দেখা গেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উচ্চ কারিগরি পদে ভারতীয়ের নিয়োগ প্রসঙ্গ আলোচ্য। দেশী-বিদেশী যৌথ ফার্মগুলির হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতনের ভারতীয় ছিল মাত্র ৭·৮%। ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারিতে মাসিক ৩,০০০ টাকা বেতনের ভারতীয় ছিল ২৪%। বেশির ভাগ ভারতীয় (প্রায় ৯২%) যাঁরা এই সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাঁদের বেতনের হার মাসিক ১,০০০—২,০০০০ টাকা।

উপসংহারে এ-কথা অবশ্য নিশ্চয়ই উল্লেখ করা উচিত যে এই সূচনাপর্বে পরিমাণগতভাবে বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগ খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সরকারী সূত্রে প্রাপ্য মূলধনের সঙ্গে এর অনুপাত প্রায় ১ : ৫, অর্থাৎ সরকারী মূলধনের এক-পঞ্চমাংশ বেসরকারী মূলধন, এবং তার পরিমাণ ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৪৩৮ কোটি টাকা। ঐ সময়ের মধ্যে সরকারী সূত্রে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। পরিমাণে স্বল্প হলেও এই সূচনাপর্বেই এর মধ্যে যে অশুভ ইঙ্গিত ছিল আপাতত কেবল তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা গেল।

### সংযোজন

**ব্রিটিশ লগ্নীর হার—১৯৬২**

| দেশ | লাভের হার | দেশ | লাভের হার |
|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ২৩·৪% | সুইট্‌সারল্যান্ড | ৭·০% |
| মালয় | ১৪·৪% | আর্জেন্টিনা | ৬·৯% |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৩·০% | বেলজিয়াম | ৬·০% |
| পর্তুগাল | ১১·১% | ডেনমার্ক | ৪·৭% |
| ভারত | ৯·৪% | পাকিস্তান | ৩·৫% |
| নেদারল্যান্ডস্‌ | ৯·২% | কানাডা | ৩·০% |
| ব্রেজিল | ৮·৫% | ফ্রান্স | ১·৮% |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৭·২৮% | | |
| অস্ট্রেলিয়া | ৭·১% | | |

উৎস: Reserve Bank of India : *Census of Foreign Assets and Liabilitie*

**বেসরকারী লগ্নী বাবদ বিদেশে প্রেরিত আয়**

| সাল | | | প্রেরিত আয় |
|---|---|---|---|
| ১৯৫৬-৫৭ | ... | ... | ২০ কোটি টাকা |
| ১৯৫৭-৫৮ | ... | ... | ২৪ " " |
| ১৯৫৮-৫৯ | ... | ... | ২৭ " " |
| ১৯৫৯-৬০ | ... | ... | ৩০ " " |
| ১৯৬০-৬১ | ... | ... | ৩৪ " " |
| | | মোট | ১৩৫ কোটি টাকা |

উৎস: Reserve Bank of India : *India's Balance of Payments.*

# ভাঙা আয়না

## সুধাংশু ঘোষ

অফিসবাড়িতেই এক ফাঁকে রায় জানতে চেয়েছিলেন, অমল সন্ধ্যেয় কোয়ার্টারে থাকবে তো? খুব সহজ গলায় নেহাত সাদাসিদে প্রশ্নটা করেছিলেন রায়। এর মধ্যে যেন নতুন লাগার মতন কিছু ছিল না, কোনো অস্বাভাবিকতার আঁচ না। অথচ অমল লক্ষ্য করেছিল, কথাটা আর কারো কানে না যায় তার প্রতি রায়ের সতর্ক দৃষ্টি। তখনই অমলের মনে হয়েছিল, তার সামনে একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশের অন্ধকার ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল। ইদানীং ঢাকাঢুকো সরিয়ে দিয়ে সত্যিগুলো বড় তাড়াতাড়ি মুখ দেখায়।

সন্ধ্যেয় তার কোয়ার্টারের সামনে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার রায়কে পাইপ কামড়ে ধরে নামতে দেখে অমল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জীপ খালি করে রায় নামলেন, ড্রাইভার আনেন নি। তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, পাইপ কামড়েধরা দাঁত দেখা গেল।

অমল হাসি-হাসি মুখ করল, 'আসুন।' গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল না। এর জন্যে তো তৈরিই ছিল।

রায়ের ভারী শরীর ভারী ব্যক্তিত্ব বারান্দায় উঠে এলে অমল আবার লক্ষ করল, রায় উচ্চতায় তার সমান, বরং একটু বেশি। সাধারণত সোজা হয়ে দাঁড়ান, আজ আরো চেষ্টাকৃত কঠিন ঋজুতা এসেছে। অবশ্য পাইপটা হাতে নিয়ে দরজায় পা রেখে ঢিলেঢালা মেজাজে বললেন, 'কী করছ হে অমলবাবু?'

অমল আজ সন্ধ্যেয় কী করছে জানবার জন্যে রায় আসেন নি। আজই হঠাৎ পাঁচিল-গুলো ভেঙে পড়ে নি অথবা ডানা মেলে উড়ে যায় নি। সযত্নে তৈরি অনেকগুলো পাঁচিল ডিঙিয়ে তার দিন-রাত্তিরের খবর নিতে রায় নিশ্চয়ই আসেন নি। অথচ অমলের সঙ্গে তাঁর কিছু একান্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ অত্যন্ত প্রয়োজন। আঘাত থেকেই নাকি জন্ম। নয়নতারার অমন বেমালুম চলে যাবার আঘাতে রায়ের হৃৎপিণ্ডে একটি যন্ত্রণার কুঁড়ি জন্ম নিয়েছিল। এখন সেই কুঁড়িটা পাপড়ি মেলে দিয়েছে। রায়ের শার্ট, গেঞ্জি, চামড়া, হাড়ের পরত কেটে অমল দেখতে পাচ্ছিল।

প্রথমদিকে অমলের ঘরদোর সাজিয়েগুছিয়ে রাখবার বাসনা ছিল। খুব সম্প্রতি সেসব বালাই পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলেছে। বিছানার চাদরটা কুঁচকে আছে, মেঝেয় নোংরা, ময়লা জামাপ্যান্ট ঝুলছে। লোহার চেয়ারের ঘষায় দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে। এই টাউন-শিপ এই কোয়ার্টার রায়ের নির্দেশে তৈরি। অল্পদিন আগে বানানো ঘর অমলের হাতে পড়ে কেমন চেহারা নিয়েছে, রায় দেখছিলেন কি দেখছিলেন না বোঝা গেল না। লোহার চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসা রায়ের ট্রাউজার্সের পাকা ধানের রঙ আলোয় চিকচিক করছিল। হাত-কাটা শাদা সিল্কের শার্ট, কবজি চওড়া, একটু দর্শনীয়ভাবে লোমশ। পদ-মর্যাদাসচেতন, কঠিন, গম্ভীর। এই ঘরের সঙ্গে রায়কে মেলানো অসম্ভব। অথচ রান্নাঘর-সংলগ্ন বারান্দায় পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অমলের বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছিল না, বরং রায়ের নরম ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা দেখে আমুদে এবং একই সঙ্গে ঈষৎ তেতো হাসি চাপতে হচ্ছিল।

চা নিয়ে এসে অমল বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল, দুজনের মাঝখানে বিবর্ণ টেবিলটা। রায় শরীরের ভার ডান থেকে বাঁয়ে সরিয়ে নিলেন, চায়ে চুমুক দিয়ে নড়েচড়ে শিথিল করলেন বসার ভঙ্গি।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি হঠাৎ কেন এমন এলাম।' রায় গলায় প্রচুর স্নিগ্ধতা মাখিয়ে দিলেন।

অমল সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তা কেন? আমরা কে কেমন আছি আপনি তো খোঁজ নিয়ে থাকেন।' রায় তেমন কিছু করেন কি না, কোনোদিন করেছেন কি না, অমল জানে না। তবু চটপট কথাগুলো বলে দিল। সব দায়িত্ববোধের ঝামেলা ধুয়েমুছে গেছে।

নিজেকেই যেন রায় বলছিলেন, 'তোমাদের একটু দেখাশোনা করা আমার উচিত। হয়ে ওঠে না, আজকাল নানাকাজে আর হয়ে ওঠে না।'

সন্ধ্যে উতরে গিয়ে রাত্তির এখনো আসে নি। অনেকে হয়ত কাজ থেকে ফেরে নি, অনেকে সবে ফিরেছে। অন্ধকার ঘন হয় নি বলে টাংস্টেন আলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। বড় জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখল, সামনের রাস্তাটা নির্জন। একটা জীপ চলে যাবার শব্দে অমল সেদিকে তাকিয়েছিল।

রায় নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে যেন প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা ছুঁড়ে দিলেন, 'অমল, নয়নের কোনো খবর জানো?'

অমল কী বলবে, বলার আছে কী? সুনন্দর মতো চোয়াড়ে অট্টহাসিতে মাথার ওপরের অ্যাসবেস্টসের ছাত উড়িয়ে দেবে?

অমলকে একটুক্ষণ চুপ দেখে রায় তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন, 'তোমার সঙ্গে মিশতো, তাই তোমাকে বলছি।'

'আমি কী খবর জানব বলুন। এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, কার্শিয়াংয়ে স্কুলে চাকরি নিয়েছে। এটুকু জানি। আত্মীয়তা তো আপনার সঙ্গে। নয়নতারার বিষয়ে বেশি খবর আপনার জানবার কথা।'

রায়কে অমল কেমন করে বোঝাবে, সে এক লাফে বয়সের সেই বৃত্তটা পার হয়ে এসেছে যার মধ্যে স্বপ্নটপ্ন ছায়া ছড়ায়।

রায়ের চোয়াল একটু নড়ল। হাড় দুটো পরস্পরকে পিষল হয়ত।

'আমার কতটুকু খবর রাখবার কথা, সে আমি জানি। তুমি কতটুকু জানো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তুমি চিঠি পাও না? তুমি তো নয়নের চিঠি পেয়েছ।'

'পেয়েছি। ব্যক্তিগত।—আপনাকে আর একটু চা দেব?'

চেয়ারটায় বিশ্রী একটা শব্দ হল। অমল চমকে উঠল না, শুধু সোজা সেদিকে তাকাল। যখন তাকাল, রায় আর নড়ছেন না, প্রায় পাথরের মূর্তির মতন। অমল ভাবছিল, আমি চিঠি পেয়েছি সে-খবর রাখেন দেখছি। আরো একটু নামলে পারতেন, কলকাঠি নেড়ে চিঠিখানা হাত করলে পারতেন। তাহলে আমার সঙ্গে নয়নতারার সম্পর্কের চেহারাটা ঠিক-ঠিক দেখতে পেতেন। অবশ্য রায় অত নিচে নামতে পারেন ভাবা হয়ত অন্যায়, রায় উঁচুতে থাকতেই অভ্যস্ত।

অথচ দেয়ালের প্লাস্টার-খসা ঘরের নোংরা মেঝেয় রঙ-চটা লোহার চেয়ারে বসে এখন রায় সত্যি অনেক নিচে নেমে গেলেন। গুহার মধ্যে থেকে ওপরে দাঁড়ানো অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নয়ন কী লিখেছে? চিঠি নেই তোমার কাছে?'

অমল বলে দিয়েছে, চিঠিটা ব্যক্তিগত, তবু দেখতে চাইছেন! অমল দেখেছে, যারা প্রতিদিন একটু বেশি পান করে, বিশেষ বিশেষ সময়ে অনেকক্ষণ ধরে গলায় কিছু ঢালতে না পারলে তাদের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে মনে হয়, রুক্ষ ঠোঁট ফেটে যায়, নিশ্বাস টানে হাঁ করে। নয়নের নাম উচ্চারণের সুখে রায়ের জিভ শুকিয়ে যায় নি, লালাসিক্তই ছিল এবং সেই জিভ দিয়ে তিনি রুক্ষ ঠোঁট দুবার চাটলেন।

'লিখেছিল, এখানকার থেকে ভাল চাকরি পেয়েছে। সে-চিঠি কোথায় ফেলেছি, এখন আমার মনে নেই। আমি চিঠি জমিয়ে রাখি না।'

নয়নতারার চিঠি বিষয়ে সাফ জবাব দিয়ে দেবার পর রায়কে করুণা করতে পারা, কৃপা করতে পারা সুখ না অসুখ স্পষ্ট বুঝবার আগেই অমল লক্ষ করল, রায়ের চোখ জ্বলছে, গুহা থেকে উঠে এসেছেন, চেয়ার থেকেও উঠে দাঁড়ালেন, পাইপটা নিপুণ হাতে জ্বালিয়ে নিয়ে দাঁতে চেপে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। হয়ত বললেন, 'চলি।' কথাটা ঠিক উচ্চারিত হল না।

রায় জীপে স্টার্ট দিতে দিতে অমল দরজায় তালা লাগাল। ঘায়েল জন্তুর মতো জীপটা পালাবার আগেই অমল অধিকতর ক্ষিপ্রতায় উল্লসিত তরুণ শিকারী জানোয়ারের মতন দৌড়ে গিয়ে জীপটায় লাফিয়ে উঠল।

'আমি যাব আপনার সঙ্গে। বেসক্যাম্পে নেমে যাব।'

অমল লাফ মেরে পেছনে উঠে বসেছিল। রায় একবারও ফিরে তাকালেন না। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, আলোগুলো এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল। রাস্তায় দুটি একটি লোক। শনিবার হলে এসময়ে রাস্তায় ভিড় থাকত, প্রচুর মুণ্ডা মেয়ে যুবক মুণ্ডাদের সঙ্গে নাচের তালে হেঁটে যেত। মুণ্ডা যুবতীদের প্রসঙ্গে অমল অবশ্য শুধু শুকমতীকে ভাবছিল। ভাবছিল আর, যদিও দেখবার কেউ নেই, লুকিয়ে হাসছিল, রাতারাতি বয়েস বেড়ে যাবার নেশায় ফুল্ল অথচ তেতো ঠোঁটচাপা হাসি।

টাউনশিপ পেরিয়ে গাড়িটা পাহাড়ের কোমরজড়ানো পথে ঘনঘন বাঁক নিয়ে বেপরোয়া বেগে এগোচ্ছিল। রায়ের হাতে আজ এমন ভয়ঙ্কর বেগ কেন, অমল ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবে না। সহজবোধ্য কারণটা অবশ্য দেখাতে পারবে, আঘাতের তীব্রতা অ্যাক্সিলারেটরে সঞ্চারিত। রায়ের বয়েস অমলের থেকে বছর পনের বেশি। অমল লাফ মেরে অনেক দূর চলে এলেও রাতারাতি নিশ্চয়ই পনের বছর পার হতে পারে নি। তবু ভাবতে চাইছিল, জীপের আরোহী দুজনের সমান বয়েস। এখন রায় দুটো হাতই স্টীয়ারিং থেকে তুলে নিলেও অমলের কোনো খেদ থাকবে না।

বেসক্যাম্পে পৌঁছে পুরোপুরি পেছনে না তাকিয়ে রায় বললেন, 'কোথায় নামবে?'

'এখানেই।' জীপটা সম্পূর্ণ থামবার আগেই অমল নেমে গেল।

গাড়ি নিয়ে রায় অদৃশ্য হলে অমল রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে ঘুরল। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূর সরে গিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। একটু ঢালে নামতেই রাস্তার আলো আর মোটেই পেল না, তবু অভ্যস্ত পায়ে দ্রুত নেমে গেল। মুণ্ডাদের বিয়ের উৎসবে অনেকের সঙ্গে ছাড়া রাত্তিরে আর কখনো হরোমটো গ্রামে আসে নি। একা এসেছে কয়েকবার, তবে দিনের বেলায়। আজ এখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেলে এমন একা ঢাল বেয়ে নামছিল, এমনভাবে পা ফেলছিল যেন অনেক কালের চেনা পুরোন পথে নিজের ঘরে ফিরছে।

গ্রামটায় তিন দিকে পাহাড়ের বেষ্টনী। পাহাড়গুলোর তরঙ্গিত শীর্ষরেখাটা এখনো

আকাশ থেকে আলাদা করা যায়। আগে আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দেখেছে, ওই দাগটা খুব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, ঘন মেঘ থাকলে পাহাড়ের ঢেউগুলো আকাশের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। আকাশে প্রচুর তারা থাকলে একটু অন্য রকম। আজ অবশ্য এসব খুঁটিয়ে দেখার চোখ ছিল না।

কয়েকখানা ঘরের পেছনের ক্ষেতের পাশ দিয়ে এসে সামনে উঠোন। উঠোনটার ওপাশেই অ্যান্ড্রিয়াসের ঘর।

দরজার একপাট ভেজান ছিল। দুতিনটে টোকা মারতে শুকমতী বাইরে এল। বাইরে এসেই সেই পাতলা অন্ধকারে অমলকে দেখে তার চোখ দুটো গোলগোল হয়ে এল, হাঁ হয়ে গেল মুখ। নড়তে পারল না, দাওয়ার পাথুরে মাটিতে পা আটকে গেছে। দরজায় টোকা মারার শব্দে বুঝেছিল, অ্যান্ড্রিয়াস আসে নি। নিজের বাড়িতে ফিরে অ্যান্ড্রিয়াস নিশ্চয়ই আধখোলা দরজায় টোকা মারবে না। অমলের চোখ দেখে বুঝতে পারল, অ্যান্ড্রিয়াসের খোঁজে আসে নি, তার কাছেই এসেছে। তবু শুকমতী বলল, 'অ্যান্ড্রিয়াস এখনো ফেরে নি। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

হাওয়া দিচ্ছিল। অমলকে দেখে অন্য ঘরের অন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। সম্ভবত অন্য কেউ তাকে দেখতে পায় নি। উঠোন-বারান্দার নির্জনতায়, অজস্র তারার এবং ঘর থেকে আসা মৃদু আলোয়, উত্তীর্ণ সন্ধ্যার বাতাসের ঝাপটা খেয়ে শুকমতী মুখ নিচু করে নিজের পায়ের ওপর চোখ রাখল না, সোজা তাকিয়ে রইল অমলের দিকে। চোখমুখের বিস্ময় মিলিয়ে গিয়ে বিচিত্র কৌতুক স্পষ্ট হল।

দরজায় টোকা মেরেই অমল উঠোনে নেমে এসেছিল। এখন দাওয়ায় একটা মোড়া দেখে খুঁটি ধরে উঠে গিয়ে জমিয়ে বসল। দৃষ্টি দিয়ে শুকমতীর শরীর বিদ্ধ করে চাপা গলায় বলল, 'আজ খেয়ে যাব, শুয়োরের মাংস। তাছাড়া হাঁড়িয়াটাড়িয়াও চাই।'

শুকমতী শব্দ করে হেসে উঠল। মনে হল, খানিকক্ষণ ধরে হাসি চাপতে তার কষ্ট হচ্ছিল। হাসতে পেরে দাওয়ার পাথুরে মাটি থেকে পা ছাড়াতেও পারল এবং উঠোনে নেমে কোথায় অন্ধকারে উধাও হল।

দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে যায় নি। দুপাটই খোলা। তবু ভেতরের কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। সামান্য আলোয় ঝুপসি অন্ধকার কাটে নি। কাপড়টাপড় ঝুলছে, একটা খাটিয়ার আভাস পাওয়া যায়। বারান্দাটা দুভাগ করা। খোলা অংশটায় অমল বসেছে, অন্য ভাগের চারদিকে দেয়াল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। তাকে একা বারান্দায় রেখে, হাসির গমকে শরীর কাঁপিয়ে শুকমতী কোথায় যেতে পারে। অমল প্রায় নিশ্চিত ছিল, দূরে কোথাও যায় নি, প্রতিবেশী কারো ঘরে যায় নি। হয়ত কাছেই শুধু তার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে গভীরতর অন্ধকারে কোথাও একটু দাঁড়িয়েছে। নিজেকে অমন দাঁড়িয়ে যতটা দেখা যায় দেখছে, নিজের শরীরের কাঁপা দেখছে। আজ সন্ধ্যে পার হয়ে গেলে এই বারান্দায় অমলের এমন বসে থাকা একান্তভাবে শুকমতীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার স্বাদ অন্য কাউকে দিতে পারে না। একা কোথাও দাঁড়িয়ে তার জন্যে অমলের বসে থাকার স্বাদ নিচ্ছে শুকমতী। ফিরে আসবে, এখনই ফিরবে।

কাছের কোনো ঘর থেকে বাচ্চাদের চিৎকার, স্ত্রীলোকের গলা ভেসে আসছে। উঠোনে একটা ঘাস নেই, পরিচ্ছন্ন। সেই উঠোনে নিজের অস্পষ্ট ছায়া ফেলে শুকমতী ফিরছিল। স্বাভাবিকভাবে পা ফেলছে না, দুলছে চাপা হাসির গমকে। এগিয়ে এসে দাওয়ার খুঁটি ধরে

দাঁড়িয়ে প্রায় সহজ গলায় বলল, 'সত্যি খাবে? কিন্তু শুয়োরের মাংস কোথায় পাব? সবজি করেছি, রুটি করেছি। আর, হাঁড়িয়া খেলে তুমি বমি করে মরে যাবে। অন্য কিছু দিতে পারি।'

শুকমতী ঘরে গেল। খানিক পরে রুটি-তরকারি আর জল এনে রাখল অমলের সামনে। আবার ঘর থেকে আলোটা এবং একটা বোতল নিয়ে এল যার কাঁচের রঙ ঘন নীল। সর্বক্ষণ হাসছিল। চোখে দুঃসহ কৌতুক। এত হাসছে কেন। শিশুকে নাচিয়ে হাসছে না কি শুকমতী। প্রায় রাগ হল অমলের। শুকমতী আলোটা নামিয়ে রাখতেই অমল ক্ষিপ্র হাত বাড়াল। ধরতে পারল না, শুধু ছোবল মারার মতন ছুঁয়ে গেল শুকমতীর কবজি অথবা আঙুল। কেমন অবলীলায় পেছনে সরে গিয়ে আরো অনেক জোরে সরু গলায় হেসে উঠে পাতলা অন্ধকার ফালাফালা করে দিল মেয়েটা। তখনই দাওয়া থেকে নেমে প্রায় ছুটে উঠোন পার হয়ে আবার কোথায় চলে গেল।

এ শুধু খেলা, অমল ভাবছিল, মেয়েটা নিশ্চয়ই এখনই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এখানে একা বসে রুটি-তরকারি খাওয়ার মতন খিদে কোথায়। নীল কাঁচের ওপর লণ্ঠনটা আলো ফেলেছে। শূন্য পাত্র নয়, ঠাট্টা করে নি। বয়েসের যে-গণ্ডির মধ্যে নাকি স্বপ্নের কোমল ছায়া, খ্যাপা ঘোড়ার মতন তার বাইরে লাফিয়ে এসে অমল ভাবনার সুতো ছাড়ার বিলাসকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। রুটি-তরকারিতে হাত না দিয়ে, ঘননীল বোতলটা থেকে একবারে অনেক-টাই গলায় ঢেলে উঠোনের দিকে তাকাল এবং একটুক্ষণের মধ্যে মনে হল, উঠোনের রঙ বদলে গেছে। ঘরের মধ্যে এতক্ষণ কোথাও একটা বেড়াল লুকিয়ে ছিল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দেয়ালে হাত রেখে অমল একবার উঠে দাঁড়াল এবং তখনই আবার বসে পড়ল মোড়াটায়। বেড়ালটা হয়ত ভয় পেয়ে পালাল, ঘরের মধ্যে নয়, বাইরে। উঠোনে অস্পষ্ট ছায়া ফেলে ঢেউয়ের মতো কেউ ফিরে এল না। লণ্ঠনটা এবং অমল একা বসে, এছাড়া চরাচরে আর কেউ আছে মনে হল না, যদিও তখনো মাঝে মাঝে কাছের কোনো ঘর থেকে বাচ্চাদের চিৎকার কানে আসছিল।

লণ্ঠনটা সম্ভবত ঠিকই জ্বলছিল, পুরো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই আলো কম লাগছিল। একমুখো সুড়ঙ্গের মতন অ্যাডিটের মধ্যে টর্চ জ্বাললে এমন আলো হয়। পেছনের দেয়ালে মাথা কাঁধ ঠেকিয়ে, প্রায় চোখ বুজে ভাবছিল, টর্চ হাতে একটা অ্যাডিটের মধ্যে নেমে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে।

ঝিম ধরেছিল। কতক্ষণ খেয়াল নেই। অ্যান্ড্রিয়াস এবং সঙ্গে শুকমতী এসে বারান্দায় ওঠার আগে বুঝতে পারে নি। অ্যান্ড্রিয়াস আসুক, কিছুতেই কিছু আসে যায় না অমলের। বসেই রইল মোড়ায়। অ্যান্ড্রিয়াস রুক্ষ হাতে অমলের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল : 'ঘরে ফিরে যাও মিত্তিরবাবু। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

তখন আবার শুকমতী তীক্ষ্ম চিকন গলায় হেসে উঠল।

বোনের দিকে ফিরে তাকাল অ্যান্ড্রিয়াস। তার চোখে কী ছিল দেখা গেল না। বারান্দার কোণে একটা টাঙির ফলার ওপর একফালি আলো পড়েছিল। সেদিকে অ্যান্ড্রিয়াস তাকাচ্ছে কি না তা-ও ঠিক বোঝা গেল না। ঘননীল বোতলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে অ্যান্ড্রিয়াস আবার নামিয়ে রাখল।

উঠে দাঁড়িয়ে অমল বুঝল, হাঁটতে তেমন অসুবিধে নেই। বারান্দা থেকে উঠোনে নামবার সময় বলল, 'চলি', তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় রায় যেমন বলেছিলেন। পেছনে আর তাকাল না, নিজের প্রসারিত ছায়ার দিকেও না। ছায়াটা দুলছে দেখলে পা আরও বেসামাল

হতে পারে।

ক্ষেত পার হয়ে সামনের খাড়াই বেয়ে উঠতে কয়েকবার দুহাতই ব্যবহার করতে হল, মাটি·লতা শিকড় আঁকড়ে ধরতে হল। আলোর নিচে আসফল্টের কালো রাস্তার অর্ধবৃত্তটা নির্জন। ডান দিক থেকে একটা গাড়ির শব্দ আসছিল। গাড়িটা কাছে এলে দেখা গেল, একটা জীপ। অমল বাঁ হাত তুলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছে। জীপটা থামল, স্টীয়ারিং ধরে অ্যাসিস্টেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার দাস, একা। প্রায় চোখ বুজে অমল পাশে উঠে বসল। জীপটা নিয়ে দাস এসেছে আশীর্বাদের মতো। না হলে এখন টাউনশিপে ফিরতে প্রচুর ঝামেলা হত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় নি। আগে থেকেই যেন ঠিক ছিল, দাস এই সময়ে এখানে গাড়ি নিয়ে আসবে।

দাস গন্ধ পেয়েছে, অমলের আধখোলা চোখ, কোনক্রমে নিজেকে তুলে এনে সীটের ওপর ফেলে দেওয়া, লক্ষ করেছে। অভিজ্ঞ, সন্ধানী দৃষ্টি। দাস পিঠে চাপড় মেরে তারিফ করছিল, 'এই তো চাই, মিত্তির। সাবাস! কিন্তু এদিকে কেন? হরোমটোর এদিকটায় কী আছে?'

খুব খলিফার মতো অমল মৃদু মৃদু হাসল। হেসে বোঝাতে চাইল, আছে হে আছে, রত্ন আছে। তুমি জান না। হাসলেও তার মুখে নিশ্চয়ই ব্যর্থতার, মিথ্যে হয়রানির প্রচ্ছন্ন দাগ ছিল। সুতরাং দাস দেখে ফেলল এবং খুশী হল না। তাছাড়া দাস রত্নের খোঁজ জানে না এমন হতে পারে না। এসব গূঢ় ব্যাপারের সব দুর্জ্ঞেয় রহস্য তার নখের আয়নায়।

টাউনশিপের যে রাস্তাটা অফিসবাড়ির দিকে গিয়েছে তার সঙ্গে বেসক্যাম্পের এই রাস্তাটা মিশেছে এক জায়গায়। সেখানে গুমটিঘরের কাছে জীপটাকে দুমিনিটের জন্যে থামতে হল। খাকিপরা একটি লোক দেখে নিচ্ছিল জীপের মধ্যে কী আছে। অমলের মনে পড়ল, ক্যাশিয়ার মুখার্জিবাবুকে দাস জীপে উঠতে না দেওয়ায় এখানে একদিন সে আচমকা নেমে গিয়েছিল। নিজের সেদিনের আচরণ আজ হাস্যকর মনে হল। ভাবছিল, লোকে অমন রাগ অভিমান দেখায় কৈশোরে।

টাউনশিপে নিজের কোয়ার্টারের সামনে নামল, দাস যাবে প্রসপেকটিং ক্যাম্পের দিকে। অমল নেমে বাঁদিক থেকে ঘুরে ডাইনে দাসের পাশে এসে একটু দাঁড়াল, প্রায় মনে মনে বলল, 'ধন্যবাদ।' দাস কতকালের গলাগলি দোস্তর মতো হাত বাড়িয়ে তার হাতে চাপ দিল। সারা মুখে রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে, চাপা গলায় বলল, 'ওখানে নয় হে, মিত্তির, ওখানে নয়, তুমি ঠিকানা জান না। আমি তোমায় নিয়ে যাব।'

## তের

সন্ধ্যের দিকে আজকাল মোটেই সুনন্দর দেখা পাওয়া যায় না। অফিস ফিরতি সোজা বেসক্যাম্পে গিয়ে দেখেছে, ঘরে তালা বন্ধ। অফিস থেকে টাউনশিপে নিজের ঘরে ফিরে একটু সাফসুফ হয়ে নিয়ে অমল হেঁটে অথবা ভাগ্য ভাল হলে কারো গাড়িতে বেসক্যাম্পে গিয়ে সুনন্দর দেখা পায় নি। কাছের একটা চেনা গুমটিতে একদিন গিয়েছিল। পরিচিত অন্য কয়েকজন সেখানে ছিল, সুনন্দ ছিল না।

কেউ পরিষ্কার করে কিছু না বললেও অমল বুঝতে পারছিল, সুনন্দ ইদানীং সন্ধ্যের দিকে কোথায় কী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকছে। সুনন্দ ইউনিয়ন করছে। প্রায় রোজ অফিসের পরে

একটার পর একটা গম্বুটিতে হানা দেয়। আগে আগে শুধু আড্ডা দিত, একেবারে নিচের ধাপের মজুরদের সঙ্গেও মেলামেশা করত। এখন সে-সবই আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ইউনিয়নের কথা। ঠিক এই মুহূর্তের প্রশ্নটাও অমলের কানে এসেছে। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন মেনে নেয় নি। সুনন্দরা ইউনিয়ন মেনে নিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করবে। তার আয়োজন চলছিল।

অমল সুনন্দকে কয়েকদিন ধরে খুঁজছিল। কারণটা ব্যক্তিগত। কিন্তু সুনন্দ এর মধ্যে অমলকে খোঁজে নি কেন? ব্যক্তিগত প্রয়োজন হয়ত ছিল না। ইউনিয়নের ব্যাপারে কি অমলকে ডাকা যায় না? ইউনিয়নের ব্যাপারে সুনন্দ তাকে কোনো কথা বলে না কেন? কাজের সময় হঠাৎ কখনো দেখা হলেও তো এবিষয়ে কিছু বলে না। তার ওপর কি এ ব্যাপারে সুনন্দর একটুও আস্থা নেই?

সন্ধ্যের দিকে নিজের কোয়ার্টারে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক্যাল সেকশনের দাস প্রায় রোজ আসছে। অমলকে সমঝদার পেয়েছে। তাকে ঠিক ঠিকানায় নিয়ে যাবে। অমল প্রায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। এ সময়ে সুনন্দকে পেলে সন্ধ্যেগুলো কাটাতে পারতো। দুদিন মুখার্জিবাবুর ঘরে গিয়েছে। রোজ রোজ সেখানে যাওয়া যায় না। দাসের দৃষ্টি এড়িয়ে মুখার্জিবাবুর কোয়ার্টারে লুকিয়ে থাকা কেমন হাস্যকর মনে হয়। ভরতের দোকানেও বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। তাছাড়া দাস তাকে খুঁজতে এসে কোয়ার্টারে না পেলে ভরতের দোকানে ঢু না মেরে যাবে না। সেদিন ভরতের দোকান থেকেই তো তাকে টেনে নিয়ে এলো। দাসের ইচ্ছে ছিল, সেখান থেকেই তাকে নিয়ে সোজা ঠিক ঠিকানায় চলে যাবে।

অমল তাকে এড়াতে চাইছে বুঝতে পেরেই হয়ত দাস আরো খেপে যাচ্ছিল। কেন যে লোকটা এমন করছে! সেই একদিন হরোমটোর মোড় থেকে অমলকে জীপে করে টাউনশিপে পৌঁছে দেবার সময় দাস তার গায়ে গন্ধ পেয়েছিল। যেহেতু দাস আর কিছু ভাবতে পারে না, তাই ধরে নিয়েছিল, মুণ্ডাদের গ্রামে রত্নের সন্ধানে গিয়েছিল অমল। তারপর থেকে লোকটা তাকে কিনে নিয়েছে। লোকটা এমন হন্যে হয়ে উঠেছে কেন, অমল কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। দাসের মনোভাবে খুব একটা কুয়াশা আছে মনে হয় না। অমলের সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেলে লোকটার আত্মসম্মান বাঁচে, হাড়ে তৃপ্তির বাতাস লাগে। দাস প্রমাণ করতে চায়, অমলের সঙ্গে সে এক নৌকোয় ভাসছে।

সত্যিই এক নৌকোয় ভাসছে না কি! না হলে সেদিন দাসের মাথায় লোহার চেয়ারটা ভাঙতে পারল না কেন? তাছাড়া হরোমটোর মোড় থেকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবার সময় দাস তার সম্বন্ধে অস্বাভাবিক কিছু কি ভেবেছিল?

সেদিন সন্ধ্যেয় ভরতের দোকানে এসে তাকে যখন ডাকল, দাস একা ছিল না, ইলেক্‌ট্রিক্যাল সেকশনের মহাপাত্র ছিল সঙ্গে। দোকানের বাইরে এসে অমল খুব সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, 'এখানে বড় ভিড়, বসা যাবে না, ঘরে চলো।'

'আবার তোমার কোয়ার্টারে কেন হে, মিস্তির? চলো একটু আমাদের সঙ্গে, হাওয়া খেয়ে আসি।' এই প্রথম যেন অমল দেখতে পেল, দাসের দুতিনটে দাঁত কালচে।

অমল আগে আগে হাঁটছিল। ভরতের দোকানের কাছেই তার কোয়ার্টার। দুমিনিটে দরজায় পৌঁছে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গে এল ওরা দুজন। ভেতরে গিয়ে অমল দুজনকে চেয়ার দেখিয়ে দিল, আগের মতন সহজ গলায় বসতে অনুরোধ করল। অন্য কেউ এলে যেমন করে, ভেতরের বারান্দায় হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে আয়াস করে বিছানায় উঠে বসল।

দরকারের বেশি জোরে দেশলাইয়ের গায়ে কাঠি ঘষে সিগারেট ধরিয়ে দাস বলল, 'তোমার ঘরে বসে চায়ে গলা ভিজিয়ে সন্ধ্যেটা কাটাব নাকি! হিটারফিটার নিভিয়ে চলো দেখি। ভাল লাগবে। ফিরে এসে রাত্তিরে ভাল ঘুম হবে।' দাস তখন একবার একচোখে তাকাল।

'এক কাপ করে চা অন্তত খাও। কতক্ষণ আর লাগবে। তারপর যেও।' অমল ঠোঁটে সরল হাসি মাখাল।

'তুমি যাবে না নাকি?'

'আমি আর বেরোব না। আজ বেশ ধকল গেছে।'

'বাজে বাহানা করো না, মিত্তির, চলো। না গেলে পস্তাবে। তাজা জিনিস।'

'বললাম তো আমি বেরোব না। তোমরা চা খেয়ে কেটে পড়ো।'

'এ শালা তো কম ঘুঘু নয়! আমরা চলে গেলে একা একা মালের খোঁজে বেরোবে। আমাদের সঙ্গে গেলেই দোষ।' দাস শব্দ করে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াবার সময় মহাপাত্রের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মহাপাত্র ফিক করে একটু হাসল। হেসে দাসের মন্তব্য অনুমোদন করল।

ঠেলে সরিয়ে দেওয়া দাসের চেয়ারটা অমলের হাতের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। চেয়ারের পেছনটা শক্ত করে ধরে মাথার ওপর তুলবার চেষ্টা করল। তুলতে পারল না। খুব যে ভারী তা নয়, তবু তুলতে পারল না। ভারটারের ব্যাপার নয়, আসলে শক্ত আঙুলে চেয়ারের পেছনটা চেপে ধরেই অমল বুঝতে পারল, দাস অথবা মহাপাত্রের ওপর তার রাগ নেই। যা আছে তা শুধু বিরক্তি। শুধু বিরক্তির জোরে লোহার চেয়ার তুলে কারো মাথায় হাঁকড়ানো যায় না। বরং হাসতে পারা সহজ। তখনো ঠোঁটে হাসি রেখেই অমল বলছিল, 'উঠলে কেন? চা করছি যে।'

'তোমার চায়ে আমি পেচ্ছাব করি।' দাস বেরিয়ে গেল মহাপাত্রের সঙ্গে। দরজা পেরোবার সময় আরো কি সব বলছিল। অমলকে সারাজীবনের মতো শিক্ষাটিক্ষা দেবে বলে শাসাচ্ছিল।

ওরা চলে গেলে ঘরটা হঠাৎ যেন জুড়িয়ে গেল। শুধু ভেতরের বারান্দা থেকে শোঁশোঁ শব্দটা আসছিল। কেটলি থেকে ঘন বাষ্প বেরোচ্ছে। হিটার নিভিয়ে দিল অমল। এই মাত্র তো ভরতের দোকান থেকে চা খেয়ে এসেছে।

ওরা যতক্ষণ ছিল, খুব বিরক্তি ছিল। তবে ওদের ওপর ঘৃণা হয় নি। অমল মনের মধ্যে ওদের প্রতি ঘৃণা খুঁজে পেল না। একটু ঘেন্না হয়ত হচ্ছিল। ঘৃণা আর ঘেন্না কি এক জিনিস? দুটো কথায় কখনো এক জিনিস বোঝায়?

একা ঘরে এত বেশি আলো খারাপ লাগে। অনেকদিন থেকে ভাবছে একটা কম আলোর ব্যবস্থা করবে। হয়ে ওঠেনি। বড় জানলাটার কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরের আলো ঘরে আসে বলে দরকারটাও তেমন বোধ করে নি হয়ত। এখন ঘরের উজ্জ্বল আলোটা চোখে লাগছে মনে হওয়ায় নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে জানলার পাশে সরে গেল। রাত্তিরের খাবার তৈরি করতে বেশিক্ষণ লাগবে না। দেরি আছে। এখন তো সবে সন্ধ্যে।

একা অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারল, দাসরা চলে গেলেও মন থেকে খারিজ হয়ে যায় নি। সঙ্গী হিসেবে দাসকে খুব অপছন্দ। শুধু সেই জন্যেই কি ওদের সঙ্গে হাওয়া খেতে গেল না? ঠিক একই উদ্দেশ্যে সুনন্দ যদি এসে তাকে ডাকতো। অমল অন্ধকারে চোখ

বুজে শুয়ে নিজের উদ্দেশে অনেকক্ষণ ধরে হাসছিল।

ক্রাশিং প্লান্টের হাঁ-মুখের সামনে বিরাট চত্বরটা ফাঁকা হয়ে এল। মুখের কাছে কয়েক-জন সশস্ত্র রক্ষী ছাড়া আর কেউ নেই এখন। ভেতরে কেউ কেউ থাকতে পারে, হেভি ইঞ্জি-নীয়ারিং সেকশনের লোকেরা, এখান থেকে দেখা যায় না। চত্বরের প্রান্তরেখায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে অমল পশ্চিমের উপত্যকার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। কোয়ার্টারে ফেরা হয় নি। জামাপ্যান্টে নোংরাটোংরা আছে। খাদে নামতে হয়েছিল। রেললাইন এবং ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটা ওয়াগনের ওপর থেকে ফুরিয়ে যাওয়া বিকেলের একটা হালকা হলুদ আলো পিছলে যাচ্ছিল, পশ্চিমদিকের খনি এলাকার গভীর খাদ থেকে বেরিয়ে পাতলা অন্ধকার প্রসারিত ছায়াগুলোকে আত্মসাৎ করছিল। আশপাশে অথবা দূরে কোনো শব্দ নেই, কোথাও ব্লাস্টিংয়ের আওয়াজ হচ্ছে না। ঠিক এই সময়ে পাখিটাখির ওড়বার কথা। মাথার ওপরে অথবা কাছের কোনো গাছের ডালে পাখি নেই। বড় নির্জন মনে হল জায়গাটা। দূরেও যে কেউ কোথাও আছে, এই মুহূর্তে তার প্রমাণ নেই।

এতগুলো বছর পরে, প্রচুর স্বপ্নটপ্ন নিয়ে আসার পরে, অমল ভাবছিল, এখানে তার আর ভাল লাগছে না, এখানে আর থাকা চলে না।

বেসক্যাম্প ছেড়ে আসার পর থেকে তার ঘরের তাসের আড্ডা ভেঙে গেছে। টাউনশিপে একটা বাড়িতে রিক্রিয়েশন ক্লাব। একদিকে লাইব্রেরি, একদিকে বড় হল ঘরে নানাবিধ খেলার সরঞ্জাম। সেখানে গিয়েও অমল জমতে পারে নি। অসুখটা তার নিজের মনে। সেই গোপন ব্যাধির জন্যে এখানকার স্রোতে আর সাঁতরাতে পারছে না।

বড় বড় গাছের ডালপালায় ঝাঁকানি দিয়ে আচমকা একটা ঝড়ো হাওয়া এল। ঠিক কোন্ দিক থেকে এল বুঝতে পারল না। কাছের গাছগুলোর কিছু ডাল দুমড়ে যাচ্ছিল, ধুলো আর শুকনো পাতা উড়ছিল অজস্র। ক্রাশিং প্ল্যান্টের বাড়িটার কোণগুলোয় লেগে এলোমেলো হাওয়া একটা বিচিত্র শব্দ তুলছিল। শুকনো পাতা সারা গা ঠোকরাচ্ছিল, ধুলোয় অন্ধ হয়ে যাবার মতন। ছুটে গিয়ে সশস্ত্র রক্ষীদের পাশে আশ্রয় নেওয়া যেত। অমল তেমন কিছু করল না, ঘুরে রেলিংয়ের ওপর পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। এখন ঝড় কেন? এটা তো ঝড়ের সময় নয়। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি নেই। শুধু শাদা বেড়ালের মতন টুকরো মেঘ ছিল আকাশে। এখন ঋতু বদলের সময় চলছে। সারাদিন এমন ঝড়ের কোনো আয়োজন ছিল না।

ইতিমধ্যে সব অন্ধকার। ক্রাশিং প্লান্টের বাড়ির আর রাস্তার আলো ধুলোয় ঢেকে গেছে। শুকনো অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে এই প্রথম মনে পড়ল, আজ বিকেল থেকে চা খাওয়া হয় নি, দাঁতজিভগলা ধুলোয় করকর করছে। এখানে এমন দাঁড়িয়ে থাকার কী মানে হয়! পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর। অমলের চোখ বন্ধ করে নিজেকে দেখার অভ্যেস অনেক দিনের। বস্তুত আয়না ছাড়াই নিজেকে দেখার খেলাটা খুব পছন্দ। ইদানীং এই খেলাটা প্রায়ই খেলছিল। এখন চোখ বুজে এখানে ধুলোর ঝড়ের মধ্যে নিজেকে দাঁড়ানো দেখে এক রাউন্ড হাসতে পারল। সেদিনও দাস আর মহাপাত্র রেগে চলে যাবার পর একা অন্ধকার ঘরে এইরকম হাসছিল।

আরো পরে অন্ধকার ঘন হলেও ধুলো ওড়া বন্ধ হলে হেঁটে ফিরছিল মাইন রোড ধরে। ঝড় থেমেছে, তবে বাতাসের ঝাপটায় তখনো বেশ জোর ছিল। একটা শিসের মতন শব্দ আসছিল সব দিক থেকে। রাস্তায় আলোগুলো আগের থেকে উজ্জ্বল। হাওয়া সব

ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। অবশ্য নিজের চুলের মধ্যে, আঙুলের ফাঁকে এবং দাঁতের চাপেও ধুলোবালি কিচকিচ করছিল।

অফিসবাড়িটাও পেছনে রেখে আরো দক্ষিণে খানিক এগিয়ে যাবার পর পেছন থেকে এসে একটা জীপ পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভারের পাশে আলি সাহেব। এতক্ষণ হয়ত অফিসবাড়িতে কোনো বিশেষ কাজে আটকে ছিলেন অথবা ঝড়ের জন্যে বেরোচ্ছিলেন না। এখন ফিরছেন প্রসপেক্‌টিং ক্যাম্পে। রাঘবনের প্রতিবেশী।

'আসবে নাকি, অমল?'

শুধু একটু হেসে অমল জীপে উঠল। আজ মনে হচ্ছিল, এখানকার সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। অন্য কোনো অফিসার তাঁর গাড়িতে উঠতে ডাকলে আজ অমল নিশ্চয়ই দ্বিধা করত। কিন্তু কয়েকবারই দেখেছে, আলি সাহেবের আচরণ স্নিগ্ধ। উঁচু অফিসারদের মধ্যে রাঘবন আর আলি সাহেবের জন্যে অমল একটু আলাদা জায়গা রেখেছে। জীপে উঠবার সময়ই জানতো, আলি সাহেব 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে', 'একা হেঁটে ফিরছো কেন' ইত্যাদি বাজে প্রশ্নগুলো করবেন না।

হেঁটে ফিরতে দেড় ঘণ্টা লাগতো। জীপে সেই পথ কয়েক মিনিটে শেষ হল। তাকে টাউনশিপে নামিয়ে দিয়ে আলি সাহেব আরো দক্ষিণে প্রসপেক্‌টিং ক্যাম্পের দিকে চলে গেলেন।

ঘরে ফিরে জামাপ্যাণ্ট না বদলেই চায়ের জল চাপিয়ে দিল। মাত্র এক কাপ চায়ের জল —শুধু হাতমুখ ধুয়ে আসতেই ফুটে গেল। চা তৈরি করে অন্য সময়ের মতন চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরের বারান্দায় গেল না, ঘরেই বসল টেবিলের সামনে। দুধ ছাড়াই চা করেছে। শুকমতী আজ দুধ নিয়ে আসে নি অথবা এসে দরজায় তালা দেখে ফিরে গেছে। চা খাওয়া শেষ হলে ভাবল, একসঙ্গে দুকাপ হলে জমতো। চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বুঝতে পারল, ধুলোবালিতে চাপচাপ হয়ে আছে। রাত্তিরের রান্নার জিনিস চাপিয়ে কুকারটা ধরিয়ে দিয়ে অমল স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। স্নান করল দীর্ঘ সময় ধরে। অনেক দিন এত সাবান মাখেনি, এত জল ঢালে নি গায়ে মাথায়। পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে আরো এক কাপ চা করে খেয়ে অমল যখন ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানার নতুন-পাতা চাদরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল, তখন নিজেকে খুব পবিত্র লাগছিল। যেন কোনোরকম দায়দায়িত্ব নেই, জড়িয়ে নেই কারো সঙ্গে, এই জায়গাটায় কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। চাকরির খাতিরে যেটুকু কাজ করা দরকার সেটুকু করলেই সব সম্পর্ক শেষ। নির্লিপ্ততা জিনিসটা কী, এতদিনে ঠিক বুঝতে পারছিল। পবিত্রতার বোধের সঙ্গে একটু ফাঁকাফাঁকা লাগছিল সন্দেহ নেই, তবে তাকে শূন্যতাবোধ বলা যায় না।

বাইরের দিকের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সেই দরজায় কে ঘা মারছিল। কে এসেছে অমল কাঁচের জানলা দিয়ে দেখতে পায়নি, চোখ বন্ধ ছিল। সন্ধ্যের এতটা পরে, যখন রাত্তির খানিকটা এগিয়ে গেছে, কারো আসবার কথা নয়। একমাত্র সুনন্দর কথা আলাদা। কিন্তু সে তো প্রায় রোজই এখানে ওখানে মিটিং করছে। তবু সুনন্দকে দেখবে ভেবেই অমল উঠে এল।

দরজা খুলতে প্রথমে সাপের চোখের মতন দুটো চোখ অমলের মুখ পলকে একবার চেটে নিল। দরজা খুলবার আগে ঘরের আলো জেবলে দিয়েছিল। সেই আলোর প্রথমে শুধু দুটো বীভৎস চোখ এবং তারপরই দেখতে পেল, বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যাম্ব্রিয়াস। অমল

একটু হাসবার অথবা কোনো কথা বলবার আগেই হাত দিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে অ্যান্ড্রিয়াস ভেতরে এল। শোবার ঘরের সব দিক দ্রুত দেখে নিয়ে দ্বিতীয় ঘরটায় গিয়ে আলো জ্বালল। অফিসার ছাড়া অন্যদের কোয়ার্টারগুলোর একই নকশা। কোথায় সুইচ অ্যান্ড্রিয়াসের জানা থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয় ঘরটা থেকে বেরিয়ে ভেতরের বারান্দা, রান্নাঘর, স্নানের ঘর এবং পেছনের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা তল্লাশি শেষ করে অ্যান্ড্রিয়াস শোবারঘরে ফিরে এল। উবু হয়ে তক্তপোশের তলাটা দেখে নিল একবার।

অমল এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি। এমন নাটুকে ব্যাপারের জন্যে মোটেই তৈরি ছিল না। তার এবং আরো কয়েকজন অ্যাসিস্টেন্ট সার্ভেঅরের সঙ্গে ভার বয়ে বেড়ানো অ্যান্ড্রিয়াসের কাজ। সে আজ তাকে দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে তার ঘরে এমন তল্লাশি চালাবে ভাবা যায় নি।

উবু হয়ে তক্তপোশের তলা দেখে নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াতে অমল প্রথম কথা বলতে পারল: 'এসব কী, অ্যান্ড্রিয়াস!'

সব দেখা হয়ে গেলে লোকটা কিছু বদলে গেল, সোজাসুজি আর অমলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না, যদিও তখনও অত্যন্ত রাগী চেহারা। খুব চাপা গলায় কয়েকটা কথা বলল, যা থেকে বোঝা গেল, বিকেল থেকে শুকমতীকে পাওয়া যাচ্ছে না। মোষগুলোকে ঘরে আনতে বেরিয়েছিল বিকেলে, একটা বাদে মোষগুলো নিজেরাই ফিরেছে, শুকমতী ফেরে নি।

শুকমতী ফেরে নি বলে অ্যান্ড্রিয়াস তার কোয়ার্টারে এসেছে তল্লাশি করতে! অমল কী বলবে তখনই ভেবে পেল না। আর কিছু কথা বলার, কোনো প্রশ্ন করার সুযোগও হল না। যেমন এসেছিল, অ্যান্ড্রিয়াস তেমনই নাটুকে ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, যাবার আগে একবারও অমলের দিকে তাকাল না, যেন এভাবেই মঞ্চ থেকে প্রস্থানের নির্দেশ ছিল।

অমল বেরিয়ে এসে দেখল, সামনের রাস্তাটা ফাঁকা, কয়েকটা কোয়ার্টারের খোলা জানলায় আলো, রাস্তার আলো উজ্জ্বল নয়, দুপাশের গাছের এবং ঘরবাড়ির ছায়া পড়েছে অনেক রকম। অ্যান্ড্রিয়াস কীভাবে এসেছিল, কীভাবে গেল, হেঁটে না কারো গাড়িতে, বুঝতে পারল না। সেদিন দাসরাও তাকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবার জন্যে জীপ এনেছিল কিনা দেখতে পায় নি। সম্ভবত জীপ এনে একটু দূরে কোথাও রেখেছিল, তারপর হেঁটে এসেছিল ভরতের দোকান এবং তার কোয়ার্টার পর্যন্ত।

অ্যান্ড্রিয়াস খাকি পরে কেন। যুদ্ধের পর এই ধরনের পোশাক সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। অ্যান্ড্রিয়াস এই পোশাক কোথায় পেয়েছে। আজ অ্যান্ড্রিয়াস খালি হাতে তার ঘরে এসেছিল এবং সম্ভবত একাই এসেছিল। মারমুখো একটা দল বাইরে অপেক্ষা করছিল মনে হয় নি। লোকটা আজ খালি হাতে আসায় একটু খুঁত থেকে গেল। হাতে একটা ধারালো টাঙি থাকলে দৃশ্যটা পরিপাটি হত। টাঙিটার চকচকে ফলায় অমলের ঘরের জোরালো আলো ঝলসালে জমজমাট হত। অ্যান্ড্রিয়াসের এমন চেহারা আর একদিন দেখেছিল। সেদিন একটা মরা শুয়োরের জন্যে দারুণ লোভ হয়েছিল লোকটার।

ভরতের দোকানেও ভিড় নেই, সাহুর দোকান বন্ধ। রাত বেড়েছে, ঠিক ক'টা বেজেছে বোঝা গেল না, সঙ্গে ঘড়ি নেই। জনচারেক লোক ভরতের দোকানের ভেতরের দিকে এক কোণে জটলা করছে। লোকগুলো নেশা করেছে মনে হয়। ভরত আজকাল চোলাই চালাচ্ছে নাকি। ভরত এবং ওই লোকগুলো নিশ্চয়ই শুকমতীর বিষয়ে কিছু শোনে নি। ওরা কিছু

জানলে আর একটু উত্তেজনা দেখা যেত।

অমল এখন কী করতে পারে। হরোমটো গ্রামে এই রাত্তিরে যাওয়া চলে না। কেউ কেউ হয়ত ভাববে, শুকমতীর জন্যে তার বিশেষ উদ্বেগ কেন। অতদূর এখন যাওয়াও কঠিন। কারো গাড়ি পাওয়া যাবে না। সুনন্দর কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু বেসক্যাম্পও তো অনেক দূর। সুনন্দর খোঁজে গিয়েই বা কী লাভ। অ্যাম্ব্রিয়াস অমন লাফিয়ে কোথায় চলে গেল। অমলকে কি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত না, অন্তত আর কয়েকটা কথা বলা যেত না! শুকমতী আজ বিকেলে দুধ দিতে এসেছিল কিনা, তাও তো জানতে চাইল না অ্যাম্ব্রিয়াস।

রাস্তায় এলোমেলো খানিক পায়চারি করল। একটা লোক রাস্তার কল থেকে দুবালতি জল নিয়ে যাচ্ছিল। অমলের দিকে তাকাল একবার। কোথাও কোনো শব্দ নেই। টাউনশিপের এদিকটায় অন্তত শুকমতীর খবরটা চাউর হয়নি। কিন্তু মেয়েটা কোথায় যেতে পারে। একেবারে উধাও হয়ে যাবে কী করে। কাছেই কোথাও নিশ্চয়ই আছে। এতক্ষণে হয়ত ফিরে এসেছে ঘরে। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাম্ব্রিয়াস বিনয়ী এবং ভদ্র হলেও, ওর মনের মধ্যে প্যাঁচ। তাই অমন খ্যাপা জানোয়ারের মতন তার কোয়ার্টারে হামলা করে গেল।

হাওয়া নেই, একটা পাতা নড়ছে না। তবে গুমোট নয়, বরং বাইরেটা রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা। অমলের যখন কিছু করবার সুযোগ অথবা মেজাজ নেই, এই ফাঁকা রাস্তায় দুসারি কোয়ার্টারের মাঝখানে পায়চারির মানে হয় না। ঘরেই ফিরে এল। কুকারটায় আর হাত দিল না, শুয়ে-বসে ছটফট করল প্রচুর, তবে ঘুমও কিছু হল। একেবারে জেগে রাত কাবার করতে হল না। আসলে শুকমতীর জন্যে দুঃসহ দুর্ভাবনা হচ্ছিল না। বিকেলে মোষের খোঁজে গিয়েছিল। গলায় কাঠের ঘণ্টিবাঁধা মোষগুলো পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের মধ্যে যেদিকটায় চরতে যায়, সেখান থেকে হিংস্র জন্তুরা অনেক ভেতরে সরে গেছে। ময়ালটয়ালও কেউ দ্যাখে নি ওসব দিকে। শুকমতী অন্য ধরনের কোনো রগরগে ঘটনার কেন্দ্রে না থাকলে, অ্যাম্ব্রিয়াস টাউনশিপ থেকে ফিরবার আগেই নিশ্চয়ই ঘরে ফিরেছে।

সকালবেলা রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেল। ভরতের দোকানে গিয়ে সব জানা গেল। কয়েকটি মুণ্ডা মজুর চা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল। চাপা উত্তেজনার সঙ্গে রসিকতা মিশিয়ে কথা বলছিল তারা। একজন তো শব্দ করে হেসে উঠে অমলের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। অমল চা নিয়ে বসেছিল বাইরে, ওদের থেকে খানিকটা দূরে। ওরা অমলকে কিছু বুঝতে দিতে চায় না। সুতরাং অপেক্ষা করতে হল। ওরা চলে গেলে দোকান খালি। তখন ভরত সব বলল। অমলকে ভরত একটু করুণা করে। কেন যে এই মনোভাব তার অবশ্য ঠিক ব্যাখ্যা নেই।

পানের রসে কালচে দাঁত দেখিয়ে, চোখ ছোট করে ভরত ঘটনাটার বিবরণ দিল। কাল বিকেলে শুকমতী জঙ্গলের মধ্যে একটা গুমটিঘরে ঢুকেছিল। একা যায় নি, সঙ্গে একজন ছিল। মাচার ওপরে কাঠের ছোট ঘরটার গায়েই একটা শালগাছ, তার দুটো মোটা ডালের খাঁজে কয়েক লাখ মৌমাছি একটা বিরাট চাক বানিয়েছিল। কাল সন্ধ্যের ঝড়ে সেই গাছটা দুভাগ হয়ে যায়, মৌচাকটা ভেঙে মধু ঝরতে থাকে। মৌমাছিগুলোর রাগ গিয়ে পড়ে শুকমতীদের ওপর। ভাঙা চাক থেকে উড়ে গিয়ে পুরু কালো পর্দার মতন ছেয়ে ধরে গুমটিঘরটা, সারা রাত সেইভাবে ঢেকে রাখে। শুকমতীদের বেরিয়ে আসবার উপায় ছিল না।

ভোরের দিকে অ্যাম্ব্রিয়াসদের মনে হয়, জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এরোপ্লেন উড়ছে। এগিয়ে গিয়ে তারা মৌমাছির পাহাড়টা আবিষ্কার করে। হয়ত তারা শুকমতীদের চিৎকারও

শুনেছিল। দুকুড়ি মশাল বানিয়ে আগুন জ্বালিয়ে অ্যান্ড্রিয়াসরা মৌমাছিদের উড়িয়ে দেয়। এত সব কসরত করতে সকাল হয়ে গেল, রোদ্দুর এসে পড়ল গাছের ফাঁক দিয়ে। তখন শুকমতী আর একজন বেরিয়ে এল, ফাঁকফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকে অনেক মৌমাছি তাদের নানা জায়গায় হুল ফুটিয়েছে। বাইরে এসে শুকমতী মাথা নিচু করে গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করল, অন্য জন বেরিয়েই ছুটল উল্টো দিকে।

অন্য জনের রহস্যটা ভরত এমন সযত্নে বাঁচিয়ে রাখছিল কেন অমল বুঝতে পারল না। বলল, 'শুকমতীর সঙ্গে কে ছিল?'

চোখ খুব ছোট করে, কয়েকটা কালচে দাঁত দেখিয়ে ভরত বলল, 'ম্যাথু।'

অমল চেনে ম্যাথুকে। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্ড্রিয়াসের মতোই বিনয়ী। বয়স কিছু কম হবে, হয়ত শুকমতীর সমবয়সী। ভরতের দোকানে প্রায়ই ম্যাথুকে দেখা যায়। ভরতের সঙ্গে দোস্তি থাকতে পারে। হয়ত ভরত আগে থেকেই কিছু জানত, সেই জন্যে অমন রহস্য করছিল। ম্যাথুর কপালে একটা গভীর কাটা দাগ আছে। বাইরের সরু একফালি রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে অমল ম্যাথুর কপালের সেই দাগটা দেখছিল।

চা শেষ করে, কয়েকদিন ধরে মাঝেমাঝেই যেমন মনে হচ্ছে, এখন আবার সেই রকম মনে হল, এই জায়গাটায় আর ভালো লাগছে না।

ঘরে ফিরে কাজে যাবার জন্যে তৈরি হবার আগে অমল মাকে চিঠি লিখল।

## চোদ্দ

খুব সকালে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল। হাওড়া থেকে টালিগঞ্জ অনেকটা দূর, ট্যাক্সি করতে হলে বেশ কয়েক টাকা লাগত। ভোরবেলায় বাসে তেমন ভিড় ছিল না, অমলের সঙ্গে ভারী মাল ছিল না, আরামে বসেই আসতে পারল। বাস থেকে নেমে গলিতে ঢুকবার আগে মোড়ের চায়ের দোকানটায় একবার উঁকি মারল, যে-দোকানে অনেক সকালবিকেল কেটেছে। ভেতরে বসে আছে কয়েকজন, সবাই অচেনা। বাসে এতটা পথ আসবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে অজস্র মুখ দেখেছে, একটাও চেনা মুখ চোখে পড়ে নি। বস্তুত এই শহরটাই অচেনা হয়ে যাচ্ছে।

এখন এই একতলা বাড়ির বন্ধ দরজার ওপাশে অন্তত দুটো চেনা মুখ আছে। মা এবং মল্লিকা জানে, অমল ছুটি নিয়ে আসছে, চিঠিতে তা-ই লিখেছিল, আজই আসছে তা অবশ্য জানে না। এই সামান্য চমক দেবার ইচ্ছেটা যদি ছেলেমানুষি হয়, তাহলে এমন ছেলেমানুষ অনেকেই।

গলির দুপাশে কিছু অদলবদল দেখেছে, কিন্তু দরজার ওপাশে ছোট উঠোনটা একই রকম, মোটেই বদলায় নি। সামনেই মা, দুপা পেছনে মল্লিকা—মুখে এবং কপালের কয়েকটা চুলে জল, চিবুক অথবা নাসাগ্র থেকে এক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল, এই মাত্র স্নানের ঘর থেকে মুখ ধুয়ে এসেছে। দুজনের মুখেই হাসি ছিল, দু রকমের। মার মুখে হাসি ছিল বলা ঠিক নয়, মা হাসেন না, শুধু ক্বচিৎ কখনো আন্দাজ করা যায়—চাপা ঠোঁট খুশি লুকিয়ে রেখেছে।

মা বললেন, 'ট্রেনে শোবার জায়গা পেয়েছিলি?'

'বসে বসে খানিক ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

মল্লিকা বলল, 'কয়েকটা দিন আগে আসতে পারলি না!'

'কয়েকটা দিন আগে এলে কী হত?'

মল্লিকা বলল না কিছু, হেসে শাদা সুবিন্যস্ত দাঁত দেখিয়ে রহস্য বাড়াল। অমল টোপ গিললো না, ভাবল—এক-দেড় মাস অথবা দু-দশ দিন আগে-পরে আসবার মধ্যে কোনো লাভ-লোকসান নেই, মিথ্যে রহস্য তৈরি করা মল্লিকার স্বভাব।

তখনই নিজের ঘরে গেল না, জামাপ্যান্ট বদলালো না। হাতমুখ একটু ধুয়ে নিয়ে মা এবং মল্লিকার ঘরে মল্লিকার পড়ার টেবিলের গায়ে চেয়ারটায় বসে চায়ে চুমুক দিল। মা রান্নাঘরে, ডিমভাজার গন্ধ আসছে, পরে আবার চা হবে, মল্লিকা খাটে বসে পা দোলাচ্ছিল।

নিজের চায়ের কাপটা খাটের তলায় নামিয়ে রেখে মল্লিকা বলল, 'তুই কতদিন আছিস রে দাদা?'

'কেন?'

'সামনের একুশ তারিখে আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। তুই থাকলে তোকে নিয়ে যাব।'

'অনুষ্ঠান মানে?'

'চণ্ডালিকা, নিউ এম্পায়ারে।'

'নাচিস নাকি আজকাল?'

'পারলে নাচতাম। আমার চেহারাটা তো নাচিয়ের।' বিছানায় বসে দর্শনীয়ভাবে পা নাচালো মল্লিকা: 'চণ্ডালিকার মায়ের গান আমার।'

'গানটান করছিস তাহলে?'

'শিখছি।'

'পরীক্ষাটা কবে?'

'শুধু পেছোচ্ছে। এবছরে হতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'পরীক্ষা দিবি না?'

'দেব, পাশও করব, তারপর একটা চাকরিও জোটাব, দেখিস।'

মল্লিকা স্বচ্ছন্দে সরলরেখায় হাঁটছে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে না একবারও—এমন সহজ নাকি এই শহরে বেঁচে বেড়ে ওঠা—বিশ্বাস হতে চায় না। কনুই লেগে চায়ের কাপটা পড়ে যাচ্ছিল; ঠেলে টেবিলের কোণ থেকে সরিয়ে দিয়ে অমল বলল, 'তুই আজকাল চিঠিফিটি লিখিস না কেন রে? এককালে তো সুনন্দকেও লিখতিস। আমি না হয় দাদা, আমাকে না হয় না-ই লিখলি, সুনন্দ তো এক্স্ট্রাটেরিটোরিয়াল ইয়াংম্যান, তাকে লিখতে পারিস।'

'সুনন্দদার কী খবর?'

'বদলাচ্ছে। শ্রমিক নেতাটেতা হয়ে যাবে।'

'তুইও তো বদলাচ্ছিস। চুল উঠে তোর কপাল চওড়া হয়ে যাচ্ছে।'

'ললাট প্রশস্ত হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো বদল নেই।' অমল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের চুল সরাল।

'তোর কিছুই বদলায় নি? নয়নতারা মজুমদার তোর কিছুই বদলাতে পারে নি?' মল্লিকা আবার কয়েকটা শাদা দাঁত দেখাল।

অমল নিজেই বুঝতে পারল, সে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। 'নয়নতারা এসেছিল এখানে? বলেছিল অবশ্য আসবে।'

ডিমভাজা ইত্যাদি নিয়ে ঘরে এসে মা অমলের কথা শুনতে পেলেন। বললেন, 'মেয়েটি চিঠি লিখবে বলেছিল কার্শিয়াং থেকে। লিখলো না তো।'

নয়নতারা কেন চিঠি লেখে নি, কারো জানা নেই। সুতরাং নয়নতারার বিষয়ে মল্লিকা অথবা অমল আর কথা বলল না। মা-ও প্রসঙ্গটা টেনে রাখলেন না। তার বদলে সুনন্দর খবর জানতে চাইলেন। অমল শুধু বলল, 'ভালোই আছে, তবে এখনো আমারই মতন অ্যাসিস্টেন্ট, চাকরিতে উন্নতি হয়নি।'

অমলের প্যান্টটা ছাই রঙের, শার্টটা শাদা। ওখানে সবার শাদা জামাকাপড় হালকা গেরুয়া হয়ে যায় এবং সবাই সেই রঙটাকে শাদা ভাবে। মার শাদা থানকাপড়টা ঈষৎ ময়লা, তবু এখন অমলের শার্টের তুলনায় সেটাকেই মনে হচ্ছিল দুধরঙ।

মা হঠাৎ অমলকে বললেন, 'একবার বাজারে যাবি?'

'আমাকে বাজারে পাঠাবে! রোজ তোমাদের কী করে বাজার হয়?' মার প্রস্তাব অমলের মোটেই ভালো লাগল না।

'রাসুর মা বাসন মেজে বাজার করে দিয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন রেশন এনে দেয়।'

'আজ পারবে না?'

'পারবে না কেন?—রাসুর মা ভালো মাছটাছ চেনে না।'

'ধ্যেৎ। মাছ খাওয়া ভুলেই গেছি।—খুকি যাক না বাজারে।'

মল্লিকা জোরে মাথা ঝাঁকালো: 'এটা কি গড়িয়াহাট মার্কেট পেয়েছিস? এখানে আমি গেলে দেখার জিনিস হয়ে যাব। লোকে তাকিয়ে থাকে, বিশ্রী লাগে। কেউ কেউ অবশ্য যায়।' একটু থেমে আবার বলল, 'ঠিক আছে, আজ তোকে বাজার করে খাওয়াই। ট্রেনে রাত কাটিয়ে এসেছিস, আজ তোকে আদর করা উচিত।'

'থাক। আমিই যাচ্ছি। তোর যখন অভ্যেস নেই, তুই রাসুর মার থেকেও খারাপ বাজার করবি। কিন্তু তোর তো অসুবিধে হবার কথা নয়। এখানে তো প্রায় সবাই তোর চেনা।'

'তুই কিছুই খবর রাখিস না। এখানে কত লোক বেড়েছে, বাজারে কেমন ভিড়, তোর ধারণা নেই। চেনা লোক আঙুলে গোনা যায়।'

মা বললেন, 'বড় কইমাছ পেলে আনিস, আর একটা ফুলকপি।'

'এটা কি কপির সময়?'

মল্লিকা বলল, 'কলকাতায় কোল্ড স্টোরেজের কল্যাণে সব সময়ে সব পাওয়া যায়। দামটা অবশ্য চড়া।'

মার দিকে ফিরে অমল বলল, 'যাচ্ছি। তার আগে আর একবার চা দেবে না?'

'বাজার থেকে ঘুরে এলে দেব। না হলে তখন আবার চা চাইবি, সকালেই তিনবার হয়ে যাবে।'

অমল কষ্টে চেয়ারটা ঠেলেঠুলে উঠল। বাইরে এসে গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছতেই দুজনের সঙ্গে দেখা। পরিতোষ আর নিশীথ। দুজনের সঙ্গেই এক স্কুলে পড়েছে। সকালের রোদ্দুরে পরিতোষের শাদা জামাপ্যান্ট ঝকঝক করছিল। এই সকালে দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, খেয়েদেয়ে বেরিয়েছে—একবার তাকালেই বোঝা যায়। নিশীথ একেবারে অন্যরকম। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু নিশ্চয়ই বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামায় না, পাজামা-পাঞ্জাবি অত্যন্ত নোংরা, যেন এইমাত্র এ-ভাবেই বিছানা থেকে উঠে এল, চোখ-মুখেও জল দেয়নি।

একটা বাস আসছে দেখে পরিতোষ দৌড়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, সন্ধ্যের পর অমলের খোঁজ করবে। এখন সময় নেই, সাড়ে নটায় অফিসে পোঁছতে হবে।

বেশ ঝ‍ুঁকি নিয়ে পরিতোষ লাফিয়ে পাদানিতে উঠল। খুব স্বাভাবিক দৃশ্য।—পাশ-টাশ করেছে, সকালবেলায় স্নানখাওয়া সেরে অফিসে যাচ্ছে। অমলের মনে হল, এই তো ফিরে এসেছে চেনা মহলে।

বাসটা দূরের মোড় ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেলে অমল আবার নিশীথের দিকে তাকাল। তখন নিশীথ বলল, 'সিগারেট দে।'

পাশেই সিগারেটের দোকান। অমল পয়সা বের করে একটা ক্যাপস্ট্যান চাইল। প্রায় মারমুখো হয়ে বাধা দিল নিশীথ: 'নবাবি দেখাচ্ছিস কাকে! একটা ক্যাপস্ট্যান না নিয়ে এক প্যাকেট চারমিনার নে, আমার বেশি উসুল হবে।'

নিশীথের ঠোঁট কালচে, শীতকাল আসতে একটু দেরি—তবু ফেটে-ফেটে গেছে। দু-একটা দাঁত বা জিভের ডগা ছাড়া মুখের মধ্যের আর কিছু দেখা না গেলেও আন্দাজ করা যায় যেন ভেতরটা খুব শুকনো, কাঠ-কাঠ, কথা বলতে অসুবিধে। স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়বার সময় নিশীথ একদিন অমলকে সাতটা ফুচকা খাইয়েছিল। অমল বলল, 'সকালে চা খেয়েছিস?'

'খেয়েছি একবার। দাদার বউটা দাদার গলায় মুক্তোর মালা। আমাকে এখনো চা দেয়। মাছ এলে ভাগের ভাগ পাই। অবশ্য আর কতদিন এমন চলবে জানি না। অমল, চা খাওয়া এক কাপ। আয় গোপালের দোকানে তোর সঙ্গে একটু বসি।' নিশীথের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল, অথচ একটানা খানিক বকবক করল।

গোপাল দোকানে নেই। তার জায়গায় অন্য একজন বসে। হয়ত গোপালের ছোট ভাই, মুখের আদল একরকম। সে অমলকে চিনতে পারল না। আর যারা বসে আছে, সবাই অচেনা। তাদের বয়েসও কম, কুড়ি-বাইশের মধ্যে। কোণের দিকে বসতে পেরে অমল বলল, 'চায়ের আগে একটা ডিমভাজা খা, নিশীথ।'

নিশীথ সারা মুখে ঘেন্না ফোটাল: 'তার থেকে বল না—একবাটি দুধ খা!'

দেয়ালে পাশাপাশি দুটো ক্যালেন্ডার, একটাতে সিক্তবসনা রমণী, অন্যটায় দেশের মানচিত্র জুড়ে নেহরু, শাদা পায়রা ওড়াচ্ছেন। সামনে রাস্তার ওপারে একটা টালির ঘরের ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়ায় সাঁটা মস্ত পোস্টারের খানিকটা রয়ে গেছে—স্বজনহারানো শ্মশানে কথাগুলো পড়া যায়।

'কী করছিস আজকাল?'

'আমাদের জেনারেশনের কেউ আর চাকরি পাবে না। তোরা যারা পাবার পেয়ে গেছিস।' নিশীথ দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। 'তোদের ওখানে দে না একটা জুটিয়ে। পাশটাশ করে-ছিলাম বলেই কাগজ-কলমের কাজ চাইছি এমন নয়। এই ধর কুলিটুলি খাটানোর কাজ।'

'আমাদের ওখানে বাবুরা কুলি খাটায় না। সিনিয়র কুলিরা জুনিয়রদের খাটায়। সুনন্দরা এসব করেছে—তুই তাদের চিনিস না।'

'যে কোনো একটা কাজ তোদের ওখানে হলে খুব ভাল হত রে। বন-জঙ্গল—অনেক দূরে, শালা পুষ্পকে নিয়ে চলে যেতাম।'

'পুষ্প কে রে?'

'পিঠোপিঠি চারবোনের বড়টি। বাপ ফেয়ার্লি প্রেসের দপ্তরি। দু' বছর হল এ-পাড়ায়।'

'নিশীথ, তুই তাহলে পদ্মকে যাকে বলে ভালোবাসিস?'

'ওসব গন্ধমাখানো রুমাল নিজের পকেটে রাখ।—প্রেম সত্যি হলে অপ্রেমও সত্যি, শরীর সবার ওপরে সত্যি।—মুখ নিচু করলে বুকের যেখানে থুতনি লাগে, পদ্মর সেই জায়গাটায় দাঁতের চাপে কালশিটে পড়েছে। আঁচল জড়িয়ে ঘুরছে। আমার বউ না হওয়া পর্যন্ত আঁচল সরাবে না। শালা চাণক্যের প্রতিজ্ঞা। বলছি, দুদিনে আপনি দাগ মিলিয়ে যাবে,—আমার কথা শুনে আরো রেগে যায়।' জানলা দিয়ে দোকানের পেছনের ড্রেনে নিশীথ থুথু ফেলল। 'পরিতোষ তো ওর বউকে ভালবাসে।'

'পরিতোষ বিয়ে করল কবে?'

'তা বছর খানেক হল। কাগজের মাল।'

'তার মানে?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকটা চিঠি ছেড়েছিল। এটা হয়ে গেল।'

সামনের টেবিলে খবরকাগজের একটা পাতা। অমলের মনে পড়ল, ইংরেজি কাগজে পেপার টাইগার আর বাঙলা কাগজে কাগুজে বাঘ কথা দুটো দেখেছে। কাগজের মাল কথাটার ইংরেজি কী হতে পারে ভাবছিল। পেপার ওয়াইফ পছন্দ হল না, পেপার হাসব্যান্ড কথাটা বরং ভালো। এখানে সুনন্দ উপস্থিত থাকলে হয়ত একটা পছন্দমত কথা বানিয়ে দিতে পারত। স্কুলে নিশীথ ট্রান্‌স্লেশনে দারুণ নম্বর পেত। তবু ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না।

অমল বাজারে গিয়ে দেখল, বড় আকারের কইমাছ বার টাকা কিলো, অথচ সেই সাইজেরই মরা কই আড়াই টাকা। জানে, কইমাছ সহজে মরে না, তাই হয়ত লোকে ভাবে—কইমাছ যখন হঠাৎ মরে না, যখন জীবনের সবটাই নিঃশেষ করে মরে, সুতরাং মরলে বড় বেশি মরে যায়। সেই কারণে দাম এত কমে যায়। কইমাছের দুই পর্যায়ের দাম লক্ষ করে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকার পর মরে যাওয়ার বিষয়ে ভাবছিল। বাজারে কয়েকটি চেনা-মুখ চোখে পড়ল। যেমন, দুর্দান্ত স্বাস্থ্যের এক মিশকালো মাছঅলা, সামনে বড় মাছ কাটবার বঁটিটা বঙ্গোপসাগরের উঠতি ঢেউয়ের মতন। লোকটি অমলকে ভুলে গেছে।

কইমাছ দিয়ে ভাত খেতে খেতে মা'র কথা শুনছিল: তাঁর ইচ্ছে ছিল অমলের কোয়ার্টারে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসেন। কিন্তু খুকিকে একা রেখে যাওয়া যায় না। বাড়িতে তালা দিয়ে খুকিকে নিয়েও যাওয়া যায় না। ফিরে এসে হয়ত দেখবেন, তালা ভেঙে সব সাফ করে নিয়ে গেছে। বাড়িটাই কেউ দখল করে নিতে পারে। একবার এসে চেপে বসলে আর তোলা যাবে না। তাছাড়া খুকি কলকাতা ছেড়ে যেতেই চায় না। আজকাল আর ক্লাস হচ্ছে না, তবে কিছুদিন হল গানটান নিয়ে খুব মেতেছে। একটা স্কুলে যায় খুকি, গান শেখায়। বলে অবশ্য শেখায় না, নিজে শিখতে যায়। স্কুলটা করেছে একটি ছেলে, নাম সুপ্রিয় দত্ত, লোহার ব্যবসা আছে, তবে গানবাজনায় দারুণ নেশা।

অমল লক্ষ করল, মা সুপ্রিয় দত্তর নামটা খুব আদরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। নামটা এই প্রথম শুনল।

ভেবেছিল, মল্লিকার সঙ্গে খেতে বসবে। তা হয় নি। রান্না সব শেষ হবার আগেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে মল্লিকা ইউনিভার্সিটিতে গেছে। ক্লাস আর হচ্ছে না, তবে আজ ফী অথবা কী সব ফর্ম্‌ জমা দেবার শেষ তারিখ। যাবার সময় সেইরকম কী যেন বলে গেল।

মা মল্লিকার বিষয়েই কথা বলছিলেন। মল্লিকা উপস্থিত নেই, সুতরাং তার বিষয়ে

খোলাখুলি কথা বলতে পারতেন। অথচ মা অন্যান্যবার অমল এলে মল্লিকার বিষয়ে যে-সব কথা বেশি করে বলেন, এখন সেরকম কথা মোটেই বলছিলেন না। আগে আগে অমলের মনে হত, মেয়ের বিয়ের প্রশ্নটা মা'র ভাবনা জুড়ে আছে এবং সে-ব্যাপারে মা অমলের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে আছেন। মা'র দিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। মা নিজে পাশটাশ কিছু করেন নি, ঘরের বাইরে গিয়ে কোনোদিন কিছু করতে হয় নি। স্বভাবতই ভেবেছিলেন, মল্লিকার জীবনের নকশাটা তাঁকেই তৈরি করে দিতে হবে এবং এ-ব্যাপারে অমল তাঁর একমাত্র নির্ভর। কিন্তু ইতিমধ্যে মা সম্ভবত চোখ খুলে অনেক দূর দেখতে পেয়েছেন, নিজের জীবনের আদল মল্লিকা নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে বুঝেছেন। খুকির ওপর মা'র আস্থা হয়েছে—এটা তো ভালই, সেই সংগে এই পরিবারে অমলের ভূমিকা থেকে একটা জমজমাট দৃশ্য এবং পুরো একপাতা সংলাপ কি ছাঁটাই হয়ে গেল? কোনো কোনো দৃশ্যে কি মঞ্চের একদিকে সে আর অন্যদিকে খুকির হাত ধরে মা এবং মঞ্চটাকে দু'খণ্ডে ভাগ করে মাঝখানে একটা অদৃশ্য পাঁচিল দাঁড়িয়ে থাকে!

দাঁতের ফাঁক থেকে মাছের একটা কাঁটা নখ দিয়ে বের করে এনে মনে পড়ল, সুপ্রিয় দত্তর নামটা উচ্চারণ করবার সময় মা'র গলা খুব স্নিগ্ধ ছিল।

মা আর মল্লিকার শোবার ঘর এবং রান্নাঘরের মাঝখানের ঘেরা বারান্দায় মেঝেয় খেতে বসেছিল অমল। মা রান্নাঘরের দরজায় বসে। একটা জানলা দিয়ে এসে রোদ্দুর পড়েছে মা'র মাথায়। অল্প পাকা চুল, কালো চুলই বেশি। কত আর বয়েস হবে মা'র, পঞ্চান্নর কাছাকাছি। চেহারায় অস্বাস্থ্যের লক্ষণ নেই। আসলে মা'র মুখ থেকে অসহায়তা এবং উদ্বেগের ছায়াটা যেন সরে গেছে। বরং নির্ভার তৃপ্ত মুখ। আগে আগে মা'কে অন্যরকম দেখেছে। প্রায় সব সময় আতঙ্কিত মনে হত। অমলকে জড়িয়ে হাতপায়ে এবং বুকে জোর পাবার চেষ্টা স্পষ্ট ছিল। শুধু মল্লিকার জীবনের নকশাটা কেমন তৈরি হবে তাই ভেবেই কি মা অমলের দিকে হাত বাড়িয়েছেন এবং এখন মল্লিকা সরলরেখায় স্বচ্ছন্দে হাঁটছে দেখেই কি মা'র মুখ থেকে দুর্ভাবনার দাগগুলো ধুয়ে গেছে? অমলের দিক থেকে তো মা'র কাছে কোনো সুখের খবর আসে নি। চাকরিতে এক ধাপও ওপরে ওঠে নি, টাকাও পাঠাচ্ছে আগেরই মতন।

মল্লিকাকে হিংসে করছে নাকি! ধ্যেৎ, খুকিকে হিংসে করতে যাবে কেন?

দ্বিতীয় মাছের মাথাটাও চিবোন হয়ে গেল। হিংসে না, কিন্তু মঞ্চের মাঝখানে অদৃশ্য পাঁচিলটা অদৃশ্য বলেই দেখতে না পেলেও, এক-একবার ঠিক মাঝখানে খুব পাতলা একটা পর্দা নেমে আসছিল যেন।

নিজের ঘরটা মনে হল একটা কাঁচা কিশোরের। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, তলায় কোনাকুনিভাবে নরম কাঠের পরপর উড়ন্ত পাখি, ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজেই এনেছিল পাঁচটা পাখি, নিজেই দেয়ালে টাঙিয়েছিল। তখন কি ভেবেছিল, ওই ময়লা দেয়াল বিকেলের আকাশ?

সরু খাটে শুয়ে জানলার পাশে টেবিলটায় বইটই, ফুলদানিতে কলম-পেন্সিল দেখা যায়। টেবিল ল্যাম্পটা যেন খেলনা। ধুলো নেই কোথাও। সে যখন বাজারে গিয়েছিল, মল্লিকা সব ঝেড়েঝুড়ে তকতকে করেছে।

মা একবার এ-ঘরে এসে একটা জানলা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন। সেই জানলাটা দিয়ে খুব আলো আসছিল। বন্ধ করে দেওয়ায় ঘরটা ছায়া-ছায়া হয়েছে। মা চাইছিলেন, অমল

দ্বপ্বরে একটু ঘ্বমিয়ে নিক।

একটু পরে মল্লিকা ফিরল। একটা মোড়া টেনে বসল খাটের পাশে।

'ঘ্বমোচ্ছিস না কেন রে?'

'ঘ্বম আসছে না। কাল রাত্তিরে একেবারে ঘ্বমোই নি এমন তো নয়।—নয়নতারা ক'দিন এসেছিল রে?'

'একদিন।'

'কী বলল এসে?'

'বলল, তোদের ওখানে চাকরি করছিল, ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কার্শিয়াংয়ে বড় স্কুলে চাকরি পেয়েছে।'

'শ্বধ্ব এই?'

'আবার কী?—বলল, তোর কাছে আমার কথা শ্বনেছে। অনেকক্ষণ ছিল। ও-ঘরে বসেছিল। মা চা করতে গেলে আমার সংগে তোর এই ঘরে এল একবার। তোর কাঠের পাখি দেখে খ্বব হাসছিল।'

হঠাৎ অমলের ম্বখের কাছে ঝ্বঁকে চোখ ছোট ছোট ক'রে মল্লিকা বলল, 'জল ঘোলা করছিস কেন রে? আমার জন্যে? আমার জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না।'

'তোর জল ব্বঝি পরিষ্কার?'

এমন সময় গলিতে একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ হল। শব্দটা থামল অমলদের দরজায়। উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখে নিয়ে মল্লিকা 'আসছি' বলে অন্য ঘরে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে শাড়িটাড়ি বদলে, ঠোঁটে খ্বব হালকা রঙ মেখে, আবার এ-ঘরে এসে বলল, 'একটু বেরোচ্ছি দাদা। সন্ধ্যের আগেই ফিরব। চণ্ডালিকার রিহার্সাল।'

দরজা থেকে মা আর মল্লিকার কিছ্ব অস্পষ্ট কথা ভেসে এল, তারপর গলি পার হয়ে গেল গাড়িটার শব্দ।

খ্বব তাড়াতাড়ি সেজে এসে কয়েক সেকেন্ড মাত্র এ-ঘরে দাঁড়িয়েছিল মল্লিকা। একটা র‍্যা সিল্কের কটকি ডিজাইনের বাদামী স্কার্ফ গায়ে জড়িয়েছে। আগের থেকেও স্বন্দর হয়েছে মেয়েটা! কেমন এক স্নেহমেশানো স্বখে অমলের চোখ ব্বজে এল।

তব্ব শ্বয়ে থাকতে পারল না। উঠে ও-ঘরে গিয়ে মা'কে বলল, 'আমিও একটু বেরোই মা। দ্বপ্বরে ঘ্বম আসে না। রাত্তিরে ভাল করে ঘ্বমোব।'

এককালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধ্বদের মধ্যে তড়িৎ এখন প্রচণ্ড এক্সিকিউটিভ। এত বড় ফার্মে সে এত উঁচুতে যে অমলের স্লিপ পেয়েই বেরিয়ে এলে রিসেপশনের মেয়ে দ্ব'টি এক মিনিট সব কাজ ভুলে গেল। লিফ্‌টে নামতে নামতে তড়িৎ বলছিল, 'একা এলি কেন? সংগে ম্বণ্ডা সখী আনতে পারলি না?'

'ম্বণ্ডা সখীদের ম্বণ্ডা সখা থাকে।'

'আমি হলে ম্বণ্ডা বনে যেতাম।'

অমল শ্বধ্ব হাসল।

পার্ক স্ট্রীটে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাল তড়িৎ। কোথাও আলোর বালব অথবা টিউব দেখা গেল না, অথচ সারা ঘরে সমান ম্বদ্ব আলো। একপাশে মঞ্চের কোণে নানাবিধ বাজনা সাজান, সন্ধ্যেয় বাজবে। বাইরে দিন না রাত্তির এই ঘরে বসে বোঝা যায় না। তড়িৎ তার বউয়ের কথা বলছিল: কলেজ থেকে এক বছরের স্টাডি লিভ নিয়েছে, আমেরিকা যাচ্ছে,

বড় অস্থির, তিন বছরে কাচ্চাবাচ্চা হল না।

পরপর সম্ভবত চারটে হুইস্কি তড়িৎ শেষ করল, অমল প্রচুর সুখাদ্যের সঙ্গে পুরো একটা বিয়ার। দেড় ঘণ্টা পরে বাইরে এলে আবার রোদ্দুর। তড়িৎ শনিবার সন্ধেয় তার বাড়িতে যাবার নেমন্তন্ন করে অফিসের দিকে চলে গেলে অমল চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটছিল।

পার্ক স্ট্রীট থেকে হেঁটে এসপ্লানেডের মোড়ের কাছাকাছি এসে অমল ভাবল, একটা পান খাই। বিয়ারের গন্ধ হয়ত একটু মরবে।

একটা সিনেমা হাউসের পাশে একটা মাঝারি রেস্টরান্ট, মাঝখানে চওড়া গলি, তার দুপাশেই পান-সিগারেটের দোকান। অমল পান দিতে বলে দেখতে পেল, একটা লোক সিগারেট কিনছে। লোকটা, বরং বলা উচিত ছেলেটা, হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নেবার সময় তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল, এখনই ছুরি মারবে। চোখে ঘৃণা, ছোট ছোট কাঁটার মতন দাড়ি উঁচিয়ে আছে সারা মুখে, যে-হাত দিয়ে সিগারেট নিল তার কবজির কাছে শিরা ফুলে উঠেছে। খুব চেনা মুখ, অথচ ঠিক চিনতে পারছিল না।

চোখে ঘৃণা জ্বলেই রইল, কিন্তু সামান্য দাঁত দেখিয়ে হাসল ছেলেটা: 'আমাকে চিনতে পারেন নি তো?'

ঠিক তখন, সম্ভবত হাসিটা দেখে, অমল চিনতে পারল। মল্লিকার বন্ধু, মল্লিকার সঙ্গে পড়ে, নাম শুভেন্দু। ইউনিভার্সিটিতে যাবার আগে কলেজেও একসঙ্গে পড়ত, বাড়িতে আসতে দেখেছে কয়েকবার। মল্লিকার পাশে যখন কোনো তরুণকে ভেবেছে, শুভেন্দুকেই ভেবেছে কি? সেই তরুণের সঙ্গে শুভেন্দুর আদল মিলছে না। ওর চোখে এত ঘৃণা কিসের? কিসের প্রতি ঘৃণা? কেন মনে হল, একটা চকচকে ছুরি একটানে ট্রাউজারের তলা থেকে বের করে এনে এখনই পাঁজরার হাড়ের ফাঁক দিয়ে আমূল বসিয়ে দেবে? শুভেন্দুর ঝড়ো চুল, মুখের হাতের চামড়ায় কোনো কঠিন অসুখের বিবর্ণতা। ট্রাউজার আর শার্ট কিন্তু সদ্য ভাঁজ ভেঙে পরেছে। যদি কোনো ব্যাধি ওকে ধরে থাকে সে কি শুধু শরীরের? অমলের থেকে কয়েক বছরের ছোট হবে, সম্ভবত মল্লিকার থেকেও, কারণ বাবার মৃত্যুর পর মল্লিকার পড়াশুনোয় বাধা পড়েছিল। এর মধ্যে এত রুগ্ন দেখাচ্ছে কেন ওকে? আগে তো ওর এমন চেহারা ছিল না।

শুভেন্দু বলল, 'এখানে একটু চা খাব। আসুন না।'

চা খাওয়া অমলের নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন। কী করে যে অভ্যেসটা হয়েছে। তবে এখন চায়ের জন্যেও পেটে জায়গা নেই মনে হলেও শুভেন্দুর সঙ্গে গিয়ে বসতে হল। অন্য কোথায়ই বা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী করবে। তাছাড়া শুভেন্দুর এক হাতে কাগজপত্তর পত্রিকাটত্রিকা থাকলেও, অন্য হাতে ধরে অবিরাম সিগারেট টানলেও, তৃতীয় একটা হাত দিয়ে যেন অমলকে টেনে রেখেছে।

শুভেন্দুর সঙ্গে আগে নিশ্চয়ই অমলের আলাপ ছিল, শুধুই কয়েকবার পরস্পরকে দেখেছে এমন নয়। তখন ওকে আপনি না তুমি বলত মনে পড়ল না। এ-ব্যাপারে শুভেন্দুও তাকে সাহায্য করল না। মুখোমুখি বসে অমল বলছিল, 'আপনাদের পরীক্ষা তো পিছিয়ে গেল।'

'আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না।' চারটি শব্দ শুভেন্দু স্পষ্ট উচ্চারণ করল।

অমল বুঝতে পারল, শুভেন্দুর বিষয়ে জরুরী খবরগুলো তার জানা নেই। একটু থেমে বলল, 'চাকরিটাকরি পেয়েছেন বুঝি?'

'না। প্রথমদিকে কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম, এখন আর করি না। জানি চেষ্টা করে লাভ নেই। ফালতু কাজটাজ অবশ্য একটু করি, দু-চার পয়সা পাই, বলবার মতো নয়। প্রায় এক বছর যাওয়া-আসা করেছি ইউনিভার্সিটিতে, তারপর মোহ কেটে গেল। কী হবে আরো একটা পচা ডিগ্রী নিয়ে!'

অমল কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। টেবিলের ওপর শুভেন্দু তার কাগজটাগজ রেখেছে। অমল একটা রোগা পত্রিকা হাতে নিল। কোনোদিন পত্রিকাটার নাম শোনে নি। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় চোখ রাখল। একটা দশ-বারো লাইনের কবিতা, লিখেছে শুভেন্দু লাহিড়ী। একালের কবিতা অমল মোটেই পড়ে নি এমন নয়, তবু দুবার পড়েও এই কবিতাটায় প্রবেশ করতে পারল না, শুধু মনে হল—শব্দগুলোয় কী এক দুঃসহ তাপ।

শুভেন্দু দেখতে পেয়েছে, অমল তার কবিতায় চোখ রেখেছে। হয়ত কবিতাপ্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্যে অল্প দাঁত দেখিয়ে হাসবার মতন করে বলল, 'মল্লিকা পরীক্ষা দিচ্ছে তো?'

অমল পত্রিকাটা রেখে দিল: 'পরীক্ষা দেবে শুনছি। তবে আজকাল গানটান নিয়ে ব্যস্ত।'

'গান, হ্যাঁ মল্লিকা তো ভাল গান করে। রবীন্দ্রনাথের গান। এক সময়ে আমিও ভাবতাম, রবীন্দ্রনাথের গান একটা আশ্রয়। এখন আর সেই আশ্রয় মেলে না। এখন শুধু কয়েক ডজন অসুখের নাম আর তাদের লক্ষণগুলো মনের মধ্যে গিসগিস করে।'

শুভেন্দু কি মল্লিকার প্রেমিক ছিল? আঘাত পেয়েছে? বিশ্বাস হয় না। শুভেন্দুর মধ্যে হাহাকার নেই। শুভেন্দুর মধ্যে, তার কবিতায় আর যা-ই থাক হাহাকার নেই। চোখে ঘৃণা জ্বলছে সত্যি, সব দিকে তাকিয়েই জ্বলছে, একমাত্র অমলের দিকে তাকিয়েই নয়। মল্লিকার নামও খুব সহজে উচ্চারণ করছিল, কোনো অস্বস্তি নেই। আঘাত যদি পেয়ে থাকে, শুধু একটি মেয়ের কাছ থেকেই পায় নি। কার জন্যে ঘৃণা—অমল জানে না, কেন মনে হয় ছুরি শানিয়ে রেখেছে—জানে না। তবে ব্যর্থতার সঙ্গে শুভেন্দুকে মেলানো যায় না। তড়িৎ বন্ধুদের মধ্যে সব থেকে সফল; সেই তড়িৎকেও ব্যর্থতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবে অমল, শুভেন্দুকে পারবে না।

মল্লিকার সঙ্গে তাদের বাড়ি এসেছে বলেই আজ এতদিন পরে সিগারেটের দোকানে দেখে চেনামুখ মনে হয়েছে সন্দেহ নেই। চেনা মনে হওয়ার কি অন্য কোনো কারণ ছিল? সুনন্দর সঙ্গে কি কোথাও মিল আছে শুভেন্দুর? আর সেই জন্যেই কি চেনা লাগছিল? শরীরে মেদ না থাকলেও সুনন্দ স্বাস্থ্যবান, শুভেন্দু রুগ্ন। সুনন্দ চোখে ঘৃণা জ্বালিয়ে রাখে না, ছুরি শানিয়ে রাখে না। তথাপি, শরীর আর মুখের আদল পেরিয়ে কোথাও কি ঈষৎ মিল আছে সুনন্দ আর শুভেন্দুর?

রাত্তিরের খাওয়া খুব তাড়াতাড়ি সারতে হল। মা দেরি করতে দিলেন না। অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যেয় পরিতোষ এসেছিল। সে চলে যাবার পর খেতে বসার আগে মল্লিকা গুনগুন করছিল। সাধলে হয়ত গান শোনাত। অমলের সাধতে ইচ্ছে হল না। রিহার্সাল থেকে ফেরার পর তখনো মল্লিকার ঠোঁটে খুব হালকা রঙ ছিল। রিহার্সালে যাবার সময় সেই রঙ ভাল লেগেছিল। এখন কেন যেন আর তেমন ভাল লাগল না। অকারণে শুভেন্দুর মুখ মনে পড়ছিল। শুভেন্দুর মুখ ঘৃণায় যতই বিকৃত হোক, পাতলা চাপা ঠোঁট কেমন করুণ।

মা'র তাড়ায় বিছানায় যেতে হল। এত সকালে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। একটা দিন,

একটা মাত্র দিন এখানে কাটল। এর মধ্যেই মনে হচ্ছিল, এখানেও ভালো লাগবে না, ভালো লাগছে না। তা হলে ছুটি নিয়ে এল কেন? ভালো না লাগলেও অন্তত শোভনতার খাতিরে কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতেই হবে?

ঘুমিয়ে পড়ার আগে পুরো দিনটা টুকরো টুকরো হয়ে ফিরে ফিরে আসছিল। তার সঙ্গে শরীরের দাহ। শরীরে এমন দুঃসহ দাহ নিয়ে একটা কাঁচা কিশোরের সরু খাটের নরম বিছানায় শুয়ে ঝালর-দেয়া বালিশে মাথা রেখে এপাশ-ওপাশ করার অধিকার নেই মনে '।

### পনের

'তুমি, অমল, তুমি এমন হঠাৎ এলে!' খোলা দরজায় অমলকে দেখে নয়নতারা যে খুব আশ্চর্য হয়েছে, শুধু তাই বোঝা গেল। আশ্চর্য হবার কথাই। অমল কোনো খবর দিয়ে আসে নি। কোনো খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এতদূর চলে এসেছে দেখে আশ্চর্য হবার কথাই। তার সঙ্গে অন্য কিছুও হবার কথা। উল্লসিত না-ই বা হল, একটু অন্তত খুশী হবার কথা। সন্দেহ নেই, মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখার কৌশল অনেকদিন থেকে নয়নতারার আয়ত্তে। তবু কিছু অনুভব আছে যা পুরোপুরি লুকোন যায় না। অথচ নয়নতারার কথা থেকে একটিও সুখের কণা ছিটকে এল না। রবিবার প্রায়-দুপুরে খোলা দরজায় অমলকে দেখে শুধু আশ্চর্য হয়েছে বোঝা গেল, পাশে সরে দাঁড়িয়ে 'এসো' বলতেও মুখ খুলল না খানিকক্ষণ।

অমল কোনো দুরন্ত নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। নয়নতারা অভ্যেসমতন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, গোপন সুখের আভাস নেই, বরং শুভেন্দুর চোখ থেকে কিছু যেন ধার নিয়েছে. তবু অমল বিদ্ধ হল না। নিজের বাড়িতে ফেরার মতন সরল পায়ে ভেতরে এসে নিজেই দরজা বন্ধ করল। একটা নিচু চেয়ারে আয়াস করে বসে স্যুটকেসটা পাশে নামিয়ে রাখল। স্যুটকেসটা ভারী, গরম কোট ইত্যাদি এনেছে।

রুটিতে মাখনের মতন গলায় স্নিগ্ধতা মাখিয়ে বলল, 'চা কর, নয়ন।'

চায়ের প্রসঙ্গ এলেও বেসক্যাম্প অথবা টাউনশিপের কোয়ার্টারের দৃশ্যাবলী অমলের মনে ভাসল না। নয়নতারার মনে এল কিনা তা অবশ্য জানে না। পুরোন ছবিটবি এখন আর আক্রমণ করছিল না, কারণ অমল অন্য এক দুরন্ত নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল।

হাতমুখ ধোবার জন্যে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিল নয়নতারা, ওখানে গরম জল আছে জানাল। দু'হাত এক করে মাথার পেছনে চেপে ধরে বড় একটা হাই তুলে আলিস্যি ভাঙবার চেষ্টা করল অমল, যদিও জানে—মহিলাদের সামনে এসব করা অশোভন। যেন কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে স্নানের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

নয়নতারা চা করতে গেল।

একটা কম বয়েসী গোলগাল অত্যন্ত ফরশা পাহাড়ী মেয়ে তোয়ালে রেখে গেল। এই মেয়েটিই প্রথমে দরজা খুলে অচেনা লোক দেখে কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল। সামনে রেখে যাওয়া তোয়ালেটার হালকা কমলা রঙ দেখল অমল। স্যুটকেসে নিজের তোয়ালে এনেছে কিনা খেয়াল করতে পারল না। না এনে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। হিসেব করে সব দরকারী জিনিস গুছিয়ে বেড়াতে আসবার মতন তো আসে নি।

হালকা কমলা রঙটা দেখছিল। তোয়ালেটার ভাঁজ ভাঙা হয় নি। ভাঁজ ভাঙা, কয়েক-

দিন ব্যবহার করা তোয়ালে দেবার মতন ঘনিষ্ঠতা নেই? যেখানে বসেছে সেটা ঘেরা বারান্দা। সামনের দেয়াল বুকসমান উঁচু, সেখান থেকে সিলিং পর্যন্ত পুরু কাচ। নিচু চেয়ারটায় বসবার আগের মুহূর্তে দেখেছিল, বারান্দার পরই ঢাল শুরু, এখন বসে কাচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল—খানিক দূরে আবার চড়াই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে স্নানের ঘরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কাল রাত্তিরে ট্রেনে শোবার জায়গা পেয়েও ঘুমোতে পারে নি, চাঅলা পেয়েও ডেকে চা নেয় নি। ট্রেন বদল করেছে ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন। ভোরবেলায়ও গরম জামা পরে নি। এখন চুপচাপ বসে শীত বুঝতে পারছিল।

ট্রেনটা এখানে আসে প্রায়-দুপুরে। অনেক বছর আগে একবার বেড়াতে এসে জেনে-ছিল। রবিবার দেখে না এলে আজ অসুবিধে হত। চিঠিতে নয়নতারা জানিয়েছিল, স্টেশন থেকে দূরে অনেকটা ওপরে বাড়ি পেয়েছে, স্কুলের নাম চিঠিতে দেয় নি। আজ অবশ্য সকাল থাকতেই ট্রেনটা পৌঁছেছিল। অন্যদিন দেরি হয় কিনা জানা নেই। বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগল। স্টেশনসংলগ্ন ছোট শহরটা ছাড়িয়ে অনেক দূর আসতে হল, অনেকটাই ওপরে উঠতে হল। তখন হাঁটাহাটির জন্যে শীত বুঝতে পারে নি। এখন গা শিরশির করছে। বারান্দার কাচের মধ্যে দিয়ে স্টেশন দেখা যায় না, উঠে দাঁড়ালেও দেখা যাবে না, উলটো দিক হয়ত।

কিন্তু নয়নতারা এত দেরি করছে কেন। চায়ের জল চাপিয়ে এদিকে আসতে পারত। এক ঝটকায় উঠে তোয়ালেটা নিয়ে স্নানের ঘর থেকে ঘুরে এল। তখনো নয়নতারা চা নিয়ে আসে নি।

কটেজটা ছোট। এখানে বসেই আন্দাজ করা যায় কোথায় ক'টি ঘর। এই ঘেরা বারান্দা বসবার জায়গা, লাগোয়া একটি শোবার ঘর, অন্যটি বাড়তি, সম্ভবত অতিথিদের জন্যে। বাথ-রুমের উলটো দিকে রান্নাঘর।

অস্থির লাগছিল। বসে থাকতে না পেরে অমল শোবার ঘরে চলে এল। প্রচুর কারু-কাজ করা খাট একটা এক পাশে, অন্য পাশে অব্যবহৃত ফায়ার প্লেস। কোনো সাহেবটাহেবের ছিল বোধহয় কটেজটা। রান্নাঘরের দরজায় এসে দেখল, কেটলি থেকে ধোঁয়া উড়ছে, জানলার কাছে নয়নতারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, খুব যেন ভাবনায় মগ্ন। কম-বয়েসী মেয়েটা মেঝেয় সবজি নিয়ে বসেছে।

দরজায় অমলকে দেখে নয়নতারা হাসল হয়ত, কিছু বলল না, অন্যমনস্ক। জল ফুটছে —তখনই যেন বুঝতে পারল। পটে ফুটন্ত জল ঢেলে চা-পাতা ভিজিয়ে সুন্দর একটা কোজি দিয়ে ঢাকল। ট্রেতে সব চাপিয়ে দরজায় এসে অমলকে বলল, 'চল।' ট্রেটা নিশ্চয়ই বেশ ভারী হয়েছে, এই শীতেও নয়নতারার কপালটা ভেজা-ভেজা, ফুটন্ত জল থেকে উড়ে-আসা বাষ্প লেগে অমন হতে পারে, না হলে শুধু চা করতে আর একটা ভারী ট্রে বইতে ক্লান্ত হবার কথা নয়। পাশাপাশি শোবার ঘরটা পার হয়ে বারান্দায় যাবার আগেই অমলের দৃষ্টি নয়ন-তারার মুখ থেকে শরীরে ছড়িয়ে গেল, না-ঢাকা গলা কাঁধ বেয়ে নেমে গেল। হাতে ভার থাকায় আগেই বারান্দায় গিয়ে নয়নতারা নিচু টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রাখছিল, ঠিক তখন নেভানো ফায়ার প্লেসের তাকের ওপরে অমল কয়েকটা আপেল দেখছিল, তখন শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে আপেল দেখা যেন অত্যাবশ্যক।

কাপে চা ঢেলে দিয়ে নয়নতারা বলছিল: 'একটা চিঠি দিয়ে, আসছো জানিয়ে আসতে

পারতে।'

শোবার ঘর থেকে নয়নতারার একটা স্কার্ফ নিয়ে অমল গলায় জড়িয়েছে। এত ঘনিষ্ঠতা নয়নতারার পছন্দ কিনা বোঝা গেল না। অমল বলল, 'সবাই সব সময় নিয়ম মেনে চলতে পারে না। আমাদের ওখানকার চাকরি ছেড়ে আসবার সময় তুমি বলে আসতে পারো নি। তাছাড়া আমার এখানে আসবার ঠিক ছিল না।'

'কতদিনের ছুটি?' নয়নতারা মুখ তুলছিল না।

'এক মাসের। কলকাতায় দিন চারেক কাটিয়ে এসেছি।'

হিল গিয়ারে একটানা গর্জন করে একটা গাড়ি ওপরে উঠে এল, দরজায় এসে শব্দটা থামল। 'আসছি' বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল নয়নতারা। তখনই একজনকে নিয়ে ফিরে এল। অমল তাকিয়ে দেখল, ছুটির দিনেও নিপুণ আঙুলে বাঁধা টাইয়ের নিখুঁত গিঁঠ, ব্রোঞ্জ রঙের স্যুট, উঁচু ধারাল নাক, দেবদারুর মতন ঋজু, বয়েস তার থেকে বেশি। উঠে দাঁড়ানো সৌজন্য, অমল উঠল না।

নয়নতারা বলছিল: 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই অমল। হীরক চ্যাটার্জি, ডাক্তার, চা বাগানের। তোমাকে বলা হয় নি, ও'কে আজ নেমন্তন্ন করেছি।'

পুরোন ছবিটাই এবারে অমলকে একটু ছুঁয়ে গেল। তবু স্বাভাবিক হেসে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

হীরকের দিকে তাকিয়ে নয়নতারা বলছিল: 'অমল, অমল মিত্র, আমার আত্মীয়। কলকাতা থেকে হঠাৎ বেড়াতে এসেছে।'

অমলের বিষয়ে নয়নতারা সব ঠিক বলল না। এ-ধরনের কূট কৌশল আগে আগে অমলকে খেপিয়ে দিত। এখন তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হল না।

ভেতর থেকে নয়নতারা আর একটা কাপ এনে হীরককে চা ঢেলে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বড় অমায়িক গলায় হীরক বলল, 'কলকাতার হালচাল কী বলুন।'

হয়ত সরাসরি অমলকে সিগারেট দেবে কি দেবে না বুঝতে না পেরে হীরক প্যাকেটটা টেবিলে অমলের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অমল সে দিকে একবার তাকাল: 'কলকাতার খবর আমি রাখি না। বন-জঙ্গলে থাকি, লোহার খনিতে কাজ।'

সঙ্গে সঙ্গে হীরক বন-জঙ্গলের খবর জানতে আগ্রহ দেখাল। লোহার খনিতে কী হয়, কেন হয়, কেমন করে হয়—সব জানতে যেন খুব উৎসুক। লুকিয়ে হেসে অমল ভাবছিল, এভাবে দেখা হয়ে গেলে, দু-এক ঘণ্টা এক জায়গায় বসতে হলে, এভাবেই আলাপ চালিয়ে যেতে হয়, পরস্পরের কাজের প্রতি অনুরাগ দেখাতে হয়। নির্বিকার সরলতায় অমল তাদের কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছিল। নিজেই বুঝতে পারছিল, নয়নতারার কোয়ার্টারে এক সন্ধ্যের আসরে যে-অস্বস্তি তাকে কুরে কুরে খেয়েছিল, তার চরিত্র থেকে তা ধুয়ে মুছে গেছে। নয়নতারা কথা বলছিল না, এমনভাবে তাকাচ্ছিল অমলের দিকে যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করছে।

হীরকের চা বাগান এখান থেকে কত দূরে, দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি কিনা, সেখানে কী হয়, কেন হয়, কেমন করে হয়, হীরককে ঠিক কাদের চিকিৎসা করতে হয়, প্রাইভেট প্রাকটিসের স্বাধীনতা আছে কিনা—অতঃপর অমল এই সব প্রশ্ন করে গেল এবং এমন আগ্রহ দেখাল যেন প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব শোনা তার পক্ষে জরুরী।

নয়নতারা রান্নাঘরেই বেশিক্ষণ থাকছিল। একবার এসে অমলকে স্নানের জন্যে তাড়া দিয়ে গেল। হীরক স্নান সেরে এসেছে।

খেতে বসে এলোমেলো গল্প করতে করতে তারিয়ে তারিয়ে খেল অমল। নিজের ছে'দো রসিকতায় হা-হা করে হাসল। বেসক্যাম্পে নয়নতারার কোয়ার্টারে এক সন্ধ্যেয় সে যে প্রচুর সুখাদ্য সামনে পেয়েও মোটেই খেতে পারে নি সে-কথা মনে পড়ায় মনে মনে হাসল। আজ খাবার টেবিলে শুধু নয়নতারাকে বড় অপ্রতিভ, প্রায় ম্রিয়মাণ মনে হচ্ছিল।

দুপুর গড়িয়ে গেলে জামাকাপড় বদলে নয়নতারা বলল, 'অমল, আজ সন্ধ্যেয় তোমাকে একটা সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব। শুক্লপক্ষ চলছে, জ্যোৎস্না পাব। এখন আমি একটু বেরোচ্ছি। হেড মিস্ট্রেসের বাড়িতে একটা মিটিং আছে। হীরক আমাকে পেঁছে দেবে। ও তোমাকে চা অথবা কফি যা চাও করে দেবে।' বারান্দার প্রান্তে দাঁড়ান গোলগাল মেয়েটির দিকে নয়নতারা তাকাল।

'আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতে তুমি আবার এতটা ওপরে উঠে আসবে কেন? আমি বরং নিচে নেমে কোথাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'তুমি চেনো এমন একটা জায়গার নাম কর।'

'এল. আই. সি.-র বাড়িটা আমি চিনি। আগে একবার এসেছিলাম, তখন ওই বাড়িতে একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন, তাই মনে আছে।'

'বেশ, ওই বাড়িটার পাশে সাড়ে পাঁচটায় থেক, আমি আসব। এর মধ্যে একটু বিশ্রাম কর, পারলে খানিক ঘুমিয়ে নাও।'

যাবার সময় হীরক বলে গেল, 'আবার দেখা হবে। আছেন ক'দিন?'

অমল শুধু বলল, 'দেখি।'

গাড়ির শব্দটা ঘুরে ঘুরে নেমে গেলে অমল প্রায়-শূন্য বাড়িতে বেশ শব্দ করে হাসল। হয়ত মিটিং আছে। হয়ত মিটিং নেই। থাকলেও নয়নতারা আজ যেতে না পারলে মিটিংয়ের দই কেটে যেত না। অমল আজই এসেছে। তাকে একা রেখে এই চলে যাওয়া কি অশোভন নয়? কিন্তু এ-সবের জন্যে অমলের আর অপমানবোধ নেই। এক সময়ে এই ধরনের অপমানে হন্যে হয়ে যেত। সেই মেজাজ পুরোপুরি খারিজ হয়ে গেছে।

বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বাড়তি ঘরটায় ঢুকে দেখল, অতিথির জন্যে সুন্দর ব্যবস্থা। রাত্তিরে এই ঘরে অমলকে ঘুমোতে দেওয়া হবে। হঠাৎ এসে পড়ায় নয়নতারার সত্যিকার কোনো অসুবিধে হয় নি। ও-ঘর থেকে বেরিয়ে নয়নতারার শোবার ঘরে এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বড় আয়নায় নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পেল। আগে আগে নিজেকে এমন দেখলে হয়ত ভাঁড় মনে হত। এখন ওসব কিছু মনে হল না। আসলে ক্লান্ত বোধ করছিল। নয়নতারার বিছানায় টানটান করে নিজেকে পেতে, পুরু কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিল। গোলগাল মেয়েটি রান্নাঘর অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে তাকে দেখছে কিনা, খেয়াল করল না।

বালিশে নয়নতারার চুলের গন্ধ, খুব মৃদু, তবু চেনা যায়। কিছু পুরোন অনুষঙ্গ অবশেষে অমলকে আক্রমণ করল। কারো নদীর ওপরের সেতুটা রাত্তিরে জীপ চালিয়ে পার হয়ে যাবার সময় অজস্র সাপের মতন জলের স্রোতের দিকে যেন একবারমাত্র চোখ পড়ল। নয়নতারা পাশেই বসে, কোনো কথা বলছে না। টাউনশিপে অমলের ঘরের জানলায় নয়ন-তারার পাশে দাঁড়িয়েছিল, বাইরে থেকে হাওয়ার ঝাপটা এসে চোখমুখে লাগল, একটা হাতে নয়নতারার কোমরটা জড়িয়ে জানলার শিক চেপে ধরল। এই সব ভাবতে ভাবতে অমল ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক পরে একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কষ্টে তাকিয়ে দেখল, ঘরে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। বিকেল হয়ে গেছে। হয়ত শব্দটা ইচ্ছে করেই করেছে নয়নতারার কাজের মেয়েটি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে অমলকে জাগাবার জন্যে চা অথবা কফি তৈরি করে শব্দ করেছে। বিছানা ছাড়বার আগে অমলের মনে পড়ল, ঘুমিয়ে অন্যরকম একটা স্বপ্ন দেখছিল। সেই স্বপ্নে নয়নতারা ছিল না।

অমল দেখছিল, একটা ঢেউয়ের মতন মাঠ, ঘাস শুকিয়ে প্রায় হলুদ, মাঠের কোনো সীমানা নেই, অনেক প্রাচীন গাছ ছিল, কারা যেন কেটে নিয়ে গেছে, ভোঁতা গুঁড়িগুলো পড়ে আছে শুধু। একটা লেজফোলানো কাঠবেড়ালি দৌড়চ্ছে, পেছনে ছুটছে শুভেন্দু। খানিক পরে শুভেন্দু খালি হাতে ফিরে এল, দারুণ হাঁপাচ্ছে, চোখে ঘৃণা, এখনই মনে হয় ছুরি মারবে, অথচ তার পাতলা চাপা ঠোঁট আশ্চর্য করুণ।

অমল তাড়াতাড়ি স্নানের ঘর থেকে ঘুরে এসে, কফিতে দু-তিন চুমুক দিয়ে বেরিয়ে এল। ডাইনে এবং বাঁয়ে কয়েকবার মোড় নিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে প্রধান সড়কের প্রান্তে সরু রেল লাইন পার হবার আগেই দেখতে পেল, রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

সেই সুন্দর জায়গাটায় উঠে আসতে সন্ধ্যে পার হয়ে রাত্তির হয়ে গেল। রাত্তির হয়ে যাবার আরো কারণ, প্রধান সড়কের একটা দোকানে খানিক বসেছিল। তাড়াতাড়িতে বাড়ির কফি অমলের নাকি ঠিক খাওয়া হয় নি, তাই ওই দোকানে ঢুকেছিল। কড়া কফির সঙ্গে একটা চাট নিয়েছিল: লাল লঙ্কাবাটা মাখানো সেদ্ধ আলু। এখনো ঠোঁট জিভ জ্বলে যাচ্ছে। নয়নতারা দোকানে শুধুই বসেছিল।

সুন্দর জায়গাটা আসলে একটা পরিত্যক্ত টেনিস কোর্ট, পাথরের ওপর সিমেন্ট করা। এখানে-সেখানে গভীর ফাটল, তার মধ্যে জ্যোৎস্না পৌঁছচ্ছে না, পিছলে যাচ্ছে ওপর দিয়ে। ঢালের দিকে পর্দা টাঙাবার ব্যবস্থা ছিল, লোহার কাঠামোর কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অন্য-দিকে পাথরের খাঁজে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বেঞ্চ কয়েকটা, ফেটে চৌচির, ফাটলের মধ্যে থেকে উঠে এসে সাপের ফণার মতন ফার্ণের পাতা হাওয়ায় দুলছে।

বাঁদিকে স্টেশন আর সামনে দূরের গ্রামের আলো চোখে পড়ে। ডান দিকটা অমল অবাধে দেখতে পেল না, কারণ একটা কম-ভাঙা বেঞ্চে তার ডান পাশেই নয়নতারা বসেছে। নয়নতারা বলছিল, 'তুমি চারদিন কলকাতায় ছিলে। তার মধ্যে একবারও কি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'তোমাদের বাড়িতে আমি কী করে যাব? তাঁরা কি আমাকে চেনেন? ঠিকানাই জানি নে। শুনেছি অবশ্য এনটালীর কাছে কোথায় তোমাদের বাড়ি। আমি তো সত্যি তোমার আত্মীয় নই।'

'তাহলে আমি তোমাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে কেমন করে গেলাম?'

'তোমার যাওয়া সহজ ছিল। আমার বাড়ির সবই তুমি জানো। আমি নিজের চারদিকে রহস্য তৈরি করে রাখি না।'

অসহিষ্ণুতা যত্নে চাপা দিয়ে নয়নতারা বলল, 'আমার বাড়ির কীই-বা তোমার অজানা! মা-বাবা রয়েছেন, দাদা-বউদিরা আছেন, তবু আমি সবার সঙ্গে মিলেমিশে আত্মীয়-পরিজনের কাছাকাছি থাকতে চাই না, কারণ আমার জীবনে একটা বড় ঘটনা আছে যার জন্যে আমি কতটা দায়ী আর অন্য একজন কতটা দায়ী তা নিয়ে তর্ক রয়ে গেছে। সবাই আমার ওপর দয়া করে

চুপ করে থাকতে চাইলেও, কখনো-সখনো সেই তর্ক এসে যায়। আমার ভালো লাগে না। আমি দূরে সরে থাকতে চাই। এ-ছাড়া আর কী রহস্য আছে আমার?'

'কোনো রহস্য নেই। সব জলের মতন। কিন্তু কার্শিয়াংয়ে তোমার কী?' অমলের গলা নরম নেই, বরং রুক্ষতার সঙ্গে ঈষৎ শ্লেষ মিশেছে।

নয়নতারা এমন হাসল যা সুখের না দুঃখের বোঝা যায় না: 'কার্শিয়াং আমার শৈশব।—বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় চলে যাবার আগে এখানে চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। আমি এখানে জন্মেছি। এই স্কুলটা থেকেই পাশ করেছিলাম। ওই বড় ঘটনাটা এখানে আমার জীবনে ঘটে নি। তাই ফিরে ফিরে আসি। নসটালজিয়া আর কি!'

দূরের আলোগুলোকে ঘিরে কুয়াশা ঝুলছে। সিমেন্ট করা চত্বরের ওপর দিয়ে দুধরঙ জ্যোৎস্না গড়িয়ে যাচ্ছে। নয়নতারার কথায় হয়ত বিষণ্ণতা মাখানো ছিল। অমল তখনই কিছু বলতে পারল না। হাওয়ায় শীত, অথচ নয়নতারার স্কার্ফটা ভাল করে গলায় জড়ানো নেই, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে আছে।

নয়নতারা আবার বলছিল, 'তোমাদের ওখানে গিয়ে দেখলাম, তুমি একেবারে অন্যরকম। ঠিক তোমার মতন কারো সঙ্গে আগে কখনো আমি মিশি নি।'

অমল ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে, এই ধরনের কথায় একটা জাদু থাকে, সাপুড়ের টুকরির মধ্যে চালান করে দেবার জাদু। জোরে জোরে জুতো ঠুকে শীত তাড়িয়ে খুব তেতো করে বলল, 'আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খেসারত এখন তোমাকে দিতে হচ্ছে।'

'কেন?' নয়নতারা এদিকে মুখ ফেরাল।

কিছু না বলে শুধু দাঁতের সঙ্গে দাঁত চাপল অমল। নয়নতারার দু'হাত কোলের ওপরে জড়ো করা ছিল। অমল নিজের ডান হাতটা তার ওপর রাখল, খামচে ধরল না। অর্থহীন প্রলাপের মতন বলল, 'তুমি কি নয়ন কোনো জ্যোৎস্নায় কারো লোমশ কবজি দ্যাখ নি?'

নয়নতারার মুখ এদিকেই ফেরান ছিল। এখন অমলের চোখের দিকে তাকিয়ে স্কার্ফটা জড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে নয়নতারার দুটো হাতই ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল অমল, স্কার্ফটা সরে যাওয়ায় কাঁধের ঢোল বেয়ে দুধ গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে অনিবার্যভাবে নিজের মুখ নামিয়ে আনল। অমলের লোমশ কবজি, কড়াপড়া আঙুলে প্রচুর জোর সন্দেহ নেই, তবু তখনই আবার নয়নতারা ছিটকে একপা সরে গেল। বলছিল, 'এখানে সাপ থাকতে পারে। ফিরি চল।'

কাঁধের ঢোল বেয়ে দুধ গড়িয়ে যেতে দেখে মুখ নামিয়ে এনে নিশীথ আর পুষ্পকে কেন মনে পড়ল, অমল ভাবছিল।

জ্যোৎস্নায় দুটো ছায়া ফেলে চুপচাপই নেমে আসছিল। একবার নয়নতারা বলল, 'এত অল্প দিনে তুমি এমন বদলে গেছ, অমল।'

পায়ের দিকে চোখ রেখেই অমল বলল, 'আমিও তো বলতে পারি—তোমাকে দেখেই জানলাম যে এত তাড়াতাড়ি মানুষ বদলায়।'

'আমি আমার মতোই। আমার কোনো বদল নেই।—ওখানে বসে ভাবছিলাম, তুমি হয়ত আমাকে গান করতে বলবে অথবা নিজেই গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করবে।'

নয়নতারার সব কথা অমলের কানে স্পষ্ট পৌঁছল না। কথা শোনার বাসনাও ছিল না তখন। গান কথাটা স্পষ্ট কানে এল। তবু বুঝতে চাইল না নয়নতারা ঠিক কী বলছে।

টেলিগ্রাফের তার অথবা অন্য কিছুতে হাওয়া লেগে একটা নিখাদ সুর বেজে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সামনের এবং দুপাশের পাহাড়ী নিসর্গ, অথচ হয়ত কুয়াশার জন্যে সব ঝাপসা। রাত্তিরে এমন কুয়াশা দেখতে চোখ অভ্যস্ত না, আশ্চর্য লাগছিল। এদিকটা একেবারে নির্জন। প্রধান সড়কে না নামা পর্যন্ত লোকজন দেখা যাবে না। একটিমাত্র লোক কাঁধের ওপর একটা ভারী কাঠ আড়াআড়িভাবে বেঁধে মেপেমেপে পা ফেলে উঠে আসছিল। অনেক ওপরে কোথাও কারো ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। সব জায়গায় ঠিক পাশা-পাশি হাঁটা যায় না, প্রায়শই নয়নতারা একটু আগে হাঁটছিল, পেছনে অমল হয়ত বা নয়ন-তারার শরীরের সম্মোহনে নেমে আসছিল, ভাবছিল—জ্যোৎস্নায় শরীরের অথবা অন্য কোনো কিছুর প্রান্তরেখা তীক্ষ্ণ থাকে না, কোণগুলো কেমন গলে গলে যায়।

প্রধান সড়কে নেমে, অমলের যেমন স্বভাব, চা অথবা কফির জন্যে আবার একটা দোকানে ঢুকতে চাইল। নয়নতারা রাজী হল না: 'রুক্মিণীর রাত্তিরের রান্না এতক্ষণে নিশ্চয়ই শেষ। আগে বাড়ি ফিরে যাই চল।'

গোলগাল মেয়েটির নাম এই প্রথম শুনল।

খাবার টেবিলে বসে খুব সরল গলায় নয়নতারা বলল, 'দুপুরে আমার রান্না খেয়েছ। এখন দ্যাখ রুক্মিণী কেমন রাঁধে।' একটু থেমে একটা দারুণ কথা মনে পড়ে যাবার মতন করে বলল, 'ভরতকে তোমার মনে আছে, অমল?'

অমল কোনো উত্তর দিল না। তার মুখ থেকে হাত বেশি নড়ছিল। বলল, 'এসব ভাল লাগছে না। খিদে নেই। কফি কর।'

'বাঃ, আর কিছু খাও, মেয়েটা কষ্ট পাবে না!'

স্নানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে, নয়নতারার সাবানটা অকারণে হাতে ঘষেঘষে অনেকখানি ক্ষয় করে দিয়ে অমল ঘেরা বারান্দায় কম আলোয় এসে বসল। একটা ট্রেন গেল, তার শব্দ। ট্রেন কিনা জানে না, শুধু ইঞ্জিনও হতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নয়নতারা কফি নিয়ে এল। দুটো কাপে কফি ঢেলে বলল, 'তুমি ক'দিন থাকবে, অমল? চাও তো আমি স্কুল থেকে ছুটি নিতে পারি। তোমাকে দার্জিলিং ঘুরিয়ে আনতে পারি।'

'আমাকে দার্জিলিং নিয়ে যেও। আমাকে মেলায় নিয়ে যেও। আমাকে বাঁশী কিনে দিও। আমাকে নাগরদোলায় চাপিও। মেলার ভিড়ে আমার হাত ছেড়ে দিও না, হারিয়ে যেতে পারি।'

খনিশহর গুয়ায় একটা চায়ের দোকানে একদিন যেমন হেসেছিল তেমন হেসে উঠে নয়নতারা আবার থেমে গেল। অমলের মধ্যে কোথায় যেন বিষ লুকোন আছে। হাসির কথায়ও সেই বিষ মাখিয়ে দিতে আশ্চর্য দক্ষ হয়েছে।

মুখোমুখি বসেনি। দুজনেরই মুখ বাইরের দিকে। বারান্দার কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে বাইরেটা ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল। কেউ কারো মুখের দিকে বহুক্ষণ তাকাল না। একবার কি দুবার অমল কফির কাপ ঠোঁটের কাছে তুলে নিল, নয়নতারা একবারও না। রান্নাঘর থেকে এক-আধটু শব্দ আসছিল, রুক্মিণীর রাত্তিরের কাজ সারার শব্দ।

মুখার্জিবাবু, সুনন্দ, শুক্লমতী, অ্যান্ড্রিয়াসের খবর নয়নতারা জানতে চাইল। রায় অথবা রায় বউদির নাম করল না।

অমল বলল, 'তুমি মাকে বলে এসেছিলে চিঠি দেবে। মাকে চিঠি লেখোনি,

মল্লিকাকেও না। শুধু শুধু কেন যে মিথ্যে বল!'

'আমি চিঠি লেখা একেবারে বন্ধ করেছি। নিজের বাড়িতে লিখি না। তোমাকেও প্রথমে একটিমাত্র লিখেছিলাম। আমার কাউকে কিছু লেখার নেই।'

দুজনের কথাতেই ঝাঁজ থাকলেও আলোচনা ঘরোয়া চেহারা নিচ্ছে দেখে নয়নতারা বরং আশ্বস্ত হয়ে কফির কাপটা একবার মুখের কাছে তুলে নিল। অথচ নয়নতারার আশ্বস্ত হওয়া অথবা খুশী হওয়া অমলের ভালো লাগল না। বলল, 'অন্য কোথাও গেলে, গিয়ে কিছুদিন থাকলে, হীরককে চিঠি লিখবে না?'

নয়নতারা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। খানিক চুপ করে থেকে টেনেটেনে বলল, 'হীরক আমার বন্ধু, তোমার মতন।'

'আমি তোমার বন্ধু কিনা জানি না। তবে আমি হীরকের মতন না।'

'তুমি অন্যরকম বলেই তো তোমাকে আমার ভালোলাগে, অমল।' নয়নতারা আর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল, যেন অবশেষে অমলকে তার মনোভাব ঠিকঠিক বোঝাতে পেরেছে।

কিন্তু অমল গলায় শ্লেষ মেশাল : 'তোমার বিচিত্র ভালোলাগার জন্যে আমি চোখে বিষণ্ণতা মাখিয়ে চিরকালের কিশোরটি থেকে যাই!'

নয়নতারা দ্রুত একবার অমলের মুখ দেখে নিয়ে চুপ করে গেল। হয়ত ভাবল, এসব নিয়ে আরো কথা বললে অমল শোভনতার মুখোশটুখোশ ছিঁড়ে ফেলবে।

আবার অনেকক্ষণ কথা না বলে কাটিয়ে দুজনই বুঝতে পারছিল রাত বাড়ছে। অমল ভাবতে চেষ্টা করছিল, ছাত্র থাকার সময় কলেজের অন্য তিনটি ছেলের সঙ্গে এখানে একবার বেড়াতে এসেছিল। স্টেশনের কাছে একটা ধর্মশালা আছে, দরোয়ানকে পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে সেখানে একটা ঘরে উঠেছিল, প্রায় রোজ একটা করে টিলায় চড়ত, খিদে পেত প্রচণ্ড, নিজেরা রান্না করে খেত। এইসব পুরোন ভাবনায় নিজেকে আটকে রাখার চেষ্টা হাস্যকর মনে হল। পাশের নিচু চেয়ারে বসে-থাকা নয়নতারার শরীরের সম্মোহনে আবার পুরোন ভাবনা থেকে ফিরে এল।

প্রায় নিঃশব্দে ঘেরাবারান্দার অন্য কোণে তোশক পেতে রুক্মিণী কম্বলটম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। কফির পাত্রগুলো নিতে এদিকে এল না।

সামনের নিচু টেবিলটায় অমল অকারণে আঙুল বুলোচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে, হয়ত বা অমলের লোমশ কবজিতে চোখ পড়ায় নয়নতারা হঠাৎই উঠে দাঁড়াল, বাড়তি ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'এবার ঘুমোতে যাও, অমল। আমার তো সকালেই স্কুল।'

'তুমি যাও। আমি আর একটু বসেই যাচ্ছি।'

ট্রেটা দুহাতে তুলে নিয়ে নয়নতারা ভেতরে গেল।

বারান্দার অল্প আলোয় একা ভূতের মতন বসে থেকে অমলের মনে হল, শুতে যাওয়া মিথ্যে। ঘুম আসবে না। কাচের দেয়ালের ওপাশের নিসর্গ এখন আর কিছুই দেখা যায় না। এই বারান্দা এই ঘরের সঙ্গে যেন চরাচরের কোনোই যোগ নেই। শব্দ নেই একটাও কোনো দিকে। দুহাত মুঠো করে টেবিলঢাকা শাদা কাপড়টায় ঘষছিল। দাঁতের ওপর দাঁত রেখে পিষছিল। সেই দুরন্ত নেশাটা আবার আক্রমণ করছিল, যা তাকে জন্তু বানায়। একটা অসহ্য কষ্ট নিচে থেকে ওপর দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে নয়নতারার কথা ভেসে এল : 'অমল, তুমি ঘুমোতে না গেলে আমি দরজা

বন্ধ করতে পারছি না।'

অমল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার আলো নিভিয়ে দিল, তারপর নয়নতারার শোবারঘরে চলে এসে দরজা বন্ধ করল নিজের হাতে।

খাটের সমান উঁচু বেডসাইড চেস্টের ওপর একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। ঘরে অন্য আলো নেই। বুকের ওপর একটা খোলা বই ধরে বালিশে মাথা রেখেই নয়নতারা এদিকে তাকাল। ঘুমের আগে বইয়ের পাতায় চোখ বুলোনো অভ্যেস হয়ত। অমল দরজা থেকে এগিয়ে গেলে নয়নতারা বলছিল, 'তুমি কী চাও!' কথাগুলো হিসহিস করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল, স্পষ্ট হল না।

খাটের পাশে দাঁড়ালে নয়নতারার শিয়রের দিকে বড় আয়নায় অমল নিজেকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে আনল বিছানায়। এসময়ে নিজের মুখের দিকে তাকান যায় না। দেখল, নয়নতারা উঠে বসেছে। কী যেন বলছিল, বুঝতে পারল না। হয়ত আবার বলছিল, 'এখানে কী চাও তুমি!' তখন অমল বুঝতে পারল, কেবল দুরন্ত নেশায় নয়, করুণ প্রার্থনার মতন, প্রায় কান্নার মতন সে বলতে চাইছিল—আর কিছু চাই না আমি, শুধু তোমাকে দেখাতে চাই আমাকে সব বলা যায়, আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়, আমি পরিপূর্ণ বয়স পেয়েছি, আমি প্রাপ্তবয়স্ক। কিছু অবশ্য বলতে পারল না। নয়নতারার দুই কাঁধ শক্ত আঙুলে কামড়ে ধরায় এলোমেলো চুল অমলের চোখমুখ ঢেকে দিয়েছে, তার শরীরের মারাত্মক ঢেউ অমলকে টেনে নিল। একটা শব্দে বুঝতে পারল, নয়নতারার হাতের বইটা মেঝেয় পড়ে গেছে। কাছেই ডানপাশে আলোটা জ্বলছিল, চোখে আলো লাগছিল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করার আগে একবার দূরের দেয়ালটা দেখতে পেল। ঘরের বাঁ দিকের শাদা দেয়ালে ভৌতিক ছায়ারা দাপাচ্ছিল। দুই বিশাল ডানায় একটা ছোট পাখিকে সাপটে নেবার অহংকার হয়ত ছিল, তবু অমল বারবার অনুচ্চারিত প্রার্থনা রাখছিল—দ্যাখো নয়ন, আমাকে দ্যাখো, আমি পরিপূর্ণ বয়স পেয়েছি!

বাড়তি ঘরটার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে নয়নতারা বলছিল, 'উঠে চা খাও, অমল। আমি স্কুলে যাচ্ছি।'

অমল নড়ল না, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে নয়নতারার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ঝোলানো বিচিত্র কারুকাজ করা ব্যাগটায় চোখ আটকে রইল। সম্ভবত অমলের সাড়া না পেয়ে নয়নতারা খানিক ভেতরে এগিয়ে এল। তখন মুখ দেখা গেল পুরোপুরি। এর মধ্যে স্নান করেছে, শাড়িটার পাড় নেই, খুব হালকা কমলা রঙ। নতুন করে লক্ষ করল, নয়নতারা কোনো গয়না পরে না।

'রুক্মিণী রান্না করবে। আমি একটায় ফিরব। তুমি একটু দেরি করলে একসঙ্গে খেতে পারি।' ঠাণ্ডা শাদা পাথরের মুখ থেকে নয়নতারা কথা বলল।

নয়নতারা চলে যাবার খানিক পরে অমল উঠে এসে ঘেরাবারান্দায় অর্থহীন পায়চারি করছিল। বারান্দা থেকে যেন শঙ্কিত পায়ে নয়নতারার শোবারঘরে প্রবেশ করল। সব গুছোন, বেডসাইড চেস্টের ওপরে নেভানো টেবিল ল্যাম্প, পাশে একটা বই, মলাটে ফুলের বাগান, নামটা দূরে থেকে ঠিক পড়া যায় না। গাঢ় রঙের বিছানা-ঢাকাটার দিকে একবার তাকিয়ে অন্য কোণে মুখ ফেরাল। কাঠের মেঝের ওপর কার্পেট পাতা, ধুলো নেই। সব ছবির মতন, তবু মনে হল, সেই ঘরে অদ্ভুত শূন্যতা। রান্নাঘর থেকে রুক্মিণীর কাজের মৃদু শব্দ আসছে, তবু

মনে হল, নয়নতারার শোবারঘরে অসহ্য নৈঃশব্দ্য।

বড় আয়নাটায় অমল নিজেকে দেখল। চোখে ঘৃণা জ্বলছে, শুভেন্দুর মতন। শুভেন্দুর চোখের ঘৃণা কিসের প্রতি জানে না, আয়নায় প্রতিফলিত চোখের ঘৃণা অমলের নিজের মুখের উদ্দেশেই জ্বলছিল।

স্নানের ঘরে গেল একবার, অতিথির ঘরে গিয়ে পোশাক বদলাতে হল। স্যুটকেসটা নিয়ে বারান্দায় পা দিয়ে দেখতে পেল, নিচু টেবিলে কখন চায়ের ট্রে রেখে গেছে রুক্মিণী। পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে বসল। রুটি ডিমভাজা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিল একবার, চায়ে দুবার চুমুক দিল।

স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বাইরের দরজা খুলেই বুঝতে পারল, রুক্মিণী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরে দাঁড়িয়ে কেমন অস্বস্তির সঙ্গে ডান হাতটা একটু নেড়ে অমল বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, বলে দিও।' রুক্মিণীর বিস্মিত দৃষ্টি থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাইরে সকালবেলার রোদ্দুর। সেই রোদ্দুরও ভালো লাগল না। নেমে যাচ্ছিল স্টেশনের দিকে। সকালে ট্রেন আছে কিনা জানা নেই। জানে, স্টেশনের কাছেই ট্যাক্সি আছে, শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে।

## ষোল

এমন ভোরবেলায়, যখন কুয়াশা দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করেনি, অনেক দিন আসেনি বেসক্যাম্পের দিকে। বিছানায় বসে ভেজা শার্শির মধ্যে দিয়ে দেখেছিল, কনস্ট্রাকশন কম্পানির একটা ট্রাক কী কারণে যেন তার জানলার কাছেই থেমে আছে। তখনো অমল চোখমুখে জল দেয় নি। জানলা খুলে চিৎকার করে কথা বলে জেনেছিল, ট্রাকটা স্টেশনে যাবে। জামাটা গলিয়ে, দরজায় তালা লাগিয়ে ড্রাইভারের পাশে এসে বসেছিল।

কনস্ট্রাকশন কম্পানির ট্রাকে ফগ লাইট ছিল। তবু এত কম সময়ে টাউনশিপ থেকে বেসক্যাম্পে নেমে আসা বিস্ময়কর। তাকে নামিয়ে দিয়ে ভারী ট্রাকটা বড়জামদা স্টেশনের দিকে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সুনন্দর কোয়ার্টারের সামনে অমল একটুক্ষণ পাতলা কুয়াশায় দাঁড়িয়ে রইল। দরজাজানলা বন্ধ, কোনো সাড়াশব্দ নেই। আজ ছুটির দিন, তাড়া নেই, সুনন্দ এখনো নিশ্চয়ই বিছানায়।

কড়ানাড়ার শব্দে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে ঘুমঘুম চোখে এক নজর দেখে নিয়েই সুনন্দ বলল, 'এক মাসের ছুটি পাওনা ছিল, পুরোটাই নিয়ে নিলি কলকাতায় যাবি বলে। অথচ দশ দিন যেতে না যেতেই আবার ফিরে এলি। কাল ফিরেই অফিসে গিয়েছিলি শুনলাম। তোর ব্যাপার বুঝি না। এমন হামলে বেড়াচ্ছিস কেন?—দেবদাস পড়েছিস?'

'স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম একবার। কেন বল তো?'

'না, এমনি জানতে চাইলাম।'

একটু দেরিতে হলেও অমলের মনে হল, বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরে ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফোটাল। সুনন্দকে বাথরুম থেকে ঘুরে আসবার সময় দিল। স্নানের ঘরে ঢোকার আগে সুনন্দ বারান্দার হিটারে কেটলি চাপাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হল।

বাইরে ভোর, তবু পাখি ডাকছিল না। ব্লাস্টিংয়ের শব্দে পাখিরা উধাও। সুনন্দ তার ঘর বড় নোংরা করে রেখেছে। মেঝেয় ধুলো, পোড়া সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ,

বিছানার চাদরটা ময়লা।

সুনন্দ মুখে তোয়ালে চাপছিল, অমল বলল, 'অনেকদিন পরে তোকে এক ঝুড়ি কথা শোনাব বলে এসেছি। চুপচাপ থাকবি। কথায় বাধা দিয়ে কথা বলা তোর অভ্যেস।'

কাহিল বিরক্ত চোখে তাকিয়ে সুনন্দ সিগারেট ধরাল : 'টেনে লম্বা করা কিসসা শোনার মেজাজ নেই।'

সুনন্দর ধৈর্যহীনতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অমল বলল, 'কলকাতায় কয়েকদিন থেকে ভাল না লাগায় কার্শিয়াং গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'ওখানে নয়নতারা স্কুলে কাজ করছে।'

'শাঁখ থাকলে বাজাতাম।'

'ইয়ার্কি রাখ।' অমল চেয়ারটায় আধ-শোয়া হয়ে সামনের টেবিলে পা তুলে দিল। তার বুকের কাছে অমলের পা চলে এসেছে দেখে সুনন্দ টেবিলটাকে ধাক্কা মেরে উঠে গেল। বারান্দা থেকে দু কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এল। বোধহয় গুঁড়ো চা, ভিজিয়ে রাখতে হল না। কাপ হাতে করে সুনন্দ শুভেন্দুর মতন তাকাচ্ছে দেখে অমল পা নামিয়ে নিল, সোজা হয়ে বসল। তখনই বদলে গিয়ে যেন লজ্জিতভাবে সুনন্দ বলল, 'দুধ নেই।'

মনে হল, সুনন্দ শুনতে চায়। গলা ভিজিয়ে নিয়ে অমল কার্শিয়াংয়ের একদিন এক রাত্রির কিছু টুকরো ছিঁড়েছিঁড়ে রাখল সুনন্দর সামনে। সব বলতে পারল না। সব বলা যায় না।

সুনন্দ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। কিছু বলবার জন্যে কাপটাকে সরিয়ে রেখে এদিকে তাকিয়ে মুখ খুলেছে, অমল বাধা দিল : 'তোর বাণী শুনতে আসি নি। তুই কী বলবি জানি। তুই কল্পনায় অনেকটা ওপরে বসে বাণী দেবার চালে বলবি—জীবনটাকে গুটিয়ে ছোট করে এনে একান্ত ব্যক্তিগত বাসনাকামনার অলিগলিতে পাখসাট মেরে বেড়ালে এইসব অভিজ্ঞতা হয়। তোর মতন নাবালকদের অবিশ্যি এসব অভিজ্ঞতা দরকার, বয়েস বাড়ে। এবার একটু সোজা হয়ে দাঁড়া, চোখটোখ খুলে তাকা।'

সুনন্দ সুন্দর করে হাসল। চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'থাম। জরুরী কাজ আছে। চল আমার সঙ্গে।'

বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে সুনন্দ আবার বলল, 'তোকে এক সময়ে ডায়রি লিখতে দেখেছি, সেই ধানবাদে থাকতে। আবার লেখ, অমল, তোর ভাষাটাষা বেশ।'

ডাকঘরের সামনে একটা পাথরের চাঁই ছিল। সেটাকে কারা সরিয়ে দিয়েছে। ওই জায়গা-টায় হয়ত এখন একটা কিছু হবে। আসলে ওখানে একবস্তা সিমেন্ট জমে গিয়ে পাথরের চাঁইয়ের মতন হয়েছিল। অমল ওই দিকে তাকিয়ে খালি জায়গাটা দেখছিল বলে সুনন্দর ঠাট্টাকে আমল দিল না।

আরো খানিকটা চলে এসে অমল বলল, 'কোথায় যাবি?'

'ইউনিয়ন অফিসে।'

'ইউনিয়নের অফিস হয়েছে নাকি?'

'জাপানীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা অ্যালিউমিনিয়মের ঘর গত সোমবারে আমরা দখল করেছি। হাঙ্গামা হয়েছিল, সামান্য।'

বেসক্যাম্পের প্রান্তে রাস্তার ধারে মাচার ওপর কয়েকটা লোক বসেছিল, দোকানের

মতন। সুনন্দ সিগারেট কিনল। দুএকজনের সঙ্গে কথা বলল। অমল তাদের ঠিক চিনতে পারল না। সেখান থেকে বাঁয়ে কিছুটা সরু রাস্তায় মোড় নিল।

হাওয়া দিচ্ছিল। বেশ শীত। শালের জঙ্গল থেকে একটানা শব্দটা আসছিল। কুয়াশা নেই। সকালের ঝকঝকে রোদ্দুর পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে পথের ওপর। হাঁটতে হাঁটতেই সিগারেট ধরাতে গিয়ে সুনন্দর একটা কাঠি হাওয়ার জন্যে নিভে গেল। সিগারেট ধরাতে একটু দাঁড়াল সুনন্দ, অমলকেও থামতে হল। রাস্তার প্রায় পাশেই একটা গাছের তলায় অমলের চোখ আটকে রইল। আশ্বিন কবে শেষ হয়ে গেছে, এখনো শিউলি! অজস্র ছড়িয়ে আছে গাছটার তলায়। দুপা এগিয়ে অমল একমুঠো নিয়ে এল, পাপড়িগুলো এখনো ভেজাভেজা।

সুনন্দ বিরক্ত চোখে তার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। অমল একমুঠো শিউলির প্রায় সবটাই মুখে পুরে দিয়ে কচকচ করে খানিক চিবিয়ে আবার তখনই হাঁটতে হাঁটতে পাশে ঝুঁকে থু থু করে ফেলে দিচ্ছিল।

॥ সমাপ্ত ॥

# বাল্মীকি প্রতিভা

## বিমল রায়চৌধুরী

বিবেকের দরজায় ঘা দেবার আগে রত্নাকর দত্ত হঠাৎ থমকে গেল। বন্ধুকে কথাটা কিভাবে বলবে এখন যেন মনেই আসছে না তার। অথচ সারা সকাল, দুপুর সে নিজের ঘরে বসে বিবেকের সঙ্গে কথোপকথনের মহলা দিয়েছে। বিবেক তালুকদারের অদৃশ্য মুখের ভাব-বৈকল্য অনুযায়ী কথা সাজিয়েছে, বন্ধু রাজী না হলে, ওর দিকে ঘৃণার চোখে তাকালে কিংবা, হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলে আলোচনাটাকে কোন পথে নিয়ে যাবে নিখুঁতভাবে ভেবেছে সব। রত্নাকর ডান হাতে ধরা ভারী, বেশ ভারী ব্যাগটা দু পায়ের মাঝখানে মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ডান হাতটা ঘেমে যাচ্ছে ক্রমশ। কোটের পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘষে ঘষে মুছল হাতটা সে।

এই ঘাম মোছার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু সব কিছুই মুছে দিচ্ছি। আমার হাতের রেখাটা আমি আজীবনের চেষ্টায় মুছতে পারি নি। বেয়াড়া দাগগুলো আমাকে ভুগিয়েছে —কোথাও একটা ব্রেকথ্রু দেয়নি। তখন আমি এই, এই হাতের তালু ভেঙে, ভাগ্যরেখা ফুটো করে, শালা চলে যাব।

রুমালটা পকেটে রাখার পর, ডান হাতটা শুকিয়ে খটখটে হওয়ার পর, রত্নাকরের মনে পড়ল সে বিবেকের দরজায় এসেছে। বিবেক ছাড়া এই অবস্থায় আর কারো কাছে যাওয়ার উপায় নেই তার। হঠাৎ একটা অসহ্য সুখের পাহাড় তার সামনে। এই পাহাড়টাকে একা পেরোনো যাবে না—কোন্ সুখকেই বা একা পেরোনো যায়—তাই এখন সুখের সঙ্গী একজন তার একান্তই দরকার। বিবেকই এখন তার চমৎকার সঙ্গী হতে পারে। কারণ আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না। বিবেক তালুকদার তার ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়েছে, চাকরি খুঁজেছে। বিবেক এখন একটা নামকরা কোম্পানিতে বিল ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, উপরি পায় মাসে প্রচুর এবং আজো মাঝে মাঝে রত্নাকরকে প্রচুর খাওয়ায়।—আমি যে শালা কাউকে খাওয়াতে পারি না মনের মতন। ইচ্ছে করলেই মল্লিকাকে নিয়ে তিনটাকা দামের সিটে সার্কাস দেখাতে পারি না তার জন্যে আমি দায়ী নই। কেউ কেউ সহজ কাজ অতি সহজেই পারে। কারো কারো পক্ষে সহজ কাজটাই এমন একটা কঠিন চেহারা নেয় যে তার সুরাহা করা শিবের অসাধ্য। অনেক দিন অপেক্ষা করা গেছে, ঢের জল ঘোলা করেছি কিন্তু এবার শালা আর জলে নামছি না। জলে না নেমে, সাঁতার না কেটে ওপারে, একে-বারে ওপারে যাওয়ার রাস্তাটা এতদিন আমি দেখতে পাই নি কারণ ব্রেকথ্রু কথাটার আদত অর্থ আমি বুঝতে চাইনি। অন্তত এই আট বছরে সাতটা চাকরি পাল্টাতে হয়েছে। বিয়ে হয় নি। ঠিকমত মাকে কাঁচড়াপাড়ায় টাকা পাঠাতে পারি নি—একটা শক্তসমর্থ পুরুষ যা পেরে থাকে তার কোনটাই—।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দটা কেমন যেন বিকট হয়ে বাজতে লাগল রত্নাকরের কানে। চারপাশের সাধারণ শব্দগুলো যখন খুব জোরে বাজতে থাকে কানে তখনই লক্ষ করেছে রত্নাকর যে তার মাথাটা কেমন ঘুরতে থাকে, পড়ে যেতে ইচ্ছে হয় মাটিতে আচমকা।

দরজা খুলে রত্নাকরকে দেখে বিবেক অবাক।

—এতদিন কোথায় ছিলি রে দস্যু?

রত্নাকরের এতদিন পরে ওর ডাকনামটাকে অসহ্য মনে হল। আজকে অন্তত যেন বিবেক ওকে 'দস্যু' বলে না ডাকলেই ভাল করত। ব্যাগটা মাটি থেকে তুলে বিবেকের পেছন পেছন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,—শরীরটা কয়দিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না তাই আসতে পারিনি। আজকে এলাম ভীষণ একটা দরকারে। সত্যি ভীষণ দরকার, দরজাটা বন্ধ করে দে, আর কাউকে এক গ্লাস জল দিতে বল।

রত্নাকরের বিশেষ দরকারের সঙ্গে বিবেক পরিচিত। নির্ঘাত কিছু টাকা চাইবে, নইলে অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে দেওয়ার কথা বলবে। বাড়ির ভেতর থেকে এক গ্লাস জল এনে রত্নাকরের হাতে দিতে দিতে সন্ত্রস্ত গলায় বলল বিবেক,

—যেখানে চাকরি করছিলি সেটা গেছে নাকি? টের পেয়েছে নাকি ওরা?

—না চাকরি যায়নি, কারণ একমাস ভালই আছি। তবে পরশু থেকে যাবে। আর সেই জন্যেই এসেছি তোর কাছে। না, না, চাকরি বা টাকা কিছুই চাই না আমার, বরং তোর কিছু টাকা চাই কিনা বল।

বিবেক হাসতে হাসতে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে। রত্নাকর খুব বিব্রত চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল। বিবেকের সবরকম মুখ মনে রেখেই কথার পর কথা সাজিয়ে এনেছে সে কিন্তু আরম্ভেই যে বিবেক হাসতে থাকবে এরকম, ভেবে রাখেনি। এখন বিবেককেই কথা আরম্ভ করতে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—ব্যাপার কী রে তোর? সেই মিস্টিরিয়াস ভাটিয়া কোম্পানির গদিতে কি চোরাই সোনার বাট হাতড়ে ফেলেছিস? ঘুষ দিয়ে ওরা তোর মুখ বন্ধ করেছে? কত টাকা, কত টাকা দিয়েছে?

বিবেক তখনো হাসছে। রত্নাকর ভাবল বিবেকের হাসিটাকে প্রথমে বন্ধ না করতে পারলে কিছুই বলা হবে না তার। তাই হাসিটাকে ছাপিয়ে একটু চেঁচিয়ে টেনে টেনে বলল,—এ-ক-ল-ক্ষ-টা-কা—!

রত্নাকর দত্ত যেন মন্ত্র পড়ল একটা। বিবেকের হাসিটা একবার চিত্রার্পিত স্থির হয়ে, মুখের ভেতরে মরে গেল।

—তুই কী বলছিস দস্যু?

—এক লক্ষ টাকাটা ঠিকই বলেছি, কিন্তু সোনার বাটটা ঠিক নয়। এই যে এই ব্যাগটা, এই ব্যাগে করকরে এক লক্ষ টাকার নোট আছে। সেই পুরোনো জায়গায় গিয়ে দিয়ে আসতে হবে। আগে এতটাকা কোনদিন দেয়নি। আজকে ওদের পুরোনো লোকটা নেই, তাই আমাকেই দিয়েছে পোঁছে দিতে। কিন্তু আমি, আমি দেবো না পোঁছে।

বিবেক প্রায় চীৎকার করে ওঠে।

—কী পাগলের মতন বকছিস! এ টাকা তুই কী করে মারবি? একলক্ষ টাকা পাওয়া যেমন কঠিন, রাখা তার চেয়েও কঠিন।

—সেই জন্যেই তো তোর কাছে এসেছি। তুই পঞ্চাশ হাজার টাকা নে, বাকীটা আমি। তার বদলে এই ব্যাগটা শুধু তোকে কালকের দিনটা রাখতে হবে কাছে। রবিবারটুকু শুধু।

রত্নাকর সুস্থ আছে কিনা দেখবার জন্যেই যেন বিবেক ডানহাতটা ওর কপালে, গায়ে ছোঁয়াল। দেখল, কপালটা একটু ঠাণ্ডা, এবং ঘামে একটু স্যাঁতস্যাঁতে।

—না-রে, আমার জ্বর হয়নি, ফিটও হবো না, অন্তত এখন। আমি সব ভেবে রেখেছি।

তোর কোনো ভয় নেই, তুই শুধু যত্ন করে ব্যাগটা কোথাও লুকিয়ে রেখে আয়। শুধু একদিন রাখবি, তার বদলে ভেবে দ্যাখ প—ঞ্চা—শ হাজার টাকা, সব দশ টাকার নোটে। ভাঙানোর, খরচ করার, কোনো অসুবিধে নেই। একটু শুধু পাপ, এ ছাড়া আর কিছু হবে না।

বিবেকের মনে হল এক অস্বাভাবিক মঞ্চে এক অসম্ভব নাটকের মধ্যেখানে কেউ ওকে জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। প্রতিবাদ করবে এরকম গলার জোরও যেন আর নেই ওর মধ্যে। ওকে বসে থাকতে দেখে রত্নাকর যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এই ধরনের দৃশ্যের মহলা ও বার বার দিয়েছে নিজের ঘরে। এতটুকু অসুবিধে হল না ওর, —কী? আমার পাপের ভাগ নিতে পারবে না ভাবছ?

যেন রামায়ণের পাতা থেকে কথা বলল রত্নাকর।

—শুধু পাপ? তোমার পুলিশের ভাগ কে নেবে? শেষকালে জেলে গিয়ে ঘানি টানবো?

এতক্ষণে যেন অনাবিল হাসবার একটা সুযোগ পেল রত্নাকর। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ারে বসে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসল সে। তারপর একসময় স্থাণুবৎ বিবেকের দিকে তাকিয়ে মৃদুগলায় বলল,—আমি জানি বিবেক, স্রেফ পাপকে কেউ কখনও ভয় করে না। পুণ্যকেও কেউ কখনও ভালবেসেছে বলে শুনিনি, কোনও বইতেও পড়িনি। আমরা কেবল সুখকে ভয় করি। পুলিশে ধরলে তোর সুখ যাবে তাই তুই ভয় পাচ্ছিস!

বিবেক ভাবল ওর একমাত্র কর্তব্য এখন কোনোরকমে বন্ধুকে পাঁচকথার জালে আটকে ফেলা। রত্নাকরকে এখন খানিকটা কথা বলাতে পারলে হয়তো ওর ঘোরটা কেটে যাবে। নড়েচড়ে বসে বলল,—তুই তাহলে সুখকে ভয় করেই একাজ করিস না। ভেবে দ্যাখ তুই একদম সুখ পাবি না, তোকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, ধরা পড়ার ভয়ে মিইয়ে থাকবি সারাটা জীবন।

—ধরা পড়ে গিয়ে আমি এখনই মিইয়ে আছি বিবেক, নতুন করে আমি আর ধরা পড়তে পারি না।

—কিন্তু, কিন্তু এই অন্যায়টাকে মেনে নিতে পারবি মনে মনে?

—তুই যে অফিসে ঠিকাদারদের কাছ থেকে এত এত টাকা ঘুষ নিস, কী করে তা' মেনে নিস?

—কতগুলো ব্যাপার আছে যা আমাদের সয়ে যাচ্ছে, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আর আমি ঠিক ঘুষ নি না, কাজ করে দেবার বদলে—

—আমিও একটা কাজ করে দেবার বদলে টাকাটা নেবো। তবে এখানে কাজটা একলা আমার। এই টাকাটা পেলে আমার জীবনটা কাজের হয়ে উঠবে। একবার চাকরি, একবার ধারের জন্যে তোর কাছে বারবার এসে হাত পাততে হবে না।

রত্নাকর জানে এর পর সত্যি বিবেকের আর নীতিগতভাবে বলার কিছু নেই। এখন বিবেক শুধু প্রশ্ন করবে পুলিশকে কিভাবে এড়াবে সে। এর উত্তর রত্নাকর মনে মনে অনেকবার জপে এসেছে। ক্লান্ত কণ্ঠে সেই জপমালাটাই আবার নতুন করে বন্ধুর সামনে ঘোরাতে লাগল।

—পুলিশের কোন ভয় নেই বিবেক। আমার ফিটের ব্যারাম অনেকদিনের। তোরা সাক্ষী, আমি যে মেসে থাকি তার বোর্ডারেরা সাক্ষী। আগামী কাল রবিবার, কালই আমার

টাকাটা বিকেলের দিকে পেঁছে দেওয়ার কথা। কাল আমি রাস্তায় ফিট হয়ে পড়ে যাব। আমাকে ধরাধরি করে লোকজন কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাবে অথবা কোনো গাড়িবারান্দার তলায় নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করবে। যখন আমার জ্ঞান হবে তখন 'আমার ব্যাগ কোথায়' বলে চীৎকার করব। ভাটিয়া সমস্ত খোঁজখবর নেবে। কিন্তু পুলিশে যাবে না। অত টাকা কোথায় দিতে যাচ্ছিলাম তার কৈফিয়ত কী দেবে পুলিশের কাছে ওরা? দিলে ওদেরই বিপদ, কালো টাকার খোঁজে ওদেরই গুদামে পুলিশ ঢুকবে। আর তাছাড়া পুলিশে যদি খবর দেয়ও তাহলেই বা কী? পুলিশ তো খোঁজ নিলেই জানতে পারবে আমার ফিটের ব্যামো আছে, যার জন্যে সব জায়গা থেকেই আমার চাকরি যায়, ভালো কাজ জোটে না। আর রাস্তার ভিড়ে একটা অজ্ঞান লোকের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে সটকে পড়া এমনকি অস্বাভাবিক এই কলকাতায়? বিবেক, পুলিশ বিশ্বাস করতে বাধ্য, আমি যা বলব বিশ্বাস করতে বাধ্য! তারপর এই কলকাতাকেই অজ্ঞান করে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাগ নিয়ে আমি সটকে পড়ব।

বিবেক তালুকদার আর কথা বলতে পারছে না। পারবে না জানত যেন রত্নাকর দত্ত। যেন সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে গেছে এইভাবে উঠে দাঁড়ায় রত্নাকর। বন্ধুর দু'কাঁধ ধরে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দেয়।

—কীরে, বিশ্বাস হল এখন যে তোকে শুধু ওই পাপের ভোগটুকুই নিতে হবে, পুলিশের নয়?

—আমাকে ক্ষমা কর দস্যু। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই না। তোর ব্যাগটা রাখতে বলছিস রাখছি। তুই কাল যখন হয় এসে নিয়ে যাস। আমি কিছু জানি না ব্যাগের মধ্যে কী আছে। তুই শুধু একটা চিরকুট লিখে দে যে আমাকে বাড়িতে না পেয়ে একটা ব্যাগ তুই আমার মার কাছে রেখে যাচ্ছিস, কাল এসে নিয়ে যাবি। থানা পুলিশ হলে ওই চিঠিটা বাঁচাবে আমাকে। এর বেশী আমি কিছু করতে পারবো না!

রত্নাকর এতটা ভেবে আসেনি। বিবেককে বুঝতে সত্যি একটু অসুবিধে হচ্ছে তার। অফিসে যে লোকটা ছোট ছোট ঘুষ নিয়ে পাপ করে, বড় পাপকে এত ভয় করে কেন সে? রত্নাকরের পাপের ভাগটা কেন জগদ্দল ঠেকছে বিবেকের কাছে? হঠাৎ বন্ধুকে বড় ছোট, বড় ভীতু মনে হল ওর। কেমন চারদিক গুছিয়ে ছোটখাট পাপের মধ্যে যায় এরা। ছোটখাট পাপগুলো জমে জমে প্রবল হয়ে বড় একটা পাপকে পেরিয়ে গেলেও এদের টনক নড়ে না। কারণ, কিস্তিবন্দী পাপ কাউকে সুখ থেকে বিচ্যুত করে না। পুলিশ খুন না করলে, চুরি না করলে, দাঙ্গা না করলে বা ওই ধরনের আরো নিশ্চিত এবং নিশ্ছিদ্র পাপ না করলে এইসব ইতরদের সুখ থেকে বঞ্চিত করে না। মল্লিকাকে বিয়ে করলে পুলিশ ধরবে না বিবেককে। 'রত্নাকর দত্তের ফিটের ব্যারাম আছে, ওর সঙ্গে রত্নাকরের বিয়ে হতে পারে না', একথা মল্লিকার বাবা মাকে বলার জন্যেই বিবেক শাস্তি পাবে না।

বিবেক অনেকক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারল রত্নাকর। এবার কিছু একটা বলতেই হয়, নইলে আবার হয়ত মত পাল্টে যাবে ক্ষুদ্র পাপীটার। তাড়াতাড়ি বলল,—বড় ধরনের পাপ করতে বড় ভয় করে, নারে বিবেক? ঠিক আছে, দে একটা কাগজ, লিখে দিচ্ছি তুই যা চাস। তবে তোকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি দেব। পাপের ভাগ না দিয়ে পাপ উপভোগ করা যায় না।

—না ভাই, তার দরকার নেই। আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার নামেই বুক কাঁপছে, টাকা

পেলে আমি নির্ঘাত হার্টফেল করে মারা যাব। তোর টাকা তুই-ই নে। তবে এর মধ্যে যে একলক্ষ আছে তুই জানলি কী করে? তুই না আগে একবার বলেছিলি, ভেতরে কত টাকা আছে তোকে জানায় না, এমনকি চাবিটা পর্যন্ত তোর কাছে থাকে না ব্যাগের?

—চাবিটা ওরা এবারো দেয়নি। তবে অনেক টাকা, তাই অঙ্কটা বলে দিয়েছে যাতে সাবধানে যাই। আমি চাবিওয়ালা ডাকিয়ে অনেক আগেই ব্যাগটার ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নিয়েছিলাম। আমি কী বয়ে বেড়াচ্ছি আমার জানা দরকার। কে কী করে বেড়ায় প্রত্যেকেরই জানা থাকা দরকার। তাছাড়া আমি অনেকদিন ধরেই এরকম একটা কিছু করার তালে ছিলাম। ফিটের ব্যারামটা এতদিনে কাজে লাগিয়ে একটা ব্রেকথ্রু পেলাম। তুই তো জানিস, এর আগে আমি জ্ঞানত কোনো পাপ বা অন্যায় তোরা যা বলিস করিনি। ঠিক করে রেখেছিলাম এ ধরনের কিছু একটা যদি করতেই হয়, বেশ বড় ধরনের করব যাতে বার বার আর করতে না হয়।

বিবেক এরপর কথা না বাড়িয়ে সামনের টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে এল, কলমটা বার করে দিল পকেট থেকে, তারপর কী ভেবে পকেটেই আবার রেখে দিল কলমটা।

—না তোর কলমেই লেখ, আমি তো বাড়ি নেই। আমার কলমে লেখাটা ঠিক হবে না।

ব্যাগটা বিবেকের কাছে রেখে যখন রাস্তায় নামল রত্নাকর তখন সবে সন্ধ্যে। রাস্তায় সদ্য-জ্বালা আলোগুলো তখনো আড়ষ্ট। রত্নাকরের কিন্তু মনে হল ওরকম উজ্জ্বল আলোকমালা কার্নিভালে ছাড়া আর কোথাও এর আগে ও দেখেনি। শুধু আলো না, কলকাতার রাস্তাঘাট ফুটপাথ যেন পোষা কুকুরের মতন ওর পায়ে পায়ে হাঁটছে, একটু আদর করে ডাকলেই যেন ল্যাজ নাড়তে থাকবে।

শালা কলকাতা সব জানে। আমি এখন লক্ষপতি (বিবেক তার ভাগের পঞ্চাশ হাজার নেবে না স্থির হয়ে যাওয়াতে তেমন একটা খারাপ লাগছিল না তার) রত্নাকর দত্ত। কেমন সহজে শালা ভাগ্যরেখা ফুটো করে হুস্ বেরিয়ে যাচ্ছে শ্রীরত্নাকর দত্ত। মল্লিকা হারামজাদী একবার তাকিয়ে দ্যাখ্—সেই ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রত্নাকর কেমন দস্যুর মত কলকাতাকে অজ্ঞান করে একলক্ষ টাকা লুটে নিয়েছে। বিবেকের সঙ্গে বিয়ে হলে ওর ছোট ছোট, বলতে-ঘেন্না-করে এমন পাপের পয়সায় গালে হিমানী ঘষে ঘষে ফরসা হবি, বয়স হলে মোটা হবি, আরো বয়স হলে ঠাকুমা হবি—কিন্তু তোদের জীবনে কোনো ব্রেক থ্রু হবে না।

ফুটপাতের লোকজনদের হঠাৎ চমক দিয়ে রত্নাকর চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্রেক থ্রু', 'ব্রেক থ্রু'।

সোমবার কাগজ খুলেই রত্নাকর অবাক। কালকের বিকেলের ঘটনাটা হুবহু বেরিয়ে গেছে। মায় একলক্ষ টাকার কথাও। মনে করবার চেষ্টা করল রত্নাকর, না, কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি। হিসেবের এতটুকু এদিক-ওদিক নয়। তবে তফাতের মধ্যে পুলিশের গাড়ি করেই মেসে ফিরেছে, মাঝে থানাতে বুঝি একবার ডায়েরি লেখাতে থেমেছিল। অবশ্য পুলিশের গাড়িতে ফেরাটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে বলতে গেলে, কারো বাবার সাধ্য নেই ওকে আর সন্দেহ করে। প্রতিবেশীরা, বোর্ডাররা কাল ওর সামনেই বলেছে যে ওর এরকম ফিটের ব্যারাম মাঝে মাঝেই হয়। ভাটিয়া এলেও ওই একই কথা শুনবে। ভাটিয়া যদি নিজে না আসে বিকালের দিকে মেসের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাটিয়ার ওখানে। কাঁদুনি গাইতে হবে কিছুক্ষণ। ধমকধামক শুনতে হবে। ভাটিয়ার ভাঙা গলাটা যেন

এখনই শ্নতে পারছে রত্নাকর, 'তোমহারা বেহ্ঁশ হোনে কা বেমার হ্যায় পহেলে কি্উ নেই বাতায়া? কি্উ সত্যানাস কিয়া হামারা?'

আমার সত্যটা যে অনেকদিন ধরে নষ্ট হচ্ছিল ভাটিয়া সাহেব? আমি বেহ্ঁশ ঠিক কাল হইনি সাহেব, কালই আমার প্রথম হ্ঁশ হল। এখন আমাকে রত্নাকর না বলে বাল্মীকি বলেও ডাকতে পারেন। রাম, রাম ভাটিয়া সাহেব রাম, রাম। রত্নাকর এতদিনে যেন গলা ফ্লিয়ে রাম, রাম বলতে পারছে।

—কী, এখন কেমন আছেন রত্নাকরবাব্? মেসের পাঁচ-ছয়জন বোর্ডার ঘরে ঢ্কতে প্রশ্ন করলেন। রত্নাকর তাড়াতাড়ি মেলে ধরা কাগজটা পাশে সরিয়ে দেয়। পাশের ঘরের শচীনবাব্ প্রশ্ন করেন,

—কাগজটা দেখেছেন? ইস্ একলক্ষ টাকা! যে নিয়েছে তার তো আজকে জন্মদিন!

—ভগবান, এই উল্ল্কটা জানে না কার জন্মদিন সত্যিকার আজকে!

—আচ্ছা একলক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছেন, টাকা ত—যে টাকা অনায়াসে আপনিই মেরে দিতে পারতেন, তাহলে এই এঁদো মেসে জীবনপাত করতে হত না আপনাকে! রবীন দত্ত হাসতে হাসতেই বলল কথাটা।

রত্নাকর চমকে ওঠে। কিন্তু তারপরেই সামলে নিয়ে নীরস গলায় প্রশ্ন করে,—আমি কী করে মারবো?

—কেন এ আর কঠিন কী? টাকার ব্যাগটা ধর্ন আগে মেসে এসে আমাদের কাছে রেখে গেলেন, তারপর রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন? হাসতে লাগল কৌতুকে রবীন এবং দেখাদেখি সবাই। রত্নাকর ঘামতে লাগল।

কলকাতার সব শালা কি আমার মতন ব্রেক প্র্ খ্ঁজে বেড়াচ্ছে? পারছে না শ্ধ্ তারা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে না বলে বা বড় পাপ করার সাহস নেই বলে, বা মল্লিকাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়ে যায় বলে বা, বা, বা,—

রত্নাকর দত্ত খাট থেকে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে গেল।

যত বেলা বাড়তে লাগল রাজ্যের ভয় ভিড় করে নামতে লাগল রত্নাকরের মনে। রবীন দত্ত হয়তো ঠাট্টা করেই বলেছে কথাটা, কিন্তু যে কথা আজকে রবীন ভাবতে পারল সে কথা অন্য যে কেউই ভাবতে পারে। তাছাড়া একলক্ষ টাকা নিয়ে এখন কোথায় পালাবে সে। খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে যে তার হাত থেকে একলক্ষ টাকা হারিয়ে গেছে। এখন এই মেস ছাড়া যাবে না, ছাড়লেই রবীন দত্তের ভুর্তে সন্দেহ নেচে উঠবে। এই টাকা এখন খরচও করা অসম্ভব। খরচ করতে গেলেই বোর্ডারদের কানাকানি শ্র্ হবে, কানাকানি থেকেই প্লিশ আসবে কিংবা প্লিশ না এলেও ভাটিয়ার ভয়ংকর অন্চরদের আসতে বাধা নেই। শেষমেষ খ্নও হয়ে যেতে পারে রত্নাকর একদিন।

রত্নাকর আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরোনোর জন্যে জামাকাপড় পরতে লাগল।

—এই দ্র্বল শরীরে আবার কোথায় বেরোচ্ছেন বাব্? মেসের চাকরটা জিজ্ঞেস করল নীচে নামার সময়।

—না, বেশী দ্রে যাব না রে হরিপদ। আমি কখনই বোধ হয় বেশীদ্র যেতে পারব না জীবনে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পায়ে পায়ে বেশ দূরে চলে এল রত্নাকর, একেবারে মল্লিকাদের পাড়ায়, মল্লিকাদের বাড়িতেই।

দরজা খুলল মল্লিকা।

অনেক রোগা হয়েছে মল্লিকা, সেই রঙটাও যেন আর নেই।

—আপনি? এতদিন কোথায় ছিলেন? নিজেই এসেছেন না বন্ধু পাঠিয়েছে?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে কেমন যেন হাঁপাতে থাকে মল্লিকা।

—মল্লিকা, এখন, আজকে আমায় আর কোনো প্রশ্ন ট্রশ্ন কোরো না। আমি এখন আর তোমাদের সেই দয়ার পাত্র রত্নাকর দত্ত নই। আমাকে আর কেউ কোথাও পাঠাতে পারে না। আমি আমার হাতের তালু ভেঙে ভাগ্যরেখা ফুটো করে বেরিয়ে গেছি। বিবেকের ওপর আমার আর কোনো রাগ নেই। এক সময় আমার রাগ ছিল, কিন্তু এখন তোমরা আমার করুণার পাত্র।

—কী, চুপ করে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, না ভেতরে আসবেন?

রত্নাকর ভেতরে ঢুকল মল্লিকার পেছনে পেছনে। বসবার ঘরে গিয়ে বসতেই মনে হল ভুল জায়গায় এসেছে। সত্যি পায়ে পায়ে কী করে যে, কেন যে এল এখানে ভেবেই পাচ্ছে না এখন।

—কেমন আছেন আজকাল আপনি? আর আসেন না কেন? মল্লিকা এত প্রশ্ন করছে কেন? ভেবে দেখল এ পর্যন্ত খালি প্রশ্নের পর প্রশ্নই করে যাচ্ছে মল্লিকা।

—ভাল আছি, খুব ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? কিন্তু বিবেক আমাকে পাঠিয়েছে কেন বললে বলো তো?

—কী জানি কেন বললাম। হয়তো ভেবেছিলাম আবার মত পাল্টেছে আপনার বন্ধু!

—মত? কিসের মত?

—সামনের শুক্রবার আপনার বন্ধুর আমাকে বিয়ে করবার কথা ছিল। রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গতকাল আপনার বন্ধু এসে জানিয়ে গেছে এখন সে বিয়ে করতে পারবে না। বলে গেল ওর জীবনে কী একটা ওলটপালট কান্ড হয়ে গেছে। ও কিছুদিন একলা ভাবতে চায়।

একটা ম্লান হাসির ভেতর দিয়ে কেমন নির্বিকার বলে যাচ্ছিল কথাগুলো মল্লিকা। রত্নাকরকে যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছিল না কথা বলবার সময়। খেলায় হেরে যাওয়ার পর পরাজিত খেলোয়াড় যেমন খেলার স্মৃতি রোমন্থন করে মল্লিকা তেমনি যেন এক করুণ হেরে-যাওয়া খেলার কথা বলে যাচ্ছে অনেকদিন পরে দেখা হওয়া পরিচিত এক দর্শককে।

—একলা কী ভাবতে চায়? নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করল রত্নাকর।

—ভাবতে চায় আমার পেটে যেটা এসেছে সেটা আপনার না তার!

—মল্লিকা! ভীষণ জোরে, প্রায় চীৎকার করেই উঠল রত্নাকর।

—আমায় ধমকাবেন না রত্নাকরবাবু। আপনার বন্ধুকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।

—ছিঃ, বিবেকটা এত নীচ? তাছাড়া এরকম একটা বিশ্রী সন্দেহই বা আসে কোত্থেকে। তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় তিনমাস পরে এই দেখা হল।

—আপনার বন্ধুর ধারণা, রোজই আপনার সঙ্গে আমার লুকিয়ে দেখা হয়। ওর ধারণা ওর ওপর আপনার আক্রোশ আছে একটা। সেই আক্রোশের বশেই ওকে ঠকাবার জন্যে—থাকগে ওসব কথা আর আমার ভাল লাগছে না রত্নাকরবাবু। কিন্তু আপনি হঠাৎ

ওকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন কেন বলুন তো!

টাকা? বিবেক বলেছে আমি তাকে টাকা দিয়েছি? কত টাকা দিয়েছি—কত—। রত্নাকর যেন চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যাবে উত্তেজনায়।

—নাইবা শুনলেন আমার মুখ থেকে। তবে আপনার টাকা ও নেয়নি বলে গেছে কাল এসে। আমাকেও কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল ডাক্তারের খরচ বাবদে।

—মল্লিকা, তুমি চুপ করো। আমি যাচ্ছি ইডিয়েটটার কাছে, কান ধরে টেনে আনছি এখানে। সামনের শুক্রবারেই বিয়ে হবে তোমাদের। আমি সাক্ষী থাকবো।

পাথরের মত ঠাণ্ডা গলায় মল্লিকা বলল,—না, রত্নাকরবাবু, বিবেককে আমি বিয়ে করার কথা আর ভাবছি না। যে নিজের পাপের ভাগ অন্যের ওপর গছাতে চায় তাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে পারব না।

চারদিক অন্ধকার করে এল। আকাশে একটাও আর তারা নেই। যেখানে তারা ছিল, চাঁদ গোল হয়ে জ্বলত, সে সমস্ত জায়গায় বড় বড় ফুটো, গহ্বর, খাদ। আমি এখন ওর যে কোনো একটা হাঁ-র মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। একবার চলে গেলে মল্লিকা আর জানতেও পারবে না। বিবেক নয়, আমি, আমিও প্রথমে আমার পাপের ভাগ ফিরি করতে গিয়েছিলাম বিবেকের কাছে। আমার সংগে কথাবার্তার পর সেদিন, শনিবার বোধহয় বিবেকও বুঝতে পেরেছে বড় বড় পাপের ভার একা বহন করতে নেই। অন্যকে ভাগ দিতে হয়, যেমন আমি দিতে গিয়েছিলাম। বিবেক অবশ্য নেয়নি, কারণ দু-দুটো বড় পাপকে সে বহন করতে পারবে না। শালার হাঁটু জলে সাঁতার কাটা অভ্যেস, বড় দিঘিকে ভয় পায়। কিন্তু আমি শ্রীরত্নাকর দত্ত, আমি সব পারি। যে কোন পাপ, যত বড় হোক, যতগুলো হোক আমি পারি। কালকেই তো আমি সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে এসেছি।

রত্নাকর মল্লিকার ভীষণ কাছে এসে দাঁড়াল।

—মল্লিকা! আমি পারি। আমি নিজের পাপ এমনকি অন্যের পাপ দুইয়ের ভাগ নিতে পারি।

প্রথমে রত্নাকরের প্রস্তাবটার মানে ধরতে না পেরে খানিকক্ষণ ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে মল্লিকা। তারপর বুঝতে পারল। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় বলল,—কিন্তু কেন নেবেন? আমি কেন ঋণী থাকবো আপনার কাছে?

—ঋণী নয়, ঋণী নয়—আমাকে আরেকটা ব্রেকথ্রু দাও। আর তাছাড়া এক্ষেত্রে অন্তত শুধু পাপের ভাগ তো নয়, কিছু পুণ্যের ভাগও যে পাব।

—তাহলে—তাহলে তুমি ঐ একলাখ টাকাটা ফেরত দিয়ে এসো। বিবেক কালকে তোমাকে অনেক ছোট করে গেছে আমার কাছে। আমি চাই না অন্তত বিবেকের তুলনায় তুমি ছোট হয়ে থাক।

বিবেকের বাড়ির দিকে যেতে যেতে সমস্ত কিছু ভেবে ফেলল রত্নাকর। কাগজের অফিসে, থানায় জানিয়ে দিলেই হবে যে ব্যাগটা সে এক বন্ধুর বাড়িতে ভুলে ফেলে এসেছিল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সমস্তটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার, তাই ঠিক সময়ে ব্যাপারটা মনে পড়েনি। ভাটিয়াকে বললে ভাটিয়াই সব ম্যানেজ করে দেবে।

কিন্তু বিবেকের বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে শুনল, সে নাকি কলকাতার বাইরে এক মাসের জন্যে গেছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি মাকে।

—কিন্তু মাসীমা, আমার ব্যাগ? আমি যে ব্যাগ রেখে গিয়েছিলাম ওর কাছে?

—হ্যাঁ, ব্যাগটা ও রেখে গেছে। বলে গেছে তুমি এলেই যেন দিয়ে দি। তুমি নিয়ে যাও ব্যাগটা। আর একটা কাগজে লিখে দিতে বলেছে যে ব্যাগটা তুমি নিয়ে যাচ্ছ। বন্ধু-বান্ধবদের ভেতরে এত যে কী লেখালেখি বুঝি না বাপু!

ম্লান হাসল রত্নাকর। বিবেক তালুকদার যে কোনোরকম বড় পাপের ভাগী না হয়ে অকুতোভয়ে জীবন কাটাতে চায় কথাটা মাসীমাকে বলা যায় না। তাই কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

ভাটিয়ার গদিতে এসেই রত্নাকরকে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। পুলিশ! এবং পাড়াটাও লোকারণ্য। রত্নাকরকে দেখেই একজন ইনেস্পেক্টর সমেত চার-পাঁচজন কনেস্ট-বল ওর দিকে এগিয়ে এল। ইনেস্পেক্টরই কথা বললেন প্রথমে,—আপনিই তো রত্নাকর দত্ত? কাল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বেহালায়। সঙ্গে একলক্ষ টাকা ছিল—খোয়া যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম রত্নাকর দত্ত। কিন্তু টাকাটা খোয়া যায়নি। ব্যাগটা আমি এক বন্ধুর বাড়িতে ফেলে এসেছিলাম। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ব্যাগটা যে আমার সঙ্গে ছিল না, একদম মনে পড়েনি। আজকে সকালে মনে পড়তেই বন্ধুর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি মিঃ ভাটিয়াকে ফেরত দিতে।

—ভাটিয়াকে কোথায় ফেরত দেবেন মশাই? ভাটিয়া অ্যারেস্টেড। ভাটিয়ার গুদামে, যাকগে পরে শুনবেন। আমরা আপনার মেসেও গিয়েছিলাম, না, না ভয় পাবেন না, আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা জানি আপনি ক্যারিয়ার মাত্র—আমরা গিয়েছিলাম স্টেটমেন্ট নেওয়ার জন্যে। যাক ভালই হল, কেস আরো পাকা হল। এই ব্যাগেই তো আছে একলক্ষ টাকা? চাবি তো আপনাদের দেওয়া হয় না, না?

রত্নাকর মাথা নাড়ল।

—জমাদার, ব্যাগকা তালা তোড়ো!

ব্যাগটা খোলার পর রত্নাকর অবাক হয়ে দেখল ব্যাগ অর্ধেক খালি। ব্যাগে পঞ্চাশ হাজারের একটা ভাগই শুধু আছে! ভীষণ হাসি পেল হঠাৎ রত্নাকরের। বিবেক তালুকদারও তাহলে ব্রেক থ্রু চায়। ঠিক তারই মতন! কেবল ফিট হতে পারে না বলেই বেচারাকে বারবার অন্যের সাহায্য নিতে হয়। মল্লিকা এবং টাকা দু-ব্যাপারেই বিবেক তালুকদারকে রত্নাকরের স্বারস্থ হতে হল। কিন্তু পাপের ভাগ নিতে গিয়ে এ কী করল বিবেক? ব্যাগের মধ্যে নিজের হাতে লেখা চিঠি রাখতে গেল কেন? এখন যে পুলিশেরও ভাগ নিতে হবে।

—এই চিঠিটা কে লিখেছে মশাই? ইনেস্পেক্টর চিঠিটা রত্নাকরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল রত্নাকর। নিজের অজ্ঞাতেই কাঁপা হাতে চিঠিটা জোরে জোরে পড়তে লাগল:

> পঞ্চাশ হাজার টাকা সত্যি কম টাকা নয়, নিলামই শেষ পর্যন্ত। চাবিয়ালা ডেকে চাবি করিয়ে ব্যাগটা খুলেছি। আশা করি এভাবে নিলাম বলে মনে কিছু করবে না। জানোই তো আমরা যারা ছোট মাপের মানুষ, বড় পাপ চট করে করতে পারি না। এই ধরনের ছোট ছোট পাপই আমাদের পোষায়। বিবেক।

রত্নাকর চিঠি পড়া শেষ হতেই জোরে জোরে হাসতে আরম্ভ করল।

—থামুন মশাই! আগে বলুন আপনার এই বিবেকবান বন্ধুটি কোথায় থাকেন। বেটা তো আচ্ছা জোচ্চোর। বন্ধু ব্যাগ ফেলে গেছে তা থেকে টাকা হাওয়া করে দিল! এখনই অ্যারেস্ট করব। ঠিকানাটা বলুন।

—অ্যারেস্ট করবেন? কিন্তু—কেন? রত্নাকরের গলায় যেন জীবন ছিল না।

—আবার কেন বলছেন? ওকে তো দু'দফা অপরাধের জন্যে অ্যারেস্ট করা যায়। এক, গচ্ছিত ধন প্রতারণা করে নেওয়ার জন্যে; দুই, পঞ্চাশ হাজার টাকার জালনোট কাছে রাখার জন্যে। বলুন, ঠিকানা বলুন, পাখি নইলে আবার উড়ে যাবে।

—জালনোট! আর পারলো না রত্নাকর। সকালে একবার হয়েছিল, সন্ধ্যেয়, দ্বিতীয়বার অজ্ঞান হয়ে গেল।

# সংস্কৃতি সাময়িকী

---

### কালো মাটির কালো পুতুল

জসীমউদ্দীন থেকে শুরু করে শামসুর রহমান পর্যন্ত কবিরা এখন কোথায়, এই মুহূর্তে? ইয়াহিয়ার সৈন্যেরা না কি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইত্তেফাকের অফিস, ধ্বংস করেছে তার সাংবাদিক কর্মীদের। তাহলে আল মাহমুদ? কোথায় এখন তিনি? বোমায় বিধ্বস্ত রংপুর। কায়সুল হক? ঢাকার জসীমউদ্দীন রোডেও কি ঢুকেছিল ইয়াহিয়ার ট্যাঙ্ক? বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ আজ পনেরো দিনের পুরোনো হলো, এর মধ্যে আমরা জেনেছি কীভাবে সামরিক অত্যাচার প্রথমেই ছুটে যাচ্ছে যে-কোনো বুদ্ধিজীবীর দিকে। ইয়াহিয়ার দল ঠিকই বুঝতে পারে যে এইখান থেকেই জেগে উঠেছে অবিশ্বাস্য এই মুক্তিবাসনার প্রথম আগুন। তাই কেবলই আজ জানতে ইচ্ছে করে বাঙলা দেশের কবিরা এখন কে কোথায় আছেন। তাঁরা কি সময়মতো পশ্চাৎপটে সরে এসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন করছেন কোনো? গ্রাম-গ্রামান্তরকে উদ্‌বোধিত করবার জন্য লিখছেন কোনো নতুন ধরনের কবিতা? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যেমন লিখেছিলেন রাফায়েল আলবের্তি আর তাঁর বন্ধুরা? আলবের্তির মতো এঁরাও কি এখন দেখতে পাচ্ছেন বা দেখতে চাইছেন সারি সারি গ্রামীণ যোদ্ধাদের স্তূপাকার মুখ, যে-মুখে অনেক জানার চিহ্ন নেই, যে-মুখে আছে কেবল বেঁচে থাকবার জন্যেই মরবার প্রতিজ্ঞা?

না কি তাঁরা সকলেই এখন এক-একজন তরুণ লোর্কা? ফ্রাঙ্কোর দলবল কেন যে মেরেছিল লোর্কাকে, অনেকেরই কাছে তা স্পষ্ট নয়। এমন নয় যে তাঁর কবিতায় ছিল কোনো বিদ্রোহী রাজনীতিক ঘোষণা, তাঁকে রাজনীতিক কবি বলার মানে নেই কোনো। তবে কি তাঁকে প্রাণ দিতে হলো শুধু এই জন্যে যে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পুরোপুরি স্পেনীয়, স্পেন দেশের বাইরে বাঁচবার কথা ভাবতে পারি না আমি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে চোখবাঁধা সংকীর্ণ কোনো জাতীয়তা আমি কথা ভাবতে পারি না আমি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে চোখবাঁধা সংকীর্ণ কোনো জাতীয়তায় আমি ডুবে যেতে চাই'? এই জন্যে? কিন্তু মানুষের পক্ষে এ তো এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে আমূল লিপ্ত রেখে পরিবেশের ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া নিজেকে, মাটির ভিতর দিকে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে ডালপালা মেলে দেওয়া হাওয়ায়, একই সঙ্গে এই দুই আপাতবিরোধী সত্যকে অর্জন করে নেওয়াই তো মানুষের চরিত্র। তাই বিশ্বতোমুখী হবার জন্যই লোর্কাকে খুঁজতে হয় স্পেন, আবহমান স্পেনের মানুষ, অতীতে-বর্তমানে জড়ানো এক স্পন্দমান জীবন। এ কোনো রাজনীতি নয়, এ হলো আত্ম-আবিষ্কারের সর্বকালীন মানবনীতি।

কিন্তু ফ্রাঙ্কো অথবা হিটলার অথবা ইয়াহিয়ার সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকই হয়ে দাঁড়ায় এই মানবনীতি। তাই আজ ভয় হয় বাঙলা দেশের সেই কবিদের জন্য, যাঁরা এতোদিন অল্পে অল্পে খুলে দিতে চেয়েছিলেন মুক্তবুদ্ধির পথ। ভয় হয়, কেননা বাঙলা দেশের এই অভ্যুত্থানের মূলেও হলো এক আইডেন্টিটির প্রশ্নে, দীর্ঘ পঁচিশ বছর যে-প্রশ্নকে সামনে রেখেছিলেন সে-দেশের কবিরা অথবা বুদ্ধিজীবীরা। এটা হয়তো ঠিক যে কৃষকসংকুল দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এখনো সম্পূর্ণ করে জাগানো হয় নি এই বোধ, বাঙালি হিসেবে তাদের আত্মপরিচয়। কিন্তু এর সম্ভাবনা এতোই বেগে ছড়িয়ে পড়ছিল দেশ জুড়ে, যাকে মূল থেকে ধ্বংস করতে না পারলে ইয়াহিয়ার উপায় নেই কোনো। সৈন্যদের প্রথম লক্ষ্য তাই সেইসব মাথা, যে-মাথা থেকে আসে এই বিদ্রোহী ভাবনা: 'যাঁরা সতেরো বছর আগে ভেবেছিলেন ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বনিয়ন্তা হবে, তাঁদের স্বপ্ন আজ তাঁদের চোখের সামনেই ধূলিসাৎ হয়েছে' (আবদুল গণি হাজারী, ১৩৭১) অথবা সরাসরি এই জিজ্ঞাসা: 'আমাদের সংজ্ঞা কী? আমরা কারা? কাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার?' এবং তার পর, প্রায় লোর্কার ধরনেই যেন, 'আমরা পাকিস্তানী, আমরা পূর্ব পাকিস্তানী, আমরা মুসলমান, সবার উপরে আধুনিক মানুষ এবং সামগ্রিক অর্থে আমরা আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা'

(আবুল ফজল, ১৩৭১) অথবা নিতান্তই সরল এই ঘোষণা, 'এ দেশে বাঙালি সমাজ নামে একটা সমাজ সত্যি সত্যি আছে বহুকাল যাবৎ' (আবদুল হক, ১৩৭৩)। বাঙলা দেশের কবি আশরাফ সিদ্দিকী যখন এ সমাজকে এ দেশকে দেখেন এইভাবে—

কলাহীন শিল্পহীন সাহিত্য সংগীতহীন যে জাতি, তাদের
জীবন মৃত্যুর মতো—বিধাতার তারা এক মূর্ত অভিশাপ!
আজ এই শরতের সোনাঝরা আলোকের মাঝখানে বসে
ফুটন্ত পদ্মের মতো নীল আকাশের নিচে যেদিকে তাকাই
মনে হয় গান আর কলা আর শিল্প আর সুরের এ দেশ!

তখন তাঁর কাছে নিজের আর-একটা বড়ো আধুনিক পরিচয় জেগে ওঠে। সেই পরিচয় থেকেই অল্পদিন আগে সাহস করে বলতে পেরেছিলেন তরুণ আল মাহমুদ, 'কে জানে ধর্ম উঠে গিয়ে কবিতাই তার স্থান দখল করে কি না'!

না, শুধু ভয় নয়, বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের এই উদ্‌বেগময় মুহূর্তে ব'সে ওই কবিদের জন্য আজ গর্ব বোধ হয়। কবিতার জন্য গর্ব। মনে হয় যেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর জুড়ে গোটা দেশের সত্তা-কেন্দ্রটিকে খুঁজে নেবার শপথ নিয়ে এইভাবে এগিয়েছিলেন ওঁরা। তাই সত্যি সত্যি অনেক সময়ে কবিতাই কি হয়ে ওঠে ওদেশের ধর্ম? তা যদি না হতো তবে কী ভাবে ওদেশের জনকর্মীরা এমন ক'রে দেখতে পেলেন বাঙলার মুখ? আমাদের এই রাজনীতিক ভ্রষ্টতার পরিবেশে কি কল্পনা করা যায় যে সমূহ এক জনউত্থানের সামনেও শ্লোগান হয়ে উঠতে পারে জীবনানন্দের কবিতা? 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি' এই লাইনের মায়ামমতা যে আমাদেরও কখনো স্পর্শ করে নি তা নয়, কিন্তু আমরা যেন ধরেই নিয়েছি এ হলো বানিয়ে-তোলা এক জগৎ, কবিতার জগৎ, এর প্রভাব শুধু ছোটো এক পাঠকসম্প্রদায়ের ওপর, এর সঙ্গে কখনোই যোগ হতে পারে না রাজনীতিক জাগরণের। কবিতা যে আমাদেরও এখানে মিছিলে-নির্বাচনে কাজে লাগে নি কখনো তা নয়, সুকান্তের কোনো কোনো লাইন আজ দেয়াললিপির কল্যাণে অনেকেরই জানা। কিন্তু সে হলো বিশেষভাবেই বিদ্রোহের ঘোষণা, রাজনীতিক উত্তেজনারই কাব্যরূপ। এ নিয়ে আমাদের কোনো বিস্ময় বা প্রশ্ন নেই। আমাদের বিস্ময় শুধু এই যে, ধ্বংসময় আক্রমণের মুহূর্তেও তবে ভালোবাসারই কথা উচ্চারণ করতে পারি আমরা? জানাতে পারি নিবিড় মায়ামমতা? অন্তত বাঙলা দেশের মুক্তিযোদ্ধারা সেই সাহস ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের, নতুন ক'রে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে অল্প কথাই অনেক বড়ো কথা, নিচু গলাই অনেক জোরালো গলা, ভালোবাসতে পারাটাই সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব।

এ নয় যে এই ভালোবাসা তাদের অস্ত্রধারণে বাধা দিয়েছে কোনো। এর দ্বারা তারা নির্বীর্য কোনো আত্মক্ষয়ে ডুবে গেছে এমন নয়। এরা শুধু আমাদের সামনে তুলে দিয়েছে সেই সাহস, যে-সাহসে বলা যায় যে লক্ষ্যকে কখনো আমি ভুলি না, তাকে সঙ্গে রাখি পাশে পাশে। আমাদের দেশের রাজনীতি তার নিজের লক্ষ্য থেকে কখন যে উচাটন হয়ে স'রে যায় তা তার মনেও থাকে না, কখনোই তার মনে থাকে না বাঙলার মুখ, হয়তো সে ভাবে যে একবার রাজনীতিক অভীষ্ট সিদ্ধ হবার পর তখন দেখে নেওয়া যাবে সেই মুখখানি। সে জানতেও পারে না যে গোপনে গোপনে দিনে দিনে কেমন ক'রে সে-মুখ ক্ষইয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের রক্ত থেকে, দুস্তর বিচ্ছেদ ঘ'টে গেছে কবিতায় আর রাজনীতিতে।

রাজনীতি-মনস্কেরা অবশ্যই বলবেন যে এই বিচ্ছেদের দায়িত্ব হলো কবির। কবিরই অপরাধ, তিনিই স'রে গেছেন তাঁর নিভৃত আপন গোত্রে, ঠিকভাবে তিনি গ'ড়ে তোলেন নি দেশের কবিতা। কিন্তু কাকে বলে দেশের কবিতা? কাকে বলে বিপ্লবের কবিতা? সে কি কেবল লড়াইয়ের উশকানি-জাগানো ফুসফুসের শক্তিপরীক্ষা? সে কি কেবল রাজনীতিক ইশ্‌তেহারকে পদ্যে বাঁধার কৌশল? তা যদি হতো তাহলে কমিউনের ছেলেদের কাছে অল্প হেসে বলতে হতো না লেনিনকে, 'মারাক-ভস্কি? কিন্তু আমার মনে হয় পুশ্‌কিন আরো ভালো'। ক্রুপস্কায়া যে জানিয়েছেন সাইবেরিয়ার দিনগুলিতে লেনিন কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন লের্মন্তফের, হাইনের—সেইসব ঠাণ্ডা, ভালো-বাসার, ভালো লাগার কবিতা—এতে আমরা অবাক হই না। কেননা চারপাশে এই সুন্দর মুখশ্রীকে দেখতে পাবার জন্যই তো বিপ্লবের আয়োজন। তাই বিপ্লবের পথেও আমি ভুলতে পারি না সেই

মুখশ্রীকে। না, এ কোনো নারীর মুখশ্রীর কথা নয়। কিন্তু নারীরও বটে।

দেশের কবিতা লিখব ভেবে এই ভুলটাই আমাদের ঘটে যায় বারবার। আমরা একটা ধরাবাঁধা নকশার মধ্যে ঠেসে নিয়েছি দেশাত্মবোধের চেহারা। ব'লেই দেওয়া যায় যে এ-কবিতায় বলা হবে, অত্যাচারী, ঢের হয়েছে, তোমার সীমাহীন লাঞ্ছনার অবসান হবে একদিন, সামনে আছে ভোর। কবিতায় লাল এই পূর্বদিগন্তের ছবি দেখতে পেলেই আমার মনে প'ড়ে যায় কী বলেছিলেন একবার এরেনবুর্গ। ভারি বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, রুশদেশে কি তাহলে মেঘ করে না কখনো? বিপ্লবোত্তর যে-কোনো উপন্যাস খুললেই কেন তবে দেখতে পাই কেবলই টাটকা ঝকঝকে দিন, আকাশে ঝলমলে সূর্য? আর, উলটোভাবে চমকে গিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভিয়েৎনামী গেরিলাযোদ্ধার হাতে কবিতার বই দেখে ধারণা হয়েছিল তাঁর, কতোই-না জ্বালাময় আগুন থাকবে ওর মধ্যে। কিন্তু পরিবর্তে, তার মলাটে ছিল স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক ছবি, তার কবিতায় ছিল সহজ ভালোবাসার আবেগ!

সেই ভালোবাসারই কথা এতোদিন ধ'রে বলেছেন বাঙলা দেশের কবিরা। আমাদের চলতি অর্থে দেশপ্রেমের কবিতা যে তাঁরা লেখেন নি তা নয়, কিন্তু সেইখানে এর সামর্থ্য নয়। এর সমস্ত মহিমা হলো দিনে দিনে গ'ড়ে তোলা এক আত্মসন্ধানের ব্রতে। আজ এই মুহূর্তে ব'সে আমরা জানি না বাঙলা দেশের এই মুক্তিযুদ্ধ আরো কতো জটিল পথ বেয়ে তবে তার কাঙ্ক্ষিত পরিণামে পৌঁছবে, আরো কতো মূল্য দিতে হবে তার মানুষকে, কিন্তু বিপ্লবের এই যে নিঃসন্দিগ্ধ প্রথম মূর্তি জেগে উঠেছে দেশ ভ'রে, তার মস্ত প্রেরণাই ছিল এক আত্ম-আবিষ্কারে, গোটা জাতির আইডেন্টিটির প্রশ্নে। আমাদের গর্ব, এ আত্মপরিচয়ের পথ তৈরি করছিল বাঙলা দেশের কবিতা।

সীমান্তের প্রহরা ডিঙিয়ে যতোটুকু বইকাগজ আমাদের হাতে পৌঁছয়, তার মধ্যে সবাই আমরা লক্ষ করেছি এই সব সন্ধান। আর তুলনা ক'রে ভাবি, পদ্মার এপারে ব'সে সেই সন্ধানকে কতোই অবজ্ঞা করেছি আমরা। একথা অবশ্য সত্যি যে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণে ওদের পক্ষে যতো অনিবার্য ছিল এই প্রশ্নে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, যতো সরাসরি দেখা দিয়েছিল ওদের শোষিত চেহারা, আমাদের পক্ষে ততোটা নয়। মধ্যখানে হা-হা-করা ব্যবধান নিয়ে ধর্ম ভর ক'রে জেগে উঠল যে নতুন রাষ্ট্র, তার অধিবাসীদের পরিচয় কী? এ দেশ যদি নতুন, তবে নতুন দেশবাসীর সত্তা কী রকম? কী তার ঐতিহ্য, কী তার ভবিষ্যৎ? ঠিক, এই বুঝে নেবার চেষ্টা থেকে ওদেশে যতো স্বাভাবিক ছিল অল্পে অল্পে রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র ক'রে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ক'রে অবশেষে ভাষার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো, আমাদের পক্ষে ততো নয়। কেননা আমাদের এই চিবিয়ে-ইংরেজি-বলা বুকনি-সর্বস্ব অঞ্চলে আমরা ভেবে নিয়েছিলুম যে স্বাধীনতার পর আমাদের জানা হয়ে গেছে ভারতীয়তা, যেন আর আত্ম-আবিষ্কারের কোনো দায় নেই, যেন গত শতাব্দীতেই আমরা চুকিয়ে নিয়েছি সে-সব বোঝাপড়া, যেন 'ভারতীয়' কথাটির সত্যি সত্যি কোনো তাৎপর্য আমাদের কাছে আছে। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা মনে করবেন ভারতীয় কোনো বোধ নিজের মধ্যে অনুভব করা মানেই এক সংকীর্ণ হীনতায় ডুবে যাওয়া, বিশ্বমানবতার পরিপন্থী এক আয়োজন। এই মুহূর্তে এঁদের কথা আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি কেবল তাঁদের কথা যাঁরা ধ'রে নিয়েছেন যে এ-বোধ আমরা জন্মসূত্রেই পেয়ে আছি, জন্মসূত্রেই আমার মুখে আছে আমার ভাষা, যেন এ নিয়ে কোনো ভয় নেই আমার।

তাই ভাষাকে আমাদের নতুন ক'রে ভালোবাসতে হয় নি কখনো। আর এইখানেই আছে সর্বনাশের বীজ। আমাদের কবিতাও বড়ো নির্লজ্জভাবে ধ'রে রেখেছে ভাষার প্রতি আমাদের এই সর্বনাশা ঔদাসীন্যের ছবি। যেমন এক দেশহীন দেশে আমাদের বসবাস, তেমনি এক নির্ভাষ ভাষায় আমাদের বাচালতা। যেমন আমাদের কাজেকর্মে পথচলতি জীবনের হাজার কোণে, তেমনি আমাদের শিল্পরচনায়—আমরা যেন ভুলে গেছি যে ভাষা হলো আমার সত্তার নিঃশ্বাস। তাই সহজেই আমাদের গলায় অথবা কলমে কেবলই চ'লে আসে অনুপলব্ধ মিথ্যা উচ্চারণ। ভাষাকে আমরা ভেবেছি কাজ চালাবার একটা উপায়মাত্র, মনে রাখি নি যে এই হলো এক সমগ্র আত্মপ্রকাশের বাহন। আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের ভাষা আনন্দের তাপে যুক্ত হয় না আর!

অন্যদিকে, এই যোগেই আছে বাঙলা দেশের কবিতার শক্তি। যুদ্ধজনিত আমাদের এই মথিত আলস্তির মুহূর্তেও আমি ভুলে যাচ্ছি না যে ভুল, দুর্বল, নিষ্ফল কবিতাও অজস্র লেখা হয়েছে

পদ্মার ওপারে, ভুলে যাচ্ছি না যে শিল্পবিচারের মহিমময় রচনা অল্পই আমরা পড়তে পেরেছি এই পঁচিশ বছরে। কিন্তু তবু, এই যে এক সরল সত্যের ওপর ভর ক'রে দাঁড়াতে পেরেছেন ওদেশের কবিরা, এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা পেয়ে গেছেন সূচনা। এই সূচনার আনন্দে প্রায় কিশোরের সারল্যে আল মাহমুদের মতো কবিদের বুক ন'ড়ে উঠছে 'জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভাণ্ডের মতো', অথবা দেশপ্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে তাঁদের প্রিয়মুখ, স্তবের মতন ব'লে উঠছেন তাঁরা, 'কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার'! কালো মাটির এই কালো পুতুলেই তাঁরা আজ দেখেছেন তাঁদের বাঙলার মুখ, এইখানে তাঁদের জয়। [ সাময়িকতা বিচার করে পরবর্তী সংখ্যার জন্য লিখিত এই আলোচনাটি বর্তমান সংখ্যার অন্তর্ভূত হলো। সম্পাদক। ]

শঙ্খ ঘোষ

**ভারতীয় চিত্রকলায় ঘাটের পুরাণ**

জন্মকাল থেকেই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা দুই বিপরীত-বিহারী আনুগত্যের টানা-পোড়েনে স্ব-মার্গচারণে দ্বিধাবিভক্ত। যদি ব্যক্তিশিল্পীর স্ব-চেতনাজাত শিল্পরীতির আত্মপ্রকাশই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার জন্মসূচক বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার জন্মকাল ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক। শৈশব, বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক। সে-কাল থেকেই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা দুই ভিন্নমুখী আনুগত্যের টানে উৎকেন্দ্রিক। এক আনুগত্যের টানে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা কোন-না-কোন ঐতিহাসিক অথবা ঐতিহ্যশাসিত ভারতবর্ষীয় কোন অধুনালুপ্ত শিল্পরীতির আনুগত্যে স্ব-কাল বিস্মৃত। অপরপক্ষে অন্য এক আনুগত্যের টানে পশ্চিম য়ুরোপীয় বা মার্কিনী কোন-না-কোন শিল্পরীতিকে আধুনিকতার পরম উদ্দেশ্যজ্ঞানে স্ব-দেশ বিস্মৃত। এ অনেকটা ঊনবিংশ শতকের রুশদেশের ওয়েস্টার্ণার ও স্লাভোফিলদের ছায়ার লড়াইয়ের মতন।

এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, আনুগত্যের উদ্দিষ্ট বস্তু কিন্তু কোন বিশিষ্ট ভারত-বর্ষীয় শিল্পরীতি, তন্নিষ্ঠ ধ্যান বা তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা নয়, নয় কোন বিশিষ্ট পশ্চিম য়ুরোপীয় বা মার্কিন শিল্পরীতি, তন্নিষ্ঠ ধ্যান বা তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা। আনুগত্যের উদ্দিষ্ট বস্তু শিল্পীভাবিত কোন এক 'ভারতীয়তা' বা কোন এক 'পশ্চিমি' আধুনিকতা। কোন এক বিশিষ্ট ভারতবর্ষীয় শিল্পরীতি অথবা কোন এক বিশিষ্ট পশ্চিমি শিল্পরীতি শিল্পীভাবিত 'ভারতীয়তা'র বা শিল্পী-ভাবিত 'আধুনিকতা'র জামা ঝুলানোর পেরেকের কাজ করেছে মাত্র। যে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা এবং ধ্যান মূল রীতির প্রেরণাদাত্রী শক্তি ছিল, সে ধ্যান-অভিজ্ঞতার সঙ্গে রীতির বর্তমান অনুগামীর ভারতীয়তার ধারণার বা আধুনিকতার ধারণার সাযুজ্য প্রায়শই অনুপস্থিত। অথচ ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা শিল্পে ধ্যানের ভারতীয়তা এবং ধ্যানের আধুনিকতা-কে কেন্দ্র করে বিস্তারিত পুরাণ (myth) গড়ে তোলা হয়েছে। এবং সেই সব পুরাণ চালিত হয়ে শিল্পীরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক অথবা ঐতিহ্যশাসিত ভারতবর্ষীয় রীতির অথবা বিভিন্ন আধুনিক য়ুরোপীয় বা মার্কিনী রীতির শুধুমাত্র দৃষ্টিচল দিকের অনুসরণে চিত্রাঙ্কন করে তাকে যথাক্রমে 'ভারতীয়তা'র এবং 'আধুনিকতা'র পরম লক্ষ্য বলে প্রচার করেছেন।

এ প্রবন্ধের প্রামাণ্য বিষয় এই যে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলা বহুলাংশে পুরাণ-শাসিত এবং যতখানি পুরাণশাসিত ততখানি অভিজ্ঞতা উৎসারিত নয়। এ-বক্তব্য প্রমাণ-সাপেক্ষ। একটা উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক।

অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল কুমারস্বামী যৌথ প্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মকাল থেকে তিন দশক ধরে এক ভারতীয় ঐতিহ্যের পুরাণকথা চিত্রকলা চর্যায় প্রধান প্রেরণাদাত্রী শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। ঐতিহাসিক 'ভারতীয় শিল্পরীতি'তে প্রত্যা-বর্তন ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি বর্জন এই পুরাণকথার দুই বিশ্বাসস্তম্ভ ছিল। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে 'ভারতীয় শিল্পরীতি' কোন একীভূত রীতি কখনই ছিল না। আর ভারতীয়-

তায় প্রত্যাবর্তনাকাঙ্ক্ষী এই সব শিল্পী তাঁদের শিল্পচর্চায় সজ্ঞানে যে সকল রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—সে সব ঐতিহাসিক ভারতীয় শিল্পরীতি, যথা আজিন্টা, ইলোরা, রাজপুত বা মুঘল-এর মধ্যে ভারতীয় ঐক্য সূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়তঃ এই সব স্থান-কাল নির্ধারিত নাগরিক শিল্পরীতির স্থানিক-কালিক পটভূমি আধুনিক কালের ভারতীয়তার প্রবক্তাদের কাছে দুর্লভ হবার কারণে ঐ-সব রীতির প্রেরণাদাত্রী শক্তিও ছিল আধুনিকদের কাছে দুর্লভ। সুতরাং পটভূমি তৈরী করতে হয়েছিল কল্পনা দিয়ে মীথ দিয়ে। আরও একটু দেখা যাক। এই সব ভারতীয়তার প্রবক্তারা পাশ্চাত্ত্য রীতি বলতে কি বুঝতেন। তাঁরা যে পাশ্চাত্ত্য রীতি বর্জন করার কথা বলেছেন তা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকীয় অ্যাকাডেমিক শিল্পরীতি যা কিনা সমসাময়িক পশ্চিমই অনেককাল আগে বর্জন করেছিল। পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারার ক্ষীণতাপ্রাপ্ত একটি ধারাকে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য শিল্পসার বলে একটি নঞর্থক মীথ ছিল ভারতীয়তার প্রবক্তাদের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী শক্তি। তত্ত্বে নয় কর্মে অর্থাৎ শিল্প-কর্মে এই আধুনিক ভারতীয়রা পাশ্চাত্ত্য-রীতির প্রভাব কতোটা বর্জন করতে পেরেছিলেন? সম-সাময়িক ইংল্যান্ডের প্রি-র‍্যাফেলাইট শিল্পীদের পুরো-ঐশ্বর্যগরীমাধ্যানের মনোভঙ্গি বা আর্ট-ন্যুভোবিদ্‌দের বস্তুরূপের অলঙ্করণপ্রিয়তার দ্বারা সংক্রামিত হননি! তাঁরা কি চৈনিক, পারসীক এবং জাপানীরীতি দ্বারা প্রভাবিত হননি! তাই বলছি ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ছিল আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম সক্রিয় পুরাণকথা।

তারপর একে একে এসেছে গেছে লোকশিল্পের পুরাণ ও আধুনিক-অর্থে-পশ্চিম-য়ুরোপীয়-আধুনিক শিল্পের পুরাণ। এখানে একটি কথা স্মর্তব্য যে ১৯২০-র পর থেকে কোন একটি পুরাণই চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে অপ্রতিহত রাজত্ব করেনি। একটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অন্য একটি পুরাণও প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। তবে সাধারণ বিচারে দেখা যায় যে একটি পুরাণ যখন প্রধান অন্য একটি তখন হয়তো অপ্রধান বা গৌণ ভূমিকা পালন করেছে।

সারা সপ্তম দশক অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ভারতবর্ষীয় চিত্রকলাচর্চা ক্ষেত্রে তন্ত্র তথা তান্ত্রিক শিল্পের পুরাণই প্রধান সক্রিয় মীথ এবং এই তন্ত্র-শিল্পই আধুনিক ভারতীয় শিল্পের শেষতম পুরাণ। অষ্টম দশকে এর মূল স্রোত ক্ষীয়মান হলেও তা অবলুপ্ত নয় এবং তা নতুনতর খাতে প্রবহমান।

তত্ত্বগতভাবে নয়, দৃশ্যত এই পুরাণাশ্রিত তন্ত্রশিল্পের সামান্য লক্ষণ কি? কোন সামান্য লক্ষণ আদৌ আছে কি? দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানের চারিত্র্য অর্থাৎ রূপবন্ধ বা form-এর চরিত্র, রেখার চরিত্র, ভরাট-ক্ষেত্র বা mass-এর চরিত্র, ঘনত্বদর্শায়ন রীতি, রূপবন্ধ সংস্থাপন বা composition-এর রীতি, তল-বিভাজন বা division of planes-এর পদ্ধতি, ক্ষেত্র অনুক্ষেপ বা treatment of space-এর রীতি, বর্ণিকাভঙ্গ বা use of colours-এর রীতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি যে সব দিয়ে শিল্পরীতির জাতিভেদ করা হয়ে থাকে সে-সবের নিরীখে ফেলে বিচার করলে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার এই তন্ত্র-শিল্পকে একটি বিশিষ্ট ধারা বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কে. সি. এম. পানিক্কর, নীরদ মজুমদার, মোহন সামন্ত, বীরেন দে, রেডাপ্পা নাইডু, জে. স্বামীনাথন, ভূপেন্দ্র খক্কার এবং গুলাম রসুল সন্তোষ-এর শিল্পকর্মে সামান্য লক্ষণ সামান্যই। অমিল গৌণ নয়। শিল্পবস্তুর বস্তুকরণে (objectification) এ'রা দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদানাবলীর ব্যবহার যে-যে-ভাবে করেছেন তাতে স্বকীয় ভঙ্গি স্বপ্রকাশ। অথচ এ'দের সকলের কাজেই মনোভঙ্গির একটা মিল সহজেই অনুভূত হয়। সে মিলের উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে শিল্পীদের ব্যবহৃত মোটিফ বা প্রধান মোটিফগুলোর মধ্যে। জানি, এতে অনেকে আপত্তি তুলে বলবেন, চিত্রে ব্যবহৃত মোটিফ দিয়ে শিল্পরীতির বিচার সিদ্ধ নয়। কি মোটিফ ব্যবহৃত হল তা বড় কথা নয়, মোটিফগুলি কি রূপে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পেল তার বিচারই মুখ্য হওয়া দরকার। 'মানুষ' অথবা 'গাছ' মোটিফের ব্যবহার দেখেই যদি শিল্পরীতির নীতিভেদ করতে হয় তবে সুস্তরীতি, ইম্‌প্রেসনিস্ট রীতি এবং তথাকথিত 'সোস্যা-লিস্ট রিয়ালিজম্'-এর পার্থক্য কোথায়? এ-আপত্তি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মোটিফ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যদি দেখানো সম্ভব হয় যে মোটিফের ব্যবহারে তাদের বস্তুরূপ অপেক্ষা সংকেতময়তাকে গুরুত্বদান করে সেই মোটিফগুলিকে প্রতীকীসত্তায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং যদি দেখানো সম্ভব হয় যে বিভিন্ন শিল্পীরা তাঁদের ব্যবহৃত মোটিফগুলিকে একই জাতের প্রতীকীসত্তায় অধিষ্ঠিত করতে

চেয়েছেন, তবে কি বলা যাবে না যে তাঁরা একই শিল্পধারার স্বক্ষমার্গসাধক পথিক এবং তাদের শিল্পধারার অন্যতম প্রধান সামান্য লক্ষণ তাদের ব্যবহৃত মোটিফগুলি এবং তাদের সাংকেতিক মূল্যের সমজাতীয়তার মধ্যে নিহিত ?

কে. সি. এস. পানিকক্কর, নীরদ মজুমদার, মোহন সামন্ত, বীরেন দে, রেডাপ্পা নাইডু, জে. স্বামীনাথন, ভূপেন্দ্র খক্কার, সুনীল দাস প্রমুখ চিত্রকরদের রচিত সপ্তম দশকের চিত্রাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে লিঙ্গ, যোনি, অণ্ড, জন্মচক্র, রাশি চিহ্ন, স্বস্তিকা চিহ্ন, তারকা, তীর, ত্রিভুজ, সর্প, যৌনকেশ, অক্ষি ইত্যাদি মোটিফ যৌনমিলন, প্রজনন, জন্ম, ভাগ্য এবং অজ্ঞাতর সঙ্গে জ্ঞাতর দ্বন্দ্বর বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে কি ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-সব চিত্রকরদের রচিত চিত্রাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা প্রতীয়মান হয়, তা' হল মোটিফগুলি খুব কম সময়েই তাদের চিত্রবহির্ভূত বস্তুরূপে বা প্রাতিবিম্বিক বস্তুরূপে চিত্রে এসেছে; সংকেতরূপেই তারা চিত্রে স্থান দাবি করেছে (সংকেত যে সব সময়েই পূর্ণ দ্যোতনা পেয়েছে তা হয়তো নয়)। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার যে এই তথাকথিত 'তান্ত্রিক চিত্রকলা' কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন না হবার কারণে চিত্রনির্মাণে ব্যক্তিশিল্পীরা তাঁদের স্বকীয় পদ্ধতি প্রকরণ অনুসরণ করেছেন। এবং সেহেতু দৃশ্যমান শিল্পবস্তুতে স্বকীয়তার ছাপ সোচ্চার। সেই স্বকীয়তার ছাপ মোটিফগুলির ব্যক্তিগত রূপায়নে দৃশ্যমান। রেডাপ্পা নাইডুর জান্তব সর্প সুনীল দাসের চিত্রে রেখাঙ্কনের বাঁধনে স্তব্ধ। আর নীরদ মজুমদারের ছবিতে সে সর্প সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; তার জায়গা নিয়েছে সর্পিল রেখা বা অন্য কোন মোটিফের সর্পিল রেখা-ছন্দ।

আধুনিক তন্ত্র-শিল্পধারার মুখ্য সামান্যলক্ষণ হিসাবে মোটিফের ঐক্য এবং মোটিফ ব্যবহারের উদ্দেশ্য-সমতা ছাড়াও, দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণ হিসাবে অপর যে লক্ষণের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করা যায় তা হল linearity of approach to painting. এখানে linearity শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। এই বিশেষ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ বিখ্যাত অস্ট্রিয় শিল্পেতিহাসবেত্তা হাইনরিষ হেল্ফেল-ফ্লিনের কাছ থেকে ধার করা। যে চিত্রে প্রধান প্রধান বিভাজিত তল, মুখ্য বর্ণক্ষেত্রসমূহ এবং প্রধান রূপবন্ধগুলি রেখাদ্বারা বা রঙের দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথকীকৃত বা যে সব চিত্রে রেখা চিত্রান্তর্গত ছন্দকে দৃশ্যমান করে তোলে সে সবই linear painting অভিধায় অভিষিক্ত হবার দাবি রাখে। তবে, জে. স্বামীনাথনের ছবি যে অর্থে linear বীরেন দে'র ছবি সে অর্থে linear নয়। এবং এও মনে রাখা দরকার যে এই সামান্যলক্ষণটিকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। কারণ আধুনিক ভারতীয় শিল্পে linear ঐতিহ্য painterly ঐতিহ্যর চেয়ে অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তা তথাকথিত তন্ত্র-শিল্পীদের আবিষ্কার নয় বা একচেটিয়া নয়।

দৃশ্যশিল্প বিচারে দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পবস্তুর বিচার-বিশ্লেষণই যেহেতু অগ্রাধিক মনোযোগ দাবি করে সেহেতু আলোচ্য শিল্পধারার দৃষ্টিগ্রাহ্য সামান্যলক্ষণগুলি প্রথমে আলোচিত হল। তার অর্থ এই নয় যে দৃশ্যবস্তু যে অদৃশ্য ভাবমণ্ডলের ইঙ্গিতবাহী সে-ভাবমণ্ডলের বিচার এ-শিল্পধারা আলোচনা প্রসঙ্গে অবান্তর। পক্ষান্তরে, এ-বিশিষ্ট শিল্পধারার আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা অবশ্য স্মর্তব্য যে শিল্পবস্তুর বস্তুকরণের ক্ষেত্রে এ-শিল্পধারার শিল্পীদের ব্যক্তিগত ব্যবধান যতখানিই হোকনা কেন—শিল্পীদের উদ্দিষ্ট অভিজ্ঞতা-ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র বর্তমান। আর সে ঐক্যসূত্রের সূত্রেই এ-শিল্পধারা তন্ত্র-শিল্প নামে আখ্যাত হতে পারে।

মোটিফের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে যৌনমিলনের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, প্রজনন কর্মে দ্বিপক্ষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ, জীব-উৎপাদনকেন্দ্রিক ভীতি আনন্দ, জীবের প্রাণস্পন্দনে ভাগ্যের লীলা এবং জীবনে মৃত্যুচ্ছায়া এ-শিল্পধারার ভাবপরিমণ্ডল রচনা করেছে। মোটিফের ব্যবহারে, রেখার চারিত্রে এবং চিত্রক্ষেত্র অনুক্ষেপে ও বর্ণিকাভঙ্গে এ-ভাবপরিমণ্ডলই ইঙ্গিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে এ-ভাবপরিমণ্ডলের ইঙ্গিতবাহী যে কোন চিত্রকেই কি তন্ত্র-শিল্প অভিধায় অভিহিত করা সম্ভব? যদি তাই হয় তবে উত্তর য়ুরোপীয় এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের অনেককেই এবং হুয়ান মিরো প্রমুখ কয়েকজন সুররিয়ালিস্ত চিত্রকরদেরও ঐ নামে অভিহিত করতে হয়। আধুনিক তন্ত্র-শিল্পের স্বাতন্ত্র্য তবে কোথায়?

যৌনকর্ম, প্রজনন, জীবের জন্ম, জীবন-মৃত্যুর রহস্য আবহমান কাল থেকে শিল্পচর্চায় প্রতি-

ফলিত হয়েছে। আধুনিক তন্ত্র-শিল্প এ-ব্যাপারে কোথায় তাদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে দেখা যাক তন্ত্রদর্শন সাধারণভাবে কিভাবে জন্ম-মৃত্যু-জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেছে। তন্ত্রদর্শনের ধ্যান-ধারণা অনুসারে দুইপ্রকার শক্তির মিলিত প্রচেষ্টা জগৎকারক। পুরুষ সুপ্ত শক্তি। স্ত্রী বা প্রকৃতি সক্রিয় বা চঞ্চলা শক্তি। দুই শক্তির প্রকৃতি ভিন্ন হবার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক। অথচ দুই শক্তি তাদের শক্তিপ্রকাশে উন্মুখ হবার কারণে একে অন্যের সঙ্গে মিলনপ্রয়াসী; মিলন ভিন্ন তারা অসম্পূর্ণ। এই মিলনের প্রকাশ জীবসৃষ্টির মধ্যে। আবার জীব তার জন্মকাল থেকেই অর্থাৎ প্রাণপ্রবাহ শুরুর কাল থেকেই নিরন্তর সেই প্রাণের বিপরীত শক্তি মৃত্যুর দিকে ধাবমান। তন্ত্রদর্শন এবংবিধ ধারণাবশবর্তী হয়ে যৌনকর্ম, প্রজনন, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যে সেই পুরুষ এবং প্রকৃতি বা পুরুষ এবং স্ত্রী বা শিব (শবের বিপরীত) এবং পার্বতী, মহাদেব এবং মহামায়া বা মহাকাল এবং কালঙ্গ বা সমাহিত এবং চঞ্চলা, অসীম এবং সীমার লীলাই দেখে। আধুনিক তন্ত্রশিল্পও কি যৌনকর্ম, প্রজনন, জীবন-মৃত্যু রহস্যে এই দ্বি-ধর্মী-সম্পূরক শক্তির লীলা দেখে? সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বীরেন দে, নীরদ মজুমদার এবং স্বামীনাথনের চিত্রাবলীতে তান্ত্রিক দ্বৈতধ্যানের (বীরেন দে'র ছবিতে বর্তুলাকার সচল রূপবন্ধের সঙ্গে লম্বাকৃতি নিশ্চল রূপবন্ধের সম্পর্ক; নীরদ মজুমদারের ছবিতে সর্পিল ছন্দসমন্বিত অবুক্ত রেখার সঙ্গে কঠিন রেখাবন্ধ আয়তক্ষেত্রের সম্পর্ক এবং স্বামীনাথনের ছবিতে ঘোর ও শীতল অনুজ্জ্বল রঙের সঙ্গে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত রঙের সম্পর্ক লক্ষ্যনীয়) কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য মেলে কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এ-সম্পর্কে কোন সচেতনতা দেখা যায় না।

সুতরাং এ সত্য প্রতীয়মান যে আধুনিক তন্ত্রশিল্পী সচেতনভাবে তন্ত্রদর্শননিষ্ঠ নন। তবে তাঁর তান্ত্রিকতার দাবি কি করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন? এ-প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আমাদের যেতে হবে তান্ত্রিকগণের আচার-পদ্ধতির কাছে। তন্ত্রদর্শনের অন্যতম স্তম্ভধারণা এই যে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হতে হলে ইন্দ্রিয়জ কাজকর্ম এবং ইন্দ্রিয়ানুভূত ভোগের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবং তন্ত্রদর্শন তাই ইন্দ্রিয়ানুভূত ভোগের অভিজ্ঞতা পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার এবং তা নিবৃত্ত করার জন্য বিশাল কর্মকাণ্ডের আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই আচার অনুষ্ঠান ব্যক্তিভেদে ভিন্ন রকম। দর্শনেন্দ্রিয় যেহেতু অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় তন্ত্রদর্শন তাই দর্শনইন্দ্রিয়কেও সাধনোচিত মার্গে চালনার আয়োজন করেছে। তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়া-পদ্ধতির এবং তান্ত্রিক দার্শনিক ধ্যান-ধারণার একটি দৃশ্যরূপ আছে। এই দৃশ্যরূপ তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত যন্ত্রে বিধৃত। তন্ত্র-দর্শনকে দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলার জন্য এবং দর্শনানুভূতিকে সাধনোচিত মার্গে চালনা করবার জন্যই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে যন্ত্রের ব্যবহার হয়। তন্ত্রানুষ্ঠানে যে-সব যন্ত্রব্যবহার করা হয় তার কোন প্রাতিবিম্বিক বস্তুরূপ নেই। যন্ত্রগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কতগুলি জ্যামিতিক চিহ্নের সমাহারে গঠিত বিমূর্ত ডিজাইন বা নকশা। চিহ্নগুলি এবং চিহ্নের সমাহারে গঠিত নকশাগুলি সাংকেতিকভাবে অর্থবহ। চিহ্নগুলি বা নকশাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও ইন্দ্রানুভূতি-জাত অনু-ভাবনার সূত্র বেয়ে চিহ্ন নির্দেশিত ভাবসংকেতে পৌঁছান দুষ্কর। একমাত্র তন্ত্রভাবনায় দীক্ষিত লোকই দীক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানের সূত্র ধরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান যন্ত্রের অর্থভেদ করতে পারেন। অর্থাৎ symbol এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, esoteric.

যন্ত্র ছাড়াও তন্ত্রাচারীরা অন্য এক ধরনের দৃশ্যবস্তু ব্যবহার করেন যাকে বলা হয় মণ্ডল। মণ্ডল পরিপূর্ণ বিমূর্ত নকশা নয়। মণ্ডলে বস্তুরূপের প্রাতিবিম্বিক দৃশ্যরূপও ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে তা বস্তুরূপ প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে নয়—তত্ত্বকে সাংকেতিকভাবে দৃশ্যমান করার উদ্দেশ্যে। যন্ত্রই হোক বা মণ্ডলই হোক তান্ত্রিকরা যে সমস্ত visual aids ব্যবহার করে থাকেন তার নকশাগুলি সাধারণতঃ আলপনাজাতীয় আবন্ধ নকশার (closed composition) রূপ পেয়ে থাকে। আর একই ধরনের রেখার, রূপবন্ধের এবং মোটিফের পৌণঃপুনিক ব্যবহারের ফলে সেই আবন্ধ নকশা প্রকটভাবে আলঙ্কারিক হয়ে ওঠে। নকশা একে আবন্ধকেন্দ্রীয়, তায় যদি আলঙ্কারিক হয়ে ওঠে তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার অর্থময়তা হারায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান রূপ আবন্ধ কেন্দ্রীয় আলঙ্কারিক নকশায় ইন্দ্রিয়াতীতের সংকেত আর বহন করে না। রূপের সংকেত জ্ঞাপক ক্ষমতা সে অবস্থায় আর ইন্দ্রিয়জ থাকে না। সে অবস্থায় অর্থের জন্য চিহ্ন এবং সংকেতের সম্পর্ক সম্বন্ধে

পূর্বনির্দিষ্ট জ্ঞানের স্মরণাপন্ন হতে হয়। এ-অবস্থা শিল্পের পরিপন্থী।

অথচ তান্ত্রিকদের ব্যবহৃত এই শিল্প পরিপন্থী দৃশ্যবস্তুর রূপায়ন পদ্ধতির দ্বারাই আধুনিক তন্ত্র-শিল্পী সবিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। মোহন সামন্ত ও জে. স্বামীনাথন ব্যতীত অন্য সব চিত্রকরদেরই আবন্ধ নকশা সংগঠনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রায় সম্পূর্ণ। একই চরিত্রসম্বলিত রেখার, রূপবন্ধাংশের এবং মোটিফের পৌণঃপুনিক ব্যবহারে অলঙ্করণপ্রবণতা প্রায় সার্বিক। এবং তান্ত্রিক যন্ত্র ও মণ্ডলের linear approach-এর ব্যতিক্রম দুর্লক্ষ্য।

এতদ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আধুনিক তন্ত্র-শিল্পীদের শিল্পচর্চায় তন্ত্র-চর্চার অভিজ্ঞতা সচেতন অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দায়। যা পাওয়া যায় তা'হল তান্ত্রিকগণ-সৃষ্ট দৃশ্যবস্তুর অচেতন অনুসরণে সৃষ্ট কিছু ভাল-মন্দ নকশা। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা চর্চার আজন্ম ব্যাধিতে সপ্তম দশকের এ-ধারাও সমভাবে আক্রান্ত। একদা ভারতীয়তার নামে কতিপয় ঐতিহাসিক ভারতীয় শিল্পধারার আপাতঃদৃষ্ট ভঙ্গির অনুসরণ হয়েছিল, লোক-শিল্পের নামে হয়েছিল লোকশিল্পের আপাতঃদৃষ্ট বিশিষ্ট কয়েকটি ভঙ্গির অনুসরণ, আধুনিকতার নামে হয়েছিল আধুনিক পশ্চিম য়ুরোপীয় শিল্পের দৃশ্যমান বস্তুর অনুসরণ। কোন সামাজিক-মানসিক পরিমণ্ডলের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি রূপে যে-সব মূলধারার প্রবর্তনা হয়েছিল তা অনুধাবন করার প্রচেষ্টা আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা কদাপি করেছেন।

অধিকাংশ আধুনিক তন্ত্রশিল্পীদের কাছে তন্ত্রোক্ত অভিজ্ঞতা শিল্পকারক যে নয় তা তাঁদের শিল্পকর্মেই প্রতিভাত। সে আলোচনায় যেতে হলে প্রতিটি শিল্পীর শিল্প বিশ্লেষণের মধ্যে যেতে হয়, আপাততঃ সে সুযোগ নেই। আপাততঃ এটুকু জানাই যথেষ্ট যে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় তন্ত্র শিল্পের উদয় অভিজ্ঞতায় নয় বহিরঙ্গ প্রেরণায়। পশ্চিম যখন আধুনিক ভারতীয় শিল্পকে পশ্চিমানুকরণ বলে ত্যাগ করেছে তখন অভিমানে ভারতীয় শিল্পী ভারতের শিল্পৈশ্বর্যের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সন্ধান করেছে এমন এক শিল্পধারার যা আধুনিক রুচিকে তৃপ্ত করতে পারে। তান্ত্রিকগণের ব্যবহৃত দৃশ্যমান বস্তুগুলি বিমূর্ত-সংকেতধর্মী এবং নকশাবহুল হবার কারণে পশ্চিমি বিমূর্ত-শিল্পের রুচিতে অভিষিক্ত আধুনিক ভারতীয় শিল্পী উৎফুল্ল হয়ে ভেবেছেন তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত ঐতিহ্য পেয়েছেন। এই আত্মতৃপ্ত ভাবনা তাঁর স্বকীয় ভাবনার যৌক্তিকতাকে ব্যাহত করল।

**প্রণবরঞ্জন রায়**

**শব্দের খাঁচায়**

উপন্যাসের যুগ শেষ একথা আমরা উপন্যাসের প্রায় জন্মের পর থেকেই শুনে আসছি। কখনো শুনেছি, ধীর ছন্দে চলা জীবন যখন দ্রুতগতিতে চলল, তখন থেকেই উপন্যাসের দিন শেষ। কখনো শুনেছি, ধনতন্ত্রের যুগে উদীয়মান বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য উপন্যাস, ধনতন্ত্র যখন দ্রুত সমাজতন্ত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে তখন উপন্যাসের উদ্দেশ্য ক্ষয়ে আসছে। কখনো শুনেছি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ উপন্যাস, ব্যক্তিতন্ত্র যখন সমাজতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে তখন উপন্যাস নির্জীব হতে বাধ্য। কখনো শুনেছি উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব অনুপ্রবেশ করার পর উপন্যাসের চরিত্র এমনই পালটে গেছে যে ফর্ম হিসেবে উপন্যাস মৃত। ইত্যাকার আরো নানান সব তত্ত্ব। কার্যত অবশ্য দেখা গেছে প্রত্যেকটি তত্ত্ব নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন নতুন উপন্যাস লেখা হয়েছে, অত্যন্ত সার্থক ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাস রচনা করেছেন। বর্তমান যুগে, আবারও ধুয়া শোনা যাচ্ছে, উপন্যাসের যুগ শেষ। শোনা যাচ্ছে, এ যুগ সাংবাদিকতার যুগ, উপন্যাসের যুগ নয়। জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ, অখণ্ড মূল্যবোধ, সমাজের পূর্ণায়ত চিত্র ইত্যাদি নাকি এখন নিতান্তই কথার কথা। সহস্রধা বিভক্ত জীবনের পূর্ণ চিত্রের রূপ এখন কারুরই পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিকেরও নয়। এ যুগ রিপোর্টাজের যুগ, সাংবাদিকতার যুগ। ট্রুম্যান ক্যাপোট-এর ইন কোল্ড ব্লাড, নর্মান মেলার-এর ভিয়েতনাম বা আমেরিকার উপর নানা রচনাই বর্তমান যুগের উপন্যাস।

এ যুগ সাংবাদিকতার যুগ, উপন্যাসের যুগ নয়, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই, বাংলা-

দেশে ভালো উপন্যাস লেখা হলেই, এবং তা রিপোর্টাজধর্মী না হলেই, প্রমাণিত হবে উপন্যাসের মৃত্যু হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশেও যে উপন্যাসের স্থান সাংবাদিকতা ক্রমশই নিচ্ছে, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

উপন্যাসের সঙ্গে সাংবাদিকতার প্রভেদ কোথায়, এখানে নিশ্চয় তা বলা উচিত। এই প্রভেদ অবশ্যই ফর্মে নয়। নর্মান মেলার বা ট্রুম্যান ক্যাপোট যদিও বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চরিত্র বিকৃত না করেই তাঁদের বিখ্যাত লেখাগুলো লিখেছেন, তবুও সেই ঘটনা বা চরিত্র অবিকল বাস্তব না করে লিখলেই যে তা অসাংবাদিক হয়ে উঠত তা নয়। কাল্পনিক কাহিনী বা কাল্পনিক চরিত্র নিয়েও সাংবাদিক উপন্যাসের রচনা ঘটছে। উপন্যাসের সঙ্গে সাংবাদিকতার আসল প্রভেদ, দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেখানে লেখক তাঁর বর্ণিত ঘটনা দেশের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মেলাতে পারেন না, যেখানে চরিত্র একটি ব্যক্তির মধ্যে আটকে থেকে দেশের বিশেষ চরিত্রগোষ্ঠীগুলোর প্রতিভূ হয়ে না ওঠে, সেখানেই লেখক সাংবাদিকতা করছেন, উপন্যাস লিখছেন না। যেখানে লেখকের কোন বক্তব্য থাকে, তা রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য যে কোন ধরনের সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়ই হোক, সেখানে লেখক যদি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে এবং প্রমাণ করার জন্য যদি তাঁর দৃষ্টিকে, তাঁর সুবিধামতো, সমাজের খণ্ড খণ্ড অংশে আটকে রাখেন, তাহলে তা হয় সাংবাদিকতা। অর্থাৎ উপন্যাসের ব্যাপ্তি বৃহত্তর, সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি ক্ষুদ্রতর। উপন্যাসে ব্যঞ্জনা আছে, সাংবাদিকতায় নেই।

রিপোর্টাজধর্মী উপন্যাস লেখেন মতি নন্দী যাঁর লেখার আলোচনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং চরিত্র তিনি পরপর সাজিয়ে যান, সেগুলো সম্বন্ধ হয় না; লেখক অবশ্য তাঁর নিজের কোন এক বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সেই ঘটনা আর চরিত্র বাছেন এবং একসূত্রে গাঁথার অধিকার নেন। কিন্তু পাঠকের কাছে, এই ধরনের রিপোর্টাজের আবেদন দানা বাঁধে না, কারণ সেই বক্তব্য এবং সূত্র ঔপন্যাসিক বাইরে থেকে আরোপ করেন, ঘটনা-চরিত্র থেকে গজিয়ে ওঠে না।

আরেকজন রিপোর্টাজধর্মী ঔপন্যাসিক হলেন অসীম রায়। মতি নন্দীর রচনা এবং অসীম রায়ের রচনায় অবশ্য আপাত পার্থক্য আছে। মতি নন্দী লেখেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে, অসীম রায় লেখেন মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে। মতির চরিত্ররা চলে আবেগের বশে, অসীমের চরিত্র চলে বুদ্ধি-বৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু মূলত দুজনেই একজাতীয়, দুজনেরই সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টি, বক্তব্য ঠিক করে নিয়ে সেই বক্তব্যের পরিস্ফুটনে চরিত্র বা ঘটনা বাছা। ফলে তাঁদের উপন্যাস তাৎক্ষণিকের গণ্ডি পেরিয়ে উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায় না।

অসীম রায়ের "শব্দের খাঁচায়", যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৮-এর অক্টোবরে, সাংবাদিক-উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই উপন্যাসটির মূল যে চরিত্র তার বক্তব্য, বাঙালিরা আজ শব্দের খাঁচায় আটকে গেছে। শব্দের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় না করে শব্দের ফানুস উড়িয়েই তারা সন্তুষ্ট। এই বক্তব্য শুধু যে মূল চরিত্রটির তা নয়, অন্যান্য অনেক চরিত্রেরও, এবং সব চরিত্রের এমনকি ঔপন্যাসিকেরও হতে পারত। বক্তব্যকে উপন্যাসের অবয়বে আনতে হলে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দরকার ছিল, তা ঔপন্যাসিক অবলম্বন করেন নি, বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে চরিত্র বা ঘটনার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করেন নি, বরং ঘন ঘন সাদা বাঙলায় এই শব্দের খাঁচা বলতে তিনি কী বোঝেন তাই শুধু চিত্রায়িত করেন নি, পাতায় পাতায় শব্দের খাঁচা কথাটি আবৃত্তি করেছেন। শব্দের খাঁচা চিত্রটি এমনিতেই স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক যে পাঠককে তাঁর উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা ঘন ঘন বুঝিয়ে দিয়েছেন তার কারণ হয়ত পাঠকের বোধশক্তির উপর তাঁর আস্থা নেই অথবা নিজের ভাষাজ্ঞানের উপরই তাঁর আস্থা নেই অথবা আপন বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করতে তিনি লজ্জিত নন।

সেটা অবশ্য আশ্চর্যের বিষয়। কেননা অসীম রায়ের বক্তব্য এমন কিছু নতুন আবিষ্কৃত তত্ত্ব নয়। বক্তব্যটি কী? লেখকের ভাষায়, বর্তমান বাঙলার যুবক-যুবতীরা, যারা ভণ্ড নয়, যারা শব্দের ফানুস ওড়াতে চায় না, যারা শব্দের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করতে চায়, তাদের করার কিছুই নেই, কেননা তারা 'বাঙলা দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত'।

বাঙালী শব্দবাগীশ, তাই বাঙলা দেশের এত অধঃপতন। এই ধরনের কথা আগেও চলত। বাঙালীরা ব্যায়াম করে না, তাই বাঙালীর উন্নতি হয় না, বাঙালীরা ভাত-মাছ খায় তাই

বাঙালীর উন্নতি হয় না, বাঙালীরা বাংলাদেশের বাইরে যায় না, আর্মিতে ঢোকে না, আই-এ-এস পরীক্ষা দেয় না, কালীবাড়ী করে, পলিটিক্স করে, পরচর্চা করে, মিলেমিশে থাকতে জানে না, পরশ্রী-কাতর, কারখানায় আপিসে কাজে কামাই করে, তাই বাঙালীর উন্নতি নেই, ইত্যাদি আরো কত কারণ আমরা আগে শুনেছি।

যাঁরা দেশের রাজনীতি-অর্থনীতির খবর রাখেন তাঁদের কাছে এসব কথা নিতান্তই কৌতুকের। এক-একটি শ্রেণীর এক-এক রকম চরিত্র হতে পারে, কিন্তু বাঙালী কোন শ্রেণী নয়। পরশ্রীকাতরতা বা বক্তৃতাপ্রিয়তা বা অন্য কোন দোষ বা গুণ কোন একটি জাতের সাধারণ চরিত্র হতে পারে না, বাঙালীরও না। আসল ব্যাপার হলো, বাঙলাদেশে কিংবা আরো বৃহত্তর পরিসর ভারতবর্ষে কথার ফানুস উড়িয়ে শাসকশ্রেণী শাসিতদের ভুলিয়ে রেখেছেন। এবং এটা শুধু ভারতবর্ষেই নয়। খোদ ইয়োরোপ আমেরিকাতেও যখন শাসকশ্রেণী ডিমক্র্যাসি ইত্যাদি কথা বলেন তখন তাঁরাও শাসিতদের সেই শব্দের খাঁচায় আটকে রাখেন। এই মূল কথাটি ধরতে না পেরে অসীম রায়ের ধারণা হয়েছে 'দারোয়ান থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাইকেই তো এদেশে কথার ভূতে পেয়েছে.' 'প্রেমিক, প্রবোধবাবু, রাজনৈতিক নেতা, অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, কূটনৈতিক সাংবাদিক, জাঁদরেল আইনজীবী, সমাজের প্রত্যেক স্তরের সকল মানুষ......তাঁরা তো সবাই বেঁচে আছেন বা করে খাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের শব্দপ্রয়োগের সাফল্যের উপর।' শব্দের খাঁচায় সকলে আটকে গেছে না বলে বলা উচিত ছিল শব্দের মায়ায় আটকে রাখা হয়েছে শাসিতদের। দুটোর মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

আসল কথা, যে বিষয়ে সংবাদপত্রে রম্যরচনা লেখা যেত, সেই বিষয় নিয়ে অসীম রায় পূর্ণা-বয়ব উপন্যাস রচনা করেছেন। বিষয়টি সামান্য, তাই উপন্যাসটিও সামান্য।

"শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসটি পড়তে যে ক্লান্তি আসে তার কারণ শুধু সামান্য বিষয়ই নয়, ক্লান্তিকর ফর্মও বটে। উপন্যাসের চারটি অংশ, এবং সেই চারটি অংশেরই উপসংহার হয়েছে 'শব্দের খাঁচা' এই চিত্রটির ব্যাখ্যায়। ফলে, উপন্যাসটিকে উপন্যাস মনে হয় না, মনে হয়, 'শব্দের খাঁচা বলিতে কী বোঝ তাহা উদাহরণ সহযোগে বিশদ করো' এই প্রশ্নের উত্তর।

উপন্যাসের মূল চরিত্র, যার চোখে তার পরিপার্শ্বের লোকজন শব্দের খাঁচায় আটকে গেছে, যার কাছে সেই সব লোক আর শব্দ ক্লান্তিকর, যে নিজেও নিজের কাছে ক্লান্তিকর, সেই চরিত্রটি পুরো উপন্যাসেই এই এক ক্লান্তির বিন্দুতে আটকে আছে। ফলে উপন্যাসে কোন গতি নেই এবং এই জড়ত্ব ইচ্ছাকৃতও নয়। মূল চরিত্রের পাশে যেসব চরিত্র ঘোরাফেরা করছে, তারাও সেই ক্লান্তির বিন্দুতেই আটকে আছে। যে শব্দের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করতে গ্রামে গামে ঘুরছে, যে শব্দের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করতে পাকিস্তান থেকে প্রেমের খোঁজে কলকাতা আসে, তারাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, উজ্জীবিত হয় না, পাঠককেও উজ্জীবিত করে না। উপন্যাসের কোথায়ও হাঁফ ছাড়া যায় না, লেখকের বিদ্রূপ শান্ত হয় না।

অসীম রায়ের লেখার সবচেয়ে বড়ো দোষ তাঁর এই উৎকট বিদ্রূপপ্রিয়তা। সমকালীন জীবনের কোন কিছুর সঙ্গেই তিনি সহানুভূতি অনুভব করেন না, জীবনের নেতির দিকেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ। পার্টির কাজে সকলেই শুধু কথার শূন্যকুম্ভ বাজায়, সাহিত্যের ক্লাসে সকলেই কেবল চর্বিতচর্বণ করে, সাংবাদিকমাত্রেই সাদাকে কালো কালোকে সাদা দেখানোর ম্যাজিক দেখায়, প্রেমিকেরা কেবলই ভাষার আড়ালে ভাবকে গোপন করে, রাজনীতি অর্থনীতি শুধুই অন্তঃসারশূন্য কথা— অসীম রায় এই শব্দময়তার গণ্ডী ছাড়াতে পারেন নি এবং সন্দেহ হয় তিনি ছাড়াতে চান নি, কেননা তাহলে তাঁর উপন্যাস দাঁড়ায় না।

শুধুই বিদ্রূপের উপর যদি উপন্যাস দাঁড় করাতে হয়, তাহলে সেই উপন্যাস যদিও এক-পার্শ্বিক হয়, তবুও পাঠযোগ্য হতে পারে, যদি বিদ্রূপের পাত্র যথার্থই বিদ্রূপযোগ্য হয় এবং বিদ্রূপের ভাষা যথাযোগ্য হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে অসীম রায়ের বিদ্রূপের লক্ষ্য নির্বাচন এবং বিদ্রূপের ভাষা নিয়ে প্রশংসা করা কষ্টকর।

যাঁদের নিয়ে অসীম রায় বিদ্রূপ করেন তাঁদের নিয়ে পাঠক কোন কৌতূহল অনুভব করেন না। ধরা যাক, উপন্যাসটির মূল চরিত্রটি নিজেই। সে ইংরেজির অধ্যাপক, এবং সেই সূত্রে বাঙালী ইংরেজি-অধ্যাপককে ব্যঙ্গ করে। বাঙলা দেশের ইংরেজির অধ্যাপকের সমস্যা আছে, যে সমস্যা

যাবতীয় না-ইংরেজ ইংরেজি-অধ্যাপক মাত্রেরই, বিজাতীয় ভাষায় বিজাতীয় সাহিত্য পড়ানোর সমস্যা। কিন্তু অসীম রায়ের নায়ক সেসব সমস্যার মধ্যে না গিয়ে, কতগুলো শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সুলভ কথা আবৃত্তি ক'রে সাহিত্য আলোচনার নামে ভাঁড়ামো করে। ফলে সেই ভাঁড়ের সমস্যা নিয়ে পাঠকের কোন মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়।

স্যাটায়ার-লেখকের যদি যথেষ্ট কলমের জোর না থাকে তাহলে স্যাটায়ারও তেমন জমে না। ভাষার উপর অনায়াস দখল অসীম রায়ের নেই, যেমন আছে ধরা যাক আর-এক স্যাটায়ার-লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের, যাঁর বক্তব্য যখন যা-ই হোক ভাষা মার্জিত, ক্ষণে-ক্ষণে চমক দেয়, হুলও যেমন ফোটায়, নিরাবিল আনন্দও দেয় তেমন। অসীম রায়ের লেখায় চমক নেই, হিউমার নেই, ভাষার গাঁথুনি শিথিল, অনেক সময়ই পীড়াদায়ক। বস্তুত, শব্দের মায়ায় আটকে গেছেন সন্দীপন, তার কারণ তাঁর শব্দের ঔজ্জ্বল্য। অসীম রায়ের শব্দ উজ্জ্বল নয়, তাই সন্দীপনের ক্ষেত্রে যে খাঁচাটি দুঃখের, অসীম রায়ের ক্ষেত্রে সেই খাঁচাটি ক্লান্তিকর। অসীম রায়ের হালকা ইয়ার্কি তবু সহ্য হয়, কিন্তু যখনই তিনি গম্ভীর গভীর হতে চেষ্টা করেন তখন তাঁর হাত থেকে এরকম বাক্য নিঃসৃত হয়: 'অথচ তারা ঘুরে বেড়িয়েছে সেই কালহীন নীলাভ চিদাম্বরে যেখানে সমস্ত অনৈক্য সুসংহত।' যে শব্দের খাঁচাকে আক্রমণ করে তাঁর উপন্যাস, তিনি জানেন না, তিনি নিজেই সেই খাঁচায় আটকে আছেন। তাই উপন্যাসের যে-অংশটুকুতে অসীম রায় ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করেন নি, সেই প্রেমের অংশটুকুই পাঠকের কাছে সবচাইতে পীড়াদায়ক মনে হয়, কেবলই 'শব্দের ওগলানো' মনে হয় এবং দুঃখের বিষয় সেই শব্দেরও কোন আকর্ষণশক্তি নেই।

সহানুভূতির অভাবে অসীম রায়ের লেখা আবার সময় সময় বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে, বিশেষত রাজনীতি নিয়ে যখন তিনি লেখেন। 'কয়েক দিন আগে কলকাতার রাস্তায় বিপ্লব হয়ে গেছে' এই ধরনের ব্যঙ্গ কলেজের ছাত্রদের আড্ডায় শস্তা সময়ে চলে, বামপন্থী সচ্ছল লোকের মদের মজলিসেও বেশ বাহবা পাবে, কিন্তু যেখানে রাজনীতি নিয়ে যুক্তিনির্ভর উপন্যাসের অবতারণা হয়, সেখানে এসব কথা তখনই চলবে যখন অভিজ্ঞতা থেকে আসবে। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললে সেগুলো কেবলই কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লব যেমন একদিনে ঘটে না, প্রস্তুতি দরকার হয়, নিষ্ঠা দরকার হয়, তীব্র আবেগ দরকার হয়, তেমনি উপন্যাস রচনাতেও দরকার মননশীলতা, আবেগ আর নিষ্ঠা আর সহানুভূতি।

সন্দীপনের বাচনভঙ্গি বাঙলাসাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁর ভাষা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষার আত্মীয়, তবে আরো শাণিত। খাঁটি শহুরে, চমকবহুল, বঙ্কিম হিউমারের ছড়াছড়ি। মেপে মেপে শব্দ এবং যতিচিহ্ন তিনি ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর লেখার একটি মুদ্রাদোষ, নীটোল শব্দের অজস্র প্রয়োগের মধ্যেই, তাঁর লেখার চরিত্র ফুটে ওঠে। যা কিছু তিনি লেখেন নীটোল লেখেন। এভাবে লেখার গুণ যেমন, দোষও তেমন। এই বাহনে বেশিক্ষণ চড়া যায় না, না লেখকের পক্ষে না পাঠকের পক্ষে। আবেগে যুক্তিতে ভেসে যেতে না পারলে লেখকের পক্ষে দিক থেকে দিগন্তে চড়ে বেড়ানো অসম্ভব। সন্দীপন যে বেশি লেখেন না বা বেশি লিখতে পারেন না, তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে তাঁর গদ্য।

গদ্যের দিক দিয়ে, অর্থাৎ গদ্যের একটা দিকে, তির্যক ব্যঙ্গপ্রখর গদ্যে সন্দীপন যতটা সিদ্ধ-হস্ত, ততটা মনোযোগী যদি তিনি তাঁর বিষয়ে হতে পারতেন, তাহলে বলা চলত তিনি সাংবাদিক নন, ঔপন্যাসিক। কিন্তু একটি বিষয়ে বেশিক্ষণ মগ্ন থাকা, একটি বিষয় নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবা, তাকে টেনে রাখা সন্দীপনের চরিত্রে আসে না। তাঁর উপন্যাস "একক প্রদর্শনী" এবং ছোটগল্পের বই "সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য" তাই উপন্যাস বা ছোটগল্প মনে হয় না, মনে হয় সন্দীপনের মনের টুকরো-টুকরো চিন্তার মেলা, একটা বড়, একটা ছোট। দুটো রচনার চরিত্রের কোন পার্থক্য নেই, উপন্যাসটি ভেঙে দিলে তা ছোটগল্পের বইয়ের কণিকাগুলোতে দাঁড়াবে, ছোটগল্পের বইটির কণিকাগুলি ঠিকমতো সাজিয়ে দিলে উপন্যাসটি হয়ে দাঁড়াবে। এইজন্যই এটা সম্ভব যে, একটি গ্রন্থের অংশ অপর গ্রন্থটির হুবহু অংশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক স্থানে—যথা বেয়ারার কাছে রেভেনিউ স্ট্যাম্প চাওয়া ব্যাপারটা।

আসলে দুটো রচনাকেই লেখকের নোটবই বা জর্নাল বা ছোটগল্প বা উপন্যাসের ফ্রেম বা

সাংবাদিকের মন্তব্য বলে ধরা চলতে পারে। বিষয়ের দিক দিয়ে সন্দীপনের রচনার চরিত্র কয়েকটি সূত্রেই বলা যেতে পারে। প্রেম বিষয়ে সন্দীপন মধুরভাবে মগ্ন নন। প্রেম তাঁর কাছে শারীরিক ক্রিয়া, কখনো কখনো মনের, তাতে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে বিকর্ষণ ভাবটাই প্রবল। তাঁর নায়কেরা নির্বোধ এ-কথা জেনে বিনীত না হয়ে কপট হয়েছে। ঠিক সময়ে ঠিক কথা তাঁর নায়কেরা বলতে পারে না, ঠিক কাজ করতে পারে না, তাই অনুতাপে ভোগে। তাঁর নায়কেরা নিশ্চেষ্ট, কারণ 'ভয় সর্বত্র, কোনো সমাধান নেই, কোন পরিত্রাণ নেই, তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা' বৃথা।

এই কয়েকটি সূত্র যদি একটি বিশেষ ফর্মে বাঁধা যায় তাহলেই সন্দীপনের যে কোন রচনায় পরিণত হবে। সেই ফর্মটি কী? উদাহরণ দিয়ে বলা যায়,

'কী রে, কেমন আছিস?' এর উত্তরে অনেককাল পরে দেখা হলে অংশু ভেবেছিল বেচুকে বলবে যে 'এখন একটু নুয়ে পড়েছি, বুঝলি?' বুঝবে কি বেচু?

সময় নিয়ে সন্দীপনের এটাই স্বাভাবিক ক্রীড়া। 'অনেককাল পরে' 'দেখা হলে' 'ভেবেছিল' 'বলবে' 'বুঝবে'—এক-একটা পর পর আচমকা এসে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। বেচুর সঙ্গে অংশুর দেখা হল কি হল না, দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি না, এসব প্রশ্ন সন্দীপনের কাছে অবান্তর। প্রশ্নটাই আসল, এবং উত্তরটা, এর ইতিহাসগত বাস্তবতা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা ভাবগত বাস্তবতা। সন্দীপনের লেখায় তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অতীতকে ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকে বর্তমান, বর্তমানকে অতীতে তৈরি করা হয়। কাহিনী বড়ো নয়, ইতিহাস বড়ো নয়, ইতিহাসের এক-একটি মুহূর্তই তাঁর কাছে ব্যঞ্জনাবহ। তাঁর "একক প্রদর্শনী"র নায়ক যেমন উপদেশ দেয় 'ঠিক মুহূর্তকে ধরতে শেখো ও ধরো' সন্দীপনের লেখারও মূল চরিত্র তাই।

বাঙলা উপন্যাসের সবচাইতে বড়ো দোষ, এর লেখকেরা বেশি লেখেন যার অধিকাংশই অবান্তর। সন্দীপনের ক্ষেত্রে, এর উলটো। তাঁর লেখার দোষ হলো, তিনি বহুদিন ধরে লিখলেও ভীষণ কম লেখেন। এবং তাঁর কম লেখার কারণ, তাঁর লেখার ধরন এবং বিষয়ের সীমাবদ্ধতা। তাঁর আত্মকথনভঙ্গিও যে-জন্য অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, তিনি নিজেকে ভুলে অপরের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করতে পারেন না। অর্থাৎ, ঔপন্যাসিকের অপরিহার্য অস্ত্র, নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর নেই।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, সন্দীপন যেটুকু লিখেছেন তা অনবদ্য। এবং সেই রচনাকে উপন্যাস বা গল্পের ফ্রেমে ফেলা যাচ্ছে না বলেই তা দোষাবহ, তা-ও নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয়, যিনি অপর্যাপ্ত লেখেন না, অপর্যাপ্ত লেখার মালমশলা যাঁর নেই, তাঁর লেখা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে, এবং সেই বৃত্তটি চেনা হয়ে গেলে, তাঁর রচনার চমকপ্রদ গুণটি চটকদার গুণে এবং তার পরই পৌনঃপুনিকতার দোষের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে।

সন্দীপনের জার্নাল লেখার ধরনও এক ধরনের সাংবাদিকতা। সংবাদ যেমন দর্শকনিরপেক্ষ হতে পারে তেমনি আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিকও হতে পারে। রিপোর্টাজ যেমন রিপোর্টারের মন্তব্য ছাড়াই নিছক সংবাদ, বহির্বিশ্বের বর্ণনা, তেমনি জার্নালও লেখকের অন্তর্বিশ্বের রিপোর্টাজ, বহির্বিশ্ব কীভাবে রিপোর্টারের মনে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তার রিপোর্টাজ। রিপোর্টাজ বা জার্নালের সঙ্গে উপন্যাসের এটাই পার্থক্য, ঔপন্যাসিকের রচনা হতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন গড়ে ওঠে, এবং সেই দর্শনের আলোয় সেই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং সেই ব্যাখ্যাকে কখনই মনে হবে না, লেখকের আরোপিত। যে-মুহূর্তে সেই দর্শন ও বিশ্ব লেখকের কল্পিত মনে হবে, আরোপিত হবে, সেই মুহূর্তে তাকে মনে হবে সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিকের ভাষ্য। উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধ সবসময়েই তাই এমন যে ঔপন্যাসিকই সেই জগতের স্রষ্টা অথচ সৃষ্টির সময় থেকে শেষ পর্যন্ত সেই উপন্যাস ঔপন্যাসিকের কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায়। যেজন্য অনেক ঔপন্যাসিককে জিজ্ঞাসা করলে শোনা যায় লেখার শুরু পর্যন্ত তিনি জানেন তিনি কী লিখবেন, কিন্তু লেখা শুরু করলে তাঁর লেখনী তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে তা তিনি জানেন না। যিনি অত্যন্ত হিসেব নিকেশ করে লেখেন তাঁর কাছে এ-কথা হাস্যকর শোনাতে পারে, কিন্তু তাঁর লেখা বড়ো ছকমাফিক নিষ্প্রাণ হয়ে উঠছে।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

## পাঠকের চিঠি

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ সংখ্যার চতুরঙ্গে নিত্যপ্রিয় ঘোষ সংস্কৃতি সাময়িকীর পৃষ্ঠায় "অর্জুন" ও "বিশ্বাস"—এই দুটি উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি রাজনৈতিক মতবাদের উল্লেখ করেছেন যেগুলি নিষ্ঠুরতা ও মানবতা-বিরোধী হেতু প্রতিবাদের যোগ্য। আমার বক্তব্য প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা করব। প্রথমত : নিত্যপ্রিয় ঘোষের রাজনৈতিক মূল্যায়ন; দ্বিতীয়ত : তার সমালোচনার চরিত্র-পরিচয়।

এই দুটি পুস্তককে কতটা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা আছে তা নিরূপণের মাধ্যমে নিত্যপ্রিয় রাজনৈতিক মতবাদ বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। নিত্যপ্রিয় কম্যুনিজমের পথ সম্বন্ধে নিরুচ্চার, লক্ষ্যটাই তুলে ধরতে সচেষ্ট। পথ যদি দোষণীয় হয় তাহলে কোনো সন্তোষজনক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। কম্যুনিজমের লক্ষ্যে পৌঁছুতে মার্ক্সবাদীরা যে যে-কোনো পথে চলতে প্রস্তুত, সে-কথা তাঁরা কখনই গোপন করেন না, নিত্যপ্রিয়ও করেন নি। শোষণ-ব্যবস্থা বিলোপ শুধু মার্কস-বাদীদেরই কাম্য নয়, মানবতাবাদীদেরও কাম্য। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য হরণ দ্বারাই যে পুরো স্বাতন্ত্র্যের, পুরো ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এমন যুক্তি হাস্যকর। কম্যুনিজম আর রেজিমেন্টেশন-এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী নয়—নিত্যপ্রিয়র এমনতর ইচ্ছাপূরক মতবাদের সমর্থন ইতিহাস করে না, এমন কি মার্ক্সীয় তত্ত্বও নয়। তাহলে ডিমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম অথবা ডিক্টেটরশিপ অব দি প্রলেতারিয়েত মার্কসবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে গ্রাহ্য হত না। মার্কসবাদের সঙ্গে রেজিমেন্টেশনের সম্পর্ক এতই অঙ্গাঙ্গী যে ইতিহাসের যে স্তরে ও ক্ষেত্রে সর্বহারার একনায়কত্ব সম্ভবই নয় বলে স্বীকৃত সেই স্তরেও রাজনৈতিক দলের একনায়কত্ব অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত।

এ কোন ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্থাপনের প্রয়াস যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, যাদের নিত্যপ্রিয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা বলেছেন, প্রাণ দিতে হয়েছে, নির্বাসিত হতে হয়েছে? এ কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মধারা যাতে ভিন্নমতের কোনো স্থান নেই? বহু উদ্দেশ্যেই এইভাবে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার কালে হয়েছে, উপনিবেশ প্রসারের যুগে হয়েছে, নাৎসীদের সময়ে হয়েছে, স্তালিন ও মাও সেই স্বাধীনতা হরণে কুণ্ঠিত হন নি। কম্যুনিস্ট-বিরোধী ম্যাককার্থি নাগরিক স্বাধীনতা হরণের দোষে দোষী। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অসমর্থনীয় কাজে একটা সমর্থনের যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করা হয়, তা সে-যুক্তি যতই দানবীয় হোক না কেন। ক্ষমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনই যে অপব্যবহৃত ক্ষমতার দ্বারা হৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য বহু যুগ অপেক্ষা করতে হয়। মানুষ স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টায় যে বন্ধুর পথ দিয়ে এসেছে, তারপর সে আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে শোষকদলের আনুগত্য বলে ভাববে না। ভারতেই শুধু অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় না। এমনকি এই দরিদ্র ভারতেও দেখা যায় অভাবে স্বভাব নষ্ট ততটা হয় না যতটা হয় প্রাচুর্যে ও ক্ষমতার একাধিপত্যে। সুতরাং নিত্যপ্রিয় ঘোষিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপক্ষে ওকালতি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

কম্যুনিজম মানুষের কোনো চিরন্তন মূল্যবোধে অবিশ্বাসী। সেই জন্যই মার্ক্সবাদীরা মত ও পথের একাত্মতায় অবিশ্বাসী। কম্যুনিজম বলে সমাজ এবং তার যাবতীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস—সমস্তই ধনোৎপাদনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। একারণে যখন ধনোৎপাদনের চরিত্র পরিবর্তন-শীল, ইতিহাস তার সাক্ষী, তখন মূল্যবোধও পরিবর্তনশীল। অথচ নিত্যপ্রিয় বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করতে এই মৌল তত্ত্বকে অস্বীকার করে গেছেন।

প্রত্যেকটি বামপন্থী পার্টির প্রতি লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থনের উল্লেখ দ্বারা নিত্যপ্রিয় শিশুসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের আনুগত্যই যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে পীরের দরগায় যে লক্ষ লক্ষ লোক শিরনি চড়ায় অথবা শীতলার কৃপালাভ করতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মানত করে—তাদেরও বলতে হয় সত্যাগ্রহী। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার আমলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে অবিশ্বাসী সন্দেহে পুড়িয়ে মারতে উৎসাহ দেখা দিত, তাও তো তেমনি সত্যানুগ ছিল! তাহলে নাৎসীরাই বা প্রশংসনীয় নয় কেন? অধুনা যে বহু শিক্ষিত মানুষ গুরুবাদে বিশ্বাসী, সেই গুরুবাদই বা সত্য বলে গৃহীত হবে না কেন? বস্তুত, সত্য প্রথম প্রকাশ পায় একের মধ্য দিয়ে বহুর বিরোধিতা সত্ত্বেও। মানুষের মনে গ্যয়টে বর্ণিত মূর্খসুলভ দুষ্টির অঙ্কুর থাকে বলেই সত্য

সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও কালোত্তীর্ণ। মানবিকতার বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত সত্যকে রোধ করতে পারে না। যদিও হয়তো অনেক প্রাণ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য দিতে হয়। বর্তমান যুগের দ্বন্দ্বের জন্য মার্কসবাদীয় নবধর্মের অজ্ঞতাও কম দায়ী নয়। নিত্যপ্রিয় লিখেছেন নকশালী আন্দোলন সমস্ত সমাজকে একেবারে গোড়া থেকে টান দিয়েছে। উক্তিটি বিচার্য। প্রথমত নকশালী আন্দোলন মার্ক্সবাদী আন্দোলন বহির্ভূত নয়। যদিও কোনো কোনো মার্ক্সবাদী পার্টি ঐ আন্দোলনকারীদের সমালোচনায় মুখর। কিন্তু ঐ যে টান দিয়েছে বলে নিত্যপ্রিয়র দাবি তার প্রমাণ কোথায়? কোনো প্রচলিত বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে? যদি সন্ত্রাসজনিত ভীতির প্রসারই তার প্রমাণ হয়ে থাকে তাহলে এককালীন ঠগীদের জন্য যে ভীতি জনসাধারণে সঞ্চারিত হয়েছিল তাও তো সমাজকে ধরে টান দিয়েছিল বলে বলতে হয়।

সমালোচনার নামে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যে পরিচয় নিত্যপ্রিয় দিতে প্রয়াসী, সেটা মার্ক্সবাদের পরিচয়পত্র। চিন্তার ক্ষেত্রে আলোচনার দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকুক, প্রত্যেক ব্যক্তি-স্বাধীনতাকামীর তাই লক্ষ্য। কিন্তু আলোচনা যদি যুক্তিবর্জিত হয় তাহলে তার প্রতিবাদও প্রয়োজন। প্রায় শতাধিক বৎসরের আলোচনার পর মার্ক্সবাদের পক্ষে নতুন কোনো আলোকপাত আর সম্ভব নয়। এমনকি মার্ক্সবাদের যে-বাস্তব পরীক্ষা রাশিয়ায় দেখা গিয়েছিল, তার সমস্ত সম্ভাবনাই অন্তর্নিহিত মানবতাবিরোধী প্রবণতার ফলে এই শতাব্দীর ত্রিশ দশক পার হবার সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার মার্ক্সবাদ-নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্তর পার হয়ে আসে নি, এসেছে এক দুর্বার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতার কর্মশক্তির ফলে ও প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রশক্তির যে অবনতি ঘটে তার জন্য। রাষ্ট্রশক্তি দখলই কোনো নীতিগত মূল্যের প্রমাণ নয়। তাহলে অদূর অতীতে যত অল্পদিনের জন্যই হোক, ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতাসীন হওয়া, হিটলারের অভ্যুত্থান, ব্যাখ্যা করা যায় না। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লেনিন যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে তিনি জয়ী হয়েছিলেন বাস্তবকে দূরদর্শিতার ফলে নিয়ন্ত্রিত করায়, মার্ক্সবাদের নিজস্ব কোনো বিভূতিতে নয়।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদ যে নির্দিষ্ট উত্তরণ—এ সত্য প্রমাণিত হয় নি। মার্ক্সবাদীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যা এক সময় অনস্বীকার্য ছিল, অভিজ্ঞতার আলোকে তার নূতন প্রয়োগ হচ্ছে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে; নীতির বিচারে মার্ক্সবাদ সৎ-অসতে কোনো ভেদাভেদ করে না; দর্শনতত্ত্বের দিক থেকে মার্ক্সবাদ দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে সিংহাসনচ্যুত ঈশ্বরের স্থলে অভিষিক্ত করেছে। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অসহিষ্ণু একনায়কত্বে বিশ্বাসী। কম্যুনিজম-এর 'জিগির' দুনিয়ার মজদুর এক হও· কিন্তু এই জিগির-এর মাধ্যমে একবারো তাদের একত্র করতে পারে নি। মার্ক্সবাদ প্রথম যুগে শোষণের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, তার মানবিক মূল্য অবশ্যই অসীম ও স্বীকৃত। কিন্তু যা নাকি মাত্র আংশিক সত্য, তাকে যখন নিটোল, সার্বিক, অনিবার্য এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বলে তুলে ধরা হয় তখনই তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ধরা পড়ে। আজ তাই মার্কসবাদকে নতুন করে যাচাই করে দেখতে হবে।

ভেদকে নিয়ে যে মৌলিক বিভেদ তার আলোচনার পর উপন্যাস দুটির সমালোচনা নিয়ে বক্তব্য অল্পই থাকে। "অর্জুন" ও "বিশ্বাস" সম্বন্ধে নিত্যপ্রিয়র মতামত তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, আর যতই সাহিত্যিক মানদণ্ড ও বাস্তব বিচারের কথা বলা হোক, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ দ্বারা নির্ণীত। তা না হলে ভলটেয়ার, টলস্টয় কেন শেক্সপীয়রকে পছন্দ করতেন না এবং কেনই বা বায়রন কীটস্-এর কবিতার অনুরাগী ছিলেন না, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবুও এই প্রসঙ্গে নিত্যপ্রিয়র কয়েকটি উক্তি গ্রহণ করা শক্ত। যেমন তাঁর উক্তি কোনো উপন্যাস 'মনোরম হতে পারে মনোজ্ঞ হয় না'। ইংরেজি প্রবাদ টুইডলডাম অ্যান্ড টুইডলডির পার্থক্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তেমনি বিস্ময়কর তাঁর আর-একটি উক্তি : 'উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজে ঢুকে পাশব জীবনও'...। চতুরঙ্গের পাঠকেরা এবং লেখকেরাও—কোন সমাজের অন্তর্গত? তাঁরা কি সবাই পাশব জীবন যাপন করছেন? এমনি ছোটখাট অনেক ব্যাপারকেই, যেমন জামার সেন্টের গন্ধ, তিনি অতিপ্রাকৃত মূল্য অর্পণ করে "অর্জুন" গ্রন্থের যাচাই করেছেন। উপন্যাসের উপসংহার, আমার মতে যা নাকি নায়কের সুনির্দিষ্ট উপলব্ধি ও অধিকার, তাঁর মতে আত্মরতির অন্য নাম।

গুরুচণ্ডালি দোষে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করি, গোরার উপসংহার কোন্ নিকষে বিচার্য ?

মোটের উপর নিত্যপ্রিয়র সমালোচনা প্রায় উপলক্ষের স্তরেই রয়ে গিয়েছে, মূল বক্তব্য মার্ক্স-বাদ। তাই তিনি সুনীল ও সমরেশ দুজনেরই বিচার করে একজনকে বলেছেন অজ্ঞ আর অন্যজনকে করেছেন বিদ্রূপ।

**সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

**লেখকের বক্তব্য**

যে কোন সাহিত্যকর্মের আলোচনায় প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার সেই সাহিত্যকর্মের বিচারের নিরিখ কী? "অর্জুন" এবং "বিশ্বাস" উপন্যাসের আলোচনায় আমি বলতে চেয়েছি, ওই দুটি উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা রক্ষিত হয় নি, যার ফলে উপন্যাসদুটির আবেদন পাঠকের কাছে কমে গেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে নানারকম মত বাজারে চলে, সুতরাং আমি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলতে কী বুঝি সে বিষয়ে আলোচনার গোড়াতেই স্পষ্ট করে নিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা যে কোন গোষ্ঠীভূত নিরিখ নয়, এবং বর্তমান বাঙলা উপন্যাসে বাস্তবতা রক্ষিত হলে তা একই সংগে সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য, এটা আমার অভিমত। এই অভিমত সম্পর্কে আলোচনা নিশ্চয়ই চলতে পারে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই আলোচনায় যান নি। তিনি ধরে নিয়েছেন, আমার উপলক্ষ ওই দুটো উপন্যাস এবং লক্ষ্য মার্কসবাদ প্রচার। যেহেতু তিনি মার্কসবাদ-বিরোধী সেই হেতু তিনি উপন্যাসদুটোর আলোচনায় যান নি, গিয়েছেন মার্কসবাদ যে অসার তা প্রতিপন্ন করতে। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রতিবাদের উত্তরে আমি যা বলব, তা আমার মূল আলোচনা থেকে সরে আসবে।

মার্কসবাদ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রবাবুর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সুতরাং উত্তরে আমাকে অনেক প্রাথমিক কথায় যেতে হবে। সত্যেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদপত্রে বহু প্রশ্ন এলোমেলোভাবে ছড়ানো আছে, সুতরাং এই উত্তরও এলোমেলো হবে।

আমার উদ্দেশ্য মার্কসবাদ আলোচনা, "অর্জুন" এবং "বিশ্বাস" নিতান্তই উপলক্ষ, সত্যেন্দ্র-বাবুর এই বক্তব্য আমি স্বীকার করি না। মার্কসবাদ একটা সামগ্রিক জীবনদর্শন, সাহিত্যও সামগ্রিক জীবনদর্শন, দুটোকে আলাদা করা যায় না। একটির আলোচনায় আর একটি এসে পড়েই। তবে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানেই মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদে বিশ্বাস না রেখেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় বিশ্বাস রাখা যায়।

কমিউনিজমের পথ সম্বন্ধে আমি স্বাভাবিক কারণেই নিরুচ্চার ছিলাম, কারণ তা আলোচনার স্থান আমার রচনায় ছিল না। আমার বক্তব্য ছিল সুনীলও সমাজতন্ত্র চান কিন্তু তার পথ তিনি জানেন না, যার ফলে তাঁর লেখা ইউটোপিয়ায় পর্যবসিত হয়। সেজন্য তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় অপ্রাপ্তমনস্কদের জন্য লেখা।

মার্কসবাদীদের চোখে পথ ও লক্ষ্যে কোন বিভেদ নেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী অসৎ পথে সৎ লক্ষ্যে যাওয়া যায় না। তাই সত্যেন্দ্রবাবুর যে ধারণা কমিউনিজম লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোন পথে চলতে প্রস্তুত, তা ভুল ধারণা। যদি কেউ মার্কসবাদের নামে একথা প্রচার করেন যে লক্ষ্য সৎ বলে যে কোন দূষণীয় পথ গ্রহণযোগ্য, তিনি মার্কসবাদী নন।

স্বাতন্ত্র্যহরণের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এটা সত্যেন্দ্রবাবুর কাছে হাস্যকর শোনাচ্ছে। এর উত্তরে কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। তিনি কি বিশ্বাস করেন, সমাজে দুটো শ্রেণী আছে শোষক ও শোষিত? এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ না করলে তার শ্রেণীসত্তাই থাকে না, একথা কি তিনি স্বীকার করেন? তা যদি করেন, তাহলে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে, শোষকের স্বাতন্ত্র্যহরণ শোষিতদের স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যাবশ্যক। মার্কসবাদ যেহেতু শোষিতদের জন্য, সেই হেতু শোষকের স্বাতন্ত্র্যহরণ তার প্রথম কাম্য। সত্যেন্দ্রবাবু যদি বলেন, তিনি শোষকশোষিত ভেদ মানেন

না, বা শোষকশোষিত সহাবস্থানে তিনি বিশ্বাস করেন, তাহলে তাঁর সংগে আমার তর্ক নেই, কারণ তাঁর দেখা জগতের সংগে আমার দেখা জগতের কোন মিল নেই।

মার্কসবাদ নিষ্ঠুর ও মানবতাবিরোধী এটা সত্য, তবে সেই নিষ্ঠুরতা এবং মানবতাবিরোধী-ভাব মুষ্টিমেয় শোষকদের প্রতি প্রযোজ্যমাত্র।

কমিউনিজম এবং রেজিমেন্টেশনের সম্বন্ধ অংগাংগী নয়, এটাই মার্কসবাদ, আমার থিয়োরি নয়। ডেমক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজমের অর্থই তাই। ডিকটেটরশিপ অব দি প্রলিটারিয়েটের সংগেও রেজিমেন্টেশনের কোন সম্বন্ধ নেই। রাজনৈতিক দলের একনায়কত্ব একটি অস্ত্রমাত্র, যার সাহায্যে সর্বহারার একনায়কত্বে পেঁাছনো যায়, যার সাহায্যে সাম্যবাদে পেঁাছনো যায়। রাজনৈতিক দলের অর্থও একনায়কত্বের রেজিমেন্টেশন নয়। আমার সন্দেহ, সত্যেন্দ্রবাবুর এই শব্দগুলো সম্পর্কে ধারণা অস্বচ্ছ, তাই সব গুলিয়ে ফেলেছেন। অথবা, কয়েকটি দেশে যেভাবে সর্বহারার একনায়কত্ব চালানো হচ্ছে, তার অসম্পূর্ণতার জন্য মার্কসবাদকে বরবাদ করছেন। রাশিয়ায় স্ট্যালিন যেভাবে রেজিমেন্টেশন এনেছিলেন, তাই নিখুঁত মার্কসবাদ, এই সিদ্ধান্তে আসা অবৈজ্ঞানিক।

সর্বহারার একনায়কত্বে ভিন্নমতের কোন স্থান নেই, একথা মার্কসবাদী নয়। শোষকশ্রেণীর আনুকুল্যে কোনো মতের স্থান নেই, এই মাত্র। শোষকশ্রেণীর আনুকুল্যে কেউ যদি কাজ করেন তবে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। মানবতার নামে চোর-ডাকাতদের কেউ প্রশ্রয় দেন না, শোষকশ্রেণীকেই বা প্রশ্রয় দেওয়া হবে কেন?

বহু উদ্দেশ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য হরণ করা হয়েছে একথা সত্য। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার সময়ে, উপনিবেশ প্রসারের যুগে, নাৎসীদের সময়ে, স্ট্যালিনের সময়ে, মাওয়ের সময়ে। একথা ঠিক। কিন্তু কে কী উদ্দেশ্যে স্বাতন্ত্র্য হরণ করছেন, সেটা বিচার করাই আসল কথা। মার্কসবাদ যেহেতু শোষক শোষিত নির্বিশেষের জন্য নয়, শুধু শোষিতদের জন্যই, তাই শোষকের স্বাতন্ত্র্যহরণ মার্কস-বাদের পক্ষে কাম্য। উদাহরণের অন্যত্র একথা খাটে না, সেখানে শোষিতদের স্বাতন্ত্র্যহরণ করা হয়েছে শোষকদের জন্য। স্ট্যালিন বা মাওয়ের সময় যদি শুধু শোষকদের স্বাতন্ত্র্যহরণ হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিবাদের প্রয়োজন থাকে না। তবে স্ট্যালিন বা মাও যে সর্বত্র ঠিকপথে চলেছেন, সেকথা কেউ বলেন না। 'মানুষ স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টায় যে বন্ধুর পথ দিয়ে এসেছে তার পর সে আর ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে শোষক দলের আনুগত্য ভাববে না...অভাবে স্বভাব নষ্ট ততটা হয় না যতটা প্রাচুর্যে ও ক্ষমতার একাধিপত্যে হয়। সুতরাং নিত্যাপ্রিয় ঘোষিত ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপক্ষে ওকালতি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।'—সত্যেন্দ্রবাবুর এই সিদ্ধান্তে আমি যুক্তি বা অর্থের কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না।

যেমন যুক্তিহীন তাঁর কথা—'কমিউনিজম মানুষের কোন শাশ্বত চিরন্তন মূল্যবোধে অবিশ্বাসী। সেই জন্যই মার্কসবাদীরা মত ও পথের একাত্মতায় অবিশ্বাসী।' একটা থেকে আর একটায় লাফানো কীভাবে সম্ভব? আর মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল, এই মৌলিক তত্ত্ব আমি কোথায় অস্বীকার করে গেছি?

প্রত্যেকটি বামপন্থী পার্টির পেছনে লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থনের কথা আমি যে প্রসংগে বলেছি, সত্যেন্দ্রবাবু সেই প্রসংগের ইংগিত বুঝতে পারেন নি। এক লক্ষ লোকের সমর্থন থাকলেই যে কোন মত গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়। কিন্তু সমর্থন থাকলে তা কীজন্য আছে, তার বিচার প্রয়োজন। সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া বাস্তবতা নয়।

'বর্তমান যুগের দ্বন্দ্বের জন্য মার্কসবাদীর নবধর্মের অনজ্ঞেয়তা কম দায়ী নয়।' অনজ্ঞেয়তা অর্থ? যা জানা যায় না? মার্কসবাদ জানা যাবে না কেন?

নকশালী আন্দোলন কীভাবে বাংলাদেশের গোড়া ধরে টান দিয়েছে তা সত্যেন্দ্রবাবু বুঝতে পারেন নি। উত্তর বেশি বড়ো হয়ে যাবে, সুতরাং এ-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার করা সম্ভব নয়। সম্ভবত মাদ্রাজ থেকে সত্যেন্দ্রবাবু বুঝতে পারছেন না বাংলাদেশে কী ঘটছে। আর নকশালদের সংগে ঠগীদের তুলনা করে, তিনি আবার প্রমাণ করছেন, তাঁর দৃষ্টি ঘটনাতেই আবদ্ধ, উদ্দেশ্য তাঁর চোখের বাইরে।

'শতাধিক বৎসরের আলোচনার পর মার্কসবাদের পক্ষে নূতন কোন আলোকপাত আর সম্ভব

নয়।' এটা সত্যেন্দ্রবাবুর ধারণা। মার্কসবাদ গুরুবাদ নয়, মার্কসবাদ কেবল মার্কসের বাণী নয়। মার্কসবাদ একটি দিঙ্‌দর্শক, এর সাহায্যে প্রত্যেক দেশে নতুন নতুন মানুষ তাঁদের সমাজকে চিনতে, পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন। তাই মার্কসের পর লেনিন, লেনিনের পর মাও মার্কসকে নতুন-ভাবে প্রয়োগ করছেন। ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়া চলবে।

মার্কসবাদের অপপ্রয়োগ ঘটে মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত মানবতাবিরোধী প্রবণতার জন্য নয়, মার্কসবাদ বোঝা ও প্রয়োগে অসামর্থ্যের জন্য।

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের মূলে আছে তৎকালীন বিশ্বশক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ধুরন্ধর লেনিনের চতুরতা, মার্কসবাদের বিভূতি নয়—এই ধারণা অনেকের ছিল, আজকেও আছে। এঁরা রাশিয়ার ইতিহাস জানেন না, এবং বলশেভিক সাফল্যের অন্য কোন ব্যাখ্যা পান না বলে এই ধারণার আশ্রয় নেন। এ-বিষয়ে এত আলোচনা হয়েছে, সত্যেন্দ্রবাবু যদি সত্যই উৎসাহী হন, তাহলে যে কোন যুক্তি-আশ্রয়ী ইতিহাস পড়লেই এটা বুঝতে পারবেন।

সত্যেন্দ্রবাবুর কাছে, মার্কসবাদ আংশিক সত্যমাত্র। কোন্‌ অংশ সত্য এবং কোন্‌ অংশ মিথ্যা না বললে, অভিযোগের উত্তর দেওয়া মুশকিল।

সত্যেন্দ্রবাবুর মতে সাহিত্যিক মূল্যায়ন ব্যক্তিগত পছন্দ দ্বারা নির্ণীত। একথা স্বীকার করলে সাহিত্য সমালোচনা ব্যাপারটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

'মনোরম' ও 'মনোজ্ঞ' একার্থক নয়। একটি রমণের ব্যাপার, আর একটি জ্ঞানের ব্যাপার।

"চতুরঙ্গ"-এর পাঠক এবং লেখকেরা পাশবজীবন যাপন করেন কি না, সত্যেন্দ্রবাবুর এই অনুসন্ধিৎসা অপ্রাসঙ্গিক।

শেষ কথা। "গোরা"র উল্লেখ করে তিনি 'গুরুচণ্ডালী' দোষে দুষ্ট হবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আমার জিজ্ঞাসা, কে গুরু, কে চণ্ডাল? সম্ভবত, তাঁর সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই।

**নিত্যপ্রিয় ঘোষ**

**একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল**—সত্য গুহ। অধুনা। কলিকাতা। মূল্য ১৫·০০

"একালের গদ্য-পদ্য আন্দোলনের দলিল" গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেমন ব্যাপক, রচনার উদ্দেশ্যও তেমনি স্পষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথ অব্দি বাংলা গদ্য-পদ্যর যতোখানি যা আলোচনা হয়েছে খুবই দুঃখের যে রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশ বছরের লেখালেখির বেলায় ঠিক ততখানিই জুটেছে উদাসীন উপেক্ষা ও মর্মান্তিক নীরবতা। সামগ্রিকভাবে বাংলা গদ্য-পদ্যর পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই।' এ বিরাট গ্রন্থ সেই আলোচনার প্রয়াস—যা লেখকের নিজের কাছেই 'দুঃসাহস' মনে হয়েছে। সাঁতার না জেনে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যেও এক ধরনের দুঃসাহসিকতার পরিচয় থাকে; প্রয়াস আর পণ্ডশ্রমের মধ্যে তখন আর বিশেষ পার্থক্য করা যায় না। সত্য গুহর বৃহদায়তন দলিলটি পাঠ করে যদি কেউ অনধিকার চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন লেখককে—খুব অন্যায় করবেন বলে মনে হয় না।

গ্রন্থ পরিকল্পনার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। বিদেশী ভাষায় এই ধরনের প্রচেষ্টার নজির থাকলেও, আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। এমনও বলা যায়, সত্য গুহ একটি অনুভব্য প্রয়োজন পূরণের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কিন্তু, এই ধরনের বৃহৎ ও দুরূহ বিষয়কে নির্ভর ও ব্যবহারযোগ্য সার্থকতায় উন্নীত করার জন্য যে চর্চা, সাহিত্যবোধ ও গ্রহণক্ষম মানসতার প্রয়োজন, হয় তা লেখকের অনায়ত্ত ছিল, না হয় ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। ফলে তাঁর প্রয়াস হয়ে পড়েছে একদেশদর্শী এবং হঠকারী (মাঝে মাঝে অশালীন) উক্তিতে পূর্ণ একটি অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। এগুলি হতো না, বা এড়ানো যেতো, যদি চটপট মন্তব্য করার ঝোঁক বাদ দিয়ে লেখক প্রতিটি মন্তব্যকে তত্ত্ব ও তথ্য-নির্ভর প্রামাণ্যতায় নিয়ে যেতেন এবং কাউকে নস্যাৎ করার বা বাহবা দেবার অকারণ প্রবণতা ত্যাগ করে নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নিতেন। 'অকারণ' বলছি এই কারণে যে, অমুক ভালো এবং অমুক খারাপ, অমুকের এই লেখাটি পড়া যায়, অন্যটি কিছু নয়, ইত্যাদি মন্তব্য বইয়ের যত্রতত্র ছড়ানো; কিন্তু, কেন ভালো বা কেন খারাপ তার কোনো কারণ দেখানো হয় নি। এমনও মনে হতে পারে, গ্রন্থে উল্লিখিত লেখকদের রচনার সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটে নি এবং ঘটে নি বলেই তাঁর পরিচিত—অথচ গৌণ—অনেক লেখক আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছেন; এবং উপেক্ষিত হয়েছেন এমন অনেকে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য—যাঁদের রচনাকর্ম মৌল গবেষণার অপেক্ষা রাখে। পড়তে পড়তে ধারণা হয়, লেখক অসম্ভব দ্রুত এক দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন—কোনোরকম অনুশীলন ছাড়াই বইটি লিখে ফেলা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছিল।

দৃষ্টান্ত দিতে হলে প্রায় সম্পূর্ণ বইটিকেই উদ্ধার করতে হয়। এখানে শুধু কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল, যা থেকে লেখকের মানসিকতা ও বিচারপদ্ধতির মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে।

(১) '...বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও কল্লোলকালের কিছু লেখকের লেখার রেখাচিত্র দিয়ে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা

সমাপ্ত (?) করে নিজেকেই সম্ভবত তাঁর নিজের কালের এবং উত্তরসূরীদের সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্যকার বলে ঘোষণা (?) দিয়ে এন্তার লিখে যাচ্ছেন—ডাইনে বাঁয়ে কি লেখা হচ্ছে দেখছেন না; যাদের কৃপা করে দেখছেন তাদের ছিঁটেফোঁটা আশীর্বাদ দিয়ে 'দেশে' করে খাবার পথ করে দিচ্ছেন।...'

(২) '...সহজে হপ্তাখাটা উপন্যাস খাড়া করার জন্যে তিনি (সমরেশ বসু) একেবারে হাল আমলের কবি-লেখকদের লেখালেখি থেকে বিষয়, চরিত্র এবং এ্যাটিচিউড পর্যন্ত অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।...'

(৩) 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর মধ্যে দেখা গেছে একটা ফরাসী মানসিকতা ও বৈদগ্ধ্য। তিনি সর্বত্র প্রকৃতির একটা মাংসল উপস্থাপন ঘটিয়ে যৌনপ্রতীকে চিত্রিত করেছেন সবকিছু।...'

(৪) '...কার কতদূর স্থায়িত্ব কেউ বলতে পারে না। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছেন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, যুগান্তর চক্রবর্তী—আনন্দ বাগচীরা তো পিকচারেই নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তরুণ সান্যাল, সিদ্ধেশ্বর সেন, মানস রায়চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দত্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের অবস্থাও নিষ্প্রভ।...'

(৫) 'মেয়েছেলের মুখে খিস্তি নাকি বেশ ভালোই লাগে। আধুনিক মহিলা কবি কবিতা সিংহ নিশ্চিতভাবেই আধুনিকা। পুরুষ কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দ ভঙ্গিতে শব্দবোধে তথাকথিত মহিলাত্বের বাঁধন রাখেন নি!'

(৬) 'বাংলাদেশে সম্প্রতি যা কিছু লেখালেখি হচ্ছে সবই কি যৌন বা সিনেমা পত্রিকা বা তার স্বগোত্রীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর ভালো কাটতির জন্য নিছক জৈবিক আনন্দের উত্তেজক মাদকরস ঠাসা ছাপার হরফ? সবই কি অন্তঃসারশূন্য এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তমনস্কদের দিকে তাকিয়ে লেখা যৌনকেন্দ্রিকতা এবং নৈরাজ্যের সাহিত্য?...সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে রায় দেবার আগে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে সাহিত্য কোন্‌টা।...সাহিত্য পেতে হলে অবশ্যই বেমক্কাভাবে প্রকাশিত তরুণ লেখকদের মুখপত্র লিটল ম্যাগাজিনগুলো খুঁজে পেতে পড়তে হবে। সেগুলোর মধ্যেই প্রকাশিত রয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্য।...'

(৭) 'একটা সময় গেছে যখন তরুণ সাহিত্য আন্দোলনকে স্রেফ চেপে দেবার চেষ্টা হয়েছে। সমালোচকরা যেমন এসব লেখা সম্পর্কে 'টু-টা রা' করেন নি, তেমনি এস্টাব্লিশমেন্ট নিজেদের মুনাফা বাঁচাতে গিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকে সচেতনভাবে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছে, এর ওপর প্রচুর নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছে এবং তরুণ লেখকদের 'দোল সংখ্যায়' ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছে।......এস্টাব্লিশমেন্ট যখনই দেখেছে, এই সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে থেকে সত্যিকারের ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু কবি ও গদ্যকার আত্ম-প্রকাশ করেছেন, তখনই আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্যে সেইসব লেখকদের কিনে নেবার চেষ্টা করেছে।'

(৮) 'এস্টাব্লিশমেন্টের কর্তারা বই পড়ার বড় রাস্তায় 'নীললোহিত' 'রূপচাঁদ পক্ষী'র খেয়োখেয়ির তামাশা দেখতে দেখতেই কব্জা-করতে-না-পারা ক্রুদ্ধ-ক্ষুধার্ত সাহিত্যধারার পাশে নষ্ট এবং ভেজাল খাদ্য কাঁচের আড়ালে দাঁড় করিয়ে এটা-

সেটা পুরস্কারবিজয়ী লেখকদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো সাক্ষীর বুলি কইয়ে নিয়েছে।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠক—অন্তত আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের মোটামুটি পরিচয়ও রয়েছে—বুঝতে পারবেন, উপরোক্ত ভাষা ও চিন্তাধারা থেকে কোন্ বস্তুর জন্মদান সম্ভব! মন্তব্য আছে, নেই যুক্তি বা বিশ্লেষণ, পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা আছে, নেই সজ্ঞান অনুভূতি—এমনকি রুচিও নেই। কিছু না-থাকা থেকে এতো বড়ো এক-খানা বই লিখে ফেলা দুঃসাহস বইকি!

এক নম্বর উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকর্মের ব্যর্থতা বা দুর্বলতার (যদি কিছু থাকে) দিকে দৃকপাত না করে সোজাসুজি তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুৎসা করার চেষ্টা করেছেন লেখক কিছু কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অনুযোগ উপস্থাপিত করে। ভিত্তিহীন, কিন্তু অকারণ যে নয়—সেটা বোঝা যায় উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তিটিতে এসে।

দু' নম্বর উদ্ধৃতিটি সমরেশ বসু সম্পর্কে। উক্তির সপক্ষে অবশ্য তিনি খ্যাত, অখ্যাত কয়েকজন তরুণ লেখকের রচনা উদ্ধৃত করেছেন—এবং এমন পদ্ধতিতে, যা অনুসরণ করলে আজকের কোনো কোনো লেখকের রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথকেও অনুকারক প্রমাণ করা যায়। যদিও বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। যদিও উদ্ধৃত ও তুলনামূলক অর্থে ব্যবহৃত রচনাগুলির কোনো কোনোটির মৌলিকতা ও গদ্যভঙ্গির উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহের কারণ থেকে যায়। তিন নম্বরে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী?) মধ্যে গ্রন্থকার লক্ষ্য করেছেন 'ফরাসী মানসিকতা ও বৈদগ্ধ্য' এবং মন্তব্যটিকে বিশ্লিষ্ট করেছেন পরবর্তী পংক্তিতে। ফরাসী মানসিকতা ও বৈদগ্ধ্য কি 'প্রকৃতির একটা মাংসল উপস্থাপনা ঘটিয়ে যৌনপ্রতীকে চিত্রিত' করা? বা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যকর্মের সব তাৎপর্য ধরা পড়ছে ওই মন্তব্যে? পাণ্ডিত্য প্রকাশের এ-রকম হাস্যকর দৃষ্টান্ত বইটির পাতায় পাতায় ছড়ানো। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই, তেমনি লাভ নেই লেখকের চার ও পাঁচ নম্বরে উদ্ধৃত মন্তব্য বিষয়ে গবেষণা করে।

কিছু বক্তব্য তবু থেকে যায় ছয়, সাত এবং আট নম্বর উদ্ধৃতি বিষয়ে। এই পর্যায়ে 'এস্টাব্লিশমেন্ট' নামে একটি প্রতিপক্ষ খাড়া করে গ্রন্থকার যথেচ্ছ বিষোদ্গার করেছেন (এ-ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অনেকটা নির্বাচনের ভোটপ্রার্থীর মতো অসুস্থ ও ক্লিন্ন) এবং সাফাই গেয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনগুলির পক্ষে। যে-কোনো ভাষার সাহিত্যেই লিটল ম্যাগাজিন একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যতোদূর মনে হয়, লিটল ম্যাগাজিন ও তথাকথিত ব্যবসায়িক পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্যের প্রভেদ এতো দুস্তর যে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কোনো কারণ নেই। বলা বাহুল্য, একটির উদ্দেশ্য অন্যটি কোনোভাবেই পূরণ করতে পারে না; বিষয় ও রুচিভেদে এদের পাঠকগোষ্ঠীও ভিন্ন হতে বাধ্য। যে-কোনো কারণেই হোক, সত্য গুহ উভয়ের মধ্যে একটি খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন—সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আবহাওয়া তাঁকে অনুরূপ চিন্তার সুযোগ দিয়েছে। 'এস্টাব্লিশমেন্ট' বিষয়ে তাঁর ধারণা অবশ্য কোনো দার্শনিক তত্ত্বনির্ভর নয়, বরং কাকতালীয়। ফলে, উদ্ধৃত মন্তব্য-গুলি থেকেই বোঝা যাবে, এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে স্পষ্টবাক হবার প্রবণতায় পরোক্ষে লিটল ম্যাগাজিন তথা তরুণ 'গদ্য-পদ্য' লেখকদের দৈন্য ও দুর্বলতাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। এ-চিন্তা একবারও তাঁর মাথায় আসে নি যে এস্টাব্লিশমেন্ট কোনো হঠাৎ-উদ্ভূত ব্যাপার নয়, বা তরুণ লেখকরাও নিতান্ত শিশু নন, যে তথাকথিত এস্টাব্লিশমেন্ট তাঁদের ধরে ধরে খাঁচায়

প্নরবেন! এস্টাব্লিশমেন্ট কোনো কোনো অর্থে এ'দেরই সৃষ্টি—খ্যাতি ও অর্থলিপ্সাহেতু এ'দের ধর্ম বিসর্জনের, নির্লজ্জ আত্মদানের ফল। এ-চিন্তা তাঁর মাথায় এলো না যে, লেখার চরিত্র পালটান লেখক নিজে—পত্রিকা বা এস্টাব্লিশমেন্ট নয় এবং লেখক চরিত্রভ্রষ্ট হন নিজ দায়িত্বে। এটা ঠিক, বাংলা ভাষার সাহিত্যে বর্তমানে একটা অসুস্থতার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সন্দেহ হয়, লিটল ম্যাগাজিনগুলি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে পারলে হয়তো এই দুরবস্থা সম্ভব হত না। একদা 'সবুজপত্র', 'পরিচয়' বা 'কবিতা' যা পেরেছিল, বা শেষাবধি 'কৃত্তিবাস'—ইদানীং কোনো খুদে পত্রিকাই তা পারছেন না। তাঁরা ছড়িয়ে পড়ছেন, সমষ্টি ও শিল্পের স্বার্থ থেকে প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছেন ব্যক্তিস্বার্থে। বর্তমানে এতো যে খুদে খুদে কাগজ বেরুচ্ছে, তা কি শুধুই সৃজনশীলতার তাগিদে? না কি এর মর্মে আছে আরো গূঢ় কোনো কারণ: আত্মপ্রকাশের চেয়ে বেশি আত্মপ্রচারের তাড়না এবং উপলব্ধির চেয়ে বেশি অপরকে অন্যায়ভাবে অস্বীকারের ইচ্ছা! যদি তা না হয়, তাহলে এ বিশ্বাস রাখা ভালো যে সৎ ও প্রকৃত সৃজনশীল রচনাকর্ম স্বীকৃতি পাবেই। পাবে ইতিহাসের নিয়মে।

দিব্যেন্দু পালিত

**ঠগী কাহিনী**—ফিলিপ মেডোস টেলর। সুবর্ণরেখা। কলিকাতা ৯। মূল্য ১৫·০০ টাকা।

কিছুকাল আগেও বর্গীর ভয় দেখিয়ে দুরন্ত শিশুদের ঘুম পাড়াতেন বাংলাদেশের মায়েরা। ঠগীদের নাম কিন্তু তাঁদের মুখে কখনোই শোনা যেত না; যদিও বর্গী ও ঠগীর বিভীষিকা তাঁদের অন্তিমদশায় একই সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অকস্মাৎ আক্রমণ করে, গ্রাম নগর জ্বালিয়ে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিত বর্গীরা। উদ্দেশ্য লুটপাট। একই উদ্দেশ্যে ঠগীরা মানুষ খুন করতো। কিন্তু তাদের পদ্ধতি ছিল পৃথক। আপাতদৃষ্টিতে ধনী পথিক, বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা তাদের 'বুনিজ' বা শিকার হলেও, দরিদ্র পথচারী, এমনকি ভিক্ষুক পর্যন্ত তাদের হাত থেকে নিস্তার পেত না। সুপরিকল্পিত, নির্মম একটি হত্যার নিদর্শন লোপ করতে গিয়ে আরও অনেক হতভাগ্যকে খুন করতো ঠগীরা। উৎকোচ দিয়ে, কৃপা প্রার্থনা করে বর্গীর হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু ঠগীরা যাদের 'বুনিজ' বলে স্থির করতো তাদের নিস্তার ছিল না কিছুতেই। সরীসৃপের মতো ঠাণ্ডা প্রাণের এই দস্যুদের নাম মুখে আনতেও বোধহয় ভয় পেতেন বাংলাদেশের মায়েরা।

এই ঠগীদের দমনে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব যাঁদের সেই ইংরেজ শাসকেরা কিন্তু চুপ করে থাকেন নি। শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও ঠগী দমনের নায়ক ক্যাপ্টেন শ্লীম্যানের নাম কীর্তিত হয়েছে। ঠগী নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন তাঁরা ভারতবর্ষকে; ঠগীদের ইতিহাস, কার্যকলাপও আমরা জানতে পারি কয়েকজন ইংরেজ লেখকের রচনা থেকেই। Edward Thornton-এর *Illustrations of the History and Practices of the Thugs* (London, 1837), Sir William Sleeman-এর *The Thugs or Phansigars of India* (Philadelphia, 1839) এবং Philip Medows Taylor-এর *Confessions of a Thug*, 1839, ঠগী সম্পর্কে আকর-গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ফিলিপ মেডোস

টেলরের বইটি অবশ্য একটু ভিন্ন প্রকৃতির। অসাধারণ লিপিকুশলতা ছিল তাঁর (যা তাঁকে পরবর্তীকালে The Times পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেছিল); বিশুদ্ধ ইতিহাস রচনা না করে ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখারই প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি। পাঠকের তাতে অবশ্য ক্ষতি না হয়ে লাভই হয়েছে বেশি। ঠগী সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের সঙ্গে একটি উপন্যাস পাঠের আনন্দও পাওয়া যায় তাঁর বই থেকে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ঠগীদের উৎপাত হয়েছে বলে জানা গেলেও অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঠগীরা হত্যা এবং লুটপাট চালাতে থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ছিল এই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে অতিগূঢ় কোনও অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্যই ঈশ্বর বা আল্লা ঠগীদলের সৃষ্টি করেছেন। বিজয়া দশমীর দিন ভবানীর শুভ ইঙ্গিত ও আদেশ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঠগীরা ছড়িয়ে পড়তো বিভিন্ন অঞ্চলে। অসন্দিগ্ধ পথিকদের নানা ছলচাতুরীর সাহায্যে নিজেদের আয়ত্তে এনে কিভাবে সামান্য এক-টুকরো রুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হতভাগ্য শিকারকে হত্যা করতো এবং নিহতদের কবর দিয়ে হত্যার চিহ্ন লোপ করতো তা বোধহয় সকলেরই জানা। বছরের বাকি সময়টুকু নিজের নিজের গ্রামে আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিত হয়ে ঠগীরা আপাত নিরীহ জীবন যাপন করতো। এ সময়ে তাদের স্বরূপ চিনতে পারা প্রায় অসম্ভব ছিল। ফলে প্রায় নিরুপদ্রবেই তাদের লুণ্ঠনাভিযান চলতো। বলা বাহুল্য সারা দেশের অরাজক অবস্থা, রাজনৈতিক পটভূমির অতিদ্রুত পরিবর্তনজনিত বিশৃঙ্খলা সহজতর করে দিয়েছিল ঠগীদের অভিযান। কোনও কোনও অঞ্চলের শাসক বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করেছেন এদের দমন করতে; ধরা পড়লে নির্মম, গা-শিউরে-ওঠা শাস্তি বরাদ্দ ছিল এদের জন্য। তবুও দমন করা যায়নি এদের। বংশপরম্পরায় এ ব্যাবসা চলায় অতিসতর্ক ঠগীরা তাদের হত্যালীলার পর্বে পর্বে অসাধারণ নিপুণতা অর্জন করেছিল। উপরন্তু গ্রামের শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষক পেটেল ও দফাদারেরা ঠগীদের অর্থে বশীভূত ছিল। এমনকি অনেক জমিদার, ছোটখাট রাজাও একই কারণে এদের সহ্য করতেন। কাজেই 'ভবানীর আদেশ' নিরুপদ্রবেই পালিত হতো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন বিস্তৃততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠগীদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ১৮৩৫ খৃঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক-সৃষ্ট ঠগী ও বর্গী দমন বিভাগে জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন ডবলিউ. এইচ. শ্লীম্যান। ঠগীদের সহজে অভিযুক্ত করার জন্যে একটি বিশেষ আইন পাশ করা হয় ১৮৩৬ সালে। তারপর শ্লীম্যান সাহেব ও তাঁর সহকারীদের অক্লান্ত, অকুতোভয় ও ব্যাপক চেষ্টায় ধীরে ধীরে অসংখ্য (১৮৩৭ সালের মধ্যে ৩,২৬৬ জন) ঠগী ধরা পড়ে। ধৃত আসামীদের জবানবন্দী থেকে আরো অনেক আসামীর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঠগী সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হয়।

মেডোস টেলরের "ঠগী কাহিনী" থেকেও এইসব তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর কাহিনীর নায়ক অতি সুপুরুষ, আচার-আচরণে অতি সম্ভ্রান্ত আমির আলি ৭০০ নরহত্যার গৌরবে গর্বিত। আমির আলির স্বীকারোক্তি থেকে তার শৈশবকাহিনী, ঠগীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, প্রথম নরহত্যা, সুন্দরী নর্তকী জোহরার প্রেম ও প্রবঞ্চনা, আমিনার সঙ্গে বিবাহ এবং একের পর এক প্রতিরোধহীন হত্যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। কিছুদিনের জন্য পিণ্ডারী সর্দার চিতুর অধীনে দস্যুবৃত্তির কথাও লিখেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ঝালোনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতের বহু নিভৃত নিরাপদ অঞ্চল আমির আলি ও তার অনুচরদের

'বুনিজে'র কবরে ভরে উঠেছে। এই নির্মমতার, অনেক সময়ে অতি সামান্য অর্থের জন্য এই নিষ্ঠুর হত্যার, মনে হয় কোনও প্রতিকার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু ঠগীরা তাদের এই ঘৃণ্য ব্যবসার কথা আপন স্ত্রীপুত্রদের কাছেও গোপন রাখতো। শেষ পর্যন্ত আমির আলির জীবনও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তার পালক পিতার শোচনীয় শাস্তি ও মৃত্যু, তার গোপন ও পাপ ব্যবসার কথা জানতে পেরে স্ত্রী আমিনার আত্মাহুতি এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজের হাতে ধরা পড়া। আমির আলির বহু বিচিত্র অভিযানকে কেন্দ্র করে টেলর সাহেবের এই কাহিনী ইংলন্ডে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯১৬ খৃঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এই বইখানিকে World's Classics গ্রন্থমালাভুক্ত করেন।

অসংখ্য পাঠকের মনোরঞ্জন ও জনপ্রিয়তা অর্জন ছাড়া মেডোস টেলরের বই আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিল। সেটি রাজনৈতিক। ঠগী অত্যাচারের জন্য ভারতবর্ষীয় সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না করলেও, অতিদক্ষ রাজকর্মচারী মেডোস টেলর এ দেশের রাজন্যবর্গকে ও দেশীয় রাজকর্মচারীদের অপদার্থতা, অর্থগৃধ্নুতা, কর্তব্যে উপেক্ষা—এককথায় নৈতিক অধঃপতনকে এই ব্যাপক ও শতাব্দীদীর্ঘ কলঙ্ককে টিঁকিয়ে রাখার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। আরো অনেক ব্যর্থতার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমার অযোগ্য এই ত্রুটি যে ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রসার অপ্রতিরোধ্য ও প্রায় সর্বজন-কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছিল—এ মতবাদ টেলর সাহেবের বইয়ে স্পষ্ট যদিও তা অনুচ্চারিত।

ঠগী কাহিনীর বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। ১৯৬৮ খৃঃ বর্তমান সংস্করণটি ছাপা হয়। অনুবাদকের নামের কোথাও উল্লেখ নেই। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রথম অনূদিত হয়েছিল এ কথা স্মরণে রাখলে অনুবাদের সামান্য কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা ক্ষমা করা যায়। তাছাড়া এই কাহিনী এতই লোমহর্ষক এবং অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনাবহুল যে ভাষার সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি মনেই থাকে না। প্রথম পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পাংশের প্রতি আকর্ষণ পাঠকের অটুট থাকে।

**নির্মল দত্ত**

**ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়**— শিবশম্ভু পাল। সাহিত্যপত্রগ্রন্থ। ৯, কাশী ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা।

শিবশম্ভু-র কাব্যচর্চার সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত তাঁর কবিতা আমি বহুকাল থেকেই দেখে আসছি। বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো ধারণা কাগজে-কলমে পূর্ণাকৃতি পাওয়ার সুযোগ পায় নি। এতকাল শিবশম্ভু পালের কবিতার কোন নির্ভরযোগ্য সংকলন ছেপে বেরয় নি।

প্রথমেই "ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়" গ্রন্থের 'তোতনের জন্য কবিতা'র [ ৩৮ পৃঃ ] নীচের অংশটির উদ্ধৃতি দিলাম; মনে হয় এ থেকেই শিবশম্ভুর সাম্প্রতিক কবি-চরিত্র স্পষ্ট হবে—

কে এমন বিস্ফোরণ শব্দহীন ইতিহাসহীন
কে এমন অস্ত্রহীন দিগন্তসীমার
ফুলের আগুনে দীর্ঘ শতাব্দীর অমল শুদ্ধতা

কী প্রবল শক্তি ধরে আমাকে উপড়ে নিল নকল মাটির থেকে, আমি
সহজ হাওয়ার মধ্যে দলগুলি মেলে দিতে পারি।

এই যে—'আমাকে উপড়ে নিল নকল মাটির থেকে' আর তারপরই—'আমি সহজ হাওয়ার মধ্যে দলগুলি মেলে দিতে পারি', এমন সব অকপট উক্তির মধ্যে কবির জীবন সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার চেহারাটা স্পষ্ট হতে পারে। আর এমনই অকৃত্রিম স্পষ্টোক্তির পাশাপাশি রাখা যেতে পারে এই তিন ছত্র—

মননের ঝাঁজালো ওষুধে
কাজ হয় না আজকাল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্ষয়ে যায় চটি।
সব নাও রেখে দিও শুধু গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডটি।

পাঠক হিসেবে স্বভাবত এই আত্মজিজ্ঞাসায় কাতর হই—নকল মাটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সহজ হাওয়ার মধ্যে দলগুলি মেলে দিতে পারার আনন্দের তীব্রতা কেন এত বেশি? মননের ঝাঁজালো ওষুধে কেন এমন অতৃপ্তি? দৈনন্দিন বাঁচায় কৃত্রিমতা কি বড় বেশি জায়গা জুড়ে আছে? মননের চাপে কি জীবনের সহজ স্নিগ্ধ হৃদয়গ্রাহ্য ধারাটি খুব বেশি কোণ-ঠাসা? শিবশম্ভু পালের একেবারে প্রথম দিককার, এমনকি তার পরেও, কবিতার কথা মনে রাখলে, তাঁর ইদানীংকার কবিতার বক্তব্য পরিষ্কার হতে পারে। তাঁর প্রথমদিকের কবিতার বক্তব্য কম-বেশি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বক্রোক্তিনির্ভর ছিল। তা থেকে তাঁর বর্তমান রচনাসমূহ বহুলাংশে মুক্ত হওয়ায় তা নিজস্ব আকৃতি পাওয়ার একটা পথ সন্ধানের চেষ্টায় আছে।

কাব্যদক্ষতা শিবশম্ভুর স্বভাবেই ছিল বরাবর, তার সঙ্গে তাঁর বর্তমানের মেজাজের হস্তক্ষেপে এমন সব উল্লেখ্য পংক্তির নজির মেলে এই কাব্যগ্রন্থে

পাতার মর্মরধ্বনি ফিরে আসে বারবার শ্রুতির দুয়ারে
বক্ষোদেশ শব্দময় হিল্লোলিত ফসলের ক্ষেতের মতন।
অগাধ আনন্দ জাগে। প্রিয়তমা, মাঝে মাঝে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে
তীব্রতর বনফুল প্রতিধ্বনি করে : ওগো তুমি
কখনো মরার নাম মুখে আনবে না

অথবা

বিশ্বাস করুন আপনি, শবযাত্রা দেখলে আমি এড়িয়ে এড়িয়ে যাই, ভয়।
কিছুতেই মৃতদেহ সহ্য করতে চোখে দেখতে পারি না। একবার
কোন এক যুবতীর চন্দনচর্চিত দেহ আড়চোখে দেখে
সারা অঙ্গে শিউরে উঠেছিলাম।
আমার কানের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে হরিধ্বনি উত্তুরে হাওয়ার শীত এনে দিয়েছিল
বজ্রের মতন শব্দে ফেটে গিয়েছিল
সাংঘাতিক শব্দহীনতায়।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থের একমাত্র দীর্ঘ কবিতা 'ভালোবাসার সংজ্ঞা', অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতার তুলনায়, নামে মনোলোভা হলেও কার্যত তেমন কিছু দিতে পারে নি। বরং ক্ষুদ্র কবিতাবলীর গঠনে ও প্রকৃতিতে শিবশম্ভুর বাকধারা বা শিল্পপদ্ধতি বেশি আত্মক্ষমতানির্ভর। উল্লিখিত কবিতার পঞ্চমাংশের পঠনকালে বিষ্ণু দে বড় বেশি সামনে এসে দাঁড়ান। অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে তো বটেই; বিশেষত তৃতীয় স্তবকে, যার শুরুতে পাই

তন্বী, তোমার আপন বলতে কিছু নেই কিছু নেই

কোন বাক্যাংশ বা এমনকি সম্পূর্ণ বাক্যের ওপরে হয়তো কোন কবিতার আংশিক সাফল্যও নির্ভর করে না, তবু অনেক সময় অনেক কবিতার বুনিয়াদ, মনে হয়, এমনই সব অর্ধ-বাক্য বা অসম্পূর্ণ উক্তি, অর্থাৎ সমগ্র কবিতাটি দাঁড়িয়ে আছে সোজাসুজি এদেরই ওপর। এ কাব্যগ্রন্থ থেকে দুয়েকটি নজির তুলে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা যেতে পারে

শিশুর চোখের মতো পৃথিবীর কল্প প্রতিনিধি
ইস্কুল পালাতে রোজই প্রণোদিত করে [ পৃ ১০

বা

সারাদিন জুতো পরে আসা যাওয়া করে গেছে অনেক মানুষ
এবার মেঝেটা ঝাঁট দাও [ পৃ ২৫

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষ ৩২ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭

# নিজের দর্পণে

দেবীপদ ভট্টাচার্য

আত্মচরিত বা আত্মজীবনী শব্দ দুটি Auto-biography শব্দের অনূদিত রূপ। অভিধান থেকে জানা যায় উক্ত ইংরিজি শব্দটি উনিশের শতকের গোড়ায় অর্থাৎ ১৮০৯ সালে প্রথম সংকলিত হয়। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আত্মজৈবনিক সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন নয়। যদিচ তার নাম ছিল পৃথক। সেন্ট অগাস্টিনের 'কনফেশনস্' (খৃষ্টপর পঞ্চম শতক) আজ পর্যন্ত আত্মচরিত হিসাবে বরণীয় গ্রন্থ। খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বমতে মানুষের জন্ম 'আদি পাপ' থেকে। মর্ত্যের নর-নারী তাই 'পাপী'। তার 'স্খলন-পতন-ত্রুটি' একমাত্র ঈশ্বরই ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন, তারজন্য প্রয়োজন হবে অনুতাপের ও প্রায়শ্চিত্তের। এখানে বলা দরকার "ইন্‌ফার্নো"র যে ভয়াবহ বর্ণনা মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) তাঁর "দিভাইনা কম্মেদিয়া" কাব্যে বিবৃত করেছেন তার সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্র থেকে, খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র থেকে নয়। যদি খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে Hell বা নরকের অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকৃত হয়নি। ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করা এবং আদম ও ঈভের 'শয়তানে'র প্রলোভনে ধরা দেওয়ার প্রকৃত অর্থ হল ঈশ্বরের সঙ্গে আদি-মানুষের বিচ্ছেদ। আদম ও ঈভের সন্তান মর্ত্যবাসী নরনারী, খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসারে তাই তারা হারিয়ে ফেলেছে সেই দিব্যজীবন 'super-natural life of sanctifying grace'.

খৃষ্টধর্মে প্রত্যয়বান্ কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ (১৮১২-৮৯) লিখেছেন :

'Tis the faith that launched point blank its dart
At the head of a lie; taught Original Sin,
The corruption of man's heart.

খৃষ্টধর্মমতে 'Faith' হল পরিত্রাণের পথ। অনুতাপে, অনুশোচনায় যে দুঃখের দহন, তাই ফিরিয়ে নিয়ে আসে মানুষকে বিশ্বাসের ভূমিতে, তার শুষ্ক জীবনে তখন নামে করুণা (grace)-ধারা। নর-নারী তখন উন্নীত হয় ঈশ্বরসান্নিধ্যে অর্থাৎ বিচ্ছেদ থেকে মিলনে।

অগাস্টিন সরে গিয়েছিলেন ঈশ্বরনির্দিষ্ট পথ থেকে। কার্থেজ শহরে পাঠ্যাবস্থায় তিনি হীন আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার পড়েন—ভুলে যান ঈশ্বরের নির্দেশ,

ধর্মশাস্ত্রের আহ্বান। পরে মাতা সোনিকা ও গুরু সেন্ট অ্যামব্রোসের উপদেশে তিনি পূর্ব-পথ পরিত্যাগ করেন, নতজানু হন ঈশ্বরের উদ্দেশে। তাঁর চিত্তলোকের এই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের স্তরগুলি নির্বাচিত ঘটনার সাহায্যে অবিস্মরণীয় রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে উপনীত হবার অন্তর্-যাত্রা অগাস্টিনের গ্রন্থে দীপ্যমান হয়ে আছে। কী গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতায় তাঁর অন্তর্-লোক উদ্‌বেলিত হয়েছিল তার ঈষৎ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল :

O let the Light, the Truth, The Light of my heart, not mine own darkness, speak unto me. I fell off into that and became darkened; but even thence, even thence, I love Thee.

'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মন্ত্র অগাস্টিন যেন উচ্চারণ করছেন। অগাস্টিনের পনের শো বছর পরে বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে একজন ইংরেজ কবি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিলেন :

To Carthage then I came
Burning burning burning burning
O Lord Thou pluckest me out!

অগাস্টিনের কাছে কার্থেজ প্রতিভাত হয়েছিল পাপনগরী রূপে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে টি. এস. এলিয়টের দৃষ্টিতে তাঁর জগৎকে মনে হয়েছিল পাপপূর্ণ। তিনিও তাঁর পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন অগাস্টিনের মতো। তিনি যেন পাতালের অন্ধকার থেকে উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 'O Lord, thou pluckest me out!'

রেনেসাঁস চতুর্দশ শতকের ইতালিতে নিয়ে এল প্রবল জীবন-সম্ভোগ। পাপের দুর্দহনের কথা, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কথায় মানুষ কান দিতে চাইল না। আসলে এ যুগ মূলত হল কলিংউডের ভাষায় ইহলোকমুখিতার যুগ। উদ্দাম জীবন-পিপাসাকে রুদ্ধ করার মধ্যযুগীয় শাস্ত্রনির্দেশ মানুষ অমান্য করল। এমন এক যুগ দেখা দিল ঐতিহাসিকের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'when Art and Crime were equally glorious'—সেলিনির (১৫০০-৭১) আত্মচরিতকে এই মন্তব্যের সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'কন্‌ফেশন্'-ধর্মী আত্মচরিত ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে সেই পেত্রার্কের (১৩০৪-৭৪) হাতে যিনি অভিহিত হয়েছেন 'The firist modern man' নামে। পেত্রার্কের *Letter to Posterity* (1351) সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, অগাস্টিনের দৃষ্টি সেখানে অনুপস্থিত। অবশ্য পেত্রার্কের 'জীবনের ধ্রুবতারা' লরার কথা এখানে খুব কমই বলা হয়েছে, যদিও তাঁর সনেটগুলিতে সেই রাগরক্ত হৃদয় উদ্‌বারিত।

ষোড়শ শতকে সেলিনি-র আত্মচরিত (রচনাকাল ১৫৫৮-৬৬) যার উল্লেখ ঈষৎ-পূর্বে করা হয়েছে ও যে গ্রন্থের গুণমুগ্ধ ছিলেন স্তাঁদাল এবং কার্দানো-র *Book of My Life* ইতালীয় রেনেসাঁসী জীবনধারার নানা দিককে তুলে ধরেছে। সেলিনি রূপদক্ষ, কিন্তু এই বিস্ময়কর শিল্পীর পক্ষে নরহত্যা করতেও বাধে না—এই স্ববিরোধ কার্দানোর ক্ষেত্রেও। তবে এ ধারা অগাস্টিনের কন্‌ফেশনের নয়। অগাস্টিনের ধারা লুপ্ত হয় না, হতে পারে না—কেননা খৃষ্টধর্ম মরেনি, পাপবোধ মানুষের মন থেকে লুপ্ত হয়নি। ঈশ্বর-সন্ধান বা *Pilgrim's Progress* স্তব্ধ হয়নি।

দ্বাদশ খণ্ডে বিধৃত রুশোর (১৭১২-৭৮) আত্মচরিত "কন্‌ফেশন্‌স" নামে অগাস্টিনের

সগোত্র কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নয়। রুশো তাঁর আত্মচরিতের শুরুতে লিখেছেন :

I mean to present my fellow-mortals with a man in all the integrity of nature; and this man is myself. I know my heart, and have studied mankind; I am not made like anyone I have been acquainted with, perhaps like no one in existence; if not better, I at least claim originality ...with equal freedom and veracity have I related what was laudable or wicked, I have concealed no crimes, added no virtues,

এই ঘোষণা আত্মচরিতসাহিত্যের দিক থেকে স্পর্ধিত ও অভিনব। রুশোর আত্মকথা উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক। সবচেয়ে কৌতূহল-জাগানো প্রসঙ্গ হল, মাদাম দ্য ওয়ারেনস্-এর সঙ্গে রুশোর বিচিত্র অদ্ভুত সম্পর্ক, বয়সে বারো বছরের বড়ো এই 'সুন্দরী সচ্ছল' ক্যাথলিক মহিলা রুশোর কাছে হয়ে উঠেছিলেন 'more to me than a sister, a mother, a friend or even than a mistress and for this very reason she was not a mistress; in a word I loved her too much to desire her.'— ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বা লরেন্সের "সন্স অ্যান্ড লাভার্স"-এর পদধ্বনি এখানেই শোনা গেছে। এই বইটিতেও পাপের স্বীকৃতি, যন্ত্রণা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয় কিন্তু সে পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, নিজেরই সত্তার বিরুদ্ধে। এখানে তিনি আধুনিক, মধ্যযুগীয় নন। পাশ্চাত্ত্য আত্মচরিত রচনার দুটি মূল ধারা, কনফেশনাল্ ও সেক্যুলার—তাদের জন্মকথার আভাসমাত্র দেওয়া হল।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে কবিরা তাঁদের বংশপরিচয়, ব্যক্তি-পরিচয় দিয়েছেন। এ রীতিটি তাঁরা সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাছাড়া পাণ্ডুলিপির যুগে পুথির কপিরাইট রাখবার দরকার ছিল। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, রূপরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কাব্যে এই রীতি বেশি দেখা যায়।

অন্তর্দাহ থেকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পাপ-স্বীকৃতি থেকে পাশ্চাত্ত্যে আত্মচরিতের জন্ম হয়েছিল। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) খৃষ্টধর্মতত্ত্ব ও সাধনার ঠিক বিরোধী ছিলেন না, মিশনরিদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে তিনি রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁর ব্রাহ্ম-ধর্মে বা নির্দেশে খৃষ্টীয় পাপতত্ত্ব দেখা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) কোন-রূপ অবতারত্ব মানেননি। ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টমত প্রবেশ করে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে। রাজনারায়ণ বসুর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় একই ফরাসের দুই বিপরীত প্রান্তে বসে দেবেন্দ্রনাথ পড়ছেন উপনিষদ ও কেশবচন্দ্র বাইবেল। দৃষ্টিভঙ্গিগত এই বিরোধ পরে ব্রাহ্মসমাজের ভাঙনের কারণ হয় এবং কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৬ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' গঠন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞান পাঠ করলেও তাঁর প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মধর্ম মূলত উপনিষদভিত্তিক, যদিচ তার মধ্যে মিশেছিল মহানির্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র, কখনো বা স্ব-সংশোধিত কোনো শ্লোক। তিনি ফরাসী ব্রহ্মবাদী কুঁজা বা ফেনেলোঁ-র ঈশ্বর-সংজ্ঞা গ্রহণ করলেও খৃষ্টীয় পাপতত্ত্ব, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তকে স্বীকার করেন নি। দেবেন্দ্র-নাথের বক্তব্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

'বিদেশীরা এবং তাহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত

ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। তাঁহাকে যথার্থ ভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। ...যদি বলি অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয় তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্যধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে।' [ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী ১৩শ খণ্ড, ৩৫৯-৬০ পৃঃ]

অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁর একুশ বৎসরের বিলাসী যৌবনে মৃত্যুপথযাত্রিনী 'দিদিমা'র (পিতামহী) সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়ে এক নির্জন সন্ধ্যায় বালিতে চাঁচের উপর বসে বৈরাগ্যবহ 'অভূতপূর্ব আনন্দ' বোধ করেছিলেন। স্বীকার করেছেন "এতদিন আমি আমোদে ডুবিয়া ছিলাম"—এখানে যেন অগাস্টিনের কথাই শোনা যায়। তবে কেশবচন্দ্র সেন যেভাবে বলেছেন সেভাবে বলা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' (১৮৮২ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা) গ্রন্থে পাই :

'পাপবোধ আমার অনেক প্রবল; অনেক জীবনে এত প্রবল নয়। পাপ কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া আমার পাপবোধ হয় নাই। পাপদর্শনে পাপবোধ হইল; পলকের মধ্যে সহজে পাপবোধ করিলাম। যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে সে অবস্থায় আর কেহ গুরু হইয়া পাপবোধ করিয়া দেয় নাই; আপনার পাপের প্রবলতম সাক্ষী আপনিই হইলাম।'

দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের জীবনের চরিত্রগত ত্রুটির জন্য অনুতাপ, ক্রন্দন বাংলা সাহিত্যে প্রথম শোনা গেল 'সম্ভাবশতক' কাব্যের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ছদ্মনামে রচিত 'রাঃ সেঃর ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮) বইটিতে। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই বইটি অদ্যাবধি স্বল্পালোচিত। খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের বৈদ্যবংশজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রাশনাম রামচন্দ্র দাস। তাই এই আত্মচরিতগ্রন্থের নাম 'রাঃ সেঃর ইতিবৃত্ত'। কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সি শিখেছিলেন। ঢাকায় চাকরি পেয়েছিলেন শিক্ষকতার। সেখানে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। ১৮৪৬ সালে ব্রজসুন্দর মিত্রের চেষ্টায় ঢাকায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে শাক্ত, তারপর বৈষ্ণব ও ঢাকায় যাবার পর ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এই পর্বের জীবনের অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'অল্পদিন পরে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থ ও 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' পাঠে তাঁহার যথাক্রমোৎপন্ন ধর্মসংস্কারের পরিবর্তন হইল। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার স্তুতি-পঠনা শ্রবণ করিতেন। দুই একদিন স্তুতি-সংগীত শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভাব এরূপ হইত যে লুণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হইত।'

এ বর্ণনার অকৃত্রিম সৌন্দর্য কে অস্বীকার করবে? কৃষ্ণচন্দ্র নিজেকে নিজেরই দর্পণে দেখে-

ছেন তবে দূরে দাঁড়িয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে না দেখলে আত্মচরিত লেখা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র অকপটে নিজের অন্তরকে, তাঁর অভিমান, বেদনা, কলুষ, গ্লানিকে খুলে দেখিয়েছেন, যা উপন্যাসের চরিত্রে অভিপ্রেত। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

'রাঃ সঃ কুৎসিত ছিলেন, অথচ সৌন্দর্যের অভিমানী হইতেন। অনেক সময় রূপচিন্তায় সুখে অতীত করিতেন। কিন্তু লোকলজ্জায় দর্পণদ্বারা মুখশ্রী অবলোকন করিতে পারিতেন না। কখন কখন কোন ব্যপদেশে কূপের নিকটে বসিয়া তাহাতে মুখশ্রী অবলোকন করিতেন। যদি কোন দিন মুখশ্রী ভ্রান্ত সংস্কারের অনুরূপ না দেখিতেন তবে অত্যন্ত ক্ষুভিত হইতেন। বিবেচনা হইত না যে সৌন্দর্যের অভিমান অনিষ্টকর ও তন্নিমিত্ত সন্তাপে কোন ফল নাই।'
এর চেয়েও করুণ বা ট্রাজিক চরিত্র হয়ে ওঠেন লেখক যখন তিনি লেখেন :

'এক রাত্রিতে রাঃ সেঃর মনে অকস্মাৎ উদয় হইল তাঁহার পরিবার দেবজাতীয়া। পার্শ্ব-বর্তিনী স্ত্রীর প্রতীয়মান দেবভাবে আপনাকে অত্যন্ত নীচ বোধ হইল। আপনার সংসর্গে তাঁহাকে অপবিত্র করিতেছেন ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন।'

এই পাপবোধ ও অনুতাপবোধ এবং তার অসঙ্কোচ স্বীকৃতি ১৮৬৮ সালে লেখা এই বইটির বিশেষ মূল্য। মদ্যপ ও কদাচারী এই ব্যক্তিটির প্রতি ঘৃণা ও সহানুভূতি একই সঙ্গে জেগে ওঠে।

বাংলা আত্মচরিতসাহিত্যে 'রাঃ সেঃর ইতিবৃত্ত' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছদ্ম-নামে প্রকাশিত। কিন্তু স্বনামে বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লিখে যিনি আমাদের বিস্মিত করেন তিনি পূর্ববঙ্গের একটি বৈষ্ণব পরিবারের গৃহস্থবধূ রাসসুন্দরী দাসী। তাঁর লেখা 'আমার জীবন' বইটির প্রথম ভাগ ১৮৭৬ সালে বার হয়। এই অক্ষরজ্ঞানহীনা মহিলা ছেলেদের কাছ থেকে গোপনে অক্ষরপরিচয় শেখেন। এই বইটি তাঁর নিজের লেখা। অষ্টাশি বছর বয়সে এই বইটির দ্বিতীয় ভাগ রচনার শেষে তিনি লিখেছেন :

'এই বইখানি আমার নিজে হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না।'

রাসসুন্দরী বইলেখা শুরু করেছেন 'মঙ্গলাচরণ' দিয়ে ও শেষ করেছেন 'শ্রীমধুসূদন'কে প্রণতি জানিয়ে। সেটাই স্বাভাবিক হয়েছে। লেখিকা তাঁর রচনার মধ্যে জীবনটিকে শতদলের মতো সুন্দর রূপে মেলে ধরেছেন। বাল্যে মায়ের কাছ থেকে লব্ধ ভগবদ্‌ভক্তি তাঁর জীবনের চিরপাথেয় ছিল। সেজন্য কোনও শোক বা বিঘ্ন-বিপদ তাঁকে অভিভূত বা বিচলিত করেনি। পারিবারিক জীবনের নানা ঘটনা তিনি ছবির মতো এঁকে গেছেন, তার থেকে স্বামীর জয়হরি ঘোড়াকে দেখে ঘোমটা টানার কৌতুককর প্রসঙ্গ বর্জন করেননি :

'ঐ বাড়ীতে একটি ঘোড়া ছিল তাহার নাম জয়হরি। একদিবস আমার বড়ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তার। তখন আমাকে সকলে বলিল 'দেখ দেখ! কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ।' আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে কেমন করিয়া যাই! ঘোড়া যদি আমাকে দেখে তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম।'
এই ধরনের নানাতথ্য বইটিতে আছে। রাসসুন্দরীর বইটি পড়লে তাঁকে আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী অকারণ এই বইটির প্রশংসা করেননি।

বাংলা আত্মচরিতের প্রথম পর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'স্বরচিত জীবনচরিত' নিঃসন্দেহে উচ্চস্থান দাবি করে। ১৮৯১ সালে তাঁর তিরোধানের পর তাঁর ছেলে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন বইটি প্রকাশ করেন। বইটিতে অহং-মুক্ত যথার্থ আত্মচরিতরচয়িতার দৃষ্টি ও শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সেইজন্য তিনি পিতা-মাতা সম্বোধনের পরিবর্তে 'ঠাকুরদাস' ও 'ভগবতী দেবী' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বাল্য-কৈশোরের বর্ণনায় তাঁর আত্মকথাকে অসমাপ্ত করে রেখে গেলেন এটাই দুঃখের। তবুও এই কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর পরবর্তী জীবনের তেজস্বিতা, পরদুঃখকাতরতা ও সহজ কৌতুকরসোপভোগের ইঙ্গিত রয়েছে।

বাংলা আত্মচরিতসাহিত্য চিরায়ত মূল্য অর্জন করল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মজীবনী"কে অবলম্বন করে।

# দাগ

## হাইনরিখ বোল

যুদ্ধ থেকে ফিরলাম পঞ্চাশ সালের বসন্তকালে। তার আগে ফিরতে পারি নি। ফিরে চেনা কাউকেই শহরে খুঁজে পাই নি। আমার কপাল ভালো, বাবা কিছু পয়সাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। শহরে একখানা ঘর ভাড়া নিলাম, সেই ঘরের বিছানায় শুয়ে ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, অবশ্য কিসের জন্যে অপেক্ষা জানতাম না। আমি কাজ করতে চাই নি। বাড়িউলিকে পয়সা দিতাম, মহিলাটি আমার দরকারি সব জিনিস কিনে দিতেন, আমার খাবার রান্না করে দিতেন। প্রত্যেকবার তিনি কফি অথবা খাবার নিয়ে আমার ঘরে এসে যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ থাকা আমার পছন্দ হত না। কলিনভ্‌কা নামে একটা জায়গায় তাঁর ছেলে নিহত হয়েছিল। আমার ঘরে এসে টেবিলের ওপর হাতের ট্রে-টা রেখে যেখানে ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকারে আমার খাট পাতা ছিল তিনি ঘরের সেই কোণে চলে আসতেন। আমি আধো ঘুমে চুপচাপ পড়ে থাকতাম, দেয়ালে চেপে সিগারেটের শেষ টুকরোগুলো নেভাতাম; কালো কালো দাগে খাটের পাশের দেয়াল ছেয়ে গিয়েছিল। মহিলাটি নীরক্ত এবং রোগা। স্বল্প আলোয় তাঁর শাদাটে মুখ আমার বিছানার ওপর ভাসতে দেখলে আমার কেমন ভয় হতো। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, মহিলাটির মাথায় ছিট আছে, কারণ তাঁর খুব বড় বড় চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দেখতাম। বারবার আমাকে নিজের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেন: 'তুমি ঠিক বলছো তুমি তাকে চিনতে না? জায়গাটার নাম কলিনভ্‌কা—সেখানে তুমি কখনো যাওনি?'

আমি কিন্তু কলিনভ্‌কা বলে কোনো জায়গার নামই শুনিনি। প্রত্যেকবার আমি দেয়ালের দিকে ফিরে বলতাম, 'না, আমি তাকে চিনতাম না। আমি কিছু স্মরণও করতে পারি না।'

মহিলাটির পাগলামির কোনো লক্ষণ সত্যি আমি দেখিনি, বরং তাঁর নরম স্বভাব লক্ষ করেছি। তাঁর প্রশ্ন শুনলে আমার কষ্ট হতো। দিনের মধ্যে অনেকবার তিনি আমাকে একই প্রশ্ন করতেন। আমি কখনো রান্নাঘরে তাঁর কাছে গেলে, তাঁর ছেলের ছবি দেখতে হতো। একটি রঙিন ছবি সোফাটার ওপরে দেয়ালে টাঙানো ছিল। সেই রঙিন আলোকচিত্রে ছেলেটি হাসছে, তার মাথা-ভরতি চুল, পদাতিক সৈন্যের পোশাক পরা।

'ফ্রন্টে যাবার আগে ব্যারাকে ছবিটা তোলা হয়েছিল।' মহিলাটি বলতেন।

ছবিটা বুক পর্যন্ত, মাথায় হেলমেট, পেছনে সাজানো ভেঙে-পড়া দুর্গ নকল লতাপাতায় ঢাকা।

মহিলাটি বলতেন, 'ও ট্রামের কন্ডাক্টর ছিল। খাটতো খুব।' তারপরই তাঁর সেলাইকলের-ওপরের একগাছা সুতোসাতার মধ্যে থেকে ছবি রাখার একটি বাক্স তুলে নিতেন। প্রত্যেকবারই তাঁর ছেলের একতাড়া ছবি আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিতেন। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তোলা ছবি, সবার হাঁটুর ওপর স্লেট বই। লাল ফিতেয় জড়ানো গীর্জার মধ্যে তোলা অনেকগুলো ছবি। সোনার পানপাত্র আঁকা ঝকঝকে সিল্কের কাপড় ঝুলছে, তার সামনে বিরাট একটা বাতি হাতে নিয়ে কালো সুট পরা ছোট্ট ছেলেটা হাসছে। আরো ছবি একটা

তালা তৈরির কারখানায় তোলা। লেদমেশিনের পাশে ছেলেটি দাঁড়িয়ে, মুখে-হাতে কালি-ঝুলির দাগ।

'এই কাজের যোগ্য ও ছিল না,' মহিলাটি বলতেন, 'তালা বানানোর কাজ ও ঠিক পারতো না।' তখন তিনি তাঁর ছেলের সেনাদলে যোগ দেবার আগের ছবিটা দেখাতেন। ট্রাম কন্ডাক্টরের পোশাক পরে ন'নম্বর টার্মিনাসে একটা ট্রামের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রামলাইন বাঁক নিয়ে টার্মিনাসে ঢুকে গেছে, পাশেই একটা সিগারেট লেমনেড ইত্যাদির ছোট দোকান। আমি জায়গাটা ভালো করে চিনি। যুদ্ধ শুরু হবার আগে ওখান থেকে কতবার সিগারেট কিনেছি। ছবিটাতে আরো ছিল, আমার চেনা পপলারগাছগুলো, সেই বড় বাড়িটা যার গেটে সোনার রঙের দুটো সিংহ। যুদ্ধের পরে এখন আর সিংহ দুটো নেই।

ওই ছবিটা দেখলেই একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে, যার কথা যুদ্ধের সময় আমি প্রায়ই ভেবেছি। তার দীর্ঘ চোখ পুরোপুরি মেলে সে তাকাতো না, কেমন একটু ম্লান। তবে আমার চোখে সে সুন্দর ছিল। ন'নম্বর টার্মিনাস থেকে সে ট্রামে উঠতো।

একটু বেশি সময় ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই অনেক কথা আমার মনে এসেছে: মেয়েটি এবং যে সাবানের কারখানায় আমি কাজ করতাম; ট্রাম চলার কর্কশ শব্দ, গরমের দিনে ছোট দোকানটা থেকে যে লাল লেমনেড খেতাম, সিগারেটের সবুজ বিজ্ঞাপন এবং আবার ওই মেয়েটি।

'হয়ত', মহিলাটি বলতেন, 'তুমি আসলে তাকে চিনতে।'

আমি মাথা নাড়তাম এবং ছবিখানা বাক্সে রেখে দিতাম। আট বছরের পুরনো হলেও চকচকে কাগজের জন্যে ছবিখানাকে নতুন মনে হতো। বলতাম, 'না, তাকে আমি চিনতাম না। কলিনভ্কা কোথায় তা-ও জানি না।'

প্রায়ই আমাকে ভদ্রমহিলার খোঁজে রান্নাঘরে যেতে হতো, তাঁকেও বারবার আমার ঘরে আসতে হতো। যুদ্ধকে আমি ভুলতে চাইতাম কিন্তু যুদ্ধ আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকতো। খাটের পেছনে আমি সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলতাম, শেষ টুকরোগুলো দেয়ালে চেপে নেভাতাম।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে শুয়ে শুয়ে পাশের ঘরে একটি মেয়ের চলাফেরার শব্দ শুনতে পেতাম। অথবা রান্নাঘরের পাশের ঘরের বাসিন্দা যুগোস্লাভ লোকটির একা একা বকবক করা শুনতাম। ঘরে ঢোকার মুখে আলোর সুইচ হাতড়াবার সময় লোকটা কাকে যেন অভিশাপ দিত।

যুদ্ধ থেকে ফেরার তিন সপ্তাহের মধ্যে কন্ডাক্টরের পোশাক পরা কার্লের ছবিখানা আমাকে প্রায় পঞ্চাশবার হাতে নিতে হয়েছে। শেষের বার ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে লক্ষ করলাম, যে-ট্রামের সামনে সে দাঁড়িয়ে সেটা খালি নয়, যাত্রী আছে। সেই প্রথম আমার দৃষ্টি ছবিখানার দিকে আকৃষ্ট হল। দেখলাম, ওই ট্রামের যাত্রী একটি মেয়ে ছবিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। মেয়েটি হাসছে। সেই লাবণ্যময়ী, যুদ্ধের সময় যাকে আমি প্রায়ই ভেবেছি।

মহিলাটি আমার মুখের ভাব লক্ষ করে কাছে সরে এলেন। বললেন, 'এখন তুমি তাকে চিনতে পারছো, তাই না?' তিনি আমার পেছনে এসে কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর গোটানো এপ্রন থেকে তাজা সবুজ মটরশুটির গন্ধ এল।

'না।' একটু টেনেটেনে বললাম, 'তবে এই মেয়েটিকে আমি চিনি।'

'মেয়েটি?' তিনি বললেন, 'ওই মেয়েটি তার বান্ধবী ছিল। তবে আর কখনো ওদের

দেখা হয়নি, সে বরং ভালো।'

'কেন?'

তিনি তখনই আমার কথার উত্তর দিলেন না, সরে গিয়ে জানলার পাশের চেয়ারটায় বসলেন, মটরশুঁটির খোসা ছাড়াতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'তুমি মেয়েটিকে চিনতে?'

ছবিখানা ভালো করে ধরে তাঁর দিকে তাকালাম। সাবানের কারখানা, ট্রামের ন'নম্বর টার্মিনাস, সেখান থেকে রোজ সুন্দরী মেয়েটার ট্রামে ওঠা—সব তাঁকে বললাম।

'আর কিছু না?'

'না।'

তিনি একটা টুকরিতে করে ছাড়ানো মটরশুঁটিগুলো নিয়ে জলের কলের তলায় রাখলেন, কলটা খুলে দিলেন। আমি তাঁর রোগা পিছনটা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম।

'মেয়েটিকে যখন আবার দেখবে, তখন বুঝতে পারবে—কার্লের সঙ্গে ওর আর দেখা না হওয়া কেন ভালো হয়েছে—'

'মেয়েটিকে আবার দেখবো?'

এপ্রনে ঘষেঘষে হাত মুছলেন, আমার কাছে এগিয়ে এসে খুব যত্নে আমার হাত থেকে ছবিখানা নিলেন। তাঁর মুখ এখন আরো রুগ্ন দেখাচ্ছিল, আমার পিছনে দূরে কিছুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার বাঁ হাতের ওপর আলতো করে তাঁর হাত রেখে বললেন, 'সে তোমার পাশের ঘরে থাকে। তুমি কি এর মধ্যে একবারও অ্যানাকে দেখতে পাওনি? আমরা ওকে ম্লান অ্যানা বলে ডাকি, ওর মুখ ভীষণ ফ্যাকাশে।'

বললাম, 'আমি এখনো ওকে দেখিনি, তবে পাশের ঘরটায় যে একটি মেয়ে আছে বুঝতে পেরেছি। ওর কী হয়েছে?'

'এসব কথা আলোচনা করতে আমার খারাপ লাগে। তবে তোমার জেনে রাখা ভালো। অ্যানার মুখ দেখতে বিশ্রী হয়ে গেছে, সারা মুখে কাটাছেঁড়ার অজস্র দাগ। বোমা পড়ছিল; একটা দোকানঘরের কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে অ্যানা ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়ে। ওকে আর চেনা যায় না।'

সেদিন সন্ধ্যেয় আমি অনেকক্ষণ ধরে দরজার সামনে অপেক্ষা করছিলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু প্রথমবার আমার ভুল হয়েছিল। লম্বা চেহারার যুগোস্লাভ লোকটি ফিরছিল। আমাকে অমন দৌড়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। কোনোরকমে 'শুভসন্ধ্যা' কথাটা মুখ থেকে খসিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

অ্যানার ফ্যাকাশে ম্লান মুখ ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, ভাবতে পারছিলাম না। দাগটাগ সত্ত্বেও তার মুখ সুন্দর মনে হচ্ছিল। সাবানের কারখানাটার কথা ভাবলাম, মাবাবার কথা ভাবলাম। অন্য একটি মেয়ের কথা মনে আসছিল; তাকে নিয়ে সেই সময় বেড়াতে বেরোতাম। তার নাম ছিল এলিজাবেথ, কিন্তু সে চাইত আমি তাকে মাৎস্ বলে ডাকি। যখনই তাকে চুমু খেতাম, সে খিকখিক করে হাসতো আর আমার নিজেকে বোকাবোকা লাগতো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি ওকে পোস্টকার্ড পাঠাতাম। সে বাড়িতে তৈরি বিস্কুটের ছোটছোট পার্সেল পাঠাতো। বিস্কুটগুলো গুঁড়ো হয়ে আমার হাতে পৌঁছতো। সিগারেট আর খবরকাগজও পাঠাতো। একটা চিঠিতে ও লিখেছিল: তোমরা ঠিক জিতবে। তোমার জন্যে আমি গর্ব অনুভব করি।

২

কিন্তু যুদ্ধ করছিলাম বলে, আমার কোনো গর্ব ছিল না। ছুটি পেলে ওই মেয়েটিকে জানাতাম না। তখন আর একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। আমাদের বাড়িতে একজন তামাকব্যবসায়ী থাকতো, তার মেয়ে। তাকে আমি সাবান কিনে দিতাম, সে দিত সিগারেট। আমরা সিনেমায় যেতাম, নাচতে যেতাম। একদিন যখন তার মাবাবা বাড়িতে ছিল না, সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। অন্ধকারে আমি তাকে সোফার ওপর ঠেলে ফেলে দিলাম। কিন্তু যেই তার শরীরের ওপর ঝুঁকেছি, সে সুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। ওর হাসিতে ছিল ধূর্ততা। চোখধাঁধানো আলোয় দেয়ালে হিটলারের ছবি টাঙানো দেখলাম। গোলাপি-রঙের দেয়ালকাগজের ওপর হিটলারের রঙিন আলোকচিত্রের চারপাশে ছবির কাগজ থেকে কেটে কেটে আরো অনেক হেলমেট-পরা কঠিন মুখের ছবি পিন দিয়ে গেঁথে রাখা ছিল। হিটলারের ছবির চারপাশে ওই ছবিগুলো হৃৎপিন্ডের নকশা তৈরি করেছে। মেয়েটাকে সোফায় শুইয়ে রেখে, সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরে ওরা দুজন মেয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে পোস্টকার্ড পাঠিয়েছে। দুজনই লিখেছে, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি কোন উত্তর দিইনি।

অ্যানার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, অন্ধকারে বসে বসে অনেকগুলো সিগারেট খেলাম, অনেক কথা ভাবছিলাম, তারপর যখন তার দরজার তালায় চাবি ঘোরাবার শব্দ পেলাম, উঠে আসতে এবং তার মুখ দেখতে কেমন ভয় হল। সে দরজা খুলে ওঘরের মধ্যে নড়া-চড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করছে, বুঝতে পারলাম। একটু পরে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘর চুপচাপ হয়ে গেল, সে আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল না, গুনগুন করছিল না। বন্ধ দরজায় টোকা মারতে আমার হাত উঠলো না। যুগোস্লাভ লোকটি তার ঘরে বিড়বিড় করছিল, কার্লের মা'র রান্নাঘর থেকে ফুটন্ত জলের শব্দটাও আসছিল। কিন্তু অ্যানার ঘরে কোনো শব্দ নেই। আমার নিজের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার খাটের পাশের দেয়ালে সিগারেট চেপে নেভাবার দাগগুলো এদিকে তাকিয়ে আছে।

যুগোস্লাভ লোকটি শুয়ে পড়েছে৷ তার পায়ের শব্দ আর পাচ্ছিলাম না, শুধু তার বিড়বিড় কানে আসছিল। রান্নাঘর থেকে ফুটন্ত জলের শব্দও আর আসছে না; তার বদলে কফির পটের মুখ ঢাকা দেবার ধাতব শব্দটা পেলাম। অ্যানার ঘর তখনো নিঃশব্দ। আমার মনে হচ্ছিল, অ্যানা আমাকে পরে বলবে—তার দরজার সামনে আমি যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন সে কী ভাবছিল। পরে সবই সে আমাকে বলেছিল।

বন্ধ দরজার পাশেই দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল। একটা হ্রদে রুপোলী জল ঝিকমিক করছে, একটি জলপরী উঠে আসছে সেই জল থেকে, তার ভেজা স্বর্ণাভ চুল, একটা চাষী ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বড় বেশি সবুজ লম্বা ঘাসের মধ্যে ছেলেটা লুকিয়ে আছে। আমি জলপরীর একটি স্তনের আভাস পাচ্ছি, তার শ্বেত গ্রীবায় আশ্চর্য ডৌল।

কতক্ষণ পরে জানি না, দরজার হাতলে হাত রেখেছি, আর সেই হাতলে চাপ দেবার এবং আস্তে দরজা খুলবার আগেই আমি জেনেছি অ্যানা আমার : তার সারা মুখে অজস্র নীলাভ চকচকে দাগ, তার ঘর থেকে তরকারি রান্নার গন্ধ আসছে। আমি দরজাটা পুরো খুলে অ্যানার কাঁধে আমার হাত রেখেছি, তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হেসেছি।

অনুবাদ : সুধাংশু ঘোষ

# অন্তিক

অমিয় চক্রবর্তী

কী ক'রে মন বুঝবি যদি
এমনি ধ্বনি রাখলি দূরে
(সঙ্গচ্ছধ্বং...)
অন্ধবুকে জাগুক না প্রাণ
মন্ত্রস্বরের একটু সুরে—
(সংমনাসি...)
ওদিকে দিন ঘিরে আসে
বিদেশী শীত কুয়াশাতে,
কালো আঙুল গাছের মাথায়
ঠাণ্ডা একা শূন্যরাতে—
(সহবীর্যং করবাবহৈ...
যখন কোথাও কিছুই তো নেই
সেই তো সময় আসল শোনার—
উপনিষদ ঋষি বলেন
শেষের মিলন আরাধনার।
(যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম...)॥

# পুনর্ভব

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এ নয় অন্ধকারের মতো মাটি ছেড়ে
দিগন্তসংসারে
উঠে যাওয়া;
এ নয় দৃশ্যের
নক্ষত্রে তাকিয়ে শুধু বুঝে নেয়া দিক;
নষ্ট কম্পাসের পাশে
নয় এ সন্ত্রস্ত কোনো অর্ণবনাবিক;
এ হয় মানুষ
পৃথিবীর একভাগ স্থলের একজন
অভিলাষী, শব্দবন্ধ, নারীর পুরুষ।
যে নাকি এখনো
ঈশ্বর শাসিয়ে গায় গান,
মাঝে মাঝে হাড় মাংস নিয়ে
শ্মশান অভ্যাস করে
ময়দানের থমকে থাকা
ঘাসের উপরে!
তখন সূর্যের মুখ ঢেকে রাখে মেঘ,
অশিক্ষিত বাতাসের গাঙ্গেয় আবেগ
মৃত্যু ভেবে ছুটে এসে
ভুল স্পর্শে ছুঁয়ে ফ্যালে চুল, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে
পালায়; যেনবা তিলার্ধ বিলম্ব হ'লে
ভাষায় আক্রান্ত হবে ক্ষমা;
একা সঙ্গমবিহীন শুয়ে থাকা সমস্ত উপমা
সটান বৃক্ষের মতো দাঁড়াবে অস্থির
যেন বা সবুজ ফৌজ;
দূরে কাছে
রক্তের অঘোর অন্ধকার
ঘিরে ধরবে উপনিষদবয়সী সব বন;
প্রকৃতি ও মানুষের যথার্থ বিরোধ শুরু হবে।

শুধু একজন
স্থায়ী স্থলের মানুষ নক্ষত্র ও নারীর শরীরে
সূর্যকে লুকিয়ে রেখে খুঁজবে কিছু না-লেখা কাগজ ;
যে কাগজ লুকানো যায়নি, যে কাগজ
লুকানো যায় না ; যাকে
শকুন হায়না এসে সময়ের খাদ্য হতে ডাকে।

# বাঁচাকাহিনী

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একাগ্র চোখ তাকিয়ে রয়, বুকের মধ্যে ঘুণপোকা সে, ভয়—
লড়াই—সে তো নিজের সঙ্গে, লাল বল তো নিমিত্ত,
একটু এদিক-ওদিক হ'লে কে ঠেকাবে প্রবল পরাজয়,
শেলাই থেকে শব্দ ওঠে ধূর্ত, কুটিল, দুরন্ত, উৎক্ষিপ্ত—
বাঁচা তো নয় যেমন-তেমন, সমস্তক্ষণ চিবিয়ে খায় সময়!

বাঁচতে গেলে মরতেও হয় কখনো, জানি উদাহরণ।
আক্রমণেই আত্মরক্ষা—এ-কথা নয় নগণ্য—
সামান্য ভুল, তাতেই তো শেষ। খেলার এটা ধরন।
হাল কে ছাড়ে? এটা তো ঠিক বাঁচার রাস্তা অনন্য—
মরার জন্য ওৎ পেতে রয় হাজার উপকরণ।

আমি চাইনি আমার উপর পড়ুক সব ভার—
দেশসুদ্ধ অভাব;
ঠোকা বলের বিরুদ্ধে হুক, মারের বদলা মার—
বিপর্যয়ের মধ্যে যেন পাতৌদির নবাব।
থাকুক, যদি তবুও বয় শেষ অবধি হার!

খেলার মধ্যে হার-জিত তো আছেই—
ক্রিকেট? না কি সম্মানের লড়াই?
দুঃখ কিংবা আনন্দ নয় সাধারণ্যে প্রকাশ্য। তাই, কাজেই,
উইলোর এই টুকরোটাতে সংক্রমিত লুকোনো সব বড়াই।
নিজের মান শেষ অবধি বাঁচে, কিংবা হারায়, নিজের কাছেই।

# জর্নাল, ১৯৭১

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যতোই সম্পূর্ণ মুছে দাও
ততোই বসন্ত থেকে হাত-চিঠি চ'লে আসে কাছে—
ফেরিঘাটে ভিড়; আলো ক্রমশঃ দেখায় নীড় নিকটে ও দূরে;
মানুষের রক্ত থেকে মানুষেরই জন্ম হয়—তাকে কে ঠেকাবে?
যদিও অনেক ঘরে পতঙ্গসমান মরে মানুষ, স্বজন,
আবারো নিশান ওড়ে কোনদিকে? প্রিয় স্বাধীনতা,

তোমাকে চেয়েছে যারা মুছে দিতে, তারা স্থির পরাজিত হবে॥

# খাদ্যান্বেষণ : রুগ্ন প্রেয়সীর জন্য

রফিক আজাদ

বড়-বেশি অসুস্থ সে, যদিও ভুগছে না কোনো রোগে
কিছুই রোচে না তার মুখে,—খেলে বিবমিষা হয়।

শহর, শহরতলী আর গ্রামে
উপযুক্ত খাদ্য তার নেই কোনোখানে।
কী সে চায় কেন-যে বলে না মুখ ফুটে!
প্রচুর খেয়েছে সে গ্রামের সবুজ সতেজ শব্জী,
পুকুরের মাছ, পালিত গোরুর দুধ, কাঁচ ডাব;
শহরতলীর কলা, আনারস, ঝুনা-নারিকেল;
সযত্নে দিয়েছি এনে শহরের দামী রেস্তোরাঁর
'মেনু'-ঘেঁটে সর্বজন-প্রশংসিত সুস্বাদু খাবার;
—কিছুতেই পারে না সে খেতে এইসব পরিচিত
খাদ্যাবলী;—বিবমিষা লাগে!

খাবার জোগাতে তার
হেঁটে-হেঁটে অতিক্রম করি যোজন-যোজন পথ—
কোনো তীর্থে যেতে, দল বেঁধে, যেমতি ধার্মিক-পান্থ
পথশ্রান্ত হ'য়ে পুন নতুন উদ্যমে
পথে নামে।
আমারও সম্পূর্ণ পথ উচ্চাবচ, শ্বাপদ-সংকুল—
পথিমধ্যে নেই কোনো পান্থশালা, ধর্মাশ্রম, অগ্রজের বাড়ি।
অবিশ্বাস্য অন্ধকারে, বজ্রের গর্জনে, কিবা বিরুদ্ধ বাতাসে
ডানে-বামে-সম্মুখে বিপদ।
রুগ্ন প্রেয়সীকে তবু অসম্ভব 'মূল্য' দিয়ে খাদ্য এনে দেবো।

রক্তসিক্ত নগ্নপদে হেঁটে অকস্মাৎ রাত্রিশেষে
সম্মুখে সমুদ্র দেখে অনুভব করি :
অদ্ভুত রহস্যময় এই রেস্তোরাঁর সমুদ্র কিচেনে তৈরী
প্রচুর প্রোটিনযুক্ত, ক্যালোরিপ্রধান টাটকা সব
সুগন্ধি খাবার, অনন্ত সঙ্গীত, আর অনাবিল আলো-হাওয়া
মনে-প্রাণে চেয়েছিলো, চায় আজীবন রুগ্ন প্রেয়সী আমার॥

# ভৌতিক ছায়া

**কমলেশ চক্রবর্তী**

যখনি গভীর রাতে ঘরে ফিরি
পথে কাঁপে ছায়া
কখনো কখনো ম্লান মুখে উড়ে যায়
ভেসে ভেসে চঞ্চল শরীর ভৌতিক বিষণ্ণ
জীবন-মৃত্যু জীবন, মৃত্যুর মতন
মাঝখানে দোলে প্রেম প্রবল কাঙ্ক্ষিত

আলোছায়া খেলা করে ঘরে ফেরার প্রাচীন পথে
সামনে আলোর ঈষৎ কম্পন
মানুষের চিরচেনা ঘামে ভেজা গন্ধ
একটু দাঁড়ালে

কোনো গৃহে অক্লান্ত ধ্বনিত হয় টেলিফোন
বেজে বেজে আকুল প্রার্থনা নিঃশব্দ হবার আগে
একক আলাপে কাঁপে পথের চঞ্চল ছায়া

বস্তুত নিরন্ধ্র শহর যেখানে
নিষ্প্রদীপ আকাশের নিচে একা
আর চোখের সামনে জীবন-মৃত্যু জীবন
মৃত্যুর মতন খেলা চলে
ছায়া কাঁপে পথে কাঁপে ছায়াদের চঞ্চল শরীর

টেলিফোন থেমে গেলে
আর একটু অপেক্ষা ক'রে
নিয়ম মতন পা-বাড়াবো
চেনা ঘাসে।

# ছুরি

## সুবিমল মিশ্র

কে যেন পেছন থেকে ডাকল, হুই সুদাস, কোথায় যাচ্ছিস? সে পেছন ফিরে তাকাল না। বুড়ো নিমের ডাল থেকে মৃত শরীর তেমনি ঝোলানো আছে, পায়ে দড়ি বাঁধা, মাথা নিচের দিকে, নাক দিয়ে টপ টপ রক্ত গড়িয়ে পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে দিয়েছে। সে দেখল, খাঁচায় সেই পুরনো পাখিটা বসে আছে, মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে লোহার শিকগুলো পরখ করে দ্যাখে, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়, চেঁচিয়ে ওঠে : সুদাস, হুই সুদাস, কোথায় যাচ্ছিস তুই? সে তার বন্ধুর বাড়ি থেকে বেগনী মখমলের খাপে ঢাকা পুরনো আমলের ছুরিখানা চুরি করে এনেছে। সেই ছুরির গোড়ালি হাতির দাঁতের, ঘোড়ার মুখের আকৃতি করা, মাঝে মাঝে নির্জন হলে সে তার ধার পরখ করে দ্যাখে। অন্ধকার রাত্রে শেয়াল ডাকে গাছগাছালির ফাঁকে, রাত্রি আরো অন্ধকার হয়। সে শোনে মা বলছে: তোকে কেন এমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে সুদাস? সে চমকে ওঠে, বলে, কৈ না তো। ছুরিটা চেপে ছুটতে থাকে সে, মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল পেরিয়ে যায়, অবশেষে কাসেম মিঞার আস্তাবলে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। পাখিটা ছটফট করতে করতে খাঁচা দোলায়, ডাকে : সুদাস, হুই সুদাস, কোথায় গেলি রে? কাসেম মিঞার আস্তাবল পড়ো-পড়ো, ঘোড়াগাড়ির ব্যবসা আর চলে না, শহর আজকাল মোটর-গাড়ি চায়, কাসেম মিঞা তার আধপাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: আমরাও যাব, সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাবসাও শেষ হয়ে যাবে। বলে: জানো দাদাবাবু, তখন এ জুড়িগাড়ির কি রমরমা ছিল, বাবুদের ইজ্জত, কোঁচা দুলিয়ে বুকে আতর ঢেলে বাবু-বিবি হাওয়া খেতে বেরোত, আর এখন—কাসেম মিঞা আপসোস করে আর অন্যমনস্কভাবে দাড়িতে হাত বুলোয়। তার চারদিকে ভাঙা চাকা ও পরিত্যক্ত গাড়ির হাড়গোড় পড়ে থাকে। গাছে ঝোলানো মৃত শরীর থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরে ভিজিয়ে দেয় জায়গাটা। কারা যেন ছোটবেলায় এমনি করে হুলো বেড়াল মারতো। গলায় দড়ি বেঁধে কলাগাছে ঝুলিয়ে দিয়ে আসতো, সারা রাত বাঁচার জন্য ম্যাঁও ম্যাঁও চেঁচাত বেড়ালটা, সকালবেলা মরে থাকত। তারা সকালবেলা দল বেঁধে দেখতে যেতো, বেড়াল কেমন মরে আছে। বেলা হলে হাজার হাজার ডেঁয়ো পিঁপড়ে তার চোখ খুবলে খেয়ে ফেলতো। রাত্রিবেলা দেখা যেতো, জোনাকি জ্বলছে মৃতদেহের আশে পাশে। দেখতে দেখতে সে হাঁপায়, দেখে কাসেম মিঞা বলে : কি হয়েছে তোমার খোকাবাবু, এত হাঁপাচ্ছো কেন। সে প্যান্টের পকেট চেপে রেখে বলে, না কিছু না, কিছু হয়নি। বলে: জানো কাসেম মিঞা, কয়েকটা জংলি জানোয়ার আমার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ছটফট করছে। ঠিক বুকের এইখানটায়, ব'লে সে হাত দিয়ে বুকের মাঝখানটা দেখিয়ে দেয়। আরো বলে : আমি রাস্তার ওপাশে খালের ধারে একটা কালো ঢ্যাঙামতন মানুষকে বুকে হেঁটে বেড়াতে দেখে এসেছি। তখন লোকটা খালের ধারে নোংরা জায়গাগুলো শুঁকে বেড়াচ্ছিল। কাসেম মিঞা বলে: এ আর এমন কি খোকাবাবু, ওদিকের মানুষরা তো সব যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে, বলছে খেটে খাওয়ার সুযোগ চাই, ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে চাই। রোগাপটকা ঘোড়াটা, চোখে ঠুলি পরা, বাঁধা থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে কাঠের মেঝেতে পা ঠোকে, মাঝে মাঝে অ্যাঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ ধরনের এক অদ্ভুত শব্দে ডাকতে ডাকতে কিসের প্রতি যেন বিদ্রোহ জানায়।

শব্দ শুনে সে চমকে ওঠে, হাত দিয়ে বাঁটসুদ্ধ ছুরিটা প্যান্টের পকেটে চেপে রাখে।

ছুরিটা চুরি করার কোন ইচ্ছে ছিল না। তবু ঘরের মধ্যে সাজানো পুরনো সব ছোরা-ছুরি তলোয়ারের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন যেন কি সব হয়ে গেল তার, ঢিপ ঢিপ বুকে প্যান্টের পকেট চেপে পালিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছে সামনে মস্ত একটা মোষের মাথা শিং উঁচিয়ে আছে, ডানদিকে বাঘের ছালসুদ্ধ হাঁ-করা মুখ।

রাত্রির অন্ধকারে বড় অস্বস্তি হয় তার, সে অন্যমনস্ক এলোপাথাড়ি বনজঙ্গল ভাঙতে থাকে। দ্যাখে একই ডাস্টবিন থেকে মানুষ আর কুকুর খাদ্য খুঁটে নিচ্ছে। পাখিটা ডাকে, ডানা ঝটাপটায়, চেঁচায়—এই ছুরি নিয়ে কি করবি তুই সুদাস, তুই ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে। সে জানে না ওটা নিয়ে কি করবে, সমস্ত জনমানুষ গাছপালা গাড়িঘোড়া ছাড়িয়ে চলতে থাকে সে, প্যান্টের পকেটে ছুরিটাকে চেপে রাখে। মাঝে মাঝে বার করে দ্যাখে, দ্যাখে তার বেগনি মখমলের ঢাকনা, তাতে লাল সবুজ জরির কাজ, খুলে দ্যাখে হাতির দাঁতের হাতল, ঘোড়ার মুখের আকৃতি করা, সে হাত দেয়, ধার পরীক্ষা করে। মাঝে মাঝে কাসেমের আস্তাবল থেকে রোগাপটকা ঘোড়াটা অদ্ভুত অ্যাঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ ডাক ছাড়লে চমকে ওঠে রাত, তার হাত থেকে ওটা খসে পড়তে চায়, সে তখন বলে : এটা নিয়ে আমি কি করব, এটা তো আমি চাইনি। কেউ দেখে ফেলছে কিনা এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্যাখে, তারপর তাড়াতাড়ি ওটা আবার প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফ্যালে।

কোত্থেকে এক দঙ্গল উটকো ছেলে এসে বলে: ওটা নিয়ে তুমি কি করবে সুদাস, ওটা আমাদের দিয়ে দাও। সে শক্ত মুঠোয় পকেট চেপে রাখলে ওরা গম্ভীর মুখে যেমনি অন্ধকার থেকে এসেছিল তেমনি অন্ধকার জলার দিকে চলে যায়। কেবল আবছা আলোর ভেতর অস্পষ্ট জোনাকি জ্বলে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকে। গাছের ডালে ঝোলানো সেই উপুড় করা মৃত শরীরের নাক ছুঁইয়ে টপ টপ রক্ত পড়তে থাকে। সেখানো ডেঁয়ো পিঁপড়ে জমে যায়। খালপুল পেরিয়ে দীর্ঘপথ আবছা জ্যোৎস্নায় ভরে থাকে। মাঝে মাঝে কোত্থেকে যেন অস্পষ্ট কান্নার শব্দ ভেসে আসে, কখনো হাসির। লাল কাঁকর বিছানো রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরোহী বলে ওঠে: এই আসন্ন অন্ধকারে জনহীন পড়ো কেল্লার দিকে কোথায় তুমি যাও সুদাস? সুদাস চমকে ওঠে, বলে, না, কোথাও না।

কাসেম মিঞা দাড়িতে হাত বুলোয়, তার রোগা ঘোড়াটি, চোখ বাঁধা, থলে থেকে ঘাস চিবোতে থাকে। সে গম্ভীর মুখে বলে: দিনকাল বড়ো খারাপ যাচ্ছে খোকাবাবু, সাবধানে যাওয়া আসা করো। অন্ধকার ঝিলের দিকে যেওনি আর। কেন, ওখানে কি হয়েছে? কিছু না, এমনি। কাসেম মিঞা যেন কিছু চেপে যায়। সে দ্যাখে তার পাখি খাঁচায় ডানা ঝটপটায়, দানা খায় না।

সে দ্যাখে ভিখিরী বুড়ি স্টেশনে ভিক্ষের আশায় হাত পেতে বসে আছে। সে দ্যাখে ধূর্ত শেয়াল গেরস্থের মুরগি চুরি করে দ্রুত আলোর তলা দিয়ে বাদামী অন্ধকারে মিশে গেল। গলা শুকিয়ে গেলে সে পুকুরের ভাঙা ঘাটে জল খেতে যায়, পুবে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ওপর চাঁদ ওঠে, সে দীঘির জলে সেই চাঁদের ছায়া দ্যাখে। দেখতে দেখতে ভাবে ছুরিটা জলে ফেলে দিলে কেমন হয়, সব আপদ চুকে যায় আর ভাবতে হয় না। কিন্তু প্রাণে ধরে ফেলা হয় না কিছুই, জ্যোৎস্নার আলোয় সেই আধো-মরচে-পড়া ছুরির ফলা চকচক করে। সে ভাবে, আমি একে ফেলতে পারি না, কেননা আমিই একে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এটি রেখে আমি কি করব। রমেনদের বাড়িতে, ড্রইংরুমের দেয়ালে এই রকম অনেক ছোরা সাজানো

আছে, এর থেকে অনেক অনেক বড়, পিস্তল বন্দুক সব কত রকমের। রমেনের বাবা কেমন গোঁফে তা দিতে দিতে সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেন : এসব অস্ত্র কত সব পুরনো যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইতিহাস—সব ইতিহাস। সে জলের ধারে দাঁড়িয়ে জলে জ্যোৎস্না পড়ে আছে দেখতে দেখতে ভাবে, কেন সে নিয়েছিল—কেন—কেন। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আমবোলের গন্ধে ম ম করছে সমস্ত দীঘির পাড়, তার পুরনো পৈঠা, ভেঙে যাওয়া সিঁড়ি, শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে সে চলে আসে, কেবল পাখিটা পেছন থেকে ডাকে : যাস না সুদাস, যাস না।

মা বলে, সুদাস এত রাত হল কেন? এমনি, দীঘির পাড়ে বসে ছিলাম; জানো মা, ওখানে আজকাল কারা যেন দল বেঁধে নীলকণ্ঠ পাখির ডাক শুনতে আসে। তাদের হাতে পুরনো সব রক্ত লেগে থাকে, মাথায় লাল নীল পাখির পালক। তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস, ওদিকে যাস না। কেন মা? যেতে নেই। তারপর একটুখানি থেমে তার চোখে মুখে তাকিয়ে বলেন : তোকে আজকে যেন কেমন লাগছে সুদাস। সে তখন বলে : তা তো লাগবেই মা, আমি যে মানুষ আর কুকুরকে একই ডাস্টবিন থেকে খুঁটে খেতে দেখে এসেছি। ব'লে সে মাকে রক্তে ভিজে থাকা সেই জায়গাটা দ্যাখ্যায়—যেখানে সেই মৃত শরীরের নাক চুঁইয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে অনন্তকাল।

কাসেম মিঞার আস্তাবলে ঘোড়াটা মুখে বাঁধা থলে থেকে ঘাস চিবোয়, মাঝে মাঝে অ্যাঁ—হ্ঁ—হ্ঁ—হ্ঁ ডাকে, কাসেম মিঞা অন্ধকারে বসে কেবল মশা মারতে থাকে আর মাঝে মাঝে বিড়ি ফোঁকে। বলে : দাদাবাবু, সে সব কাল গ্যাছে, আর আসবে না। বাবু-বিবিকে নিয়ে টগবগ টগবগ ছুটে চলেছি পুরনো কেল্লার রাস্তা ধরে, রাস্তায় চলা মানুষজন পথ ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে—বাবুদের জুড়ি : তফাত যাও তফাত যাও। আমিও যাব, আমার সঙ্গে সঙ্গে সবশেষ হয়ে যাবে।

রাত্তিরে কিছুতে ঘুম হয় না তার, সে জানালায় কাদের যেন ফিসফিসানি শুনতে পায় : ওটা নিয়ে কি করবে তুমি সুদাস, দিয়ে দাও, আমাদের দিয়ে দাও। মাটি খুঁড়ে পুকুরের পাড়ে আমগাছের তলায় সে লুকিয়ে আসে ওটা, ভাবে এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গ্যাছে, কেউ সন্ধান পাবে না। মাঝরাতে দেখতে পায়, ক'টা শেয়াল মৃতদেহের সন্ধান করতে করতে জায়গাটা খুঁড়ে ফেলেছে। ছুটে যায় সে, হাঁ হাঁ করতে করতে ঢিল ছুঁড়ে মারে, শেয়াল তাড়ায়। শেয়ালেরা চোখে আগুন জেবলে কাছে কাছে ঘুরঘুর করে, তফাত যায় না। তার বুক ঢিপ ঢিপ করে, ওটা না আনলেই ভালো ছিল। বিনিদ্র চোখে সে আকাশ দ্যাখে, মাথার রুক্ষ চুলে আঙুল চালায়, পাগলের মত সারারাত পুকুরের পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সে মানুষ আর কুকুরের একসঙ্গে একই ডাস্টবিন থেকে এঁটো-কাঁটা কাড়াকাড়ি করে খাবার দৃশ্য দেখতে থাকে বারবার। দূর থেকে মায়ের গলা ভেসে আসে : যাসনি সুদাস, যাসনি, সু—দা—স। তার পোষা খাঁচার পাখি ডেকে ডেকে ওঠে : হুই সুদাস, কোথায় যাচ্ছিস, হুই সুদাস। সে ছটফট করতে করতে বলে : জানো কাসেম মিঞা, আমি একখানা ছুরি চুরি করে ফেলেছি। আর জানো, ওটা নিয়ে আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। তারপর অন্যমনস্ক, মাথায় আঙুল চালাতে চালাতে বলে যায়, আমি ঠিক চুরি করতে চাইনি, জানো, কি করে যে কি হয়ে গেল। জানো রমেনদের ঘরে দারুণ দারুণ সব অস্ত্র আছে—কতরকমের ছোরা-ছুরি তলোয়ার বন্দুক বাঘের চামড়া মোষের শিং—ঠিক যেন একটা জাদুঘর। বলতে বলতে তার বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে যায়। তার অস্পষ্ট গোঙানি কাসেম মিঞার আস্তাবল থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার অ্যাঁ—হ্ঁ—হ্ঁ—হ্ঁ ডাকে ডুবে যেতে থাকে। কাসেম

মিঞার আস্তাবলে একটিমাত্র ঘোড়া, রোগাপটকা, নিশ্চুপ, থলের ভেতর শুকনো ঘাস চিবোতে থাকে, মাঝে মাঝে লেজ নাড়ে, মাঝে মাঝে কাঠের মেঝেতে পা ঠোকে ঠকঠক, মাঝে মাঝে অ্যাঁ—হু‍ঁ—হু‍ঁ—হু‍ঁ ডেকে কিসের যেন প্রতিবাদ জানাতে চায়। কাসেম বলে : সময় হয়ে এসেছে, আমিও যাব, আমার ঘোড়াটাও যাবে। বলে বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে এসে কাসেম ঘোড়াটার পাঁজরাবারকরা পেটে হাত বুলোয়, বলে : খুব সাবধান খোকাবাবু—বড় খারাপ সময় এখন, রাস্তা পেরিয়ে ঝিলের দিকে যেওনি।

বুকের ব্যথা বাড়তে থাকলে সে রাস্তায় নেমে পড়ে অন্যমনস্ক হাঁটতে থাকে। অন্ধকার রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, বাতাসে আমবউলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসে। চোখে টর্চ জ্বালিয়ে সারাক্ষণ তার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে ক'টা শেয়াল। এরা সেই ঝুলে থাকা মৃত-শরীর-চুঁইয়ে-পড়া রক্তে জিভ দিয়েছিল, রক্তের স্বাদ নিয়ে ফিরেছে। তার কখনো কখনো খারাপ লাগে, কখনো-কখনো ভালো লাগে। মাঝে মাঝে তার ভাবনা হয় সে তো এমনটি চায়নি। মাঝে মাঝে সেই নীলকণ্ঠ পাখির ডাক শুনতে আসা মানুষ জনের কথা তার মনে পড়ে—তারা হাতের বাসি রক্তের দাগ নিয়ে পাখির সুকণ্ঠ শুনতে এসেছিল। চারিদিকে নির্জন রাস্তা, জ্যোৎস্নায় ভেঙে পড়া প্রাচীন কেল্লার অবয়ব, লাল খোয়া বিছানো সেকেলে রাজপথ, তার একটুও ভয় করে না। সে চলতে থাকে, ছোরাটাকে প্যান্টের পকেটে চেপে ইতস্তত, অন্যমনস্ক চলতে থাকে। মাঝে মাঝে মা অস্পষ্টস্বরে কেঁদে ওঠেন : ওরে সুদাস রে—। সে তখন মনে ঐ দৃশ্যে আনার চেষ্টা করে : একই ডাস্টবিনের তলায় মানুষ আর কুকুর খাদ্য নিয়ে মারামারি শুরু করেছে। মাঝে মাঝে তার খাঁচায় পোষা পাখি ডানা ঝটপটায় : হুই সুদাস, কোথায় যাচ্ছিস, হুই সুদাস। সে ভাবে, তার বুকের ব্যথা নিয়ে সে কোথায় বা যাবে, যেতে পারে। মাঝে মাঝে রমেনের বাবার কথা মনে পড়ে : জানো সুদাস, এইসব ছোরাছুরি বন্দুক যা এই দেয়ালে সাজানো দেখছো, একসময় ইতিহাস তৈরি করেছিল। ইতিহাস—সব ইতিহাস। কাসেম মিঞার আস্তাবলে সেই একক প্রতীকের মত রোগাপটকা ঘোড়াটা, চোখে ঠুলি বাঁধা, মাঝে মাঝে কাঠের মেঝেতে পা ঠোকে, মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে মাছি তাড়ায়; কিন্তু প্রায়ই অ্যাঁ—হু‍ঁ—হু‍ঁ—হু‍ঁ ডেকে কিসের বিরুদ্ধে যেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখে। কাসেম মিঞা বিড়ি টানতে টানতে বলে : আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাল শেষ হয়ে যাচ্ছে খোকাবাবু, খুব সাবধান, ঝিলের দিকে অন্ধকারে যেওনি।

সুদাস হাঁটতে হাঁটতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, দ্যাখে সে এক দিক-দিগন্তহীন জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে, তার সামনে সেই পুরনো কেল্লার অবয়ব। সে সেইদিকে যন্ত্রচালিতের মত এগোয়, এগোতে থাকে। তার তখন গাছের ডালে ঝোলানো সেই শবটির কথা মনে হয়। মনে হয়, সারাসময় সে এক অসহ্য ব্যথা বুকময় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে ঠিক করে, এই নির্জন জ্যোৎস্নায় এই পুরনো কেল্লার ভৌতিক চত্বরে তার অস্বস্তিকর অস্ত্রটি বিসর্জন দিয়ে চলে যাবে। সে ভাবে আমি ঠিক চলে যাব। চলে গিয়ে সেই নীলকণ্ঠ পাখির ডাক শুনতে আসা হাতে বাসি রক্তের দাগ মানুষদের দঙ্গলে মিশে যাব। এইসব ভেবে সে ক্লান্ত হয়ে সেই প্রাচীন কেল্লার ভাঙা সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। রমেনের বাবার কথা মনে হয় : ইতিহাস—সব ইতিহাস। কাসেম মিঞার কথা মনে হয় : আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে; আমিও মরব, আমাদের এই বুড়ো ঘোড়াটাও মরবে। ঘোড়াটার ঠুলিবাঁধা চোখ থেকে এখন টপটপ করে কান্না ঝরতে থাকে—কাসেম তার রোগা পাঁজরায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রবোধ দিতে চায়। সেইসব চোখের জল আর মৃত শরীরের নাক থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত

মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। চাঁদ ডুবে যায় ক্রমে, অন্ধকার সেই প্রাচীন কেল্লার দেয়ালে ঘন হয়। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সন্দাস চিৎকার করতে থাকে : আমি এ চাইনি—আমি চাইনি। সে শিথিল হাতে ছোরাটাকে বের করে কেল্লার অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দ্যায়; আর দিতে গিয়ে দ্যাখে, সেই দেয়ালে, সেই প্রাচীন কেল্লার দেয়ালে, অসংখ্য হাত—অসংখ্য ব্যাকুল হাত রক্তের অক্ষরে নিজেদের পাঞ্জার ছাপ রেখে গিয়েছে।

# কবিতায় শ্রাব্যকল্প ও তার অনুষঙ্গ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে—

সুরেশ সমাজপতি বুঝতে, ধরতে, অনুভব করতে পারেননি এর কুহক। দীক্ষিত হতে পারেননি এর মন্ত্রবৎ অপ্রতিরোধ্যতার কাছে। স্বাভাবিক। কেননা তিনি তো একথা জানেননি যে ঐতিহ্যগত কাব্যভাষা আমাদের উপলব্ধিকে সংগঠিত করে এক অন্বয় রৈখিক বিন্যাসে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তখনই তো আধুনিক কবিতা লিখছেন। লিখছেন সেই ভাষায় যে ভাষায় কবিতা শুধুই পাঠকমনে সঞ্চারিত হয় না—পাঠককে দীক্ষা দেয় এক ব্যক্তিগত নৈর্ব্যক্তিকতায়। বাক্‌নির্মিতি (syntax) এবং শাব্দ অভিজ্ঞানে এ তখন হয়ে উঠেছে গভীরের বাণী। ছিঁড়ে ফেলছে পুরানো আলঙ্কারিক ন্যায়ক্রম। যে-নীরবতাকে বাণীমূর্তি দানের জন্য এই আয়োজন, সে শুধু অরবতা নয়, বিবর্ণ যূথচারী জীবনের ব্যক্তিবৈশিষ্টহীন কলরবের বিপরীতেই শুধু এ নীরবতা অনুভবগম্য। এ নীরবতা আধুনিক কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান। 'নিলাজ নীল' এই অভিপ্রায়ী অভিব্যক্তির মূলরহস্য এইখানে। আজ এসব কথা আমাদের কাছে যত সহজে মীমাংসিত হচ্ছে সেদিন এ মীমাংসা তত সহজ ছিল না।

বাক্‌নির্মিতি এবং শাব্দ অভিজ্ঞানে যে পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ঘটিয়েছেন তা কমবেশী ঊনবিংশ শতকের বিদায়ী বেলার সমুদ্রপারের কবিদেরও অন্বিষ্ট ছিল। পুরানো আলঙ্কারিকতা ও বর্ণনারীতির সঙ্গে একালের নতুন মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ব্যবধান সম্বন্ধে কবিরা অবহিত হয়ে উঠছিলেন। ব্যক্তিসত্তা বাইরের জগতের বিবর্ণ পৌনঃপুনিকতায়, সমষ্টির পিপীলিকাকল্প যৌথ অস্তিত্বচর্চায় যতই নির্বেদ অনুভব করেছে ততই সে নিজের গহন স্বরূপের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ততই তার কাছে স্পষ্টরেখ হয়ে ওঠে অস্তিত্বের যন্ত্রণাময় উপলব্ধি। নতুন কালের কবিদের মধ্যে র‍্যাঁবো, মালার্মে এবং নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ অনুভব করেছিলেন ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তিতে ভাসিত স্বরূপের দুর্মোচনীয় রহস্য। ধীরে ধীরে শুধু হৃদয় নয়—ব্যক্তির ভবিতব্যই হয়ে উঠল কবিতার বিষয়। বস্তুর প্রত্যক্ষতা-লব্ধ রূপের মধ্যে রয়েছে এক সীমিত বাস্তবতা; সে বাস্তবতাকেও আবার ব্যক্তিত্ববিনাশী শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী অনিবার্য যান্ত্রিকতা গ্রাস করেছিল। তখনই আরো এক গভীরতর বাস্তবতার খোঁজ শুরু হয়েছে। সে বাস্তবতা ব্যক্তিরই আন্তরসত্তার গূঢ়তর বাস্তবতা।

এটা যদি য়ুরোপের পক্ষে সত্য হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে এটা দুবার করে সত্য। এখানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে একল্পেই জাত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অমল পিপাসা, আর তার বিকল্প শ্যামদেশীয় যমজ বিবর্ণ ঔপনিবেশিক যান্ত্রিকতা। রবীন্দ্রনাথের অতিসচেতন বয়ঃসন্ধির স্বপ্নময় আর্তিকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই স্বদেশবীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষার পটভূমিতে। য়ুরোপের জীবনের স্বাধীনতার আবেগময় প্রভাব ও দেশজজীবনের নিষেধাত্মক সহস্র চৌকাঠের স্মৃতি প্রায় তাঁকে ভারসাম্যচ্যুত করে ফেলেছিল। বাস্তবের যোগাযোগে প্রতিভাই

তাঁকে বাঁচিয়ে দিল শেষটা। তিনি প্রথম য়ুরোপ প্রবাসের অন্তে দেশে ফিরে খুঁজতে গেলেন তাঁর 'শব্দ' অর্থাৎ তাঁর বাস্তবতা।

শব্দই কবির অভিজ্ঞতা। তাঁর বাস্তবতা। কবিতা অভিপ্রায়ী অভিব্যক্তি বলেই কবি খোঁজেন অমোঘ শব্দকে। যাকিছু আছে তা অমোঘ শব্দ। অমোঘ অলঙ্কার বলে কিছু নেই। শব্দ কবিভাবনায় দুই স্তরকে যুক্ত করে। এক হল চিত্র-পরম্পরা, আর হল ধ্বনির তাৎপর্য। যা দর্শনীয় তার প্রতিরূপ রচনা করা—এ যেমন তার এক কাজ, যা শ্রাব্য তার বস্তু-ধ্বনিরূপ নির্মাণ করাও তার আর-এক কাজ। দুইকে মিলিয়ে মিশিয়ে সে যখন তৃতীয় রূপ রচনা করে সে তখন সর্বোত্তম। চিত্রকল্প বলতে তাকেই বোঝানো হয় যা শব্দে অঙ্কিত চিত্র। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এ প্রসঙ্গে সার্থকতর প্রতিশব্দ সৃষ্টি করেছেন ডঃ শ্রীঅমলেন্দু বসু—'বাক্‌প্রতিমা'। আমি ধ্বনিকল্প বলতে নির্দিষ্ট করছি সেই সব শব্দগুচ্ছকে যারা শব্দের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চায় আর-এক ধ্বনিকে। এ পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের অনোম্যাটোপিয়া নয়। তা থেকে স্বতন্ত্র আর-এক কবিকৃতি। যেমন 'মধ্যাহ্ন বাতাস প্রলাপ বকিতেছিল'। এখানে বাতাসের যথেচ্ছ মর্মর প্রলাপের ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। একেই বলা যাক শ্রাব্যকল্প। এই শ্রাব্যকল্পেরও দুই রূপ : শাব্দরূপ আর আর্থরূপ। শাব্দ আধার যে কখনো কখনো অর্থসাযুজ্যে নিজেই পরোক্ষ এই ধ্বনিকল্প হতে পারে তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথে অপ্রচুর নয়। 'দুঃসময়' কবিতার 'এ যে অজাগর গরজে সাগর দুলিছে' এই চরণটির চারটি এ-ধ্বনি ও দুটি আ-ধ্বনি এক তরঙ্গকম্পন সৃষ্টি করেছে—যা চিত্রকল্পের সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত করেছে ধ্বনিকল্প। সে ধ্বনিকল্প মূর্ত করে প্রতিকূল সমুদ্রের বৈরিতাকে। গীতাঞ্জলির ২৬নং গানের 'জলধারার কলস্বরে|সন্ধ্যাগগন আকুল করে,|—নিশ্চয় জলধ্বনির শব্দকল্প। আর এর ঠিক পরে 'ওরা ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে|চল্‌রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে|—এই চরণের 'ন'-ধ্বনি ঐ তরুণীর কঙ্কন-কলসের মৃদু সংঘর্ষের ধ্বনিরূপ ভাবতে বাধা কী? শ্রাব্য-শব্দের অনুষঙ্গ ও শ্রাব্যকল্পের তাৎপর্য আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিদের কিছু কবিতার প্রসঙ্গ আকর্ষণ করবো। শ্রাব্যকল্প শব্দময় জগৎ সম্বন্ধে কবির ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অধিগত করে তোলে। শ্রাব্যধ্বনির অনুষঙ্গে তাঁর ভাবানুভূতি পায় গভীরতার মধ্যে বিচিত্রতা।

## দুই

মধ্যযুগীয় প্রভেন্সাঁয় কবি কাঠের আগুনের কান্নার সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি-প্রেমিকের কান্নাকে। এ কি শুধু তুলনাই? দান্তের ইনফার্নোর ত্রয়োদশ সর্গে বার বার শ্রুতির ব্যবহার শব্দ-প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। সেও এক শ্রাব্যকল্প।

1. As from a green branch that is burning at one end and drips and sputters from the other with escaping vapour, so from the broken stick words and bloods come together.

2. The branch then blew hard and the breath then changed to a voice.

3. And he led me to the bush that was weeping in vain from its bleeding rents. [Speech and Language in *Inferno* XIII by Léo Spitzer.]

উদ্ধৃত সকল ক্ষেত্রেই আত্মহতদের অরণ্যে রসাক্ত (=রক্তাক্ত) গাছেদের কথা, নিঃশ্বাস, কান্না আরো কত শ্রুতিগম্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে করা যায় এই অংশটি :

......When suddenly there came crashing
On our astonished ears a wild uproar
As the huntsman hears the boar and the chase dashing
Down on his port like the noise of a hurricane.
With trampling of beasts and all the branches smashing.* ,

ইন্‌ফার্নোর আলোচ্য ক্যান্টোর আধ-অন্ধকারে শ্রুতিগ্রাহ্য বাতাস-বিভগ্ন শাখার সংঘর্ষকে দান্তে ক্যান্টো-টির উদ্দিষ্ট তাৎপর্যেই ঐসব শব্দকল্পে ও প্রতীকে রূপান্তরিত করেছেন।

শেক্সপীয়রের বাক্‌প্রতিমা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রসতীর্থঙ্করেরা করেছেন। তা এখানে মনে করিয়ে দেবার সমীচীনতা নেই। কিন্তু একটি শব্দগুচ্ছের কথা আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়। গুঞ্জনাত্মক hum শব্দের সঙ্গে তাঁর নাটকে মৃত্যু, ব্যাধি ইত্যাদির যোগাযোগ এবং অনুষঙ্গ পণ্ডিতেরা লক্ষ করেছেন। Hum নিজে ধ্বনিকল্প নয়, ধ্বনি-প্রতীকও নয়। কিন্তু hum যখন তন্দ্রাচ্ছন্নতা, নিদ্রা এবং মৃত্যুকে আকর্ষণ করে তখন তা হয়ে ওঠে অনুষঙ্গবাহী ধ্বনিকল্পনা।

সচেতন পাঠক লক্ষ করেছেন হোয়েলডারলিনের The Archipelago কবিতায় ধ্বনি-কল্পের ব্যবহার। কবির নব্য ক্লাসিক রূপভাবনায় এরা দেখতে দেখতে হয়ে উঠেছে শাব্দ-প্রতীক। 'The Cyprian liquar gushes from the drunken hill', 'the subterranean thunder', 'their nocturnal song' প্রভৃতি, অথবা এই সমস্ত বাক্‌বৈভব— 'you think yourself lonely; in the hushed night the rock hears your lament' —অথবা কলরবমন্দ্রিত বন্দরের ধ্বনিস্মৃতি, নোঙর তোলার শব্দ, ঢেউয়ের কলধ্বনি, নদীর প্রপাতশব্দ এই কবিতার সুদূরস্পর্শী নব ক্লাসিক পরিবেষকে সার্থকতা দিয়েছে। দান্তে অথবা হোয়েলডারলিন চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দুইকেই তাঁর বিস্তৃত রূপ-নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শব্দকল্পের প্রয়োগকে কেউই কোনো সময়েই যথেচ্ছ হতে দেননি। তাঁরা উদ্দিষ্ট তাৎপর্যের সীমা কোনো সময়েই লঙ্ঘিত হতে দেননি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও শ্রাব্যকল্প এই প্রকারের শৈল্পিক অন্বেষারই বশবর্তী। 'চিত্রা' কাব্য থেকে মাত্র কতকগুলি শ্রাব্যকল্পের ব্যবহার লক্ষ করা যাক :

(ক) অধীর মর্মরে
শিহরি উঠুক বন মাথার উপরে

(খ) সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রুমন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায়।

(গ) নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন।

(ঘ) যে শব্দ তাহার পরে
চুম্বনের মতো পড়ে

* Canto XLLL/Comedy of Donte Alighieri—Translated by Dorothy L. Sayers.

নীরবতা রূপে

(ঙ) স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল ক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর,

(চ) নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্যসঙ্গীত
নক্ষত্রসভায়

(ছ) শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে
কাঁকনে।

(জ) সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়নতলে।

(ঝ) বহু বনগন্ধ বহে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস, কান্না, শিহরণ, মিনতি, প্রলাপ প্রভৃতি ধ্বনিপ্রসঙ্গ আবেগঘন মানসিক অবস্থার চূড়ায়িত অবস্থার সূচক। একমাত্র 'চ'-চিহ্নিত উদ্ধৃতিটি ছাড়া বাকি সমস্ত শ্রাব্যকল্পই অপ্রাপ্যের জন্য আকুলতাকে ফুটিয়ে তুলছে। সেইজন্যই ভাবাতিরেক কখনো কখনো যে ঘটেনি এমন নয়। লক্ষণীয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলিকে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে রাখা যায় এবং অধিকাংশ বস্তু-ধ্বনিকল্পই কবিতাগুলির মূল ভাবনাদীপক বাক্‌প্রতিমাবলীর অনুগত। শ্রাব্যকল্পই এসব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কবিতাগুলির সমান্তরাল অর্থকে বহন করে এগিয়ে গিয়ে কবিতার শাব্দ অর্থকে ছাড়িয়ে গেল না। বরঞ্চ সে তুলনায় এদের কিছুটা পূর্বে লিখিত 'গানভঙ্গ' কবিতার এই শ্রাব্যকল্পটি স্মরণীয় :

হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে
হেলার কলরব শিলার মতো চাপে সে উৎসের মুখে।

এ শ্রাব্যকল্প এখানে সমগ্র কবিতার বাগর্থকে এবং অর্থাতীতকে ধারণ করে আছে। রবীন্দ্রনাথ কত নিবিষ্ট এবং ভাবুক শিল্পী তা বোঝা যায় এই কবিতার অন্য বাক্‌প্রতিমাগুলির দিকে তাকালে। এ কবিতার বিবরবস্তুই ধ্বনি। একজনের একদা উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর যা কালের প্রহারে জর্জরিত, বিপন্ন তাই এখানে কবিতার বিষয়। সেই ব্যক্তির কারুণ্যকে কবি মূর্ত করেছেন বাক্‌প্রতিমায়।

কাঁপিয়া ক্ষীণস্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।

এখানে ধ্বনি-কল্প নেই, যা আছে তা চিত্রকল্প। কিন্তু আছে শ্রাব্যকে দৃশ্য করার প্রয়াস।

শ্রাব্যকে দৃশ্য করে তুলতে গিয়েই কবিতাটিতে এল সেই কালজর্জরিত ব্যক্তির অনিবার্য ব্যর্থতার তৃতীয় স্তর। তবু, একে আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে ধারণ করতে পারি না। এ চিত্রকল্পই, আর বেশি কিছু হবার প্রয়োজন এর ছিল না।

কিন্তু একথা খাটবে না 'পরিশোধ' কবিতার ক্ষেত্রে। সেখানে শ্রাব্যকল্পের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে কবিতাটির উদ্দিষ্ট রসরূপ, তার পাত্র-পাত্রীর টেনশন, গড়ে উঠেছে কবিতাটির নাট্যমান। ধ্বনিকল্পগুলি পরিণামমুখী কাহিনীধারায় এনে দিয়েছে নানা নাটকীয় ইঙ্গিত এবং সঙ্কেত। সেগুলি এই :

(ক) রমণীর উচ্চ হাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্যে শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি।

(খ) দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ উৎসব গান।

(গ) তন্দ্রাঘন বটশাখা 'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষনীড় গীতশব্দহীন;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘদিন।

(ঘ) ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো।

(ঙ) অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ।

(চ) শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতিক্ষণে।

(ছ) বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম আকূতিস্বর।

প্রথম শ্রাব্যকল্পটি থেকেই মূল নাট্যগতি পেয়েছে দ্রুতবেগ। দর্পণ বা কাচপাত্র ভেঙে পড়ার শ্রাব্যকল্পে সঙ্কেতিত হল শ্যামার অশুভ পরিণাম। তার জীবনের অকস্মাৎ মোড় ফেরায় ভেঙে গেল তার এতদিনের অভ্যস্ত রঙিন কাচপাত্র। দ্বিতীয় ধ্বনিপ্রসঙ্গ শ্যামাকে দিল একান্ত ক্ষণস্থায়ী এক আশ্বাস। কিন্তু আসলে এ শুধু প্রস্তুত করে তুলল তৃতীয় ধ্বনি-প্রসঙ্গের বিপরীত পটভূমি। তৃতীয় ধ্বনিপ্রসঙ্গের মূল অর্থ হল চতুর্দিকবর্তী নীরবতা। এই অকর্মক নীরবতার মাঝখানে শুধু শ্যামার লোভ বা কামনাই ছিল গুঞ্জনশীল। তাই 'অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘদিন'। এই গুঞ্জনের সঙ্গেই মিশে রয়েছে আশঙ্কা ও অনু-শোচনায় মেশা শ্যামার অনুভূতি। এর পরে শ্যামার সেই বিদারক স্বীকারোক্তির প্রাঙমুহূর্তেই উচ্চারিত হল চতুর্থ শ্রাব্যকল্প। 'বীণার তন্ত্রীর মতো'—এই শ্রাব্যকল্পের সাহায্যেই ব্যক্ত হল শ্যামার প্রত্যাশার ক্ষীণ কিন্তু তখনো অনিঃশেষ অবশেষটুকু। এর পরেই নেমে এল সেই

ভয়াবহ অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান। পঞ্চম প্রসঙ্গটি আসলে নীরবতার ভাবচ্ছবি। কিন্তু কাহিনীর সুকঠিন পটভূমিকায় এ নীরবতাও বাঙ্ময়। ষষ্ঠ ধ্বনিকল্পে আমরা যেন শুনতে পেলাম শ্যামার স্খলিত বাসনার অন্তিম হাহাকার।

একটা নিশাচরী পাপবাসনার অন্ধকারে এ কবিতার পটভূমি প্রধানত সমাচ্ছন্ন। যেন প্রধান বিষয় সবই অন্ধকারে ঘটমান। তাই দর্শনীয়ের থেকে শ্রাব্যের তাৎপর্য এখানে অধিকতর। শুক্ল পঞ্চমীর চান্দ্র আশ্বাস মধ্যরাত্রের পূর্বেই বিদায় নিয়েছে—শ্যামার বাসনার মতোই। তার আগে-পরেও অন্তর-বাহিরের এক দুর্মর অন্ধকারে শোনা গেছে অর্ধব্যক্ত ঐ সব ধ্বনিপুঞ্জ—যা শ্রাব্যেরও অতিরিক্ত এক বিশ্ববিধানের দিকে পাত্র-পাত্রীকে আকর্ষণ করছে। সে অন্ধকারে সবই অদৃশ্য, শুধু :

> অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
> অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
> বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
> মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
> বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
> অন্তিম কাকুতিস্বর;

এইখানেই শ্যামার চরম অভীপ্সার শেষ নির্বাপণ। তৎক্ষীম্ভূত সেই প্রাকৃতিক সাক্ষীর দল নিজেদের শঙ্কিত নীরবতায় ফুটিয়ে তুলল শ্যামার শেষ ব্যর্থ আকুতি। এ নীরবতা শ্যামার পাপেরই মতো দুর্বহ।

## তিন

আঁখির যা গ্রাহ্য আর শ্রুতির যা স্বাদ্য কবিতায় কখনো কখনো তার এক সুমিত প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাই প্রয়োগের ফলে শুধু যে অভিব্যক্তিতে আসে এক সুসমতা তাই নয়—ভাবের বা কাব্যিক চিন্তার নিশ্চলতা ঘুচে যায় এই শব্দকল্প ও চিত্রকল্পের গূঢ় ঐক্যের ফলে। 'দুঃসময়' কবিতাটির প্রথম স্তবকের চিত্রকল্প ও দ্বিতীয় স্তবকের ধ্বনিপ্রসঙ্গ, আবার তৃতীয় স্তবকের চিত্রময়তা ও চতুর্থ স্তবকের ধ্বনিপ্রসঙ্গ কবিতাটির ভাবগত আর্তিকে দিয়েছে এক অভিপ্রায়ী অভিব্যক্তি। বিভিন্ন শব্দানুষঙ্গও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। কবি জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যমালায় যেসব অনুষঙ্গসৃজনী শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে তা এই : 'সমুদ্র সফেন', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে', হাওয়ার শাঁই শাঁই 'সিংহের হুঙ্কার', 'পিস্‌টনের উল্লাস' চিলের কান্না এবং বুনো হাঁসের পাখার শব্দ, 'একটা অদ্ভুত শব্দ', 'নদীর ছল্ ছল্ শব্দ', 'কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদ', 'পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে', 'ফেনিল শব্দে', 'মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে', 'সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন'। শিশিরের শব্দ শুশ্রূষার অনুষঙ্গবাহী। হাওয়ার শাঁই শাঁই পিস্‌টনের উল্লাস তির্যকভাবে অপরিপূর্ণ রিয়্যালিটিতে বন্দী অস্তিত্বের স্মারক। পায়রার ডাক ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার ভাববহ। মক্ষিকার গুঞ্জন দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনির অনুষঙ্গ ফুটিয়ে তুলেছে কালগত সুদূরতার ব্যঞ্জনা। সিংহের হুঙ্কার আর বন্দুকের শব্দ সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বের ও নশ্বরতার সঙ্কেতবাহী। চিলের কান্না অপ্রাপ্যের জন্য চিরকালীন কান্নার প্রতিভূ। বাংলা ভাষার প্রচলিত রীতি ভেঙে 'ছল্ ছল্' এই ধন্যাত্মক শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঘুম-স্বপ্ন-বাস্তব জগতের এক নিষ্ঠুর সংঘর্ষে এই কবিতার ভাবভূমি গঠিত। বুঝিবা নদীর অদ্ভুত ভাষায় তারই উপযুক্ত ভূমিকা। আর এই সব কিছু একত্র মেলালে আমরা বনলতা সেনের জীবনানন্দকে পাই, যে জীবনানন্দ সৌন্দর্যবিধুর, হেমন্তে বিষণ্ন কিন্তু উৎক্রান্তির জন্য ব্যাকুল, ব্যাকুল কিন্তু শান্ত, যে জীবনানন্দ সভ্যতার সাম্প্রতিকতায় ক্লান্ত, কিন্তু সেই ক্লান্তির মধ্যেও দিকহারা নয়। সে একক পথিক পথের শেষ পাবে না বটে কিন্তু তার দীর্ঘ পথ-স্মৃতি বর্ণ-গন্ধ-ধ্বনির অমিত বৈভবে পূর্ণ। স্মৃতি, স্মৃতি—তার মতো বিষণ্ন সঙ্গিনী আর কে?

বাস্তব জগতের শব্দের অনুষঙ্গ-সৃজনী ক্ষমতায় জানা যায় কবির মনোজগতের ঐতিহ্যবাহিকতাকে, জানা যায় আন্তর সম্পর্কে গ্রথিত তাঁর জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে। 'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থের 'চৈতে-বৈশাখে' কবিতায় বিষ্ণু দে বৃষ্টিপাতের শব্দানুষঙ্গে স্থানিক ও কালিক পরিক্রমা আরম্ভ করেন। মনের মাটিতেই শেষটা মিলিয়ে দেন দেশ-কালের সীমাকে। আর, নিজস্ব শিল্পস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্যে তিনি এটা সম্পন্ন করেন সেটাও লক্ষণীয়। মূর্তকে বিমূর্তায়নের দিকে তিনি ঝোঁকান না বলেই বস্তু তাঁর হাতে বস্তুরূপ না হারিয়েও শোনাতে পারে এক গাঢ়তর ও গভীরতর ভাষণ। অনচ্ছকে তিনি স্বচ্ছ করে তোলেন না। কিন্তু তাকে স্থাপনা করেন এমন পরিপ্রেক্ষিতে যে দৃশ্যকে তা নতুন আলো-ছায়ার কাটা-কুটিতে রূপান্তরিত করে। শ্রাব্য প্রসঙ্গেও সেই একই ব্যাপার। তাই 'বৃষ্টি পড়ে পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে', 'ছাতে ও ছাতায়', 'ঈশান হাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে'—কিন্তু এরই মধ্যে যখন 'নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বন্ধ্যা মাতা বসুন্ধরা ঝলকে সজল হাস্যে', তখন সত্যই বৃষ্টি-স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শ পাই। সে স্পর্শই আমাদের নিয়ে যায় 'বড়ু চণ্ডী-দাসের প্রাঙ্গণে'। ধারাপতনের শব্দের অনুষঙ্গে একালের ঐতিহ্যসচেতন কবির হাতে কালে কালে রাখী-বন্ধন শিল্পিতায় নিবিড় হয়ে ওঠে :

রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ লক্ষ মানস বলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে
অণরোণীয়ান
কিংবা যেন বঁধুয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

তখন বাংলার আবহমান প্রকৃতিই দেখতে দেখতে হয়ে ওঠে উজ্জীবনের প্রতীক। তখন সে আরেক কালের রেশকে জীবিত করে, স্পর্শ করে এ-কালকে, ডাক দেয় ও-কালকে।

## চার

রবীন্দ্রনাথের 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে শ্রাব্য প্রসঙ্গগুলি লক্ষণীয়। শ্রাব্য প্রসঙ্গগুলির মধ্যে তুলনায় অধিক সংখ্যক ব্যবহৃত হয়েছে দ্বার খোলার বা দ্বারে আঘাত করার শব্দ। দরজা খোলার সঙ্গে অর্ধরাত্রের একটা রহস্যময় আকর্ষণের অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে রয়েছে খেয়ার 'আগমন' কবিতা থেকে। হয়তো তার সূত্রপাত আরও আগে—চিত্রার 'সিন্ধুপারে' কবিতায়। কিন্তু এই অনুষঙ্গের সঙ্গে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে কবির গোধূলিপর্বের দ্বার খোলাকে আর-এক তাৎপর্য দিয়েছে। তারই কাব্যসাক্ষ্য সেঁজুতির 'ঘরছাড়া' কবিতায়। রাত

একটার এলার্মধ্বনি, মধ্যরাত্রের দরজায় ট্যাক্সির 'হুংকার পরুষরব', প্রহরীশালার ঘণ্টাধ্বনি—সব কিছুর সঙ্গেই মিশে গেল এক অনিবার্য ভবিতব্যের অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গই অবচেতনে ঠাঁই নিয়েছে অতঃপর। 'জন্মদিন' কবিতায় উচ্চারিত হল, 'শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে'। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে এই অপ্রতিরোধ্য ভবিতব্যবোধ ঋজু ও তির্যকভাবে এই অনুষঙ্গগুলিকে ডেকে এনেছে—দ্বার>সন্ধ্যা>সাড়া>খুলে দেওয়া>ডাক>পথ>চেনা শব্দ মিলিয়ে যাওয়া। যথা :

(ক) মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ 'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়।

(খ) সন্ধ্যাবেলায় যে দ্বারে দিয়েছ
বিরহকরুণ নাড়া
মিলনের ঘায়ে সে দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া?

(গ) কে দেয় দুয়ার রুধে
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে
সময় হলে রাজার মতো এসে
জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবি।

(ঘ) দ্বার ভাঙিবার অভিযান তার
বার বার কর হানে।

(ঙ) মোটর গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে।

(চ) এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ঐ ভক্তের মুখে

(ছ) রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে।

(জ) আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।

(ঝ) আধেক রাত্রে শুনি যেন তার—
দ্বার খোলা, দ্বার বন্ধ।

এরই সঙ্গে পরোক্ষভাবে অন্বিত হয়ে রয়েছে 'প্রতিধ্বনি'-প্রসঙ্গ, আর অর্ধরাত্রের রূঢ় জাগরণের প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত একটা কথা, রবীন্দ্রনাথের শব্দ-ধ্বনি প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রধানত যুক্ত হয়ে রয়েছে গাঢ় রাত্রির অনুষঙ্গ। এবং সে রাত্রি আতঙ্কের রঙে কালো। আর, শঙ্খানুষঙ্গে যেসব রাত্রে আতঙ্কের প্রসঙ্গ নেইও, সেগুলিও ঘন তিমিরে সমাচ্ছন্ন। যথা :

| | ॥ শঙ্খ ॥ | ॥ অনুষঙ্গ ॥ | কাব্য/কবিতা |
|---|---|---|---|
| (ক) | কার শঙ্খ...................... | কোন্ অন্ধ কারা মাঝে | চিত্রা/এবার ফিরাও মোরে। |
| (খ) | মঙ্গল শঙ্খ.................... | কম্পমান...শঙ্কিত (অন্তর) | চিত্রা/স্বর্গ হইতে বিদায় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (গ) | শতেক শঙ্খ...................... | আঁধার হইয়া গেল সে ভবন | চিত্রা/সিন্ধুপারে। |
| (ঘ) | শঙ্খরবে........................... | নিশার কুসুম | কল্পনা/বিদায় |
| (ঙ) | শঙ্খের মতন .................. | আতঙ্কে মিশি | কল্পনা/বর্ষশেষ |
| (চ) | শঙ্খে তোমার তুলো নাদ...... | স্বপন, সুখশয়ন, অবসাদ | উৎসর্গ/মরণ-মিলন |
| (ছ) | বাজা শঙ্খ বাজা................. | আঁধার ঘর | খেয়া/আগমন |
| (জ) | বাজল দূরে শাঁখ............... | রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে | ঐ |
| (ঝ) | জয়শঙ্খ.......................... | নিশার বক্ষ, আতঙ্ক | বলাকা/শঙ্খ |
| (ঞ) | ঘরের মঙ্গলশঙ্খ.............. | কালবৈশাখী, শ্রাবণ রাত্রি | বলাকা/নববর্ষের আশীর্বাদ |
| (ট) | শঙ্খ কহে........................ | ছায়ার ছায়া, নিশীথ নাচে | মহুয়া/উদ্বোধন |
| (ঠ) | শঙ্খধ্বনি........................... | ছায়া, কালি | নবজাতক/উদ্বোধন |
| (ড) | শঙ্খকুহর........................ | রাতের, গম্ভর রব, কেঁপে | সানাই/কর্ণধার |

শঙ্খ প্রতীকায়িত হয়েছে বলাকায়। তার আগে ও পরে যতবার সে কবিতায় এসেছে সে এক সচেতক শক্তির তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, অগ্নিকাণ্ডে শঙ্খধ্বনি মানুষকে সহসা সজাগ করে তোলে, বিবাহরাত্রে বধূর কাছে শঙ্খ জীবনের সমাসন্ন রূপান্তর সম্বন্ধে সচেতক। এইভাবে শঙ্খরব হয়ে উঠল এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের অনুষঙ্গবাহী। অতি পরোক্ষে 'দ্বার খোলা, দ্বার বন্ধে'র শব্দও কবিকে সচেতন করে তুলছে একটা পর্যায়ের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে। কিন্তু প্রশান্তির পটভূমিতে স্থাপিত এই সচেতনতায় স্বভাবতই কোনো উদ্বেগ আতঙ্ক নেই, যেমনটা ছিল শঙ্খরবের অনুষঙ্গে। বরঞ্চ সে আতঙ্ক ধৃত রয়েছে এই সময়ের আর-একটি, এরই সঙ্গে অন্বিত, কিন্তু, অতি গৌণ শব্দপ্রসঙ্গের সঙ্গে। সেটি ডঙ্কা>শঙ্কা।

অর্ধরাত্রের এই ডাক 'সানাই'এ বহন করছে প্রশান্ত সমাপ্তির এক সঙ্কেত। তা সর্বাপেক্ষা শিল্প-লাবণ্য পেল সানাইয়ের শেষ কবিতায়—কবিতাটির নাম 'অবসান'। ষোলোটি ছোট ছোট পংক্তিতে লিখিত এই কবিতাটি শিথিলভাবে আমাকে মনে করিয়ে দেয় এমিলি ডিকিন্‌সনের At Halfpast Three a Single Bird/Unto a silent sky* কবিতাটি। এই কবিতায় পাখির ডাক থেমে গেল, তারপর পাখি সত্তা হারিয়ে ক্রমে রূপান্তরিত হল এক আলোকময় দিবস-পরিণামে। হয়তো কবির আস্তিক্যময়ী পরমা চেতনাই জীবনের নশ্বরতা থেকে অবিনশ্বরতায় উত্তরণের এই ধারণার রূপকল্প রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের অবসান কবিতায় প্রথম আট পংক্তিতে প্রধান হয়ে উঠল "রজনীতে ঘুমহারা পাখি/একসুরে গাহিবে একাকী—/যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি/সে জানিবে, তারি নীড়হারা/স্বপন খুঁজিছে সেই তারা/যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগী।" একসুরে নিঃসন্দেহে জীবনের অন্তহীন অন্বেষার প্রতীক। প্রথম চরণের (জানি দিন অবসান হবে) 'আমি' সহজেই মুছে গেল। সেই অতলান্ত মহানীরবতার সঙ্গে তফাৎ রইল শুধু পাখির ডাকে, ঐ শেষ অন্বেষায়। 'যে শুনিবে, যে রহিবে'—উদাসীন স্বর সৃজন করেছে এক শান্ত বৈরাগ্য। 'নীড়হারা স্বপন' একালের ব্যক্তির জটিল নৈঃসঙ্গ্যের ভাষা। সেই ভাষাই ঐ একটানা পাখির ডাকে মূর্ত। তারপরেই দ্বিতীয় অষ্টকের প্রথম চরণ শুরু হয়েছে 'কিছু পরে করে যাবে চুপ'। এই

* The Poems of Emily Dickinson.

স্তবকে চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে সেই মহানিস্তব্ধতা। যে নিস্তব্ধতায় নিরবয়ব স্বপ্নও আর কখনো গুঞ্জরিত হবে না সেই চরম সমাপ্তির দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে শেষ হ'ল কবিতাটি। বিলুপ্তির ভাবনা এখানে কোনো দার্শনিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

জগৎ তো শুধু রূপময় নয়, সে বস্তু-ধ্বনিময়ও বটে। রূপের ভিতর দিয়ে রূপাতীতকে সন্ধানও যেমন চলছে, বস্তুধ্বনিপুঞ্জের ভিতর দিয়ে তেমনই চলছে ধ্বনির অতীত এক নীরবতাকে সন্ধান। এ নীরবতা নেতিবাচক বা অভাবাত্মক নয়। এ নীরবতাও এক অনুভব-যোগ্য উপস্থিতি। 'অবসান' কবিতাটির পাখির একটানা সুরের অনুষঙ্গে সেই নীরবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হল। যন্ত্রব্যঞ্জন এই কবিতায় থেকেও নেই। আর নেই 'আমি'। আছে শুধু নৈর্ব্যক্তিক নিরভিযোগ, অক্ষুব্ধ অনাসক্তি। একক পাখির কণ্ঠে পৃথিবীর ধ্বনিময়তার শেষ ভাবচ্ছবি।

# পুনর্বাসন

## দিলীপ সেনগুপ্ত

বাচ্চার হাতে বেলুন ফাটল। ঘষামাজা দুধের বালতি হাতে গোয়ালার টোকা পড়ল দরজায়। আগুনের ভাপে এই গ্রীষ্মে সকালবেলাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল জয়ন্তী, টোকা কানে যেতে ফুরসত পেল ওঠার। পাত্র হাতে দরজার দিকে যেতে যেতে 'ফাটালি তো, কিছু যদি থাকে হাতে—' বলাও হয়ে গেল নাবালক সন্তানকে।

ভোর থেকে একগাদা কাগজের সামনে আনমনা হয়ে আছে অমলেন্দু। ফেরার বাঁকে ওই মুখখানায় চোখ পড়তে জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'গুম্ হয়ে আছো যে!' তেমন কিছু না-ও হতে পারে। ছোটখাট কারণে বা অকারণেও মানুষের মুখ সময় সময় বিমর্ষ হয়। অপরপক্ষ হেলান দিয়ে বসল মাত্র। জবাব দিল না। জানালায় গা ঠেকিয়ে পায়রা ঢুকেছে ঘরে। এরাই ডানদিকে জানালার আধভাঙা কাঁচটাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেছে কাল। সেই সুবাদে পায়রা তাড়ানো অবশ্যকর্তব্য জ্ঞানেও অমলেন্দু একইভাবে বসে রইল। কথা না পেয়ে ততক্ষণে কাছ থেকে সরে গেছে জয়ন্তী। নিজের কাজে।

অমলেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁচভাঙা জানালা ভালো করে খুলে ধীর পায়ে আবার এসে বসল চেয়ারে। ও কারো থেকে কিছু কম বোঝে না। তবু, আরও নিশ্চিতভাবে বোঝা দরকার। নিজের উপলব্ধিকে অন্যেরটির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার। নিশ্বাস নিয়ে কাগজের গোছা সরিয়ে রাখল অন্য পাশে।

কিছুই ঠিক গুছিয়ে করা হয়ে উঠল না। বয়েস যে অনেক হয়ে গেছে একতলা থেকে তেতলায় সিঁড়ি ভাঙতে হলে তা টের পায়। ইদানিং দরকার থাকলেও উঁচু বাড়ি এড়িয়ে চলে। ঠিক সময় বিয়ে করে নি। কচি সন্তানটিকে একমনে বেশিক্ষণ দেখলেই উত্তাপ অনুভব করে। ছেলেটা যে কবে বড় হবে! আদৌ বড় হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগতেই বর্তমানের ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে অস্থির হয়ে ওঠে।

ঘরে তখন চড়াই ঢুকেছে। দুটো একটা গম ছড়িয়ে ছিল এদিক ওদিক। টুক করে তারই একটা মুখে পুরে একপাশে সরে পড়তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল অমলেন্দু। বেরিয়ে এল বাইরে।

বাড়ির সামনে ফুটপাথ। ডানপাশে বাজার। বাঁ পাশে আড়াই শ গজের মধ্যে স্কুল। বাঁ দিকেই ঘুরল। স্কুলের ফটক বড় একটা খোলা হয় না। তায় আজ রবিবার। প্রশ্নই ওঠে না খোলার। বন্ধ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে প্রকান্ড সাইনবোর্ডখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এই বিদ্যায়তনের নাম। বোর্ডের মধ্যভাগ ভারি কিছুর আঘাতে ডেবে গেছে অনেকটা। আবার ভাবল, কিছুই ঠিক গুছিয়ে করা যাচ্ছে না—। বারবার এই একই কথা মনে হতে থাকলে তা সত্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা—এই ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে হাঁক ছাড়ল অমলেন্দু। ফটকের ফাঁক থেকে আগন্তুক সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চিন্ত হল মোহন। তারপর দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে।

'মোহন—!' ধীরে ডাকল অমলেন্দু।

'জী—!'

'তুমি চলে যেতে চাইছ কেন?' খুব দ্রুত কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ার ফলে অপ্রস্তুত অমলেন্দু তা একটু ঘুরিয়ে নিতে চাইল। আয়োজন মাটি করে দিল মোহন, 'জী—এইসিই।' বিশ্বাস হল না অমলেন্দুর। সব বুঝতে পারছে। কিন্তু প্রাণঘাতী আতঙ্কে সেই বিশেষ উপলব্ধির প্রশ্নটিকে টেনে আনা যাচ্ছে না। তবু মোহনকে আর একটু ভাবিয়ে তোলার ইচ্ছায় বলল, 'তুমি তো জানো মোহন, এই স্কুলকে তোমার দাদা—'

'জী—হাম সব কুছ্ জানতা।'

'তবে? তোমাকে যে দরকার!'

মোহন আর কথা বলে না। ভালো লাগে অমলেন্দুর। হয়তো ফেরাতে পারবে ওকে। আরও একনিষ্ঠ করে ওর সিদ্ধান্ত একেবারে পাল্টে ফেলার আশায় 'তোমার দাদা বেঁচে থাকলে কিছুতেই স্কুল ছেড়ে যেতে পারত না, বড় ভালোবাসত—' কথা ক'টি উচ্চারণ করেই মনে হল, এ যেন প্রার্থনা। বিচার করে দেখতে লাগল অমলেন্দু।

যাবে যাক্। কারো যদি ভালো না লাগে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। অথচ ও নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে সামান্য এক দারোয়ানের দরজায় দাঁড়িয়ে যেন মিনতি করছে, থেকে যাও মোহন। তুমি গেলে চলবে না। কারও জন্য কিছু আটকায় না। এক মোহন যাবে, হাজার মোহন আসবে। এই বিশ্বস্ত সত্যটি এখন বড় অসার ঠেকল। ব্যক্তিত্বের দাপটে হাত দুখানা পেছনে করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল বটে, মুখ খুলতে পারল না আর। একদৃষ্টে বেশ খানিকক্ষণ মোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে একটুও আচ্ছন্ন করতে না পেরে ফিরে এল অমলেন্দু।

'মিটিং আছে নাকি ইস্কুলে?' পরিচিত পথচারীর এই সামান্য প্রশ্নে এত উতলা হয়ে উঠল যে জবাবই দেয়া হল না। প্রশ্নকর্তা উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে এগিয়ে গেছে।

মোহন চলে যাবে, এ বিষয় স্থিরনিশ্চয় হয়ে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। স্কুলের ভেতরে নারকেল গাছে পাতানড়ার শব্দ কানে যত না আঘাত করছে তার থেকে বেশি করছে অন্য স্থানে। সেটি ওর বুক। এই একটা স্কুলের জন্য নিজের জীবন ভণ্ডুল করে কি আর লাভ হল তবে? ঘরে ওইটুকুন ছেলে, বড় হতে না হতেই সরে পড়বে অমলেন্দু। যে ক'দিন বাঁচার কথা, অনুচ্চার কারণে তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। সকলের এই চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নিজের যে সর্বনাশ ঘটাবে, তা রোধ করবে কী দিয়ে? কে থাকবে তখন? অমলেন্দু রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। একটু সরে এল ছায়ায়। মোহনের সদম্ভ উক্তি, চলে যাওয়ার অনড় সংকল্প ওকে একেবারে কাতর করে ফেলতে পারত, যদি না তখন মনে হত, মোহনই সব নয়। অনেকে আছে। তাদের বোঝানো চাই। বোঝাতে হবে। এবারের মতো হয়তো সফল হওয়া সম্ভব।

এতদিন পরে এতখানি ও সহ্য করতে যাবে কেন? বিদ্যায়তনের সব কিছুকে ভালো-বেসে ও যদি ভুল করে থাকে, তার বিস্তৃত আলোচনা হোক।

এই আত্মসন্তুষ্টি, নিজেকে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু করার চেষ্টা অমলেন্দুকে নেহাতই ছোট আর অক্ষম করে তুলল। ও জানে, কিন্তু মন খুলে ভাবতে পারছে না। শুধু অমলেন্দু কেন, আজ ক'দিন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে যে ক'জন ছেড়ে যাওয়ার খবর দিয়েছে, তারা সকলেই সব জানে। 'অনিবার্য কারণ' বলেই খালাস হওয়া যায় না। কী সেই অনিবার্যতা—সেটি পরিষ্কার করবে কে? আর, এরা সব যাবে কোথায়?

এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে কারণ বিশ্লেষণের উদ্যোগ অমলেন্দুকে আর এক পা'ও হয়তো হাঁটতে দিত না, এইখানে, এই দোকানের বেঞ্চিতে খানিক জিরিয়ে তবে ফিরতে হত।

কিন্তু কোথা থেকে একটা দুর্বোধ্য আহ্লাদ ওকে স্কুলের সামনে আর এক দণ্ডও দাঁড়াতে না দিয়ে সামনে হাঁটাল। অমলেন্দু চলল আগের তুলনায় অনেক বেশি সপ্রতিভ তালে।

'আমার সঙ্গে আলোচনা না করে হঠাৎ রেজিগনেশন দিয়ে বসলেন যে?' দোতলার ঘরে বিশ্বাসবাবু বারকয়েক অমলেন্দুকে বসতে বলা সত্ত্বেও অমলেন্দু বসে নি। দাঁড়িয়ে, বুক সোজা করে প্রশ্ন করল।

'আলোচনার কী থাকতে পারে—আমি তো ডিসিশন নিয়েই—'

এই জবাবের পর আর কিছু বলার থাকবে না, এটাই বিশ্বাসবাবুর আশা। তবে তা মিলল না। 'আপনাকে যদি না ছাড়া হয়?' সোজা প্রশ্ন। গলা একটু ধরে গেছে। স্বরের তীক্ষ্ম কাঠিন্য মাঝখানে ভেঙে গিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি।

'আমি নিরুপায়।' বিশ্বাস সামান্য হাসলেন।

'কিন্তু কেন?'

'এই রকম অবস্থায় আমি কিছু বলতে পারবো না।'

'কিরকম অবস্থা?' এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের সামনে অবোধ একটি শিশু হয়ে দাঁড়াল অমলেন্দু। শিশুসুলভ ভয়ে কাটাল কিছুক্ষণ। বলে না ফেলে বিশ্বাস, 'আপনিও তো জানেন তা।'

'কী যে হবে বিশ্বাসবাবু!' প্রথমবার আস্তে, দ্বিতীয়বার আর্তনাদের মতো আবার 'কী হবে বলতে পারেন?' চিৎকারেও একটি কথাও বললেন না বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রশ্ন দুটি অমলেন্দুকে যথেষ্ট কাহিল করতে পেরেছে। এই সন্ত্রস্ত জিজ্ঞাসা অমলেন্দুর গোটা দেহের সব জোর নিঃশেষ করে ফেলল প্রায়। নিজের এই জিজ্ঞাসা, এক ভয়ানক উক্তির সমান। এর কোন জবাব হয় না। আবার এত বড় সংশয়কে মেনে নেওয়া মানে অবস্থার একেবারে পতন ঘটানো। এ তো অমলেন্দুর ধারণা! বিশ্বাস কিছু বলুক।

'আমার নিজের কোন ত্রুটি—?'

চোখের সামনে অমলেন্দুর এই দুর্দশা বোধ হয় সহ্য করতে পারছিলেন না বিশ্বাস। প্রবোধ কোথাও নেই, তবু চেষ্টা করলেন, 'ছি ছি—ওকথা বলবেন না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি ব্যক্তিগত কারণে।' এত মিথ্যে সওয়া যায় না। চুপ করে থাকলেই তো পারত!

এই ভীরু বাক্যের পর অমলেন্দু আর বসতে চাইল না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সেই কখন স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে আহ্লাদটুকু ওকে এতদূর হাঁটিয়ে আনতে পেরেছে, তার কথা ভাবল। খুঁজে দেখবে, সে অবসর নেই। ধীরে ধীরে দৃষ্টিহীন হয়ে যাচ্ছে। আগে তা ফিরিয়ে আনা সব থেকে জরুরী।

গেল মোহন। বিশ্বাসও থাকল না। আর—, দুঃখে ভেঙে পড়ার আগে শেষবারের মতো আর একটা চেষ্টা করে দেখলে হয়। আবার সেই আহ্লাদ। এবারে সূত্রটি খুঁজে পায়। মোহন আর বিশ্বাসই সব নয়। আরও আছে। যারা লিখেছে, আমরা আর থাকছি না। আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

ভালো মজা। হেসে ওঠার কথা। কিন্তু হল উল্টো। অমলেন্দু গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করতে চাইল, কে আমি? আমাকে বলছো কেন? যার যেমন চলে যাও।

এই অবিন্যস্ত ভাবনার মধ্যে আহ্লাদটুকু ডুবে গেল। অমলেন্দু সামান্য হেঁটে পুরনো মন্দিরের সামনে বন্ধ ফটকের দিকে চেয়ে রইল একমনে। অন্য সময় হাত জোড় করে প্রণাম করে, এখন আর হাত দুখানা তুলে একত্র করার পরিশ্রমটুকু করতে পারছে না।

সকলে চলে যাবে। হায় ভগবান! স্কুল আর থাকবে না। স্কুল বাড়িখানা, এত কষ্টের গড়া বিদ্যায়তন শরণার্থীর শিবির হয়ে উঠবে। আজীবন শরণার্থী হয়ে থাকবে অনেকে। তার মধ্যে থাকবে মোহন, থাকবে বিশ্বাসবাবু, এই স্কুল-ত্যাগী অন্য সকলে। অমলেন্দু সরকার আর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, এই দুটোকে অভিন্ন করে তোলার যে তাগিদ একটু আগেও ছিল, আচমকা এক ধাক্কায় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় যখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, বর্ণনাতীত দুর্বোধ্য কারণে নুয়ে পড়ছে মাটিতে, তখন তার সংগে একাত্মবোধ মানে নিজেকেও ক্ষুদ্র করা। মন্দিরের দরজা খোলা থাকলে আছড়ে পড়ত, 'বলো মা—এত সব হল কী করে?' পাংশু চোখ দুটো তুলেই আর এক পদত্যাগীকে দ্রুত-পায়ে হেঁটে যেতে দেখে অমলেন্দুর মনে হল, মন্দিরের দোরগোড়ায় ওর দুঃখে কাতর হয়ে দেবী যেন পরিত্রাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। পূর্বতন আনন্দবোধ আবার একটু ফুলিয়ে দিল অমলেন্দুকে। দ্রুতগামী প্রাণতোষবাবুকে গলা ছেড়ে ডাকতে গিয়ে আর ডাকল না। এই আনন্দ যদি না থাকে!

ঘরের দিকে ফেরা ছাড়া পথ নেই। বড় রোদ্দুর। তবু গা করল না।

দোকানপাট বন্ধ হয়ে আসছে। বেলা অনেক হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় কোথায় কাটিয়ে এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হাঁটা থামিয়ে স্থির মনোযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বন্ধ দরজা। মাথার ওপরে সাইনবোর্ড ঝুলছে। আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। মধ্যভাগ ডেবে আছে গর্তে। টিনের সাইনবোর্ড। চকচক করছে রোদে। এই ক্ষতস্থানটুকু না থাকলে চমৎকার দেখাত, আছে বলে তাকান যায় না। 'সারকামসটেন্স', গুপ্ত কারণ, ভয়-বিহ্বলতা, পদত্যাগের ভূমিকা, অতীত ও বর্তমান সব কিছু বিক্ষত সাইনবোর্ডের অবাঞ্ছিত অংশে ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকল।

তারপর আরও বেশিক্ষণ দেখে দেখে এই প্রচণ্ড দাবদাহে ঘূর্ণায়মান অমলেন্দু সাইন-বোর্ডখানাকে পুড়তে পুড়তে পিণ্ড হয়ে খসে পড়তে দেখল মাটিতে। এই উৎকট দৃশ্য দেখার জন্যে এতক্ষণের আয়োজনে যতই প্রস্তুত থাকুক না কেন, মুখ সরিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল অতর্কিতে।

এইখানেই শেষ না হয়ে দৃশ্যান্তর আরও বিকট হয়ে উঠল। মাথার তালু এতক্ষণের তাপে জ্বলছে। ছায়ায় অনেকক্ষণ দাঁড়াতে পারলে শীতল হওয়া যায়। কিন্তু বেলা এমন এক স্থানে পৌঁছে আছে, যখন নিজের চারপাশে এক বিন্দু ছায়া খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। দেহের চূড়ার আগুন ক্রমশ শাখা বিস্তার করল চারপাশে। স্কুল-ভবনটি জ্বলে উঠল হঠাৎ। তারপর জ্বলতে জ্বলতে যখন প্রায় সব পুড়তে বসেছে, তখন উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল। চারপাশে অভিজ্ঞ, নিরুৎসাহ ও গণ্যমান্য দর্শক। দেখছেই কেবল। মুখে কিছু বলছে না। এইভাবে সকলের চোখের সামনে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিনাশ ঘটল।

আর একটি তুমুল আর্তনাদের পর কোন এক দিকে পা বাড়াতেই বাম ও দক্ষিণ দুই হাত ভীষণ ভারাক্রান্ত ঠেকল। ত্রস্ত দৃষ্টি দুইপাশে চালিয়ে অমলেন্দু ওর দুই প্রিয়জনকে দেখতে পেল। ওর দুই হাতে দুজনে কাঁপছে। এক হাতে জয়ন্তী, অন্য হাতে বাবলু—দুই-দিকে দুজনকে নিয়ে অমলেন্দু হাঁটতে লাগল অন্য কোন আশ্রয়ের খোঁজে।

# প্রস্তুতির দিনকাল

**বরেন ভট্টাচার্য**

দ্পুর বেলা খাওয়া দাওয়া সেরেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে রমেন। ইদানীং সে লক্ষ করেছে খাওয়ার পর একটু ক্লান্ত বোধ করে, স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলে। কাজেই এ সময় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই সবচেয়ে আরাম বোধ করে। তবু কিসের আকর্ষণে যে বাইরে বেরিয়ে আসে সেটা ঠিক নির্দিষ্ট ভাবে জানে না রমেন। এখন রমেনের প্রত্যাশা একটা সিগারেটের। কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকায় মোড়ের দিকে চলেছে কোন বন্ধুর উদ্দেশ্যে। বেশ কদিন ধরেই ওর সারাদিনের সিগারেটের খরচ বন্ধুদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে যে দুটো সিগারেট-এর দোকান আছে তারা কেউই আর সিগারেট ধারে দিতে রাজী নয়। অন্তত দু-মাসের বেশি হয়ে গেছে ধার শোধ করা হয়নি। এখন ওদের কাছে গেলেই একগাল ইঙ্গিতবহ হাসি হেসে ওঠে। রমেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেও খুব একটা চিন্তা করে না তা নিয়ে। এক সময় দিয়ে দেয়া যাবে, এই রকম কিছু ভেবে নেয়। রমেনের সিগারেট বাদে বাড়তি কোন খরচ নেই। কিন্তু সিগারেটের এই সামান্য খরচও হাতে থাকে না, সেজন্যে ওর ক্ষুব্ধ হবার কথা, কিন্তু এসব ভাবনা ওকে বেশিক্ষণ চিন্তিত করে না। কারণ রমেন দরিদ্র হলেও তার অভাববোধে তীব্রতা নেই।

রমেন শারীরিক দিক দিয়েও দুর্বল। অম্বলটম্বলে প্রায়ই ভোগে। এখন সিগারেট ধরালে মাথাটা ঝিম ঝিম করবে। হেঁটে বেড়ালে শরীর আরো খারাপ লাগে। অথচ রাস্তায় বেরলে মানুষজনের হাতে দোকানে সিগারেট দেখলেই সিগারেট খাবার ইচ্ছা প্রবল ওয়ে ওঠে।

ওরা যে রকটায় বসে রোজ সকাল-সন্ধে আড্ডা মারে সেটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে রকটা। কারোরই থাকার কথা নয়। তবু কি ভেবে তাকিয়ে ছিল রমেন জানে না। হয়ত অভ্যাসবশেই। বন্ধুদের বেশির ভাগই বেকার। কিন্তু কোথায় যে এই দুপুরে গায়েব হয়ে যায়। একটু এগিয়ে মোড়ে পৌঁছে গেল। কারো দেখা পেল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে পাউডারের ছাপ-স্পষ্ট ম্যাটিনী শো-এর যাত্রিণী চলেছে ব্যস্ত ভাবে। কিছু ঘর্মাক্ত শরীর সামনে দিয়ে চলে যেতে রমেন এগিয়ে গেল। আজকাল রমেনের প্রতিটা দুপুরই এইরকম অনির্দিষ্টভাবে কেটে যায়। কোন দিনই ওর এমন কোন কাজ থাকে না যা নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায়। আসলে খুঁজে দেখলে উঞ্ছ কাজ অনেক পাওয়া যায়। বন্ধুদের অনেকেই পাড়ার পুজো, ফাংশন ইত্যাদি কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেগুলোকে রমেন এক কথায় ফালতু বলে এড়িয়ে যায়, যে কারণে পাড়ার লোকেদেরও ওকে হাতে রাখবার জন্য কোন মাথাব্যথা নেই। এবং রমেনও আদৌ কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। রমেনের জীবনটা সরল হতে পারত। কিন্তু জটিলতা-সরলতা কোন ব্যাপারেই ওর কিছুমাত্র ভাবনা নেই। মোটকথা নিজেকে নিয়ে ও কিছু ভাবে না। পোশাক-পরিচ্ছদে সে অত্যন্ত সাধারণ। দিনে দুটো ট্যুইশানী করে। এবং মাসের শেষে শ-খানেক টাকা সংসারে দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বৃত্তি যে স্থায়ী কিছু নয় এটা ও জানলেও স্থায়ী বৃত্তির জন্যে ও আপাতত সচেষ্ট নয়।

বি.এ. পাশ করেছে সে আজ থেকে বছর দুই আগে। পাশ করার পর থেকে প্রায়

বছর দেড়েক সে প্রচণ্ড উৎসাহে পরিচিত-অপরিচিত প্রভাবসম্পন্ন লোকের কাছে ঘোরাঘুরি করেছে। অল্প-বিস্তর সম্ভাবনাময় বহু খবর ওর কাছে এসেছিল। বিস্তর নিশ্চয়তাবোধক আশ্বাসে আশান্বিত হয়েছে। সে সময়ে প্রতিটি দিন একটা না একটা সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হত। কোন দিন সামান্য কারণে ব্যর্থ হয়ে গেলে মনটা সহজে ভেঙে যেত। কিন্তু তার পর-দিনই নতুন উদ্দীপনা ফিরে পেত। তারপর ক্রমশ বিশ্বাস ভেঙে গেছে। উদ্যম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নিরুত্তেজ উৎসাহহীন হয়ে পড়েছে। এ নিরাসক্তি প্রাণশক্তি ক্ষয়ের কারণেও কিছুটা। কিন্তু রমেনের মা আশা করে বসে আছেন রমেন একদিন সচ্ছলতা আনবে সংসারে। যে কারণে মা এখনও মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু রমেন নীরব উদাসীনতায় তা অগ্রাহ্য করে। মায়ের অভিযোগ, বন্ধুদের সাময়িক উপদেশ কিছুমাত্র বিচলিত করে না ওকে। ঠিক কোন লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে বলে অপেক্ষা করে বসে আছে তা নয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। চেষ্টাহীন ভাবে ভেসে যাচ্ছে বলা যায়। সমৃদ্ধি বা সচ্ছলতা সম্বন্ধে প্রচণ্ড অবিশ্বাসই এর কারণ। চাকুরে বন্ধুদের প্রাচুর্য লক্ষ করে ওর অন্তত ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ ছিল। ওদের যোগ্যতা তার চাইতে এতটুকু বেশি আছে কিনা তাও ভেবে দেখে না। এসব খানিকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই মেনে নিয়েছে ও, বলা যায় মানানসই হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সিগারেট খাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে নির্দ্বিধায় হাত বাড়ায়। অন্য কোন ব্যাপারে ও বন্ধুদের কাছে কিছু দাবি করে না। বেশিরভাগ চুপচাপ থাকার ফলে রমেনের ব্যবহারে একটা উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পায়। এবং গাম্ভীর্যজনিত যে ভার সৃষ্টি হয় রমেন তার জোরেই বন্ধুদের মধ্যে বেশ খানিকটা প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য এটা তার সচেতন চেষ্টার ফল নয়। বন্ধুরা ওকে সাহায্য করতে পারলে খুশীই হয়। তারা সামান্য কোন স্থূল রসিকতা করে শরীর কাঁপিয়ে উচ্চস্বরে গলা ফাটিয়ে হেসে রমেনের দিকে সমর্থন প্রাপ্তির আশা নিয়ে তাকায়। কিন্তু রমেন চুপচাপই থাকে। এদের কাউকে রমেন পছন্দ না করলেও (অপছন্দও করে না, বলা যায় ওদের ব্যাপারে উদাসীন) রোজই ওদের সঙ্গে রকে এসে বসে—অভ্যাসের বশে। যাদের দেখলে ও খুশী হয়, সঙ্গলাভের আশা করে তারা ক্বচিৎ আসে। ওদের দেখলে নিজের দিকে তাকাবার প্রেরণা পায় সে সেই মুহূর্তে। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতির দীর্ঘস্থায়িত্বে কোথায় মিলিয়ে যায় সেই ইচ্ছা। ওরা বিপ্লবে অংশ নিয়েছে। অর্থাৎ মহৎ কাজের জন্য প্রত্যেকেই নিজেদের সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছে। ঘরবাড়ি ছেড়েছে, ওদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রমেনের ধারণাটা অস্পষ্ট। ওরা বেশ কয়েকবার রমেনকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেছে। রমেন ওদের উজ্জ্বল মুখ দেখে, এবং ওদের সৎ বলে জানে বলেই কিছুতেই তাদের অস্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু তবু বেরিয়ে যেতে পারেনি। অথচ রমেনের যা অবস্থা তাতে ওরই তো সবার আগে যোগ দেয়া উচিত। পিছুটান বলতে তেমন জোরালো কিছু নেই। আর যারা বন্ধু রয়েছে, যাদের সঙ্গে রকে রোজ আড্ডা মারে, তাদের না যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ অন্য। ওরা নিজেদের স্বার্থ একচুল ছাড়তে রাজী নয়। ওদের দ্বারা যদি কিছু হয় তবে শখের ব্যাপার হিশেবে হবে। তাছাড়া ওরা নিজেদের প্রাণের প্রতি প্রচণ্ড মমতাশীল। যে ধরনের কাজে শান্তির বিঘ্ন ঘটা সম্ভব তা ওরা কখনও করবে না। কিন্তু রমেনের কারণ অন্য। রমেনের অভাববোধ ততটা তীব্র নয় যার ফলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে যারা তার বা তার মত অন্যান্য সবার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

রমেন হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ওর নির্লিপ্ত দৃষ্টি কোন সুন্দর মুখের উপর থমকে দাঁড়িয়েছে। তখন ওর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যেত কোন আকাঙ্ক্ষা ওর চোখে ফুটে ওঠে নি। রমেন একটা সময়ে কোন মেয়ের সান্নিধ্য পেতে প্রবলভাবে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিল, যদিও সে সময়ে সুন্দর মুখের প্রতিই আকর্ষণ বেশি ছিল। কিন্তু সুন্দর অসুন্দর নির্বিশেষে পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়েকে এক এক সময়ে সে কামনা করেছে। প্রধানত তাদের দেহভোগের ইচ্ছায়। যে জন্যে কোন ঝুঁকে-পড়া মেয়ের বুক দেখতে নানারকমে চেষ্টা চালিয়ে যেত। অথচ সব সময়ে একটা পাপবোধে পীড়িত হত বলে কখন খোলাখুলি কিছু করে উঠতে পারেনি। এখন সে মোটামুটি নির্বাসিত। কোন মেয়ের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকলেও কোন বিকার ফুটে ওঠে না মুখে।

হঠাৎ ঘাড়ের ওপর একটা ভার অনুভব হতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। বসন্ত। বসন্ত হাসতে হাসতে বলল, কিরে রাস্তা দেখে হাঁটছিস্, না অন্য কিছু দেখছিস? বসন্ত তার ঘাড়টা ঘুরিয়ে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করল।

রমেনের কোন ভাবান্তর হল না। জিজ্ঞাসা করল, তুই এদিকে, অফিস নেই? রমেনের কথার কোন আগ্রহের সুর ছিল না। বসন্ত বলল, ছিল। কেটে এসেছি। সিনেমা দেখব বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। শালা হলে গিয়ে দেখি টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। চলে এলাম।

রমেন জেরা করে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তবু বসন্ত কৈফিয়তের ঢঙেই কথাটা বলল।

—তুই এদিকে কোথায়? বসন্ত জিজ্ঞাসা করল। কোন কাজে এসেছিলি? বসন্ত জানে রমেন কোন কাজ করে না। তবু জিজ্ঞাসা করল। রমেনের নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যের জন্য ওকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

—না, এমনিই। রমেন উত্তর দিল। বসন্ত ইতিমধ্যে সিগারেট বার করে রমেনকে একটা এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরাল। ঘন শাদা একঝাঁক ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বসন্ত বলল, এক জায়গায় বেড়াতে যাবি? মাল খাওয়াব।

বসন্তের কথার মধ্যে লোভ দেখানোর রেশ ছিল। রমেনের কোথাও যেতে অনিচ্ছা নেই। কেউ কিছু খাওয়াতে চাইলে অবশ্যই খায় কিন্তু খাইয়ে ওকে দিয়ে কিছু করানো অসম্ভব। রমেন কারো ইচ্ছায় হাত দেয় না বলে মনে করা যেতে পারে ওর ইচ্ছার জোর নেই। কখনও কোন ব্যাপার মনে না ধরলে কারো ক্ষমতা নেই ওকে দিয়ে সেটা করিয়ে নেয়। রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল বলে বসন্ত জোর দিয়েই বলল, চল না। ওকে একরকম ঠেলেই নিয়ে যেতে চাইল। রমেন ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, চল। বসন্ত উৎসাহ পেয়ে গেছে। যেতে যেতে চালিয়ে গেল, আরে সে এত সুন্দর জায়গা, তোর ভালো না লেগে পারবে না। পুরো পাড়াগাঁ অঞ্চল। বিরাট ধানক্ষেত, নারকেল গাছের সারি। কতরকমের সব পাখী যা কলকাতায় দেখা যায় না।

রমেন একটু অবাক হল বসন্তের কথায়। অন্তত বসন্তের মত ছেলের মুখ থেকে এই রকম কিছু শোনার আশা করা যায় না। নিভাঁজ শার্টপ্যান্টে সজ্জিত বসন্ত বেশির ভাগই সিনেমা, খেলার মাঠ আর কখনো কখনো রাজনীতির আলোচনা নিয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করল, ওখানে যাচ্ছিস কেন?

—এমনি ঘুরতে যাচ্ছি। হাবড়ায় আমার দিদি-জামাইবাবু থাকে। ওখানেই একটা জায়গায়, দিদির বাড়ি থেকে জায়গাটায় একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন থেকে দিদির বাড়ি গেলেই ওখানে চলে যাই। দারুণ জায়গাটা। জায়গাটার কথা মনে হলেই দুর্বল হয়ে

পড়ি। তারপর সামনে দিয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে দেখে বলে উঠল, দারুণ দেখতে, তাই না? এরপর বসন্তের কথার মোড় ঘুরে গেল। ও কোন একটা মেয়ের সঙ্গে 'লাইন' করে যাচ্ছে তারই গল্প বিস্তারিতভাবে বলে গেল।

বসন্তের কাছ থেকে জায়গাটা সম্বন্ধে প্রশস্তি শোনার পর রমেনের মধ্যেও একটু আগ্রহ জেগেছিল জায়গাটা দেখার জন্য, কিন্তু এখন ও রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছে, কেউ কোন ব্যাপারে নিঃস্বার্থভাবে খরচ করলে তার প্রতি অজান্তে একটা দায়িত্ব জন্মে যায়। রমেনের মধ্যে সেটা স্পষ্টভাবে না জাগলেও প্রচ্ছন্নভাবে ছিলই। সে কারণে বসন্তের কথা আপাত মনোযোগে শোনার একটা চেষ্টা রমেনের মধ্যে ছিল। এবং অনভ্যস্ত জোরে বসন্তের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটছিল। বসন্তের জুতোজোড়া ক্রমাগত শোভন তালে এগোচ্ছিল।

শেয়ালদা স্টেশনে এল ওরা। বেশ ভিড়। রমেন এই ভিড় প্রায়ই দেখে। ওর অভ্যস্ত মনে কিছুমাত্র বিরক্তি সৃষ্টি হল না। সহজভাবে যদিও চলাফেরা করা যাচ্ছিল না। প্রতি পদেই বাধা পাচ্ছিল তবু বাধাটাকে খুব একটা গ্রাহ্য করছিল না। বসন্তও নিশ্চয়ই এই ভিড়ে সচরাচর চলাফেরা করে করে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ওর মুখ থেকে নানারকম বিরক্তি-প্রকাশক শব্দ বেরিয়ে আসছে। মুখ ওর কুঁচকে গেছে। মাঝে মাঝে রেগে উঠছিল কোন কোন লোকের উপর। বসন্তের অস্বস্তির কারণ সহজে অনুমান করা যায়। মানুষের দেহের ঘষায় ওর জামা প্যান্ট কুঁচকে যেতে পারে। হঠাৎ রমেন একজনের মুখোমুখি পড়ে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়াতে বাধ্য হল। মুখটা তুলে দেখল সুকুমার দাঁড়িয়ে পথ আটকেছে।—কোথায় চললি রমেন? সুকুমার জিজ্ঞাসা করল। ঠিক এই প্রশ্ন বসন্তের কাছ থেকে একটু আগে শুনেছে সে। তখন কোথাও যাওয়া সম্বন্ধে কিছু স্থির ছিল না। এখন কোথায় যাচ্ছে সেটা জানলেও জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই বলল, বসন্ত কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে।

বসন্ত একটু এগিয়ে গিয়েছিল। সুকুমার ঘুরে বসন্তকে দেখে নিল। তারপর রমেনকে সামান্য জেরার ভঙ্গীতে বলল, এভাবে কতদিন চালাবি বল তো? এই রকম বোহেমিয়ানার কোন মানে হয় না। সুকুমার হল তাদের দলের ছেলে রমেন যাদের পছন্দ করে। কাজেই সুকুমারের কথায় আহত হলেও কিছু বলতে পারল না। ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সুকুমার আবার বলল, তোকে আটকাবো না। যেখানে যাচ্ছিস যা, আজ পাড়ায় দেখা করব। তারপর হন হন করে চলে গেল লম্বা পা ফেলে।

বসন্তকে অনুসরণ করে ও ট্রেনে উঠল। সুকুমারকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে যাচ্ছিল। ও কোনদিন চাকরির জন্য কোথাও ঘোরাঘুরি করেনি। চাইলে কয়েক দিনে ওকে একটা বড় কোম্পানির চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারত ওর বাবা। কিন্তু দুম করে ছেড়ে দিল বাড়িঘর। আসলে ও বোধহয় ওর পরিবেশ নিয়ে তৃপ্ত ছিল না। ভিতরে ভিতরে বিতৃষ্ণা স্তূপীকৃত হতে হতে একদিন প্রতিবাদের রূপ পেয়ে গেছে। অন্তত রমেনের তাই মনে হল এখন। রমেন কামরায় উঠে একবার সিটগুলোর দিকে তাকাল। কোন আসনই খালি নেই। দাঁড়িয়েই যেতে হবে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সুকুমারকে যথেষ্ট তৃপ্ত মনে হয়। রমেন নিজের কোন অতৃপ্তির কারণ খুঁজে পেল না। কোন ব্যাপারে ওর কোন দুঃখবোধ আছে কিনা ভেবে দেখল। পেল না। তৃপ্তি-অতৃপ্তি কোনটাই ওর কাছে তীব্র নয়। আশেপাশে বেশকিছু লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই যেন আলাদা আলাদা ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজনীতির আলোচনা উঠতে প্রায় বেশির ভাগ যাত্রীই যোগ দিল। এ ব্যাপারে প্রায় সবারই কিছু কিছু বক্তব্য থাকে বলেই সাগ্রহে অংশ নেয়। বসন্ত একটু ভেতরের দিকে

দাঁড়িয়েছে, সিট আপাতত না পেলেও পরে একসময় পেয়ে যাবে তা ও জানে। তাছাড়া ওর কাছে আকর্ষণীয় কিছু ছিলই। কয়েকজন মহিলা ছিলেন ভেতর দিকে। এসব ক্ষেত্রে বসন্ত অত্যন্ত সচেতন হয়ে যায় পোশাকের পারিপাট্য সম্বন্ধে। কারো দৃষ্টি ওর ওপর পড়লে বসন্ত তাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। রমেনের কাছে ট্রেনে তার এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই গুরুত্ব পাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা মনে পড়ছে যা কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করছে। সঙ্গে বসন্ত আছে কিন্তু ধারে কাছে নেই। মাঝখানে কিছু লোককে ডিঙিয়ে ওর স্বরকে পৌঁছে দিতে হবে। তাছাড়া ওর কাছে যেতে হলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর বিরক্তির কারণ হতে হবে। দু-একবার বসন্তের দিকে তাকিয়ে সে নিরস্ত হল।

রমেন বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মন দিয়ে সরে যেতে থাকা গাছ, মাঠ, পুকুর দেখে যাচ্ছে। ওর যে দৃষ্টি শহরের মুখস্থ পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং যা ছিল অনাগ্রহ, নির্লিপ্ত তা এখন যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

পরিবর্তিত পরিবেশের জন্য ওর খুশী হওয়া অবস্থা ফিরে এসেছে। কোন কারণে খুশী হলে অন্যকে তা বলার জন্য উচ্ছ্বাস জাগে। কিন্তু রমেনের সেরকম কিছু বোধ হচ্ছিল না। নিজেই উপভোগ করছিল। মাঝে মাঝে রেললাইনের পাশে কিছু লোককে নির্বিকার ভাবে সে কাজ করে যেতে দেখছে। ওদের এত কাছ দিয়ে এতবড় একটা সচল যান সশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করছে না। অথবা লেভেল ক্রসিং-এ সার দিয়ে রিক্সা-লরি-মোটরের শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখছে। পরক্ষণেই একটা ব্যাপার দেখে রমেনের বুকটা ব্যথায় শিরশির করে উঠল। সর্ষে ক্ষেতের পাশেই শ্মশানে একটা চিতা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরচ্ছে। একজন আধবুড়ো লোক হাঁটুর ওপরে থুতনি রেখে বসে আছে চিতার পাশেই। বাকি সাত-আটজন লোক সর্ষে ক্ষেতের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আধবুড়ো লোকটা সম্পূর্ণ একা তার সদ্য ছাই হয়ে যাওয়া কোন আপনজনকে তখনো তীব্র-ভাবে মনেপ্রাণে আঁকড়ে থাকতে চাইছে, ছবিটা মিলিয়ে যাবার আগেই তা রমেনের মনে স্থির-ভাবে গেঁথে রইল। অথচ রমেনের এসব সুখ-দুঃখের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। রমেন নিজের এই পরিবর্তন বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করল। এত সহজে আনন্দ পাওয়া এত সহজে দুঃখ পাওয়ার কারণ ঠিক খুঁজে পেল না যদিও।

হাবড়া স্টেশন এসে গেছে। নেমে পড়ল বসন্তের সঙ্গে। মন বিষণ্ণ হয়ে আছে, কি কারণে এই বিষণ্ণতা তা ও ভালোভাবেই বুঝতে পারছে কিন্তু বাইরের কোন ঘটনার আড়ালে তাকে চাপা দিতে পারছে না। রমেনের এই মানসিক অবস্থার কথা বসন্তের বুঝতে পারার কথা না। কারণ রমেনের মনের খুশী অবস্থার সময় ও তার কাছাকাছি ছিল না। এখন ঠিক রমেনকে আগের মতই দেখাচ্ছে। ওরা দু'জনে এক গাদা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। বাসে ওঠার আগে রমেনকে বাজারের বাইরে দাঁড় করিয়ে বসন্ত মদের একটা বোতল কাগজে জড়িয়ে নিয়ে এল। রমেন বসন্তের হাতের দিকে একবার তাকালো মাত্র।

বাস থেকে কচুয়ার মোড়ে যখন নামল তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। এখানে নেমেই রমেন একটা আকর্ষণ বোধ করল। প্রশস্ত কংক্রীটে বাঁধানো রাস্তা অথচ লোকজনের যাতায়াত সামান্য। গোধূলির অল্প আলোর রাস্তার ধুলো ময়লা দেখা যায় না। রাস্তাটা ঠিক একটা বিরাট নিকোনো উঠোনের মত লাগছিল। এই রাস্তায় পা-ফেলে হাঁটতে আপনিই ইচ্ছা যায়। ওরা হাঁটতে শুরু করল। জায়গাটা সম্বন্ধে বসন্তের যে কী প্রচন্ড দুর্বলতা তা

রমেন ওর সঙ্গে হাঁটতে থাকাকালীন বুঝতে পারছিল। বসন্ত হল সেই ধরনের ছেলে যারা কোন ব্যাপারে খুশী হলেই 'দারুণ' 'দারুণ' করে চেঁচিয়ে ওঠে। রাস্তার একপাশ দিয়ে খেজুর গাছের সারি চলে গেছে। আর একদিকে কয়েকটা ঘরবাড়ি। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ওতে লোকজন আছে কিনা। আরও কিছু দূর এগিয়ে ওরা একটা মোড় পেল। ওরা যে রাস্তা ধরে হাঁটছিল সেই রাস্তা ধরেই চলতে থাকল। এই মোড় থেকেই বাড়ি শেষ। এখন ওদের একদিকে চওড়া অদ্ভুত সমতল একটা মাঠ—যার অন্যদিকে পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের বিরাট পুকুর। কলকাতায় একে অনায়াসে লেক বলে চালিয়ে দেয়া যায়। ওদের মুখোমুখি পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ছে। নিরুত্তাপ রোদে ওদের শরীর স্নিগ্ধতা পাচ্ছে। সোজা তাকালে মনে হয় এই রাস্তাটা দূরে গাছের সারির নিচে শেষ হয়েছে। আরও কিছুদূর এগোনোর পর দেখল একদম ধানক্ষেতের লাগোয়া একটা বিরাট বাড়ির গেটের কাছে রাস্তাটা শেষ হয়েছে। রমেন ধানক্ষেতের ধূসর রঙ দেখতে পাচ্ছে। তারও শেষে গাছের সারি। সূর্য এখন গাছের সারির মাথা থেকে একটু একটু করে নেমে যাচ্ছে। ওরা শেষ পর্যন্ত গেল না। খানিকটা আগে রাস্তার ওপরেই একটা কালভার্টের ওপর বসে পড়ল।

রমেন অনেকক্ষণ তার ভাললাগা বোধটা ফিরে পেয়েছে। এসব জায়গায় এসে 'অদ্ভুত সুন্দর' এই বহুব্যবহৃত কথাটা আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। বসন্তের সন্দেহ ছিল রমেন হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না কেন ওর জায়গাটা ভালো লাগে। কিন্তু রমেনের মুখ থেকে প্রশস্তি শোনার পর প্রচণ্ড উৎসাহে ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করল, বুঝলি রমেন, আমি লাইফে এমন সুন্দর জায়গা দেখিনি। এসব জায়গায় কি আর অন্য বন্ধুদের আনা যায়? তুই ঠিক বুঝবি আমি জানতাম। ওরা সব ফূর্তি করতে দীঘা দার্জিলিং যায়। আমার ওসব জায়গাও ভালো লাগে। কিন্তু এর মত কোনটাই নয়। কাউকে বলতেও ভরসা পাই না। ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। গেঁয়ো বলে বসবে।

—দূর। ছাড় তো ওসব গাঁড়লদের কথা। ওদের কথা এখন তুলিস না। রমেন আর কোন কথা বলবে না। চুপচাপ বসে গ্রামের লোকদের দিনের শেষ কাজ গুছিয়ে নিতে দেখছে। ধানক্ষেত থেকে এক এক করে লোক ফিরে আসছে। শেষ গরুর দলটা চলে যেতে একদম নিঃশব্দ হয়ে গেল জায়গাটা। এবং ঠিক মাটি থেকে দু-হাত উঁচুতে একটা কুয়াশার আস্তরণ স্পষ্ট হতে থাকল। তখন সূর্য সম্পূর্ণ ডুবে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বসন্ত বলল, রমেন এবার বোতলটা খোলা যাক। কি বলিস? রমেন ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছিল নিজের সম্পর্কে। রমেনের এতদিন কোন ব্যাপারেই কৌতূহল বা কোন রকম ভালমন্দ বোধ ছিল না। আজ কেন যেন হঠাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এবং তার বহুদিনের ক্ষয়ে-যাওয়া উপলব্ধি ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ডুবে থাকা বেশিক্ষণ সম্ভব হয় না। মানুষ যখন অন্তর দিয়ে কোন সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে তখনই বুকের মধ্যে কান্না জমতে শুরু করে। এটা বোধহয় এই সুখানুভূতির ক্ষণ-স্থায়িত্বের জন্যই হয়। এবং তারপরে মানুষ স্বভাবতই অতি মাত্রায় পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়ে। রমেনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছে। মদের দিকে তাকিয়ে বসন্তের কথার উত্তরে বলল, না খাব না, ভাল লাগছে না।

বাতাসে একটা আঁশটে গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। বসন্ত বলল, একটা কীরকম গন্ধ পাচ্ছিস না? বোধহয় গরুটরু ফেলে গেছে সামনের মাঠটায়।

বসন্ত হঠাৎ রমেনের কথা শুনে চমকে উঠল।

—জানিস বসন্ত, আমি এতদিন ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। অনেকদিন চেষ্টা করে চাকরি পাইনি বলে আমি সব বিশ্বাস-টিশ্বাস হারিয়ে কীরকম এক ভবঘুরে হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা এতদিন কত আমোদ ফুর্তি করেছিস, আমি হয়ত সাথী হয়েছি কিন্তু ঠিক উপভোগ করিনি। আজ আমি ঠিকই উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম—মানে আজকেই ভাবতে পারলাম, ওসব আমাকে শোভা পায় না। আমি যে কী সেটা ঠিক এতদিনে বুঝলাম। এটাও বুঝলাম আমার দ্বারা নিজের সংসারে সচ্ছলতা আনাও সম্ভব নয়।

বসন্ত ভেবেছিল, নিজেকে গরীব ভেবে রমেনের অভিমান হচ্ছে। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল, আরে ভাবছিস কেন, ঠিক হয়ে যাবে। চেষ্টা কর। আমাদের অফিসে আমি বলে রাখব।

—কী আশ্চর্য দেখ, রমেন বসন্তের কথায় কান না দিয়ে বলে চললো—আমি জানি আমার অবস্থা আমি বদল করতে পারব না। কাজেই যেমন ছিলাম ভালই ছিলাম, এটা ভেবেই আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঠিক আগের অবস্থাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে। পুরোপুরি ছটা মাস আমি ঘুমিয়ে কাটালাম। নিজেকে এতবেশি দরিদ্র মনে হচ্ছে যে কি বলব। আমি আর মা কতদিন একবেলা খেয়ে একই পোশাকে কাটিয়েছি। অথচ কোন-দিন সেই দৈন্যদশাকে উপলব্ধি করিনি, কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আজ সবকিছু বুঝতে পারলেও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে এমন শুকনো শুকনো লাগছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

—ড্যাট্। কী সব যাতা বলছিস্। চুপ কর তো।

—এত বয়েস হয়ে গেলো। অথচ কিছু পেলাম না এখন পর্যন্ত। আশ্চর্য। কী নিয়ে তৃপ্ত থাকব বলত? এক সময়ে কোন মেয়েকে প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসতে চেয়েছিলাম। যে কোন মেয়েকে। কিন্তু কারো কাছে সাড়া পেলাম না। তারপর একটা সময় কত লোকের কাছে কাঁদুনি গেয়েছি চাকরির জন্য। হল না। আর হবেও না। কারণ আমি সেই একই অবস্থায় পড়ে আছি। ইতিমধ্যে আমি আমার চরিত্রকে বদলে ফেলতে পারি নি। কিসের জোরে পেয়ে যাব প্রার্থিত বস্তু? এর চাইতে মরে যাওয়া ভাল।

বসন্ত বোতলটা বার করে বলল,—সিরিয়াসলি বলছি, একটু খা, দেখবি এসব দুঃখ-টুক্খ আর নেই। বেশ ঝরঝরে বোধ করবি।

—জানিস্ ছোটবেলায় পড়াশোনা করতে করতে আমি এক এক সময়ে এক একটা বৃত্তিকে আকাঙ্ক্ষা করেছি। যেমন ধর কোন ডাক্তারের গল্প পড়ে বা কোন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারের সামাজিক সম্মান দেখে আমি ডাক্তার হতে চেয়েছি। ঠিক সেই রকম কোন ইঞ্জিনীয়ার, প্রফেসর, গায়ক বা লেখকও এক এক সময় হতে চেয়েছি। কিন্তু যত দিন গেছে দেখেছি পড়া-শোনার লাইন ধরে আমি বিশেষ এক শ্রেণীর বৃত্তির দিকে এগিয়ে গেছি। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভেবেছিলাম আমি শেষ স্তরে পৌছে গিয়ে প্রফেসর বা কোন পদস্থ অফিসার হতে পারব, কিন্তু কোথায় কি? আজ মনে হচ্ছে আমি কিছুই হতে পারব না। হওয়া সম্ভব নয়।

বসন্ত এতক্ষণ সাধ্যমত উত্তর দিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু রমেনের শেষ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। ও এক রকম ভাবগ্রস্তের মত বসে রইল এবং ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এর কোন রকম সান্ত্বনা বসন্তের দেয়া সম্ভব নয়। ভীষণ এক নিস্তব্ধতা নেমে এল দু-জনের মাঝখানে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ সামনেই এক ঝাঁক শেয়ালের ডাকে ওরা চমকে উঠে দাঁড়াল। বসন্ত বলল,—চল ফেরা যাক। হাতের মধ্যে বোতলটাকে

খেয়াল হতে ছ্বড়ে ফেলে দিল। একটা শব্দ করে বোতলটা মাঠের ওপর পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাস মদের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গেল। দ্বজনে উঠে আস্তে আস্তে হাঁটতে শ্বর্ব করল। রমেনকে অসব্স্থ দেখাচ্ছিল। বসন্ত জিজ্ঞাসা করল, রমেন তোর শরীর খারাপ? তোকে ধরে ধরে নিয়ে যাব?

—না। ওসব কিছ্ব না। রমেন প্রচণ্ড ক্লান্তি অনব্ভব করছে। মনের দিক থেকে কোন তৃপ্তিবোধের কারণ খ্বঁজে পাচ্ছে না। এবং এটাও ব্বঝতে পারছে এভাবে আর চলা যাবে না। এখন রোজকার কথা ভেবে খ্বব বিশ্রী লাগছে ওর। সেই রকে গিয়ে বসা। পরচর্চা। বন্ধ্বদের পয়সায় সিগারেট ফোঁকা। নিজেকে দর্শনীয় করে তোলার দিকে আপ্রাণ চেষ্টা। না, এসব তার দ্বারা সম্ভব হবে না। কি যে সে করতে পারবে ব্বঝতে পারছে না।

কলকাতা পেশছে বসন্ত বাসে উঠে চলে গেল। রমেনকে পয়সা সেধেছিল বাসে যাবার জন্য। কিন্তু রমেনই ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে কিছ্ব দ্বর হে'টে গেছে। ঠিক তক্ষ্বনি ম্বখোম্বখি স্বকুমার পড়ে গেল।

—কিরে, এই ফিরলি?—স্বকুমার জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ। তোর সঙ্গে আমার একট্ব দরকার আছে। রমেন হঠাৎ যেন কিছ্ব পেয়ে গেছে এই রকম আগ্রহ নিয়ে বলে গেল। রমেন জানে স্বকুমার ঠিক ওর মত সব দিক দিয়ে। অথচ ওর কোন দ্বঃখ নেই। স্বকুমার কি করে তাও রমেন জানে। এবং স্বকুমারের মতই যে ওকে হওয়া দরকার এটা স্পষ্টভাবে ব্বঝতে পারল। রমেন দেখেছে, পাড়ায় যেসব ছেলেরা সবচেয়ে দ্বর্নাম কিনেছে, প্রত্যেকেই কিছ্ব করে উঠতে পেরেছে। যাদের কব্জিতে ছ্বরি খেলে ভাল তারা কেউই তার মত দ্বর্ভাগ্যগ্রস্ত নয়। রমেন তো ওদের মত হতে পারবে না। তার র্বচিতে বাধে। তাই স্বকুমারের এবং তার বন্ধ্বদের কাজই ওর সবচেয়ে গ্রাহ্য মনে হল।

স্বকুমার জিজ্ঞাসা করল, কি বলবি বল। তবে আমি আন্দাজ করতে পারছি তুই কি বলবি। আমি জানতাম তোকে আসতেই হবে। তুই তোর রকের অন্যান্য বন্ধ্বদের থেকে অনেক আলাদা। চল পাড়ার দিকে হাঁটতে থাকি। যেতে যেতে শ্বনব।

# সংস্কৃতি সাময়িকী

---

**অথ ললিত কলা আকাদেমি কথা**

ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৪ সালে ললিত কলা আকাদেমি, সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি ও সাহিত্য আকাদেমি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত তিনটি স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন্মলাভ করে।

গ্রীক এবং লাতিন 'আকাদেমিয়া'-র ইংরিজি রূপ 'এ্যাকাডেমি'-র এই ভারতীয় রূপান্তর যদি সজ্ঞান চিন্তার ফসল হয়ে থাকে তা'হলে বলতে হবে, উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন ইউরোপীয় 'এ্যাকাডেমি'-র সঙ্গে এই নবসৃষ্ট 'আকাদেমি'গুলির একটা চরিত্রগত পার্থক্য থাকুক।

ইউরোপের ইতিহাসে রাষ্ট্র যখনই সমাজের সর্বশক্তিমান চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে বা উঠতে চেয়েছে, তা' এথেনীয় নগররাষ্ট্রেই (হ্যাঁ, পেরীক্লিও গণতন্ত্রেও) হোক বা রোমক সাম্রাজ্যেই হোক, বা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যেই হোক অথবা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের আলোকময়-স্বৈরতন্ত্রী নেশন-স্টেটেই হোক না কেন, তখনই সাহিত্য-শিল্প-চারুকলার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের একটা নেতৃ-ভূমিকা নেবার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। নিতান্তই মূক 'খবর'-কে মানবিক অর্থময়তায় রূপান্তরিত করার কাজে সাহিত্য-শিল্প-চারুকলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিতিই উপরোক্ত প্রবণতার কারক। এই প্রবণতা থেকেই গ্রীসে, রোমে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপে সাহিত্য, শিল্প, চারুকলা সম্বন্ধীয় এ্যাকাডেমিগুলির অভ্যুদয় হয়। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত এ্যাকাডেমিগুলি সমাজ-এবং-রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ধ্যান-ধারণা মূল্য-মান-বোধগুলিকেই বিভিন্ন শিল্প-চর্চার ক্ষেত্রে 'অ্যাক্সম্' বা স্বতঃসিদ্ধান্ত হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছে; শিল্প-চর্চার বিধি-বিধান দিয়েছে, ব্যতিক্রমকে ব্যাধি প্রমাণে তৎপর থেকেছে। ফলে শিল্পচর্যায় এ্যাকাডেমিগুলির ভূমিকা সাতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল। এ তো গেল ইউরোপীয় এ্যাকাডেমিগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা।

সাহিত্য-শিল্প-নাট্য-সঙ্গীতাদি চর্চাক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুলনীয় কোন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি কোনকালে ছিল না। লোকাচার-দেশাচার-শাস্ত্রাচার পুরুত-মোল্লা ইত্যাদি শক্তির বাধা-নিষেধ-নির্দেশনা সবই ছিল, কিন্তু এ্যাকাডেমির মতন কোন বিশেষিত আধা-আইনানুগ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য ভারতীয় ইতিহাসে মেলে না। ঐতিহ্যের অভাবে আমাদের যেমন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ব্যাপারটি পেয়েও পুরোপুরি ধাতস্থ করা হয়নি, তেমনি হয়নি 'এ্যাকাডেমি' বস্তুটিকে পেয়েও পুরোপুরি পাওয়া। আর এই শেষ না-পাওয়াটির জন্য নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। আমাদের পরম ভাগ্য যে আমাদের আকাদেমির কোনটিকেই দিশী বা বিদেশী কোনপ্রকার ঐতিহ্যের শব বহন করতে হয়নি।

ললিত কলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের চিত্রকর এবং ভাস্কর-দের আগ্রহাতিশয্যে, সরকারী আনুকূল্যে। ললিত কলা আকাদেমির সংবিধানে সংগঠন এবং ক্রিয়া-কলাপ বিষয়ক অনুচ্ছেদে এই আকাদেমির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। শিল্পচর্যার আবহাওয়া উদ্দীপক রাখার জন্য শিল্পবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা এবং গবেষণায় সাহায্য করা, শিল্প উপভোগের এবং শিল্পচর্চার আবহাওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেশে, বিদেশে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করা ও প্রকাশনাদির ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ভাববিনিময়ের সুযোগ দানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাদি করা, শিল্পীদের আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদা দান করার ব্যবস্থা করা এবং ঐতিহাসিক শিল্পসম্ভার ও সৃজ্যমান শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ললিত কলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের যেসব চিত্রকর এবং ভাস্কর ললিতকলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলেরই এক-একটি একান্ত ব্যক্তিগত অথচ একটি বৃত্তিগত উদ্দেশ্য এই ব্যক্ত উদ্দেশ্যের অন্তরালে অর্ধস্ফুট

থেকে গিয়েছিল, যদিচ সেই অর্ধস্ফুট অর্ধব্যক্ত উদ্দেশ্যটিই ললিতকলা আকাদেমি নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে আসছে অদ্যাবধি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফসল হিসাবে জন্মকাল থেকেই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকর এবং ভাস্কর ধারকরা পাশ্চাত্য ভাবমণ্ডলের প্রবাসী-অধিবাসী। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম ধ্যান-ধারণা পশ্চিমিয়ানার ধাঁচে সংগঠিত। কিন্তু চিত্রকলা বা ভাস্কর্যকে বৃত্তি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে বাজার প্রয়োজন, সে বাজার তাঁর দেশে ছিল অনুপস্থিত। কারণ, শিল্পবস্তুর ক্রয়ক্ষমতা-সম্পন্ন দেশীয় বণিক এবং সামন্তকুলের আধুনিকীকরণ তখন অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে শহরের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিমি কায়দাকানুনে রপ্ত, সে শিক্ষাদীক্ষা দেশীয় বণিক এবং সামন্তকুলের রুচি-অভিলাষকে তখনও স্পর্শ করেনি। অথচ এরই মধ্যে কারুকলার সঙ্গে চারুকলার বিচ্ছেদ ঘটে চারুকলার বাজার সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণীভুত আধুনিক ভারতীয় ব্যক্তিশিল্পী পৃষ্ঠপোষকের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় শিল্পকর্ম-সম্পাদনকে ঘৃণা করতে শিখেছেন। ফলে তাঁর কাছে তাঁর বৃত্তিকে বৃত্তি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা অস্তিত্বের সমস্যার সমার্থক হয়ে উঠেছে।

এহেন অবস্থার মধ্যে দেশ স্বাধীন হল, জাতীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক আধুনিকীকরণের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকের শিল্পীরা চাইলেন সরকার চারুশিল্পের অনতিসৃষ্ট বাজার গড়ে তুলতে সাহায্য করুক এবং ললিতকলার চাহিদা সৃষ্টির ব্যাপারে পথিকৃতের কাজ করুক। কিন্তু রাষ্ট্র তো নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান। আর রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে যেসব রাজনীতিকদের আর রাজপুরুষদের দেখা যায়, শিল্পের আঙিনায় তাঁরা তো সব চীনেমাটির দোকানে প্রচণ্ড ষণ্ড। গণতন্ত্র কিন্তু অধিকারভেদ মানে। অতএব সিদ্ধান্ত হল রাষ্ট্রের আনুকূল্যে সৃষ্ট, রাষ্ট্রানুমোদিত আইন-কানুনে শাসিত কিন্তু প্রধানত শিল্পীদের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসক সংগঠন দৃশ্য-শিল্পের কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করবে।

গোড়ায় কোথাও গলদ ছিল কিংবা দীর্ঘদিন ধরে কোথাও ক্লেদ, কোথাও অভিযোগ জমে ছিল। ললিতকলা আকাদেমি আয়োজিত "দ্বিতীয় ভারতীয় ত্রিবাৎসরিক আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী : নয়া দিল্লী '৭১" উপলক্ষে সেসব অভিযোগ সাধারণ্যে প্রকাশ পেল। বরোদা এবং দিল্লীর বেশ কিছু সংখ্যক খ্যাতিমান শিল্পীদের নেতৃত্বে ভারতের বহু নামজাদা শিল্পী ললিতকলা আকাদেমির সঙ্গে সব সম্পর্ক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতার তরুণ শিল্পীদের একটি বিশিষ্ট সংস্থা ললিতকলা আকাদেমির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম সমালোচনার ঝড় তুললেও আকাদেমির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। কিন্তু কেন এই সমালোচনা, কেন এই বর্জন?

সমালোচকরা বললেন ললিতকলা আকাদেমি তার উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার বর্তমান কাঠামোয় ললিতকলা আকাদেমি সক্রিয় শিল্পীদের কোন প্রয়োজনেই আসছে না এবং আসবে না। বর্জনের পক্ষগ্রহণকারী বা বিপক্ষীয় শিল্পীদের কেউই এই অভিযোগ করেননি যে ললিতকলা আকাদেমি শিল্পীদের উপর কোন বিশিষ্ট শিল্পরীতি চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন বা কোন বিশিষ্ট শিল্পরীতি অনুসারী কোন বিশেষ শিল্পীগোষ্ঠীকে আকাদেমি বিশেষভাবে পুরস্কৃত এবং তৎসহ অন্যান্যদের তিরস্কৃত করছেন। অতএব আকাদেমির বিরুদ্ধে অভিযোগ শিল্পাদর্শগত বৈপরীত্যের কারণে নয়। তাহলে কি কারণে আকাদেমির সমালোচনা, কি কারণে আকাদেমি বর্জন?

সমালোচকরা বলেছেন, আকাদেমি তার উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সে কথা বর্জনকারীরাও বলেছেন। ভারতবর্ষের কোন প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ষোল আনা পালন করেছে? কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলা যায় যে তার কাজকর্মের অধিকাংশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি? আকাদেমির সার্থকতা বা ব্যর্থতা অন্য দশটি সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এতটুকু বেশী বা এতটুকু কম নয়। সমালোচকদের মতে ললিতকলা আকাদেমির সার্বিক বা আংশিক ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ আকাদেমির সাংগঠনিক কাঠামো এবং আকাদেমির নেতৃত্ব।

এখন দেখা যাক আকাদেমির কথিত সার্বিক বা আংশিক ব্যর্থতার দায়িত্ব কতটা তার সাংগ-

ঠনিক কাঠামো এবং কতটা নেতৃত্বের চরিত্র। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে যখনই কোন একদল ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বা গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, তখন সে প্রতিষ্ঠান দ্বারা সাধারণ মঙ্গল সাধন করার যে সোচ্চার বক্তব্য উত্থাপন করেন, সে বক্তব্য প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিকতার সপক্ষে একটি প্রচার (সে প্রচারের মধ্যে যে বক্তব্যানুসারী সদুদ্দেশ্য একেবারে থাকে না তা' বলছি না)। জনসমক্ষে প্রচারিত সোচ্চার বক্তব্যর পিছনে অন্য আরেকটি উদ্দেশ্যও নেতাদের ক্রিয়ার কারক হিসাবে কাজ করে। তা' হল, প্রতিষ্ঠানটি যে কর্মমণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই কর্মমণ্ডলে নিজেদের নেতৃত্বকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাকে পাকাপোক্ত করা। সেই জন্য দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের যে সাংগঠনিক রূপ প্রতিষ্ঠানের স্থপতিরা দেন তার মধ্যে তাঁদের সেই নেতৃত্ব বজায় রাখার এবং কর্মমণ্ডলের সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ করায়ত্ত রাখার মনোভাব একটা আইনগত অভিব্যক্তি পায়। ললিতকলা আকাদেমির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ার পিছনে এই মনোভঙ্গি যে কাজ করেনি সে কথাই বা কি করে বলা যায়? তবে, যেহেতু ললিতকলা আকাদেমির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন শিল্পী-নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল গৌণ, সে কারণে বলা যায় যে ললিতকলা আকাদেমির সংবিধানে তাঁদের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে পরোক্ষ এবং গৌণ ভাবে। মুখ্যতঃ, সংবিধান রচনাকালে সরকার দেখেছেন তাঁর দাক্ষিণ্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব যাতে বজায় থাকে। সরকার যেমন একদিকে মুখ্যতঃ এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কার্যে সরকারী কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার প্রতিষ্ঠানটিকে শিল্পীদের একটি গণতান্ত্রিক সংস্থার চেহারাও দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এই দুই ভিন্নমুখী ইচ্ছাকে মেলাতে পারেননি। পারেননি তার কারণ ভারত নামক উপমহাদেশের সব রাজ্যে শিল্পীদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন কখনও গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠেনি, তার কারণ বেশিরভাগ রাজ্যে কোন শিল্পিসমাজই গড়ে ওঠেনি। ফলে এ-সব রাজ্য থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা নিজেদের ছাড়া কারোও প্রতিনিধিত্ব করেন না। অন্যদিকে কলকাতা, বোম্বাই, বরোদা, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং হায়দরাবাদ থেকে যে-সব শিল্পীরা এসেছেন —তাঁরা অনেকেই কারো প্রতিনিধিত্ব না করলেও ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী। সরকার এবং শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে পশ্চাৎপদ রাজ্যের নাম-না-জানা প্রতিনিধিরাও তা জানতেন, ফলে ললিতকলা আকাদেমির নেতৃত্ব সহজেই তাঁদের হাতে চলে গেছে।

কিন্তু ললিতকলা আকাদেমির নেতৃত্ব কোন একীভূত গোষ্ঠীর করায়ত্ত হয়নি। চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের কিছু শিল্পী এবং শিল্পরাজনীতিক তিনটি যুযুধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আকাদেমির কর্তৃত্ব করায়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। এই যুযুধান গোষ্ঠিত্রয় (কলকাতার এক শিল্পরাজনীতিক ও মাদ্রাজের এক শিল্পীরাজনীতিকের একটি গোষ্ঠী, বোম্বাই ও বরোদার চল্লিশ দশকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী এবং বোম্বাই ও দিল্লীর পঞ্চাশ দশকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী) ছলে বলে কৌশলে অপ্রতিষ্ঠিত এবং শিল্পীগোষ্ঠীগুলিকে কুক্ষিগত করে সরকারী আমলা এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের অনুগ্রহ সংগ্রহ করে ললিতকলা আকাদেমি নামক করদাতাদের অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের খাস তালুকে পরিণত করতে চেয়েছেন। ললিতকলা আকাদেমির শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অনেক সময়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী শিল্পীদের গোষ্ঠি-যুদ্ধে বিব্রত বোধ করেছেন এবং শিল্পীসাধারণের কল্যাণার্থে আকাদেমির কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়দের অযাচিত হস্তক্ষেপে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন।

এর মধ্যে বোম্বাই এবং দিল্লীতে চিত্রের এবং ভাস্কর্যের একটা ছোট বাজার গড়ে উঠেছে। ষষ্ঠ অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের বোম্বাইয়ের এবং দিল্লীর যে-সব শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁরা এই নতুন গড়ে ওঠা বাজারের তিন-চতুর্থাংশ চাহিদা করায়ত্ত করেছেন। এবং তা' বেশিরভাগ সময়েই করেছেন ললিতকলা আকাদেমির সাহায্য ছাড়াই। পঞ্চম অর্থাৎ চল্লিশের দশকের খ্যাতিমান শিল্পীদের কাছে ললিতকলা আকাদেমি নামক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাঁদের কাজের বাজার তৈরির যন্ত্র হিসাবে। পঞ্চাশের দশকের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কাছে ললিতকলা আকাদেমির এই প্রয়োজন অনেকখানি অপসৃত হল। এই দেশীয় বাজার-বিজয়ী উচ্চাভিলাষী শিল্পীদের কাছে ললিতকলা আকাদেমির প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হল বিদেশের বাজারে তাঁদের ইমেজ তৈরি করার এজেন্সি

হিসাবে। পঞ্চাশের এই খ্যাতিমান এবং অর্থবান শিল্পীদের দলে পাবার আশায় ললিতকলা আকাদেমির নেতৃত্বে আসীন চল্লিশের শিল্পীরা আমাদের দেশের সাধ্যে আসে এমন প্রায় সব ব্যবস্থাই করলেন। কিন্তু এত করেও পাশ্চাত্যমানাকাঙ্ক্ষী উচ্চাভিলাষী পঞ্চাশের শিল্পীদের তাঁরা খুশী করতে পারলেন না।

এই প্রেক্ষাপট আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো সপ্তম অর্থাৎ ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে। ষাটের দশকে নতুন নতুন শিল্পাদর্শ এসেছে। এসব শিল্পাদর্শগুলির অনেকগুলিরই জনক যদিও চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের কিছু শিল্পী, ষাটের দশকের তরুণ শিল্পীরাই এইসব শিল্পাদর্শের যোদ্ধা-প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ষাটের দশকের বরোদা, দিল্লী এবং মাদ্রাজের এইসব শিল্পীদের শিল্পকৃতির স্বীকৃতি দানের কৃতিত্ব ললিতকলা আকাদেমির। ললিতকলা আকাদেমির জাতীয় প্রদর্শনীতেই এ'দের অনেকের সর্বভারতীয় আত্মপ্রকাশ। ললিতকলা আকাদেমি আয়োজিত জাতীয় প্রদর্শনীতে সম্মানলাভ করেই এ'রা অনেকে প্রতিষ্ঠা অর্জনের দিকে প্রথম পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এ'রা দেখলেন শিল্পের বাজার পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের করায়ত্ত। সে বাজারের চাহিদা পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের দ্বারা পূরণ হবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার ছিটে-ফোটা এইসব নব খ্যাতিমান শিল্পীদের ভাগে এসে তাদের অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তুলল। তাঁরা আশা করলেন যে-ললিত কলা আকাদেমি তাঁদের শিল্পকর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে—সেই ললিতকলা আকাদেমি তাঁদের শিল্পের বাজার গড়ে তুলতেও সাহায্য করুক। কিন্তু ললিতকলা আকাদেমি তো আর ব্যবসায়িক সংস্থা নয়। সুতরাং আকাদেমি সে ব্যাপারে ষাটের শিল্পীদের হতাশ করল। ষাটের শিল্পীরা মনে করলেন যে আকাদেমির নেতৃত্বাসীন প্রাক্তন-শিল্পীরা সৃজনশীল তরুণ শিল্পীদের সমস্যা বুঝতে অপারগ এবং তাঁদের কাছ থেকে এমন কার্যকলাপ আশাও করা যায় না যেসব কার্যকলাপ সৃজনশীল সক্রিয় শিল্পীদের সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুলে দেবে। ষাটের দশকের এসব শিল্পীরা মনে করলেন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাঁদের নিজেদেরই হাতে নিতে হবে। কিন্তু আকাদেমির কর্তৃত্ব তো চল্লিশের দশকের প্রখ্যাত অধুনা প্রাক্তন-শিল্পীরা মৌরসী পাট্টা করে বসে আছেন। অতএব, কিং কর্তব্যম অতঃপরম্? বিদ্রোহ! হ্যাঁ, বিদ্রোহ ব্যাপারটা ফ্যাশনেবল বটে।

ললিত কলা আকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ত্রিবাৎসরিক চারুকলা প্রদর্শনীকে উপলক্ষ করে সেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। এ যজ্ঞের আগুন জ্বালালেন ষাটের দশকের দিল্লী, বরোদা আর মাদ্রাজের কিছু নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা। কিন্তু এ'রা তো কুলীন ব্রাহ্মণ, এ'রা কি বলে তাঁদের বিদ্রোহটাকে 'লেজিটিমাইজ' করলেন? কিছুটা সত্যের সঙ্গে অনেকটা মিথ্যে চালিয়ে দিয়ে, আর কি! রাজনীতিতে নাকি অদ্ভুত ধরনের শয্যাসঙ্গীর দেখা মেলে। ভারতবর্ষের শিল্পরাজনীতিতে মোটেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ষাটের দশকের নব্য কুলীনত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাশের দশকের যেসব নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণদের আচার আচরণ শিল্পাদর্শ শিল্পক্রিয়া ইত্যাদিকে আক্রমণ না করে জলগ্রহণ করতেন না, হঠাৎ দেখা গেল তাঁদের মধ্যে ঝটিতি একটা সমঝাওয়াতা হয়ে গেছে। সমঝাওয়াতাটা হয়ে গেল কিন্তু একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটি হল প্রাক্তন-শিল্পী এবং শিল্প-রাজনীতিতে যাঁরা বহুদিন ধরে সমাসীন তাঁদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম করা। আর সত্যিই তো, অভিযোগ করতে চাইলে এ-সব প্রাক্তন-শিল্পী এবং শিল্প-রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে যথেষ্টর চেয়ে কিছু বেশী অভিযোগই উত্থাপিত হতে পারে। অনেক অভিযোগ তোলা হল। তার অনেকই সত্য, অনেক অর্ধসত্য। ক্ষাত্রিয়ত্বাকাঙ্ক্ষী নব্য ব্রাহ্মণ এবং নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ভ্রষ্ট ব্রহ্মচর্যের কথাটা বেমালুম চেপে গিয়ে, সক্রিয়-শিল্পীদের, নতুন সৃজনশীল শিল্পীদের নেতৃত্বে অধিকারের কথা বললেন, আকাদেমির উপর তাঁদের নৈতিক দাবির কথা বলে নিজেদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে 'লেজিটিমাইজ' করলেন।

বাংলাদেশের সক্রিয় শিল্পীদের যে অংশ আকাদেমির কার্যকলাপের সমালোচনা করা সত্ত্বেও, ত্রিবাৎসরিক প্রদর্শনী বর্জনকারী বিদ্রোহীদের পূর্বতন কার্যকলাপ স্মরণ করে তাঁদের বিদ্রোহকে ভূয়া বিদ্রোহ বলে মনে করেছিলেন, তাঁরাও কিন্তু এক অর্থে এই বিদ্রোহ থেকে লাভবান হবেন। নিজেদের নেতৃত্ব লাভ প্রচেষ্টাকে 'লেজিটিমাইজ' করার জন্য পঞ্চাশ এবং ষাটের ব্রাহ্মণরা ললিতকলা আকাদেমির গণতন্ত্রীকরণ দাবি করেছেন, ললিতকলা আকাদেমির কর্তৃত্বে সক্রিয় শিল্পীদের অধিকার

দাবি করেছেন, মনোনয়ন এবং পর্দার পিছনে তথাকথিত নির্বাচন ইত্যাদির অবসান দাবি করেছেন। এসব দাবির যদি কিছুমাত্র মেটাতে সরকার সম্মত হন তবে ললিতকলা আকাদেমি দেশের শিল্পকর্মে আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবে, আশা রাখি।

**প্রণবরঞ্জন রায়**

**যাত্রাশিল্প প্রসঙ্গে**

পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট যে এক ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে সে সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে গোটা সংস্কৃতিজগৎও যে এক প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে বিপর্যস্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা কতটা সচেতন বলা মুশকিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা সুবিধে আছে। বহু অভিভাবক (কেউ কেউ স্বনির্বাচিত) সেখানে প্রাণপাত করার জন্য প্রস্তুত; সংবাদপত্রগুলো সর্বদাই জনসাধারণকে বিপদসংকেত জানাচ্ছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবস্থাটা একেবারেই অন্যরকম। সরকার এসব ব্যাপারে প্রচণ্ড উদাসীন; জনসাধারণ প্রাণধারণের এবং প্রাণরক্ষার তাগিদে সংস্কৃতি চিন্তার সময়ই পান না; সৎ সমালোচনাও প্রায় অনুপস্থিত। সবচেয়ে ভয়ের কথা, আমরা জানি, সাংস্কৃতিক সংকট সাধারণত টের পাওয়া যায় সংকটকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ততদিন চলছে চলুক!

যে কোন সংবেদনশীল অনুভূতিসম্পন্ন লোকই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন আর পাঁচটা শিল্পরূপের মত সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রাতেও কি অসহায় অবস্থা। এরই মধ্যে আবার ফিল্ম ও থিয়েটারের তুলনায় যাত্রার অবস্থা আরও খারাপ। ফিল্ম-থিয়েটার সম্পর্কে উৎসাহী কিছু কিছু লোক দুর্গরক্ষা করার চেষ্টা করেন। এর ফলে কিছু কিছু শিল্পপ্রচেষ্টা বাঁচলেও বেঁচে যায়। যাত্রার অবস্থা অনাথ শিশুর মত। একেবারেই বুদির গড়, তায় আবার কোন কুম্ভও নেই রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। এই অবস্থায় শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রা সম্পর্কে যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যা কিছু দূরের, যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু গ্রামীণ তাই বড় মনোহর। এই বিশ্বাসে তাড়িত হয়ে এঁরা আজকাল প্রায়ই যাত্রাওয়ালাদের পিঠ চাপড়াতে শুরু করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে আছে এক নিরাপদ আত্মকণ্ডূয়নের মনোভাব। এঁরা জানেন থিয়েটার-সিনেমা সম্পর্কে প্রশংসা করাও সবসময় নিরাপদ নয়। পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে : কেন প্রশংসা করলেন? সঙ্গে সঙ্গে দায় পড়বে ব্যাখ্যা করার, ভাবনা-চিন্তা করার, দায়িত্ববান হবার। অত ঝামেলা কে নেয়? তার থেকে অনেক নিরাপদ অনেক আত্মতৃপ্তিকর যাত্রা সম্পর্কে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা। সে বেচারীরা অল্পেই সন্তুষ্ট, কখনই পৃষ্ঠপোষককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না। এই মানসিকতার ফলে বহু নাগরিক আজকাল যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছেন। এঁরা মঞ্চে অভিনীত যাত্রা দেখতে যাচ্ছেন ভিড় করে এবং স্ফীত অহংকারকে আরো স্ফীত করে ফিরে এসে বলছেন, 'এই তো শিল্প।' অথচ এঁরা বুঝতেই পারছেন না এঁদের স্তুতি-বর্ষণে প্রায়-বিনষ্ট যাত্রার সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে, যাত্রাশিল্প ধ্বংস হতে চলেছে।

যাত্রাশিল্পের সংকট আজকের নয়, বহুদিনের। অশিক্ষার আগাছা দীর্ঘদিন ধরে যাত্রাকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলছে। একটি উদাহরণ দিই। আমি স্বকর্ণে শুনেছি একটি নামজাদা দলের বহুখ্যাত 'মাইকেল মধুসূদন' পালায় গৌরদাস বসাক বলছেন : 'মধু আজকাল সকালে হিব্রু আর গ্রীক শিখছে, দুপুরে শিখছে ল্যাট্রিন।' প্রশ্ন উঠতে পারে থিয়েটারে বা সিনেমায় কি এই অশিক্ষা নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেখানে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা নিরলসভাবে এই শিল্পগুলির শিল্পসত্তা রক্ষা করার, প্রসার করার কাজে নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু বর্তমান যাত্রাজগৎ যেন অশিক্ষিতদের মনোপলি। ফণিভূষণ বা পঞ্চু সেনের মতো গুণী লোকেরা অশিক্ষার প্রবল স্রোতে খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছেন। যাত্রার কর্ণধারেরা বিশেষত অধিকারীরা দীর্ঘকাল ধরে ভুলেই গিয়েছেন যে আমাদের দেশে থিয়েটার বা সিনেমার থেকে প্রাচীনতর শিল্প যাত্রা, তার শেকড় মাটির অনেক গভীর স্তরে পৌঁছতে পারত। এই অশিক্ষার ফলেই তাঁরা কখনোই যাত্রার যথার্থ স্বধর্ম

নিরূপণ করতে পারেননি; যাত্রার স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা বুঝতে পারেননি; যাত্রা সম্পর্কে গৌরববোধ করতে পারেননি। ফলে জন্ম নিয়েছে এক আশ্চর্য হীনম্মন্যতা। এই দীনতা, এই গ্লানিকে প্রশংসাচ্ছলে আরো গভীর আরো সর্বব্যাপী করে তুলেছেন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের চিন্তাবিযুক্ত স্তুতির প্লাবনে। যাত্রাশিল্পীদের এই হীনম্মন্যতা থেকে জন্ম নিয়েছে এক আত্মবিস্মৃত পরধর্মমনস্কতা। প্রতি পদে, প্রতিটি কাজে নকলনবিশী। যাত্রার নব্য অভিনেতারা আজকাল প্রায়ই ফিল্মী-স্টারদের অনুকরণে নিজেদের নামের পাশে 'কুমার' ব্যবহার শুরু করেছেন। আগের কালে যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যত ধর্মপ্রধান, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটি বিশেষ 'র‍্যান্টিং স্টাইল'-এর অভিনয়শৈলী স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নিয়েছিল সেকালে। ভাবের ও ভাষার গাম্ভীর্য এবং কাব্যময়তাকে আশ্রয় করে যে অভিনয়রীতি তৈরি হয়েছিল তাতে সবসময়ে উচ্চগ্রামে কথা বলতে হত, একটু সুরে অভিনয় করতে হত। আবেগনির্ভর বিষয়বস্তু এই অভিনয়রীতিতে যথার্থ প্রাণ পেত। আজকাল যাত্রার দলগুলো আধুনিক হবার লোভে থিয়েটার-সিনেমার অনুকরণে বিষয়-বস্তু পাল্টে ফেলছেন। ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কঙ্গো, লেনিন, হিটলার, বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম জাতীয় তাবৎ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকালকার পালা লেখা হচ্ছে। আধুনিক হবার এই চেষ্টা নিশ্চয় ভালো। কিন্তু শুধু বিষয়বস্তু পাল্টালেই কি আধুনিক হওয়া সম্ভব? তার জন্য চাই সব কিছুতেই পরিবর্তন। পরিবর্তন চাই নাট্যকারের বিন্যাসপদ্ধতিতে, অভিনেতার মানসিকতায়, প্রযোজনারীতিতে, অভিনয়শৈলীতে। সেই পরিবর্তনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। নাট্যকারেরা আধু-নিক বিষয়ের অবশ্যম্ভাবী জটিলতা পরিহার করে পুরোনো রীতির সরলীকরণেই কাজ সারতে চাইছেন, চরিত্রগুলোকে একমাত্রিক করে ফেলছেন পুরোনো অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে। ফলে হিটলার হয়ে উঠছে যমদূত, লেনিন হয়ে উঠছেন ধর্মগুরু, ভিয়েতনামের লড়াই হয়ে যাচ্ছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। নাট্যকারদের মতো অভিনেতারাও চরিত্রানুগ পোশাক পরছেন মাত্র, মানসিকতায় তাঁরা এখনও সেই প্রাচীনত্বের পূজারী। প্রয়োজনীয় মননশীলতার কোন চর্চা তাঁদের মধ্যে নেই। অভিনয়শৈলীর ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেই একই সংঘর্ষ। রাজদরবারের অভিনয়রীতিতে তো ড্রয়িংরুমের কথা-বার্তা চালানো যায় না। ঘরোয়া প্রাত্যহিক কথাবার্তা, আজকের বাক্‌রীতিকে প্রকাশ করা পুরোনো 'র‍্যান্টিং স্টাইল'-এ সম্ভব নয় আদৌ। এই পুরোনো আধারে নতুন আধেয় রাখার চেষ্টায় এক অদ্ভুত রসাভাস ঘটছে।

এই একই পরধর্মমনস্কতার ফলে আজকাল বহু নামজাদা দল মঞ্চে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না পাশ্চাত্য প্রভাবে তৈরি থিয়েটারের তিন দেওয়ালের ঘেরাটোপে যাত্রার আপন শক্তি বিনষ্ট হতে বাধ্য। হাজার লোকের মাঝখানে সামিয়ানা-ঢাকা আসরে সুস্পষ্ট তীব্র আলোতেই যাত্রার যথার্থ রূপ প্রকাশ পেতে পারে। এখানে দর্শকে-অভিনেতায় কোন দূরত্ব থাকে না, নিমেষে ঘটে যায় প্রাণের যোগ, নিরাবরণ নিরাভরণ মঞ্চে একটানা অভিনয়ে আসে এক আশ্চর্য সঞ্চরণ-শীলতা এবং সাবলীলতা। অথচ যখনই সেই যাত্রাই আধুনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় তখনই সৃষ্টি হয় দর্শকের সঙ্গে অনতিক্রম্য দূরত্ব। একটি কথার ইঙ্গিতে আর আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে দৃশ্য এখন রাজসভা থেকে গভীর জঙ্গলে স্থানান্তরিত হল। স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত নায়কের আনন্দে-বিষাদে আর তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা বোধ করতে পারি না। এক-একবার পর্দা পড়ে আর আকাঙ্ক্ষিত যতিহীন আনন্দবক্ষ থেকে নিজেকে নির্বাসিত বোধ করি এবং তৎক্ষণাৎ সিগারেট ধরিয়ে শিল্পভবিষ্যৎ আলোচনার সূত্র ধরে অন্য জগতে চলে যাই। এমনি করে প্রতি পদে পদে কল্পনা বাধা পায়, আনন্দের নিটোল অভিজ্ঞতা অমোঘভাবে খণ্ডিত হতে থাকে।

এইসব দিয়ে আমি একথা আদৌ বলতে চাইছি না যে বিষয়বস্তু, অভিনয়শৈলী, প্রযোজনারীতি সব কিছুতে আধুনিকতা পরিহার করে যাত্রা তার আদি পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখুক। শিল্প সততই তার দিগন্ত ভাঙবে এবং বিস্তৃত করবে; নাহলে বন্ধ্যাত্ব অবশ্যম্ভাবী। পুরনো রীতি বিসর্জন দিক যাত্রা, নতুন প্রথা আবিষ্কার করুক। কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে, নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত রেখে তবেই তা সম্ভব। বিষয়ে ভাবে ভঙ্গীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলুক অহরহ। কিন্তু দোহাই, অনু-করণ নয়, সাঙ্গীকরণ করুন, আত্মস্থ করুন।

যাত্রাকর্মীদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, একাজ আপনাদেরই করতে হবে। শহরের তথাকথিত

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করবেন না। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এ'রা যাত্রার প্রতি দায়িত্ব পালনে উদাসীন। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) প্রায় সকলেই আরো অনেক কিছুর মত দেশী যাত্রাকে উপেক্ষা করে বিদেশী তিন দেওয়ালের থিয়েটারকে আপন করে নিয়েছেন। যাত্রা ক্রমেই অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে, এ'রা বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেননি। আজ হাজার চেষ্টা করলেও তাঁদের পক্ষে যাত্রার সঙ্গে একাত্ম বোধ করা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁদের প্রশংসাবাণী সম্পর্কে সাবধান। তাঁদের স্তুতি আন্তরিক হতে পারে, প্রায়শ্চিত্তের মনোভাবও থাকতে পারে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টায়। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার যথার্থ অধিকার তাঁদের নেই। যাত্রার জীবন, যাত্রার মরণ যাত্রাশিল্পীদেরই হাতে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

**আজকের থিয়েটার : ক'টি তরুণ মুখ**

খবর ব্যাপারটা এক হিসেবে খুব মজার। প্রতিদিন সকালে কাগজ খুললেই স্কুলে আগুন, বন্দুক বা টাকা ছিনতাই, বোমার লড়াই, খুনের খবর পড়ে চোখ জ্বালা করে। আরও বিচলিত লাগে যখন দেখি যে এই বিনাশযজ্ঞে তরুণরাই যুগপৎ বলি ও হোতা। কিন্তু কাগজের শিরোনামায় থাকে না, এমন অনেক কাজ, সৃষ্টির কাজ-ও তো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা করছে, করে থাকে—কাগজে মূল্যবোধ একটু অন্যরকম হলে সে-সব কথা-ও হয়ত খবর হয়ে উঠতো। থিয়েটারের শহর কলকাতায় অজস্র অপেশাদারী থিয়েটারের দল আছে। এদের মধ্যে বেশ একটা বড় অংশ হল কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের কল্পনা, নিষ্ঠা, উৎসাহ আর পরিশ্রমের ফসল। সম্প্রতি এরকম দুটি দলের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। বাংলাদেশের সমাজ এবং থিয়েটার এই উভয় দিক দিয়েই তাঁদের কাজকর্ম আমার খুব মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। নীচে এ-দুটি দলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সিলুয়েট্ দলের পরিচালক বীর সেন ১৯৬৮-তে দমদম মতিঝিল কলেজে বি.এস-সি. পড়বার সময় এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ বছর। বীর এখন এম.-এস-সি. পড়েন। বিষয় অঙ্ক। দলের সভ্যদের গড় বয়স একুশ বছর। বেশ কিছু চোদ্দ পনের বছরের ছেলেও আছে। স্থায়ীভাবে কোন মেয়ে দলে নেই এখন।

"দলের নাম সিলুয়েট দিলেন কেন"—প্রশ্ন করি।

"প্রযোজনায় ফটোগ্রাফিক প্রিসিশান চাই। তাছাড়া আদর্শের দিক থেকেও নামটা আমার পছন্দ। আবছা অন্ধকার পটভূমিতে কয়েকটি স্পষ্ট রেখার টান—তাকেই তো সিলুয়েট বলে।"—বীর সেনের উত্তর।

"মাসে কটা শো করেন?"

"দুটো।"

"এত কম কেন?"

"হল পাই না। টাকারও অভাব।"

সিলুয়েটের প্রথম প্রযোজনা "নির্বাসিত হৃদয়", বীর সেনের লেখা একটি একাঙ্ক। সময় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস। তারপর সেই বছরের নভেম্বর মাসেই আবার বীর সেনের লেখা আরেকটি একাঙ্ক, 'আলোর আলো'। পরের প্রযোজনা ১৯৬৯এ ব্রেশ্‌টের দ্য মাস (বা দ্য মেজার্‌স্‌-টেকন্‌)-এর উৎপল দত্ত কৃত অনুবাদ 'সমাধান'। তারপর ১৯৭০-এর ২৭শে মে তারিখে বিশ্বরূপায় এ'রা করেন বীর সেনের লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আবৃত্ত দশমিক'। এটি এ'দের সবচেয়ে নামকরা প্রযোজনা। নিজের লেখা নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বীর জানালেন, তাঁর গোড়ার দিকের নাটকে, যেমন "নির্বাসিত হৃদয়"-এ ব্যক্তিক প্রসঙ্গটাই বড় ছিল। ও নাটকে তাঁর বক্তব্য ছিল, আমরা সবাই মৃত। "কিন্তু পরে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ডেফিনিট্‌লি বদলে গেছে। আমি অনেক বেশি ঝুঁকেছি সামাজিক দিকে। "আলোর আলো" নাটকে বেকার সৃষ্টির ভিতরের ইতিহাস বলার চেষ্টা করেছি।

সমাজের মাথাওয়ালা লোকেরা নিজেদের স্বার্থে কিভাবে যুবসমাজকে অকর্মণ্য, বেকার করে রাখে সেটা দেখিয়েছি"—বীর সেন বললেন। তাঁর রচিত ও প্রযোজিত সর্বাধুনিক নাটক 'আবৃত্ত-দশমিক'। নাটকটি আপাত-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি টুকরো টুকরো ঘটনার সমষ্টি, অর্থাৎ এপিসোডিক। প্রথম দৃশ্য 'বিশ্ববিদ্যালয়'। একজন প্রশ্নবিক্রেতা প্রশ্ন বিক্রি করছে। ক্লাউনের পোশাক পরা দুটি লোক একটু পরে এসে প্রশ্নবিক্রেতাকেই ডিগ্রিবিতরকের সাজে সাজিয়ে দিয়ে যায়। ডিগ্রি বিতরণপর্ব শুরু হয়। ঐ ক্লাউনের পোশাক পরা লোক দুটিই আবার পোস্টার বাহকের কাজ করে, এক একটি এপিসোড শেষ হওয়ার পর পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড পালটে দিয়ে যায়। দ্বিতীয় দৃশ্য 'কলেজ'। তৃতীয় দৃশ্য—'পাবলিশিং এজেন্সী'। শিল্পীরা কিভাবে চরিত্র হারাচ্ছেন, শিল্পকে পণ্য করে তুলছেন, তার বিবরণ এই দৃশ্যে। চতুর্থ দৃশ্য, 'রাজপথে রাজকুমারদের লীলা'—শোষিত ও বিভ্রান্ত যুবসমাজের ছবি। পঞ্চম দৃশ্য—'মুক্তি আশ্রম'। ভাববাদী দর্শন ও নানা রাজনৈতিক তত্ত্বের বুলি আউড়ে পেশাদারী মুক্তিদাতারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। এই দৃশ্যটি দুটি শাখা-কাহিনীতে বিভক্ত : (ক) 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ' ও (খ) 'লটারী'। লাল ত্রিভুজ ও হঠাৎ-পাওয়া টাকাকেই বাঁচার পথ বলে সরল-সহজ মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। ষষ্ঠ দৃশ্য—'বন্ধ দরজা'—লক্ আউট ছাঁটাই ইত্যাদি বহু সমস্যায় জর্জরিত শ্রমিকের কথা। সপ্তম দৃশ্য 'তাড়িখানা'—সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যুগপৎ অত্যাচারে রক্তশূন্য নির্জীব কৃষকের কথা আছে এই অংশে। অষ্টম দৃশ্য—'সিদ্ধান্ত'। মধ্যস্বত্বভোগী-শ্রেণীভুক্ত নাট্যকার তাঁর নিজের কথা বলছেন এই অংশে : "এই আমাদের সমাজ। আমি শোষিত মানুষকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্ত এরা আমাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরল। জিজ্ঞাসা করল : 'কি করে বাঁচব? সমাজকে না ভেঙে কি করে সুন্দরভাবে বাঁচব?'" একটি প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে স্থাণুভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন বুর্জোয়া নাট্যকার। দর্শককে উত্তর দিতে আহ্বান জানানো হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে 'আবৃত্ত-দশমিক'-এর মত সমাজ-সচেতন, শিল্পোত্তীর্ণ মৌলিক নাটক বাংলাদেশে আর বড় বেশি লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সমাজের বর্তমান শোষণ ও দুর্নীতিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে সিল্যুয়েটের স্পষ্ট তির্যক রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক বক্তব্য শুষ্ক তত্ত্বে পরিণত হয়নি। নাচ, গান ও পোস্টারের ব্যবহারে, ফর্মের বৈচিত্র্যে দর্শককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে এ নাটক। এ নাটকে সাতটি গান ও একাধিক নাচ আছে। গানের সুর দিয়েছেন গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীর সেন। নাচের কোরিওগ্রাফিও করেছেন বীর নিজে।

এ নাটকে ব্রেশটীয় ফর্ম নিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করায় বীর জানালেন : "মিলার, পিরানদেল্লো, বেকেট পড়েছি। ঠিক মিলছিল না মনের সঙ্গে। ব্রেশ্‌ট্ পড়ে মনে হোল আমাদেরই কথা শুনতে পাচ্ছি। ব্রেশ্‌টে মানুষের নাড়ীর টান বোধ করা যায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্রেশ্‌টের নাট্যরীতির সঙ্গে আমাদের দেশের যাত্রার মিল আছে। অবশ্য যাত্রা মূলতঃ আবেগপ্রধান। কিন্তু ব্রেশ্‌টের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের মত শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্রেশ্‌ট একবার বলেছিলেন, 'জীবনের সত্য ও আনন্দকে ধরতে চাই।' তাই আমার ব্রেশ্‌ট ভাল লাগল। অবশ্য সর্বদাই বিশেষ কোন নাট্যরীতি মেনে চলব, এমন কোন খত দিয়ে রাখিনি কারও কাছে। যে নাটকে সামাজিক অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, আমি সেই নাটক-ই করতে চাই। সেই সঙ্গে অবশ্য নাটকটি শিল্পসম্মত হতেই হবে।"

সিল্যুয়েটের আগামী প্রযোজনা "পারী কমিউন"। এটি কিন্তু ব্রেখটের বিখ্যাত নাটক দ্য ডেজ অব্ দ্য কমিউনের অনুবাদ নয়। বীর সেনের নিজের লেখা। এমনকি লেখার সময় তিনি ব্রেশ্‌টের নাটকটি পড়েন-ও নি। পরে পড়ে মনে হয়েছে ব্রেশ্‌টের নাটকের ঝোঁক মূলতঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দিকে। বীরের নাটকে রাজনীতি আছে—শ্রেণীস্বার্থে ব্যবসাদাররা কিভাবে শাসকশ্রেণীকে কুক্ষিগত করে, সে কথা আছে। তবে বীর বেশি জোর দিয়েছেন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর। উৎসাহে উজ্জ্বল মুখে তরুণ নাট্যকার বলতে লাগলেন : "জানেন, এ নাটকে মানুষের মুখোশ-পরা একটা চরিত্র থাকবে, মুখোশটা খুলে ফেললেই দেখা যাবে জন্তুর মুখ, চরিত্রটির আসল স্বরূপ। এছাড়া নাচ থাকবে, গানও থাকবে।"

প্রশ্ন করি : "গান কেন?"

"গদ্যে কিছু বোঝাতে বড় বেশি কথা ব্যবহার করতে হয়, অনেক সময় যায়। গানে কম সময়ে, কম কথায় অনেক বেশি বলা যায়। তাছাড়া প্রডাকশানটা ইন্টারেস্টিং করতে চাই"—বীরের উত্তর।

সিলুয়েট সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য—একটা পড়ে-থাকা বাগানবাড়িতে মালিকের অনুমতি নিয়ে ওঁরা রিহার্সাল দেন। ভারি খুশি, ভাড়া দিতে হয় না। টাকার তো খুব টানাটানি। "নিজেরা পয়সা জোগাড় করে শো করি। বন্ধু-বান্ধবকে অনুরোধ-উপরোধ করে টিকিট কিনিয়েছি, মানে যাকে বলে পুশ-সেল করেছি। শো করার জন্য আমন্ত্রণও আসে মাঝে মাঝে। তখন আর্থিক চিন্তা একটু কমে। রাঁচিতে একবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম অভিনয় করার। বারাকপুরের একটা কল-শো-তে একবার তিনশো পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলাম। আর সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছিলাম বর্ধমানের শ্যামসুন্দর কলেজে 'আবৃত্ত-দশমিক' অভিনয় করে। একসঙ্গে একেবারে পাঁচশো।"

যে প্রশ্নটা সবচেয়ে আগে করার কথা ছিল; সেটাই সবশেষে করি : "নাটক করেন কেন?"

বীর সেনের উত্তর : "মানুষের জীবনকে প্রকাশ করার একটা বড় মাধ্যম নাটক। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। জনচেতনা বাড়াতে চাই। আমাদের বয়সী ছেলেরা নিজেরাও জানে না যে তারা সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পা দিচ্ছে। আমি তাদের বুদ্ধিকে সজাগ করতে চাই। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলে, তার মাধ্যমে সমাজকে বদ্‌লাতে চাই। তবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে। আমি একচক্ষু হরিণ হবো না। চোখে ঠুলি পরবো না।"

জন-যোগাযোগ প্রসঙ্গে বীর বেরলিনের আঁসাঁব্‌ল্‌-এর সপ্রশংস উল্লেখ করলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা কিভাবে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের কাছে নাটক সম্পর্কে মতামত শুনতে গিয়েছিলেন, সে কথা জানালেন। সিলুয়েটের টিকিটের পিছন দিকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে লেখা থাকে, "নাটক কেমন লাগল জানাবেন।" অভিনয়শেষে দর্শকদের নাটক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সভ্যরা। এই ধরনের জনযোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল বলেই ওঁরা চলতি নামকরা দলগুলিতে যোগ না দিয়ে নিজেরা দল খুলেছেন। যতদূর বুঝেছি, এঁদের ঝোঁকটা মূলতঃ সামাজিক দিকে। তবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নয়। ব্রেশ্‌ট্‌-অনুরাগী নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক বীর সেন ও তাঁর সহকর্মীরা জীবনের সবটা ধরতে চান।

'শিল্পী যাযাবর' দলের সঙ্গে সিলুয়েট্‌-এর মিল শুধু এক জায়গাতেই। এটি-ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সংগঠন। শিল্পী যাযাবর-এর পরিচালক শ্রীজগন্নাথ বসুর বয়স পঁচিশ। সদ্য ছাত্রত্ব ঘুচেছে, আকাশবাণী কলকাতার যুববাণী বিভাগে দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন। তাঁর বন্ধু হীরক মুখোপাধ্যায় দলের মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে আছেন। শিল্পী যাযাবর রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান। সভ্যসংখ্যা পঁচিশ। মহিলা শিল্পী আছেন মোটামুটি জনছয়েক। দলের সভ্যদের গড় বয়স তেইশ। অধিকাংশ-ই ছাত্রছাত্রী। টাকা ও হলের অভাবে ওঁরা মাসে একটার বেশি শো করতে পারেন না। নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে, টিকিট বিক্রি ও কল-শো করে কোনক্রমে প্রযোজনার খরচ তোলেন। দুঃসময়ে নিজেদের ঘড়ি, আংটি বাঁধা দিয়ে পয়সা জোগাড় করতে হয়েছে, এমন ঘটনা-ও ঘটেছে একাধিকবার। থিয়েটার করেন কেন জিজ্ঞাসা করায় জগন্নাথ ও হীরক জানালেন : "কাকারা (অভিনেতা প্রেমাংশু বসু এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের মঞ্চ-নির্দেশক ও 'রঙ্গনা' থিয়েটার হলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগণেশ মুখোপাধ্যায়) নাটক করতেন। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে থিয়েটার ব্যাপারটা ডাল-ভাতের মত পরিচিত, সহজ ও অভ্যস্ত ছিল। তাই প্রায় সহজাত প্রবণতার ফলেই থিয়েটারের কাজে নেমে পড়লাম। স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই বলে চলতি বড় বড় দলগুলিতে না গিয়ে নিজেরা দল খুললাম।"

'শিল্পী যাযাবর' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। প্রথম প্রযোজনা—রবীন্দ্রনাথের "সম্পত্তি-সমর্পণ" গল্পের নাট্যরূপ। ওঁরা নিজেরাই কয়েকজন মিলে এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলেন। এই বছরেই ওঁরা বিধায়ক ভট্টাচার্যের "সরীসৃপ" একাঙ্কটিও মঞ্চস্থ করেন। তারপর একে একে : ১৯৬৫তে চেহভের 'প্রপোজাল'-এর রূপান্তর 'রাজযোটক' ও মনোজ বসুর "কঠিন মৃত্যু"। ১৯৬৬তে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রমত্ত প্রহসন" ও বিধায়ক ভট্টাচার্যের "তাহার নামটি রঞ্জনা"। ১৯৬৭ সালে ঋত্বিক ঘটকের "জ্বালা" ও রবীন্দ্রনাথের "বিনি পয়সার ভোজ"। ১৯৬৯-এ বেখেট-এর "ওয়েটিং ফর গডো"র বাংলা রূপান্তর "ঈশ্বর বাবু আসছেন।" এঁদের সর্বাধুনিক প্রযো-

জনা ১৯৭০-এ শ্রীমতী কবিতা সিংহের লেখা "সব হিশেবের বাইরে"।

প্রশ্ন করি : কি কি কথা ভেবে নাটক নির্বাচন করেন? জগন্নাথের উত্তর : "দেশী-বিদেশী নিয়ে মাথা ঘামাই না। ভাল নাটক হতে হবে এটাই সবচেয়ে বড় কনসিডারেশান। গভীরভাবে জীবনের কথা বলতে পারে, এমন নাটককেই আমার ভাল নাটক বলে মনে হয়। তাছাড়া সব সময় চেষ্টা করি আমাদের প্রযোজনায় যেন আঙ্গিকের নূতনত্ব থাকে।" কথা শুনে মনে হল আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সম্পর্কে জগন্নাথ অতিমাত্রায় সচেতন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের "তাহার নামটি রঞ্জনা" নেহাৎ সাদামাটা, আবেগপ্রধান নাটক। তবু সে নাটকের প্রযোজনাতেও জগন্নাথ যথাসম্ভব অভিনবত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ধরা যাক—ভাই বোনের প্রথম সাক্ষাৎ-এর সময় চলচ্চিত্রের রীতি অনুযায়ী ক্লোজ-আপ ব্যবহার। বহুদিন ধরে নিরুদ্দেশ দাদার সঙ্গে বোনের সাক্ষাৎ হচ্ছে জেলখানায়। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব রয়েছে, এরা দুজন এখন বিচ্ছিন্ন। তাই দুজনকে আলাদা আলাদা ভাবে ক্লোজ-আপ-এ ধরা হয়। সেই মুহূর্তেই দেখা যায় মঞ্চের পিছনের অংশে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে খেলা করছে। একটি বিশেষ ধরনের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য এই সময় সেতারের ঝালা ব্যবহার করা হয়।

জগন্নাথ বুঝিয়ে বলতে থাকেন : "থিয়েটারে অভিনয়টাই একমাত্র উপাদান বলে আমার মনে হয় না। মঞ্চ, আলো, সঙ্গীত, রূপসজ্জা, কায়িক ও বাচিক অভিনয় সব কিছু মিলিয়েই তৈরি হবে নাট্য বা থিয়েটার। ধরুন অনেকটা অনেকটা অর্কেস্ট্রার মত ব্যাপার"। উদাহরণ হিশেবে জগন্নাথ "প্রমত্ত প্রহসন" নাটকটির কথা তোলেন। "প্রমত্ত প্রহসন"-এর অভিনয়রীতি অনেকটা স্টাইলাইজ্‌ড্ ধরনের। মানুষের জীবনে ক্রমান্বয়ে, কখনও বা একই সঙ্গে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের পালা চলছে। কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায় ট্রাজেডি ও কমেডি প্রায় সবসময়েই পরস্পরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে রয়েছে। কোরিওগ্রাফি, আলো ও সঙ্গীতের নিপুণ ব্যবহারে এই সহ-অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্চের সামনের দিকে বিয়োগান্ত অংশের অভিনয় হয়, আর পিছনে কতকগুলি রঙিন ফিতের উপর দিয়ে উজ্জ্বল আলো পিছলে যায়। লঘু, চপল সুর ভেসে আসে। এ নাটকের রূপসজ্জাও আর পাঁচটা স্বভাববাদী নাটকের মত নয়। কমেডি অংশে অভিনেতার রূপসজ্জা ভাঁড় বা ক্লাউনের মত। আর ট্রাজেডি অংশের অভিনেতার রূপসজ্জা প্রায় গ্রোটেস্‌ক্ বলা যায়। কমেডি অংশের উচ্ছল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যালের ধরনে লঘু-চপল নৃত্যভঙ্গি ব্যবহার করা হয়। অভিনয়ের স্থান মঞ্চে সীমাবদ্ধ নয়। অডিটোরিয়ামকেও মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। নাটকের শেষ সংলাপ বলা হয় ব্যালকনি থেকে।

"শিল্পী যাযাবর"-এর সর্বাধুনিক প্রযোজনা "সব হিশেবের বাইরে"-র বিষয়বস্তু হল বর্তমান কালের ব্যস্ত জীবন। প্রধান চরিত্র একজন সদাব্যস্ত চিকিৎসক। তিনি তাঁর প্রেমিকা ও মাকে ভালবাসেন। তাঁদের কাছে যেতে চান। কিন্তু সময় নেই। হঠাৎ একদিন একটা অপারেশন করতে গিয়ে ভুল করলেন। তারপর থেকে সময়ের হিশেবটা গুলিয়ে গেল। এক হিশেবে বলা যায় সময়টাই নাটকের প্রধান চরিত্র। মঞ্চপরিকল্পনাতেও সময়ের এই প্রাধান্য পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা আছে। একটি বিশাল গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের উপর বিচিত্র রঙের আলো পড়ে, সেটিকে প্রায় বীভৎস দেখায়। "সংখ্যা-গুলো বন্‌বন্ করে ঘুরছে। সর্বনাশ, দেখাই যায় না সেকেন্ডের কাঁটা। ঘন্টার কাঁটাও বন্‌বন্ করে ঘুরছে মিনিটের বেগে। তাহলে কি একদিন মানে চব্বিশ মিনিট?"—নাটকের এই সংলাপের অর্থ পরিস্ফুট করে তোলার জন্য সত্যিসত্যিই মঞ্চে রাখা গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের কাঁটাগুলি সাধারণ নিয়মে ঘোরে না। বন্‌বন্ করে ঘোরে। থীম্ মিউজিক হিশেবে জগন্নাথ বিভিন্ন ধরনের ঘড়ির টিক্‌টিক্ ও ঢংঢং শব্দ, গীর্জার ঘন্টা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিককে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। এ পর্যন্ত নাটকের বিষয় হিশেবে মানুষের ব্যক্তিজীবনের উপর জগন্নাথের ঝোঁক বেশি। অবশ্য সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব নেই। শিল্পীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের কথা উদ্ধৃত করে জগন্নাথ জানালেন, "বাস্তবের শ্রদ্ধেয় অংশের প্রতি ভালবাসা আর নোংরা দিক সম্পর্কে ঘৃণা—এই হল শিল্পীর দায়িত্ব"।

জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে ধারণা কি, প্রশ্ন করায় জগন্নাথ বলেন, "ছোট দলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ দিতে পারবে, এমন প্রতিষ্ঠান চাই।" সরকারের কাছে ওঁদের দাবি—মঞ্চ

বাড়ান। এছাড়া সূক্ষ্ম ও স্থূলে কোনরকম লেজুড় যদি না থাকে, তবে সরকারী অনুদান চান। আপাততঃ ওঁদের পেশাদারী হওয়ার ইচ্ছা নেই। লাভ হলে নতুন প্রযোজনা করবেন। নিজেরা টাকা নেওয়ার কথা এখন আদৌ ভাবছেন না।

"বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কি ভাবছেন"? প্রশ্ন করি। জগন্নাথের উত্তর : "বড় অস্থির লাগে। কতদিন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায়। মহলা দিতে আসতে পারি না। কিংবা দেখি পাড়ায় সার্চ হচ্ছে। মাথার উপরে হাত তুলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে হয়। সবচেয়ে বীভৎস—চারিদিকে খুনের খবর পাই। এ অবস্থায় স্থির হয়ে সৃষ্টির কাজ করা কি ভীষণ মুশকিল!"

—হ্যাঁ, সৃষ্টির কাজ—খুব মুশকিল হলেও সৃষ্টির কাজ। তারুণ্য ছাড়া এই একটিমাত্র জায়গায় ওঁদের দুদলের মিল। 'সিল্যুয়েট' ও 'শিল্পী যাযাবর' এই দুটি একেবারে ভিন্ন চরিত্রের দল। কিন্তু এরা সবাই তরুণ, আর চারিদিকের বিশৃংখলা, ধ্বংস আর মধ্যবয়স্ক নির্লিপ্তির মুখের ওপর তুড়ি মেরে এঁরা সৃষ্টি করে চলেছেন।

কেয়া চক্রবর্তী

**উপন্যাস ও সাংবাদিকতা : কিছু সন্দেহ**

চতুরঙ্গের কয়েকটি সংখ্যাতেই দেখছি শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ বাঙলা উপন্যাসের হালফিলের রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন। এ-ধরনের আলোচনা আজকাল হচ্ছে না। নিত্যপ্রিয় খুব দরকারি একটা কাজ করছেন। তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

নিত্যপ্রিয়-র রচনার সবচেয়ে বড় গুণ আলোচ্যবিষয়ের সংজ্ঞার্থ, তাঁর মত অনুযায়ী, তিনি আগে বলে নেন। ফলে আমাদের পক্ষে বোঝার সুবিধে হয় সাহিত্য বলতে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলতে বা সাংবাদিকতা, উপন্যাস ইত্যাদি বলতে তিনি কী বোঝেন। অবিশ্যি সাহিত্যসমালোচনার বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞার্থ নিশ্চয়ই শুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো অনড়, অটল, অদ্বিতীয় নয়। তবে সেটা একটা তাত্ত্বিক বিতর্কের বিষয় হতে পারে নিশ্চয়ই। নিত্যপ্রিয়-র উপন্যাস আলোচনা আমার ভালো লাগছে এই কারণে যে সিদ্ধান্ত ও আলোচনাকে তিনি তত্ত্বের লজিকের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন।

কিন্তু চতুরঙ্গ-এর কার্তিক ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "শব্দের খাঁচায়" রচনাটি নিয়ে আমি সেই লজিকেরই বিভ্রাটে পড়েছি।

১। "বাংলাদেশেও...উপন্যাসের স্থান সাংবাদিকতা ক্রমশই নিচ্ছে"—এমন একটা সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোথায়? তিনি তো মাত্র তিনজন ঔপন্যাসিককে এই কোঠায় ফেলেছেন। পত্রিকার পাতায় তো দেখি প্রতিদিন বা প্রতিসপ্তাহে অজস্র উপন্যাস বেরচ্ছে। তাহলে কি নিত্যপ্রিয় ঐ তিনজন লেখককে—অসীম রায়, মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—ততোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যাঁদের রচনাতে 'বাংলাদেশে...উপন্যাসের স্থান' নির্ণীত হয়ে যেতে পারে? আমার বিশ্বাস অনেকখানিই হতে পারে। নিত্যপ্রিয় কিন্তু এই জরুরি কথাটি বলে নেননি যে "নিঃসংশয়ে" যে-কথা তিনি বলেছেন তার প্রমাণ হিশেবে এই তিন লেখককেই তিনি বাছলেন কেন। সেটা বলতে গেলেই তিনি দেখতেন, আমার বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই দেখতেন, বর্তমান বাংলা উপন্যাসে এই তিনজন লেখক নিত্যপ্রিয় কর্তৃক নির্ধারিত সাংবাদিকতার সীমাবদ্ধতায় আটকা নন শুধু—তার অতিরিক্ত কিছু।

২। নিত্যপ্রিয় আমাদের বলে দিয়েছেন "নর্মান মেলার বা ট্রুম্যান কাপোট বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চরিত্র বিকৃত না করেই তাঁদের বিখ্যাত লেখাগুলি লিখেছেন।" এ-কথা আমাদের মেনে নিতে হবে কেন? "বিকৃত না করা" বলতে নিত্যপ্রিয় কী বোঝাচ্ছেন? মানে কি এই যে কাপোট বা মেলার কিছু বানান নি? কাপোটের লেখা আমি পড়ি নি। মেলারের রচনা পড়ে মনে হয়েছে বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতি বা অবিকৃতির প্রশ্নটাই তো অবান্তর। এমন-কি কেউ আছেন যিনি ঘটনাটা কী ঘটেছিল সেটা জানবার জন্য মেলারের রচনাগুলি পড়বেন? আসলে মেলার ঘটনায় আটকে না-থেকে ঘটনার ভেতরে চলে যেতে পেরেছেন বলেই তিনি সাংবাদিকতার সীমা ছাড়িয়েছেন। আবার স্টেইনবেক ঘটনার বাইরে থেকে ঘটনায় আসায় তাঁর রচনা সাংবাদিকতা আর উপন্যাস—দুএরই কলঙ্ক।

৩। সাংবাদিকতার সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে নিত্যপ্রিয় প্রথমেই বলেছেন, সাংবাদিকতায় "লেখক তাঁর বর্ণিত ঘটনা দেশের মূলঘটনাস্রোতের সঙ্গে মেলাতে পারেন না।" তার মানে উপন্যাসে পারেন। এই রচনার অন্যত্র যে-ধরনের আপ্তবাক্য আওড়ানোকে "শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুলভ কথা আবৃত্তি" বলে নিত্যপ্রিয় একটু রগুড়ে হতে চেয়েছেন—তিনি নিজেই সে ধরনের আপ্তবাক্য শুনিয়ে দিলেন? এটা কি সবসময় সত্য? এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস টমাস মানের জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্সে 'বর্ণিত ঘটনা দেশের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে' লেখক কি মিলিয়েছেন? বা ইভো আন্দ্রিতের ব্রিজ অন্ দি রিভার দ্রিনা-ও তো একরকম মধ্যযুগেরই কাহিনী। অথবা হালডর ল্যাক্সনেসের দি প্যারাডাইজ রিগেইনড? বা আমাদের উপন্যাসের গর্ব পুতুলনাচের ইতিকথা বা অসাধু সিদ্ধার্থ? নিত্যপ্রিয় বলেছেন দেশের "মূল ঘটনাস্রোত"। আসলে সাংবাদিক তো অনেকটাই তা পারেন—একটা ঘটনাকে মূল ঘটনার সঙ্গে মেলানো। কিন্তু সেটা তাই বলে কখনোই মানবিক-দলিল হয় না। আসলে বোধহয় ঔপন্যাসিক দুনিয়াটাকে যেমন দেখছেন তার একটা শিল্পসমতুল্যতা, আর্টিস্টিক ইকুইভালেন্স, খোঁজেন। তা কখনো প্লেগের স্থূল প্রতীকে দেশের "মূল ঘটনাস্রোতের" সঙ্গে মিশে যায় আবার কখনো সমুদ্রের মৌনের সাধনায় তথাকথিত মূলঘটনাস্রোত থেকে এক ধরনের নিরপেক্ষতা অর্জন করতে চায়। নর্মান মেলারের রিপোর্টগুলি বাস্তবের রিপোর্ট বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের শিল্পসমতুল-ও, আর্টিস্টিক ইকুইভ্যালেন্সও, বটে।

কিন্তু এ-তর্ক আমি তুলতে চাই নি। নিত্যপ্রিয়ের সংজ্ঞা মেনে নিলে শব্দের খাঁচায় তো সাংবাদিকতার দায়মুক্ত হয়। মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রীর ছেলের রাজনীতি, মন্ত্রীর ভাইপোর তটস্থতা এগুলোকে তো সবসময়েই লেখক দেশকালের মূলঘটনার সঙ্গে মিলিয়েছেন—গ্রামে সমষ্টি উন্নয়নের বক্তৃতা পর্যন্ত আছে। উনিশ শতকের দক্ষিণেশ্বরে হরু ঠাকুরের বাচালতা থেকে পূর্ব বাঙলা আর পশ্চিম বাঙলার প্রণয়ীযুগলের শেয়ালদার হোটেলে আলাপ পর্যন্ত দেশকাল তো বেশ পরিষ্কার ভাবে, একটু বেশি পরিষ্কার ভাবেই চোখের সামনে টেনে ধরা। তাহলে নিত্যপ্রিয়-র সংজ্ঞা অনুযায়ী এ-বই 'সাংবাদিকতা' হয়ে ওঠে কী করে?

৪। নিত্যপ্রিয় বলেছেন "যেখানে চরিত্র একটি ব্যক্তির মধ্যে আটকে থেকে দেশের বিশেষ চরিত্রগোষ্ঠীগুলির প্রতিভূ হয়ে না ওঠে, সেখানেই লেখক সাংবাদিকতা করছেন, উপন্যাস লিখছেন না।" এই শর্তটি শব্দের খাঁচা-য় প্রয়োগ করলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়। অসীম রায় তাঁর চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট রসে ব্যক্ত করতে পেরেছেন, এ-সন্দেহ যদিবা হয়, চরিত্রগুলি যে "প্রতিভূ" হতে পেরেছে—এ-বিষয়ে প্রশ্নও তোলা চলে না। বিভিন্ন অংশে ভাগ করে উপন্যাসটি রচিত ও এক-এক অংশে এক-এক চরিত্রের প্রাধান্য বলেই হয়তো চরিত্রগুলি ঈপ্সিত বৈচিত্র্য পায় নি, ব্যক্তির বৈচিত্র্য, কিন্তু শ্রেণীর বা শ্রেণীর ভেতরকার নানা স্তরের প্রতিনিধিত্ব তো নেহাতই স্পষ্ট। জাতীয় আন্দোলনের আদর্শবাদী ধারা, জাতীয় আন্দোলনের পুঁজি খাটিয়ে এখনকার মুনাফাবাজি, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যথেষ্ট আত্মীয়তা স্থাপিত হয় নি এমন নতুন প্রজন্ম, বামপন্থী আন্দোলনের অংশভাক্—সকলেই তো এখানে আছে। আমার কিন্তু মনে হয়েছে নিত্যপ্রিয় সাংবাদিকতা আর উপন্যাসের পার্থক্যের এই সূত্রটি উল্টে ফেলেছেন। "চরিত্র একটি ব্যক্তির মধ্যে আটকে থেকে" খারাপ উপন্যাস হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিত্বটুকু বাদ দিয়ে শুধু "প্রতিভূত্ব"টুকু নিয়ে সাংবাদিকতা হলেও হতে পারে, অন্তত ফিচারগোছের সাংবাদিকতা, কিন্তু উপন্যাস কখনো নয়।

৫। নিত্যপ্রিয় বেশ পরিষ্কার বলেছেন "শব্দের খাঁচায়" উপন্যাসের বক্তব্য তাঁর কী মনে হয়েছে "বর্তমান বাঙলার যুবক-যুবতীরা, যারা ভদ্র নয়, যারা শব্দের ফানুস ওড়াতে চায় না, যারা শব্দের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করতে চায়, তাদের কিছুই করার নেই, কেননা তারা 'বাঙলাদেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত'।" এরপর নিত্যপ্রিয় বাঙালির অধঃপতনের বহুশ্রুত কারণগুলির একটি তালিকা দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন "আসল ব্যাপার হলো, বাঙলাদেশে কিংবা আরো বৃহত্তর পরিসর ভারতবর্ষে কথার ফানুস উড়িয়ে শাসকশ্রেণী শাসিতদের ভুলিয়ে রেখেছেন।" নিত্যপ্রিয়ের মতে, "এই মূল কথাটি" অসীম রায় "ধরতে" পারেন নি, "বলা উচিত ছিল শব্দের মায়ায় আটকে রাখা হয়েছে শাসিতদের।"

ঔপন্যাসিকের কী "বলা উচিত ছিল", সেটা নির্দেশ করা যে সমালোচকের উচিত নয়, মানে

তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয়, এটা বোধহয় নিত্যপ্রিয়ের মনে রাখা "উচিত ছিল।" অতবড় উপন্যাসটি যদি হয় 'শব্দের খাঁচায় বলিতে কী বোঝ' তার উদাহরণ সহযোগে উত্তর, তাহলে "অসীম রায়ের বক্তব্য" বলতে নিত্যপ্রিয় আমাদের একবাক্যে যা বোঝালেন তা হয়ে দাঁড়ায় "সংক্ষিপ্তসার লেখা" এই প্রশ্নের সবচেয়ে ছোট উত্তর। নিত্যপ্রিয়ের মতো রসজ্ঞ পাঠককে অতবড় উপন্যাসটির সমালোচনা করার জন্য তিন লাইনের সংক্ষিপ্তসার বানাতে হয় কেন।

যে-দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের মুখের কথা বাঙলাসাহিত্যের সবচেয়ে ভালো জার্নালের (রামকৃষ্ণ কথামৃত) বিষয় হয়ে ওঠে—সেই দক্ষিণেশ্বরেই হয়ু ঠাকুরের কথাগুলি হয়ে দাঁড়ায় পানের লালাসিক্ত ছিবড়ে। যে-শব্দে সত্যিকারের গ্রামীণ কর্মীর মনে আশাআনন্দের হতাশাবিষাদের স্বপ্ন তৈরী হয়, সেই শব্দে কেন্দ্রীয় সচিবের বক্তৃতা হয়ে ওঠে শুকনো ফুলের মতো ঝুরঝুরে। তাহলে কেন বলবো কথার ফানুস উড়িয়ে শাসকশ্রেণী শাসিতদের "ভুলিয়ে রেখেছেন"? আমাদের অন্যতম দুর্ভাগ্য কি এই নয় যে শাসিতশ্রেণী, শোষিতশ্রেণী তার নিজের কথাগুলিকে খাঁচা থেকে বের করে আনতে পারছে না? বাস্তবতায়, হ্যাঁ, এই সত্তরের দশকের বাঙলাদেশের বাস্তবতার একটা চেহারা কি এই নয়, যে 'বিপ্লব' শব্দটিকে তার সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে আর অনুষঙ্গ নিয়ে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবার দায়িত্ব ছিল শাসিতশ্রেণীর, শাসিতশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনগুলির—পার্টিগুলির,—সেই বিপ্লব শব্দটি এই দশকে সবচেয়ে অর্থহীনতার দিকে চলে যাচ্ছে? শাসিতশ্রেণীর কোনো সংগঠন যদি বোঝে বিপ্লব মানে শহরের দেয়ালে দেয়ালে কৃষি-বিপ্লবের আহ্বান দেয়া আর কোনো দল যদি বোঝে রাজ্যের শাসনক্ষমতাটুকু দখল করা—তাহলে বেচারা ঔপন্যাসিকের দোষ কি "রাস্তায় বিপ্লব হয়ে গেছে" এই কথা বলায়? বরঞ্চ এই একটি বাচনে তিনি ধরতে পারেন শব্দের নিদারুণ অপমৃত্যু। আশা করতে পারি, নিত্যপ্রিয়ের মতো অসীম রায়ও নিশ্চয়ই অবহিত "বিপ্লব...একদিনে ঘটে না, প্রস্তুতি দরকার হয়, নিষ্ঠা দরকার হয়।" এটাও নিশ্চয় আশা করবো অসীম রায়ের মতো নিত্যপ্রিয়ও অবহিত হবেন সেই প্রস্তুতি আর নিষ্ঠার অভাবে শব্দ তার সংজ্ঞার্থ হারায় আর সেই হারানোর কাহিনী উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। সেটা বোধহয় একটা রম্যরচনার পক্ষে খুব ভারি হয়ে যাবে।

৬। "গদ্যের দিক দিয়ে...সন্দীপন যতটা সিদ্ধহস্ত, ততটা মনোযোগী যদি তিনি তাঁর বিষয়ে হতে পারতেন" তাহলে নিত্যপ্রিয় তাঁকে ঔপন্যাসিক বলতেন। কিন্তু তা নন বলে সাংবাদিক বলছেন। এর পরের অনুচ্ছেদেই তিনি সন্দীপনের "একক প্রদর্শনী" আর "সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী" "দুটো রচনাকেই লেখকের নোটবই বা জার্নাল বা ছোটগল্প বা উপন্যাসের ফ্রেম বা সাংবাদিকের মন্তব্য বলে" ধরে নিয়েছেন। এতগুলো "বা" দিয়ে যে-রচনার চরিত্র নির্ণয় করতে হয় তার রচয়িতাকে এককথায় সাংবাদিক বলা চলে কি করে? নাকি "বা" দিয়ে রচনার যতো রকম রূপের কথা বলা হয়েছে, নিত্যপ্রিয়ের কাছে সে সবই সাংবাদিকতা? উনি যতোগুলো সাহিত্যরূপের কথা বলেছেন, তার শেষেরটি বাদে যে-কোনোটি হলেই তো সন্দীপন সাহিত্যিক, সাংবাদিক নন। নিত্যপ্রিয় উপন্যাস আর সাহিত্য-কে সমার্থক ধরে নেন নি তো?

৭। সন্দেহটা আরো পোক্ত হয় যখন তিনি তাঁর শেষ অনুচ্ছেদে বলেন "জার্নালও লেখকের অন্তর্বিশ্বের রিপোর্টাজ।" সব সাহিত্যই তো তাই। নিত্যপ্রিয় "অন্তর্বিশ্ব" শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলে আমার বলার লোভ হচ্ছে সাংবাদিকতা বহির্বিশ্বকে নিয়ে, সাহিত্য অন্তর্বিশ্বকে নিয়ে। নিত্যপ্রিয় যদি বলতেন সন্দীপনের রচনাটি উপন্যাস হয় নি, তার মানে বোঝা যেত। কিন্তু তিনি বলছেন উপন্যাস হয় নি, সুতরাং সাংবাদিকতা হয়েছে। এর মানে বোঝা যায় না।

৮। নিত্যপ্রিয় অসীম রায় ও মতি নন্দীর দোষ দেখেছেন তাঁরা "নিজের কোন এক বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সেই ঘটনা আর চরিত্র বাছেন।" আবার সমালোচকরাও অনেক সময় বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য উপন্যাসকে ছকে ফেলে বিচার করেন। আমার আন্তরিক আশা, নিত্যপ্রিয় তা করছেন না।

দেবেশ রায়

# সমালোচনা

The Ragas of Northern Indian Music. *By* Alain Danielou. Barrie & Rocklife. The Cresset Press. London. 70*s*.

অ্যালান ডেনিলন্যু ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে হয়তো পরিগণিত হবেন না। কিন্তু নানা রচনা ও আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতকে সর্বত্র পরিচিত করতে তাঁর প্রয়াস যে অদ্বিতীয়, সম্ভবত একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্য, দর্শন ও সাহিত্যকে কেবলমাত্র ভারতীয়ই নন, বহু বিদেশী লেখকও নানাভাবে পৃথিবীর কাছে যেমন সুপরিচিত করেছেন প্রামাণিক উক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়ে, তেমনি ডেনিলন্যুও ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ-রসের আয়াসসাধ্য বিশ্লেষণ করেছেন ভাষা ও স্বরলিপি দিয়ে। তাঁর এমনই একটি গ্রন্থ : *The Ragas of Northern Indian Music*। এই বিশিষ্ট গ্রন্থটি নানা কারণেই ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে সমাদর লাভ করেছে। এই গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আরো কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ প্রয়োজন। কোনো গ্রন্থের আলোচনা অথবা সমালোচনার সময় প্রথমেই দেখা উচিত গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য কি, এবং দ্বিতীয়ত এই গ্রন্থের মতামত কোন শ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থটি ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে রাগের ভাববিশ্লেষণ ও পরিচিতির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর মধ্যে 'নোটেশন' বা স্বরলিপি যা ব্যবহৃত হয়েছে, তা 'স্টাফ-নোটেশন' যাকে বলা যায় পৃথিবীর সর্বত্র গ্রাহ্য।

'স্টাফ নোটেশন' সাধারণত পাশ্চাত্য স্বরলিপি হিসেবে পরিচিত। তার মাধ্যমে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর গতিভঙ্গিমাকে বিশ্লেষণ করা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবিক দুরূহ। কিন্তু লেখক প্রমাণ করেছেন, এ কাজ তাঁর পক্ষে অসাধ্য নয়। বরং যাঁরা 'স্টাফ নোটেশন'-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা অতি সহজেই এই স্বরলিপির মাধ্যমে রাগ-রাগিণীর গঠনভঙ্গিমা জানতে পারবেন। বলা প্রয়োজন, গ্রন্থটিতে ক্রিয়াঙ্গকে স্বরলিপি-মাধ্যমে যতটা প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে রাগের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে ভাব প্রকাশের জন্য যে-সব চিহ্ন পাশ্চাত্য স্বরলিপিপদ্ধতিতে ব্যবহৃত তার খুব অল্পই এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হয়, স্বরলিপিপদ্ধতিটিকে সর্বজনবোধ্য করতে লেখক ঐ জটিলতা পরিহার করেছেন। অথচ ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম অঙ্গ যে 'ভাব'—তাকে পরিহার করেননি। ভাব-ভঙ্গিমাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর ভাষার মাধ্যমে। অনুভূতি এবং কল্পনাকে নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে লেখকের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

প্রশ্ন হল, এই গ্রন্থ কাদের উপকারে আসবে? এ বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে বলি—বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্য সঙ্গীতজগতে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তাতে লাভবান হবেন ওদেশের ভারতীয় সঙ্গীতপিপাসুগণ। ঐতিহ্য যদিও অনস্বীকার্য, কিন্তু ডেনিলন্যুর মত সঙ্গীতরসিক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব দেশের সীমা অতিক্রম করে অন্যদেশের সঙ্গীত-ভাবকে আত্মস্থ করা। দেশীয় সঙ্গীতের মূলভাবকে ধরা সহজ, কিন্তু অন্যদেশীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মূল ভাবধারাকে বোঝা বা অনুকরণ করা কঠিন। এবং সেই অসুবিধা

অনেকাংশে সহজ সরল হয় ডেনিলুর মত লেখকের মাধ্যমে। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতি রাগের প্রতি স্বরকে তিনি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন তার 'ভাব'-এর বিশ্লেষণ করে। এইভাবে রাগের প্রযোজ্য স্বরসমূহ যদি সাজিয়ে প্রতি স্বরের ভাবগুলিকে ক্রমান্বয়ে ধরা যায় তবে সমগ্র রাগের মূল ভাব-রস ক্রিয়াঙ্গে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। যদিও তিনি প্রতি রাগের শুরুতে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে তর্জমা করে রাগ-রূপকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মনে হয় কল্পনাপ্রসূত। একথা সত্যি এই কল্পনার মূলে আছে ক্রিয়াঙ্গ—অর্থাৎ সুরকে না প্রকাশ করা পর্যন্ত তার ভাবকে যেমন প্রকাশ করা যায় না, তেমনি কোন স্বরের কি রূপ, তার আসল পরিচয় না জানা পর্যন্ত শুধুমাত্র ধ্বনি বা নীরস স্বর দিয়ে রাগ-রূপ ফুটে ওঠে না। ঠিক এই কারণেই রাগের প্রতি স্বরের ভাব-বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকার বইটিকে সার্থক করে তুলেছেন।

এবার কিছু আলোচনায় আসা যাক। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত স্বরলিপি প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, 'স্টাফ নোটেশন'-এর সাহায্যে লেখক রাগ-রাগিণীর স্বরপরিচয় ঘটিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রেই 'সি'-কে 'টনিক' ধরা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হল সি-ডি-ই-এফ-জি-এ-বি এবং ভারতীয় শুদ্ধ সপ্তকের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি আপাত দৃষ্টিতে একই। যেখানে বিকৃত অর্থাৎ কড়িকোমল-এর ব্যবহার, সেই সব স্বরের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট বা শার্প ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে হয়, ভারতীয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। যেভাবে আমরা 'গ' ব্যবহার করি সেইভাবেই তিনি 'সি' ব্যবহার করেছেন। এজন্য সিগনেচারে কোথাও ফ্ল্যাট বা শার্প চিহ্ন ব্যবহার করেননি। এমনকি 'স্কেলচেঞ্জ'-এর ক্ষেত্রেও নয়। যেমন, কল্যাণ বা ইমন—অর্থাৎ তীব্র বা কড়ি মধ্যম যুক্ত রাগ-এর স্বরলিপিকে 'জি-স্কেলে' লিখলে কোথাও 'শার্প' চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় না। কিন্তু তিনি সে পথ না নিয়ে সরাসরি 'সি'-কে টনিক করে এফ (শার্প) প্রয়োগ করার রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এইভাবে কাফী ঠাটের ক্ষেত্রেও 'ডি'-কে স্কেল করলে সব 'ন্যাচারাল' পাওয়া যেতে পারে এবং সি-ডি-ই-এফ-জি-এ-বি-সি-ডি সবকটি 'ন্যাচারাল' স্বর দিয়েই কাফী লেখা যেতে পারে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ আগেই বলেছি, স্বরলিপি লেখার মূল পদ্ধতি হিসাবে তিনি ভারতীয় রীতিকে গ্রহণ করেছেন। যদিও সবটা স্টাফ নোটেশন, তবু তা শুধু বিদেশী সংগীতরসিকজনের জন্য বলেই আমার মনে হয়।

ডেনিলুর এই গ্রন্থটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস শাস্ত্রালোচনা। দ্বিতীয় ভাগের মূল বিষয় হল: স্বরলিপি ও বিভিন্ন রাগের বিশ্লেষণ। এর মধ্যে আটটি অনুচ্ছেদ আছে রাগের সময়-প্রকৃতি অনুসারে। যথা, ১। অতি প্রত্যূষের রাগ ২। প্রাতঃকালীন রাগ ৩। দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নের রাগ ৪। সান্ধ্যকালীন রাগ ৫। রাত্রের প্রথম দিকের রাগ ৬। গভীর রাত্রের রাগ ৭। মধ্যরাত্রের ও শেষ রাত্রের রাগ, এবং ৮। ঋতু কালীন রাগসমূহ। এ থেকে বোঝা যায় উত্তর ভারতীয় রাগের যে সময়নির্দেশ আছে তা তিনি লঙ্ঘন করেন নি। শুধু তাই নয়, যথাযথভাবে প্রধান রাগগুলিকে তিনি প্রতি অনুচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং এদের প্রতিস্বরকে তিনি ভাষার মাধ্যমেও রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রতি রাগের শাস্ত্রোক্ত রূপ, আরোহী-অবরোহী, বাদী-সম্বাদী, জাতি, ঠাট ইত্যাদি দিয়েছেন এবং পরে একটি করে গৎ—তার স্থায়ী ও অন্তরা, স্বরের ভাববিশ্লেষণ যাকে তিনি 'শ্রুতিজ এক্সপ্রেশন' বলেছেন তার মধ্যে স্বকীয় কল্পনা বা অনুভূতির তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে-সব রাগের মধ্যে অনেক সময় তিনি যা বহুল প্রচলিত, সেই

'প্রকার'কে প্রকাশ না করে অন্য 'প্রকার'-কে করেছেন। মনে হয় বহুল প্রচলিত প্রকারের ব্যাখ্যা করলে আরো ভালো হত। প্রকাশ—এই পর্যায়ে তিনি যে-সব কথা লিখেছেন তার মধ্যেও মতভেদ থাকতে পারে। যেমন মালকোষ রাগের জ্ঞ (কোমল গা)-কে passionate, মধ্যমকে peace, কোমল ধা (দ)-কে love, desire এবং কোমল নি (ণ)-কে satisfaction, peace—এইভাবে স্বরের ব্যাখ্যা করেছেন। এখন দেখা দরকার, এর সার্থকতা কতোটা। মালকোষের মধ্যে তেজোদ্দীপ্ততা কিংবা ভক্তি-ভাব কি নেই? তবুও বলি যে কটি শব্দ তিনি যে যে স্বরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন সেই সকল ভাবকেও বোধহয় একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। বসন্তকালীন রাগবিভাগের মধ্যে তিনি তিনটি রাগ ধরেছেন। হিন্দোল, বসন্ত ও পঞ্চম। বসন্ত রাগের শাস্ত্রালোচনায় বলা হয়েছে: class (Jati) Audava-shadava (pentatonic in ascent, hexatonic in descent), Sonant (vadi) c (Sa) consonant (Samvadi): F (Ma-tivra) Mode type (Thata): purani characteristies—No fifth (no pa). এখন প্রশ্ন, পূরবী ঠাটের বসন্ত রাগে পঞ্চম যে কতোখানি স্থান অধিকার করে আছে তা এই রাগের রসিকগণ জানেন। পঞ্চমবর্জিত বসন্ত হয় মারবা ঠাটের বসন্তে যা শুদ্ধ বসন্ত নামে অভিহিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে পূরবী ঠাটের বসন্তে কোমল ধৈবত এবং মারবা ঠাটের বসন্তে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহৃত হয়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—এফ বা তীব্র মধ্যমকে সম্বাদী বলা হয়েছে। কিন্তু নিষাদ এবং তীব্র মধ্যম যেমন কখনই বাদী হতে পারে না, তেমনি তীব্র মধ্যম সম্বাদী সচরাচর হয় না—অন্তত এক্ষেত্রে। এই সকল ত্রুটির কথা ছেড়ে দিয়ে বলা যায় গ্রন্থটি অনেকদিক থেকেই সার্থক। কিন্তু খুবই ভালো হত যদি প্রচলিত রাগপ্রকার এবং প্রচলিত স্বরবিন্যাস এর সঙ্গে যুক্ত হত, অর্থাৎ যে বিশেষ উদ্দেশ্যে এই বইটির (যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে) সৃষ্টি তার সার্থকতা অনেকগুণ বেড়ে যেত।

**রবিন ঘোষ**

Creezy. *By* Felicien Marceau. *Translated by* J. A. Underwood. Calder & Boyars. London. 30s.

ফেলিসিয়ঁ মার্সোর উপন্যাস 'ক্রিজি'—১৯৬৯-এর গঁকুর পুরস্কার ও বহু পত্র-পত্রিকার সম্মানজনক স্বীকৃতি সত্ত্বেও—একটি সাধারণ এবং অগভীর জীবন-জিজ্ঞাসার কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। উপন্যাসখানি 'সুখপাঠ্য', কারণ কাহিনীর বিকাশ ঘটেছে আধুনিক চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক্ পদ্ধতিতে, যা আধুনিক পাঠককে ঘরে বসে ছায়াছবি দেখার আনন্দ দেয়। 'অগভীর', কেননা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা ত্রিকোণ প্রেমের কোনাকুনি ছবি থাকলেও তার ঘনত্বের পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা নেই এবং সেই কারণে লেখক গর্ডিয়ন জটে কাঁচি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্যারিসের কোনো প্লাজাতে দাঁড়িয়ে নায়ক তার মৃত প্রেয়সী ক্রিজি-র চিন্তায় আকণ্ঠ মগ্ন। ক্যামেরার মতো তার চোখ প্রথমে জনস্রোত, যানবাহন, ফ্ল্যাটবাড়ির ওপর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ক্রিজি-র মৃত্যুকে অস্বীকার করে। শেষে সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি তার ভেতরে

আবার ফিরে আসে—ক্লিজি-র মুখ, অসংখ্য ক্লিজি, অসংখ্য মুহূর্তের ক্লিজি। এইভাবে শুরু হল ক্লীজ ও জেক্‌ওয়েজের অবৈধ প্রেমের কাহিনী; পোস্টার গার্ল, বিখ্যাত মডেল ক্লিজি একই প্লেনে আকস্মিকভাবে জেক্‌ওয়েজের সহযাত্রী হয়েছিল এবং তখন থেকে ব্যস্ত চেম্বার অব ডেপুটির সদস্য, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফল মানুষ, বিশ্বস্ত স্বামী ও দুই সন্তানের সুখী পিতা জেক্‌ওয়েজ্ তার সফল সামাজিক ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অজানা, অন্ধকার, রহস্যময় জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। স্বাভাবিকভাবেই নায়কের স্ত্রী বেটি এই বিপজ্জনক সম্পর্ককে মেনে নিতে পারবে না, স্বাভাবিকভাবেই নায়কও তার প্রেয়সীর আবেদনে ('আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই' বা 'আমাকে তোমার সঙ্গে নাও') পুরোপুরি সাড়া দিতে পারবে না আনুষঙ্গিক সমস্যার জন্য এবং স্বাভাবিকভাবেই নায়ক এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে, ঠিক যেমনটি হয় যে-কোনো ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীতে। পার্থক্য ঘটে শুধু পরিণতিতে—সমস্যার সমাধানে। মার্সোর সমাধান কৌতুককরভাবে যান্ত্রিক। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় তাড়না থেকে নায়ক যখন ক্লিজিকে তার বাড়ির ওপরতলার বারান্দা থেকে নিচে নিক্ষেপ করে তখন গ্রীক নাটকের ডিউ এক্‌স্ মেশিনার তুলনা মনে আসে। হয়তো লেখকের উদ্দেশ্যই ছিল আধুনিক স্পেস্-এজের জনৈক ডেপুটি ও জনৈকা মডেলের নিষ্ফল প্রেমের 'যান্ত্রিক' সমাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করা, যেহেতু কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়রনির অন্তঃস্রোত লক্ষণীয়। তবু বলতে হয়, উদ্দেশ্য সফল হয় নি, কারণ আয়রনির পাশাপাশি আর একটি মনোভাব একইভাবে সোচ্চার—প্রেম-কেন্দ্রিক ভাববাদ। এই দুই স্ববিরোধী কণ্ঠস্বরের সহাবস্থানই কি লেখকের বিষয়? বোধহয় নয়, কারণ নায়কের দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের ওপর লেখক তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। জেক্‌ওয়েজের কাছে ক্লিজি ইজিপ্টের ক্লিওপেট্রা, অসংখ্য সত্তার সমাহার, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আত্মবিস্মৃত কর্তব্যবিমুখ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি অ্যান্টনি—দুই যুগের দুই প্রেমোপাখ্যানের সমান্তরাল অথচ বিপরীতমুখী বিকাশের ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে শ্লেষাত্মক। গ্লাস্, প্ল্যাস্টিক, স্টিল, অ্যালুমিনিয়মের যুগে ক্লিওপেট্রা জন্ম নিলে হয়তো ক্লিজির মতোই হতো—হাজার রকম ভূমিকায় হাজার রকম ক্লিজি। প্যারিসের বিখ্যাত পোস্টার গার্ল। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের ক্লিওপেট্রা যেখানে কথায় ও ব্যবহারে সত্যিই সংখ্যাতীত ব্যক্তিত্বের প্রতি-মূর্তি, মার্সোর ক্লিজি কখনই সেভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করে না, তার বৈচিত্র্য নিতান্তই নায়কের সাবজেক্‌টিভ্ স্তরে থেকে যায়, একটি কি দুটি জায়গা ছাড়া কখনই তা বাস্তব ঘটনার মর্যাদা লাভ করে নি। একটি জায়গা বিশেষ করে স্মরণীয়—যেখানে জেক্‌ওয়েজ্ জানতে পেরে অবাক হয় যে তার স্বপ্নের রাজকন্যা, তার 'স্বর্গের পাখি' ক্লিজি একটি দোকানের মালিক এবং তাই চেম্‌বার অব্ কমার্সে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। আধুনিক ফরাসী সমাজের এই দুই প্রতিপত্তিশালী নর-নারীর প্রেম যে মূলত নিষ্প্রাণ ও নিষ্পত্তি-হীন খেলামাত্র তা উপন্যাসের শেষে নায়কের উক্তিতে প্রমাণিত হয়—'আমার ক্লিজি, সোনা আমার, আমার স্বর্গলোকের পাখি, তোমাকে যে খুন করেছে সে কি আমি? আর কাকেই বা আমি খুন করেছি? নিয়ন, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়ম—কবেই বা আমরা বেঁচে ছিলাম?' একটা তীক্ষ্ণ বিতৃষ্ণা ও আত্মধিক্কারের সুর এই উক্তিতে, অথচ নায়ক স্পষ্টতই 'রোম্যান্টিক'. তার মনগড়া জগতের সঙ্গে তার বিরোধ কখনই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নি। স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক ও তজ্জনিত যে বেদনা তাও তেমন গভীরভাবে উপস্থিত হয় নি। যা সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে তা হল ক্লিজির সঙ্গে জেক্‌ওয়েজের দৈহিক প্রেম, যন্ত্রতন্ত্র, যেমন-

তেমন অবস্থায়, এবং পূর্ণ কাব্যিক উপমায় তা সম্মানিত হয়েছে। সমুদ্রে অবগাহনরত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমান্বেষণ কাব্যিক বর্ণনা হিসেবে সফল, কিন্তু নায়কের প্রেম-ভাবনায় কোনো বিশেষ আলোকপাত করে না। ভাব থেকে শ্লেষ—শ্লেষ থেকে ভাব, মার্সোর নায়ক সামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো এই দুই বিন্দুর মধ্যে যাতায়াত করে। এই যাতায়াত ততটা ব্যঞ্জনাময় ও উদ্দেশ্যমূলক মনে হয় না যতটা লেখকের উদ্দেশ্যহীনতার ফল বলে মনে হয়। গল্পবলার জটিল স্তরভেদের জন্য লেখকের মনোভাব ও বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে নি। স্বগতোক্তিমূলক গল্পে যদি আগাগোড়া ফ্ল্যাশ্‌ব্যাক্‌-দৃষ্টিকোণ বেছে নেওয়া হয় তবে সাধারণত লেখক একটি অসুবিধের সম্মুখীন হতে বাধ্য—সেটি হল অতীতের নায়ক, স্মৃতি যার বাসস্থান ও বর্তমানের নায়ক অর্থাৎ বক্তা, যে খোলামনে খালিচোখে প্রথমজনকে চিরে চিরে বিচার করে আর মন্তব্য পেশ করে, এদের দুজনের দুটো স্বতন্ত্র মনোভাব থাকায় কাহিনীর মৌল সমস্যা স্থান-কালভেদে দুরকমের চেহারা নিয়ে আসে এবং তাতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে। মার্সোর উপন্যাসে আমরা তিনজন নায়ককে পাই এই অর্থে—জেক্‌ওয়েজ, যে খ্যাতনামা ডেপুটি, জেক্‌ওয়েজ্‌ যে ক্লিজির প্রেমিক, জেক্‌ওয়েজ যে বক্তা এবং সেইহেতু প্রথম দুজনকে শল্যাবিদের মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে আত্মানুসন্ধান করার চেষ্টা করে। এখন, ক্লিজির প্রেমিক জেক্‌ওয়েজ না বক্তা জেক্‌ওয়েজ 'সিনিক' বা 'অবিশ্বাসী' বলা কঠিন। গল্পকথনে যে মৃদু ব্যঙ্গের সুর তা ঘটনা ঘটার সঙ্গে জড়িত না স্মৃতিচারণের ফল? চরিত্রের মনোভাব সম্বন্ধে পাঠক অসহায় বোধ করতে পারেন। উপন্যাসের শেষে নায়ক ও নায়িকার তুলনা দেওয়া হয়েছে দুটি রবোটের সঙ্গে (নায়কের নিজের ভাষায়), এই তুলনা নায়কের মনে আগে আসে নি, আজ ক্লিজির মৃত্যুর পরে এল, সুতরাং প্রেম সম্বন্ধে নায়কের ঘোর কাটল বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই একই নায়ক উপন্যাসের শুরুতে প্লাজায় দাঁড়িয়ে যখন প্রথম পাঠককে ক্লিজির কথা বলতে থাকে, তখন তার ভাষায় বিন্দুমাত্র মোহমুক্তিজনিত শ্লেষ পাওয়া যায় না—'ক্লিজি আর নেই। বুঝতে পেরেছ, ক্লিজি আর নেই? আমি রিক্ত, শূন্য, নির্জন......কিছুক্ষণ আগেই আমার সময় বলতে কিছু ছিল না। আমার সময় বলতে ছিল ক্লিজি। প্রতিটি মুহূর্ত আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম বহুকষ্টে—ক্লিজি। আমার স্বাধীনতা—ক্লিজি...আমার চোখের সামনে অসংখ্য দিন, ক্লিজি নেই এমন দিন, ক্লিজির গন্ধশূন্য দিন, ছাই রঙের আকাশে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন বিশাল কঙ্কালের দল।'

গল্পের ঘটনা আগেই ঘটে গেছে, নায়ক শুধু স্মৃতিচারণ করছে। সুতরাং ক্লিজি ও তার প্রেম যে দুই রবোটের প্রেম তাও সে ক্লিজির মৃত্যুর পর এই প্লাজাতে দাঁড়িয়েই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গল্পের শুরুতে এই মোহমুক্তির ইঙ্গিত নেই, আছে মোহমুগ্ধ মনের বিলাপ—কয়েক ঘণ্টার স্মৃতিচারণে মনস্তত্ত্বের একটি বড়ো সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। যদি সাধারণ সরলরেখায় গল্প বলা হতো তবে এই ত্রুটি চোখে পড়ত না, কারণ সেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব পর পর আসে, কিন্তু স্বগতোক্তিমূলক গল্পে অতীত আর বর্তমানের একটি-দুটি মুহূর্ত প্রাধান্য পায় বলে একটি বিন্দুতে এসে বক্তার মনোভাব আর পরিবর্তনের সুযোগ পায় না, কারণ গল্পের কাঠামোতে সে-সময় ও সুযোগ থাকে না। মার্সোর নায়ক তার মোহমুক্তির কথা যে আগে বলে নি সেটা হয়তো নাটকীয় সাস্‌পেন্সের খাতিরে, এবং এই কারণেই, গল্পটিতে সিনেমার স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু এই সাস্‌পেন্স শেষ বিচারে কৃত্রিম এবং তার প্রয়োজন লেখকের তাগিদে যতটা নায়কের তাগিদে ততটা নয়। নাট্যকার মার্সো নাটকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অবহেলা

করেছেন। উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে মনস্তাত্ত্বিক চাতুর্যের প্রশংসা অতিশয়োক্তির মতো শোনায়। শুরুতে নায়ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে 'বৃত্তাকার, এই প্লাজাটা। না, ঠিক বৃত্তাকার নয়। কেন আমি বললাম বৃত্তাকার?' শেষেও সেই একই ভাবনা। এই দুই মুহূর্তের মধ্যে যতটুকু সময় (খুবই অল্প) ততটুকুতেই নায়কের কাহিনী বিধৃত এবং এই সময়ের মধ্যেই নায়কের মোহ থেকে মোহমুক্তিতে উত্তরণ ঘটেছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে প্রথম থেকেই (অর্থাৎ গল্প বলার সময় থেকেই) নায়ক ব্যাজস্তুতির আশ্রয় নিয়েছে তবে তার প্রথম পর্যায়ের আত্ম-বিলাপে রবোটের মতো অ-রোমাণ্টিক তুলনা মনে এল না কেন?

স্পষ্টতই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা। কোনো কোনো দৃশ্যে এই পরীক্ষা নিঃসন্দেহে সফল, যেমন সেই দৃশ্যটি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) যেখানে ডেপুটি জেক্-ওয়েজ্ ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে টেলিভিশনে বক্তৃতা দেয় এবং টেলিভিশন সেটের ঠিক নিচে কার্পেটে প্রেমোন্মাদ জেক্ওয়েজ্ ক্লিজির সঙ্গে যৌনসঙ্গমে ব্যস্ত। নায়কের এই দ্বিখণ্ডিত রূপটি অন্যত্র তেমন স্পষ্ট হয়ে ফোটে নি। লেখকের ক্যামেরা অধিকাংশ সময় নায়ক-নায়িকার প্রেমোন্মত্ততার ওপর নিবদ্ধ থেকেছে। ইলিয়া কাজানের উপন্যাস "দি অ্যারেঞ্জমেন্ট"-এ যেভাবে ত্রিকোণ প্রেমের চারপাশে অর্থলোভী হিসেবী ব্যবসায়ী সমাজের পটভূমিকা দৃশ্যগোচর হয়, মার্সোর উপন্যাসে ঠিক তার বিপরীতভাবে এক গুটিপোকার অন্তর্জগৎই গোটা মঞ্চ জুড়ে থাকে, অথচ স্পেস্-যুগের মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করার জন্য মার্সো প্রশংসিত হয়েছেন বলে বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্সোর উপমা ও বাক্-প্রতিমা অবশ্যই নিপুণ ও ব্যঞ্জনাবিশিষ্ট—"আমি মুক্ত, হ্যাঁ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, অনেকটা ট্যাক্সির মতো, যা মুক্ত হয় তখনই যখন আর ট্যাক্সির কর্তব্য সম্পাদন করে না।" এই ভাষা-সম্পদ অবশ্য মার্সোর কাঠামোর দুর্বলতা ঢাকতে পারে না।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

Underground Film : A Critical History. *By* Parker Tyler. Grove Press. New York. $ 1·75.

Underground Film শব্দটি খুবই হাল আমলের। এর আগে কোন উল্লেখযোগ্য বইয়ে এর কোন ব্যবহার দেখা যায় নি। সার্জেই আইজেনস্টাইন, জ্যে লিডা, সিগফ্রিড, ক্রাকেনার বা আর্থার নাইট-এর কোন বইয়ে underground film-এর যে কি বস্তু তার কোন বিবরণ নেই। ষাট দশকের কয়েকজন নবীন বিদ্রোহী আমেরিকায় প্রচলিত সকল ধ্যানধারণাকে উপেক্ষা করে তাঁদের যা-খুশী-তাই-কে নিয়ে ছবি করবেন বলে মনস্থির করলেন। তাঁরা দেখলেন যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে ছবি তৈরি হয় তার অধিকাংশই শিল্পগুণবিবর্জিত। অথচ সিনেমা-ভাষায় যে বিপুল ক্ষমতা ও সম্ভাবনা তার যোগ্য ও যথার্থ ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টা-ই নেই এই ব্যবসায়িক ছবিতে। কমার্শিয়াল ছবির প্রযোজকরা বোঝেন টাকা, তাই তাঁদের ছবি তৈরির পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অর্থ রোজগার। এ অবস্থাকে তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। অথচ ছবি তৈরি করতে চাইলে-ই তো ছবি তৈরি করা যায় না। যে বিপুল

অর্থসম্ভার এর পেছনে খরচ হয় তা তাঁরা পাবেন কোথায়। সেজন্য এ'রা বেছে নিলেন অন্য পথ। যোগাড় করলেন ষোল মিলিমিটারের ক্যামেরা, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ হলো—নাম-না-জানা লোকজন নিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী ঠিক করলেন, রাস্তা-ঘাট শহর গ্রামে—অর্থাৎ স্টুডিও চত্বরের বাইরে স্যুটিং করে শুরু করলেন। যে বিষয় নিয়ে কেউ কোন-দিন ছবি করার কথা ভাবতে পারে নি, এমন সব বিষয় নিয়ে ছবি হলো, কোনটা একেবারে সম্পূর্ণ গর্হিত বিষয় নিয়ে, কোনটা বা নিতান্ত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী মারফৎ। ছবি তৈরি হলো, কোন প্রদর্শনগৃহ এদের ছবি দেখাতে রাজী না, কেননা সেখানেও ছবি দেখানর বিচার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থির হয়, তাঁরা সেজন্য-ও পেছপা নন, নিজেদের মধ্যে দেখাতে শুরু করলেন, নিজেদের মধ্যেই ক্রেতা খুঁজে বের করলেন। এইভাবে শুরু হলো Underground Film আন্দোলন। যে ছবি অন দা গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে না, বা প্রদর্শিত হচ্ছে না, যার নির্মাণ ও প্রদর্শন সম্পূর্ণ-ই ব্যক্তিগত বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ তাই underground film। অন্য সকল আন্দোলনের মতো, এখানেও বেশ একদল লোক একত্রে জুটে গেল, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব, ছবি তৈরির ঢঙ প্রায় একরকম। তারাই ক্রমে underground film maker বলে পরিচিত হয়ে উঠল। আমেরিকায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত। (New American Cinema, Experimental Film Makers বলে পরিচিত দলেরই একটা অংশ এরা) ক্রমে পৃথিবীর নানা জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়েছে, পশ্চিম জার্মানী সুইডেনে বেশ বড়োসড়ো দল গড়ে উঠেছে—যাঁরা এ জাতীয় ছবি তৈরি করেন। এখন পৃথিবীর নানা জায়গায় এ'দের উৎসব হয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ'দের নিয়ে নানা আলোচনা বের করে ও বিভিন্ন দর্শক-মহলে এ'দের নিয়ে নানারূপ কৌতূহল ও আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশিষ্ট শিল্পবিদ পার্কার টাইলার গভীর অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অসংখ্য ছবি দেখে আলোচ্য বইখানি রচনা করেছেন। তিনি বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই আন্দোলনের সঠিক উৎস দাদা-ইজম ও স্যুররিয়লিজমের মধ্যে। এই নব্য বিদ্রোহী পরি-চালকেরা অইজেনস্টাইন, অ্যাবেল গান্স, কক্‌তো, লুই বুনুয়েল, রেনে ক্লেয়ার-এরই যোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি যে সব ছবি বা ছবির পরিচালক নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা করেছেন তার প্রায় সবকটি ছবিই আমাদের অদেখা, পরিচালকদের সাথেও অন্যভাবে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, ফলে তাঁর মতামতের গুণাগুণ বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁর মতে, এই সব ফিল্মের বিচারের মানদণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তিতে স্থির করতে হবে। এই পরিচালক-দের মুখ্য উদ্দেশ্য ফিল্মের ভাষা নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, (ক্যামেরাকে চিত্রশিল্পীর হাতের তুলি বা ব্রাশের মতো স্বচ্ছন্দ ও গতিময় করে তোলা বা কোন কোন জায়গায় একেবারে স্থির রেখে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা, বা কোথাও কোন অসম্ভব দুরূহ দৃষ্টিকোণ থেকে এই জগৎ সংসারকে কোন বিশেষ ভাবে দেখা, বা লেন্সের তারতম্য ঘটিয়ে কোন জিনিশকে অস্বাভাবিক বড় বা ছোট করে দেখা) ও প্রদর্শিত বাস্তবকে ইচ্ছেমত ভেঙেচুরে নতুন একটা abstraction-এর লেভেলে গড়ে তোলা। এ'দের দৃষ্টিভঙ্গী যেহেতু সম্পূর্ণ subjective, ফলে সেইদিক থেকে এর বিচার করা উচিত, এর মানদণ্ডকে আর-পাঁচটা কমার্শিয়াল ফিল্মের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে চলবে না। পার্কার টাইলার এই সব ফিল্মের আলোচনা করতে গিয়ে নানাভাবে সাহিত্য বা চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সকল পরিচালকেরা বলেন যে আধুনিক জগৎ ও জীবন অত্যন্ত জটিল, সেই জটিলতাকে যথার্থরূপে প্রতিফলিত করতে গেলে, বাস্তবকে নানাভাবে ভাঙচুর করে

দেখাতে হবে এবং তার মাধ্যমেই বিষয়ের অন্তর্গত প্রকৃত রূপ ফুটে উঠবে। একারণে এ'রা প্রচলিত ঢঙে সিনেমা নির্মাণের পক্ষপাতী নন, এ'দের ছবি কোন কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী হয় না, তৈরি হয় কোন একটা বিশেষ ভাবের ভিত্তিতে, সেজন্য গল্প বলাকে এ'রা সম্পূর্ণ-ভাবে বর্জন করেছেন, এমনকি ছবিতে দৃশ্যপরম্পরাকেও অনুসরণ করে চলেন না। ফিল্ম মানুষের মনে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ক্রাকেনার যাকে Hypnotic power of the film বলে অভিহিত করেছেন তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ'রা ছবি নির্মাণ করেন। এ'দের ছবিতে তাই technical effects-টাই মুখ্য। সাধারণ দর্শক সিনেমার চতুষ্কোণ পর্দার সামনে সম্মোহিত অসহায় অবস্থায় বসে থাকেন। তাঁর সামনে প্রদর্শিত চিত্রের প্রচণ্ড গতি ও শব্দতরঙ্গ তাঁকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলে। এই অবস্থায় তাঁর মনে চিত্র ও ধ্বনির সম্মিলিত প্রয়োগে যে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেটাই সিনেমার নিজস্ব মাধ্যম। এই মাধ্যমের দ্বারা একজন চলচ্চিত্রকার যা-খুশী-তাইকেও বিশ্বাস্যরূপে প্রতিপন্ন করে তুলতে পারেন। দর্শকেরা যেন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো (বস্তুতপক্ষে আন্ডার গ্রাউন্ড ফিল্মের দর্শকগোষ্ঠীর প্রধান অংশই drug addicted audience)। প্রসঙ্গত একখানি ছবির কথা ধরা যাক্, ছবিটির নাম Empire State Building। সময়ের বিচারে ছবিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ছ-ঘণ্টা, এ ছবিটির পুরো সময় জুড়ে আমরা দেখতে পাব ESB-র বাইরের রূপটা, বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থা কিরকম, একটা স্থির ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে। ছবিটি সাধারণভাবে অত্যন্ত বিরক্তি সৃষ্টি করবে, কিন্তু এর মধ্যেই পরিচালক তাঁর বিষয়কে বলতে চেয়েছেন। বা ধরা যাক A Man is Sleeping ছবিটির কথা—ছবিটি একটানা আঠারো ঘণ্টা ধরে চলে, এর মধ্যে লোকটাকে প্রায় ন-দশ ঘণ্টা ধরে শুধু ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখা যাবে—ছবিটির বিষয় কি এই ক্লান্তি, নৈরাশ্য বা হয়তো এই বিরক্তি উৎপাদন-ই ছবিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অন্য নানা বিষয়ও, যেমন যৌন বিষয় I am Curious (Yellow), নর-নারীর অবাধ মিলন, গোপন সম্পর্ক এ'দের প্রিয় বিষয়। নানারকম ভিস্যুয়াল ভ্যারাইটি, ডিজাইন-এর মারফৎ ছবি তৈরি হয়েছে। পার্কার টাইলার তাঁর অন্য শিল্পশাখা সম্পর্কে সমৃদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অসংখ্য আন্ডার গ্রাউন্ড ফিল্মের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করে-ছেন যে এই পরিচালকদের মাধ্যম ও প্রয়োগভঙ্গী জটিল বিষয়কে রূপায়িত করার পক্ষে কতখানি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। সেই সাথে এসকল ছবির বিষয়ভাবনা ও তার প্রয়োগ-কর্মের মধ্যে তিনি দার্শনিক তাৎপর্যও খুঁজে পেয়েছেন। বইটির আরম্ভে তিনি লিখেছেন, My aim in this book is not to write a history in the ordinary sense of supplying an encyclopadia of information. I want to show, rather, what exact personality of the underground film is, and how it traits, getting to so much attention these days, exists in a historical perspective, which must be evaluated. বইটির আদ্যোপান্ত পড়ে, যাঁরা এখনো কোন underground film দেখেন নি, তাঁদের পক্ষেও এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হবে।

তবে পরিশেষে একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। যদিও আজকাল বিদেশে underground film সম্পর্কে একটা বিশেষ craze সৃষ্টি হয়েছে, তবে এর প্রভাব কতখানি সুদূরপ্রসারী হবে তার সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যদিও এইসব পরিচালকের মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট সাহস ও সজীবতার প্রমাণ রয়েছে, যাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা উচিত না, তবুও এই আন্দোলন এতই ব্যক্তিগত মনোভঙ্গীর দ্বারা নির্ধারিত যে, এ'রা কোন

সময়েই অডিয়েন্সের ভিত্তিতে ছবি রচনা করার চেষ্টা করেন না, কম্যুনিকেশন এ'দের কাছে কোন সমস্যাই না, লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, আমার এই ছবি এই রকম হবে, এরকম একটা তোয়াক্কাহীন মনোভাব এ'দের ছবি তৈরি করতে চালিত করে। তাছাড়া অতি-সাহস ও একটা নতুন-কিছু-করব এরকম অতি-উৎসাহে উদ্ভট ছবি তৈরিও শুরু হয়ে গেছে। এ'দের মধ্যে খুব ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীর সৃষ্টি হয়েছে, নিজস্ব ক্ল্যায়েন্টেল গড়ে উঠেছে, যাঁরা এদের ছবি খরিদ করে নেন, তবে তা-ও বিভিন্ন কারণে ও বিশেষ করে ষোল মিলিমিটারের ছবি হওয়ার দরুন খুবই সীমাবন্ধ। এ'রা যে খুব বড়ো বিষয় নিয়ে ছবি করতে পারেন তা নয়, দুয়েকজন বড় ফিচার লেংথের ছবি করেছেন তাঁরা খুব সফল হন্ নি। ফলে এ'রা ব্যাপকভাবে সামগ্রিক বিচারে মূল চলচ্চিত্র আন্দোলনে এখনো কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি।

সুনীত সেনগুপ্ত

**রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ**—গৌরীপ্রসাদ ঘোষ। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা, ৯। মূল্য সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি নিছক তত্ত্বস্বরূপ ও ভাবাদর্শের মহনীয়তা, প্রাচীন ভারতীয় সার্থক উত্তরাধিকার কিংবা স্বীকৃতিতেই অবিস্মরণীয় নয়, কবিভাবনার বিচিত্র-গভীর স্পন্দন ও শিল্পচাতুর্যের বিস্ময়কর পরিব্যাপ্তিতেও অসাধারণ, এই বিষয়টি আমাদের দেশের রবীন্দ্রসমালোচকেরা অনেকটা যেন কথার কথা বলে ধরে নিয়েছেন। নাহলে, এতাবৎ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রকাব্যবিষয়ক আলোচনার সংখ্যা ও সীমানা ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও বেশির ভাগ ব্যাখ্যা-ভাষ কেন স্তুতিভক্তি এবং তত্ত্বানুসন্ধানের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারছে না? অথচ এব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, শিল্পরূপের সার্থক বিচার ব্যতিরেকে রবীন্দ্রসৃষ্টির সমীক্ষা পূর্ণায়ত হতে পারে না। এবিচারে গৌরীপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থখানি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি বহন করে।

সম্ভবত রোমান্টিক তথা লিরিক কবি রবীন্দ্রনাথের নিয়ত প্রস্তুয়মান বিচিত্র ব্যাপক কাব্যশিল্পের যথার্থ বিচার সহজসাধ্য নয় বলেই তাঁর কাব্যের শিল্পরূপের রহস্য সন্ধানে সমালোচক সম্প্রদায়ের উদাসীনতা এতটা প্রকট হয়ে ওঠে। কবির অন্তর্লগ্ন প্রেরণা-ভাবনা, কবিমনের বিচিত্র অনুরণন এবং তার কাব্যান্তরিত শিল্পাভিব্যক্তি,—ভাবুককবি এবং শিল্প-স্রষ্টার দ্বৈত অস্তিত্বের মধ্যে যে সূক্ষ্মজটিল সম্পর্ক রয়েছে তার সাফল্য সৌন্দর্যকে খুঁজে বের করা রীতিমত দুঃসাধ্য কাজ। এবিষয়ে লেখকের প্রচেষ্টা সর্বত্র তর্কাতীত না হলেও বহুলাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপের বিচারে সমালোচক মোটামুটিভাবে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করেছেন। এবং যাবতীয় বিচার-বিবেচনাকে একটি সংহত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর আলোচনার পথচিহ্নগুলি এই রকমের, (১) ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনায় সুতীব্র হলেও তাঁর কাব্যের অনুভূতি সংগঠনে এবং রূপনির্মিতেও ইউরোপীয় তথা ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তীব্রতর। বিশেষভাবে তাঁর পরিণততর কাব্যরচনায়। (২) সমালোচকের মতে কবির শেষ

তিরিশ বছরের কাব্যরচনার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কবিতার বিপুল বিক্ষোভ ও বিস্ফার উপচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের মৌল কবিপ্রাণতা কেন্দ্রগ রোমান্টিক স্বভাবধর্মে সম্পূর্ণ অবিচল থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। (৩) রবীন্দ্রনাথ যেহেতু রোমান্টিক কবিস্বভাবাপন্ন, গীতিকার এবং লিরিস্ট তাই তাঁর অনুভূতি-স্পন্দনগুলির সৌন্দর্য এবং অনন্যতা কবিতার তত্ত্বসন্ধানে পরিস্ফুট হবে না, হবে তাঁর শিল্পানুভূতি এবং রূপনির্মাণের অন্তশ্চরিত্রের মূল্যায়নে। (৪) রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপের সবলতা, দুর্বলতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ একটি উপায়েই সম্ভব। তা হল, বিশ্বসাহিত্য, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বের আপেক্ষিক বিচার।

সমালোচকের দৃষ্টিকোণ এবং আলোচনার ভিত্তিভূমি দুঃসাহসিক এবং সম্ভাবনাপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তা একদেশদর্শী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের পূর্বভাষণে 'অল্প বয়সেই ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের চর্চা করায় রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে আমার অনুভূতি বা ধারণা বহুদিন ধরে এবং বহুভাবে বিবর্তিত হবার সুযোগ পেয়েছে'—এই স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপের বিচারক্ষেত্রে অনেকটা সংস্কারের মত কাজ করায় ইউরোপীয়, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক-লিরিস্ট ইংরেজ কবিদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় লেখকের রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু আদর্শ-প্রেরণা-ঐতিহ্যের দিক থেকেই নয়, কালিদাস-জয়দেব-বৈষ্ণবপদকর্তাগণ রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতার কায়গঠনেও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। রবীন্দ্রশিল্পসৃষ্টির সার্থকতার বিচারে স্বদেশীয় কবিতার ঐতিহ্যের অনুবর্তনের এই দিকটি সবিশেষ আলোচিত না হলে রবীন্দ্র-কাব্যের শিল্পরূপের বিচার পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। পূর্বভাষণে অন্যত্র লেখক বলেছেন, 'রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা থেকে মন যতই সূক্ষ্মতর শিল্পবোধের দিকে অগ্রসর হতে লাগল ততই কবির শিল্পীজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের কাব্যকে সাধারণভাবেই প্রথমার্ধের কাব্যের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর মনে হতে লাগল; এবম্বিধ উক্তি যুক্তিযুক্ত এবং সুস্পষ্ট নয়। রোমান্টিক কবিপ্রাণতা কি সূক্ষ্মতর শিল্পবোধের বিরোধী? লেখক তো অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র এবং আপসহীন রোমান্টিক মানসতাই তাঁকে পরিকীর্ণ আধুনিকতার বিক্ষোভ থেকে স্বতন্ত্র রেখে স্বমহিম করে তুলেছে। দ্বিতীয়ার্ধের কাব্যকে প্রথমার্ধের কাব্যের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করার মত ব্যক্তি-চিন্তা কিংবা উপলব্ধির স্বাধীনতা লেখকের আছে, কিন্তু এই ফতোয়া নিশ্চয়ই বিতর্কের অতীত নয়। এবং লেখকও নিজস্ব মতকে তাঁর আলোচনাধারায় যথাযোগ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাই বলে লেখক স্তুতিভক্তির পথে রবীন্দ্রপূজার আয়োজন করে আলোচনাকে ক্লান্তিকর করে তোলেননি। অনেক ক্ষেত্রেই কবির সবলতার পাশাপাশি দুর্বল শিল্পপ্রযত্নের অকপট বিচার করে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-রীতির যথার্থ বিচারে যত্নবান হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যেটা এই গ্রন্থের আলোচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, তা হল, বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-কাব্যশিল্পের বিচার।

আলোচনার ধারা দৃশ্যত পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হলেও আলোচনা-সমগ্রকে দৃষ্টি-কোণের বিচারে দুটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম স্তরে রয়েছে আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিচার এবং লিরিক-কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-লোকের বিভিন্ন সুরগুলির বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ের চেষ্টা। এই স্তরের আলোচনা মুখ্যত রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব আবিষ্কারে প্রচেষ্টাবদ্ধ। আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের বিক্ষোভ এবং পরিণতিবিহীন চিত্তবিক্ষেপের মাঝখানে জন্মরোমান্টিক কবি

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রশ্রয়ী অবিরাম চলা, আধুনিকতার অভিনব উৰুতাকে গভীরভাবে অনুভব করে এবং তার রীতিপ্রকৃতিকে অনেকক্ষেত্রে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে আত্মসাৎ করেও আপন রোমান্টিক স্বভাবধর্মে অবিচল থাকার মধ্যে যে স্বকীয়তা এবং বিশিষ্টতা রয়েছে তা লেখকের পাণ্ডিত্যের গুণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রাচীন কলাবিধির পরিবর্জন এবং আধুনিক রীতির পরিমার্জন দুই-ই ঘটলেও তিনি আপন রোমান্টিক স্বাতন্ত্র্যকে কখনও বর্জন করেননি,—এই বিশেষ দিকটি দৃষ্টান্ত এবং বিশ্লেষণের সহায়তায় লেখক তুলে ধরতে পেরেছেন। তবে, আধুনিক জীবন ও সাহিত্যের চিত্তবিক্ষেপ শুধু অনির্দেশ্য খামখেয়ালিপনা নয়, তার ভেতরেও যে কিছু কিছু প্রতিজ্ঞা উপ্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে—এদিকটা আরো খানিকটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বললে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার দিকটা আরো উদ্ভাসিত হতে পারত।

রবীন্দ্রনাথের লিরিকপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় ব্যাপারে লেখকের বিচারপদ্ধতি বর্তমান আলোচনার সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে লিরিকপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনি আটটি সুরে বিভক্ত করেছেন। বিভিন্ন সুরের প্রকৃতিবিচারে লেখকের রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতায় মানবীয় প্রেমের চিত্রণ ও গভীর বিশ্বচেতনার সুর, —এই দুটি পর্যায়ের আলোচনায় লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপায়ণের বিশেষত্ব বিচারে ব্যয়িত। এই স্তরে আছে রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের ক্রমবিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যের পরিমাপপ্রয়াস এবং দৃষ্টান্তসহ কিছু গীতি-কবিতার শিল্পাত্মার অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা। 'রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের ক্রম-বিবর্তন' পরিচ্ছেদটিতে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের বিবর্তনের রূপরেখাটি লেখক যেভাবে গ্রথিত করেছেন তা প্রশংসনীয়। কালপরিবর্তন কিংবা ভাবের বিবর্তন—এর কোন একটি প্রথাসিদ্ধ পথ ধরে তিনি রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের স্তরবিন্যাসে অগ্রসর হননি,—রবীন্দ্রকাব্যের ভাবরূপ এবং শিল্পরূপের অগ্রগমন এবং পশ্চাদপসরণের বিচিত্র সূত্র ধরে তিনি কাব্যপ্রবাহের বাঁকগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রকাব্যের বিন্যাসীকরণ বর্তমান আলো-চনায় সম্পূর্ণ একটি নূতন বৈপ্লবিক পথের সন্ধান দিয়েছে। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লিরিককবিদের কবিতার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে তিনি আলোচনাকে ব্যাপকতর পটভূমিকায় দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছেন। 'রবীন্দ্রকাব্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য'-এর লেখক রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর শিল্পোৎকর্ষ, চিত্রকল্পের মাধুর্য, ছন্দের অমোঘতা, শব্দ ও ধ্বনি ব্যবহারে প্রয়োগ-সার্থকতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গীতি-কবিতার পরিচয়' পরিচ্ছেদটিতে লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং কাব্যরস আস্বাদনের সামর্থ্য স্পষ্টলক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিচ্ছেদে তিনি কবির বিখ্যাত কিছু গানকে লিরিক কবিমনের অনুরণনের সূত্রে কয়েকটি ভাবানুষঙ্গে বিভক্ত করে তার সৌন্দর্য ও শিল্পোৎকর্ষের বিচারে প্রচেষ্টিত হয়েছেন। এইসব শিল্পসৃষ্টির ভেতর কবির ভাবনা এবং কাব্যাভিব্যক্তির অতিরিক্ত একটি ভিন্ন চরিত্রের শিল্পমাধ্যম প্রকটিত, যার নাম সংগীতধর্ম—সেই সংগীতধর্মকে গানের ভাবরূপ এবং কবিতারূপী কায়গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তার থেকে সৌন্দর্যগুণকে অব্যর্থভাবে ছেঁকে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য। এই কাজ চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন না হলেও লেখকের সংবেদনশীল ব্যাখ্যা ও ভাষ্যরচনায় অনেকাংশে তা সম্পাদিত হয়েছে।

প্রণয় সেন

Tussy Is Me. *By* Michael Hastings. Weidenfeld & Nicholson. London. 40*s*.

আলোচ্য উপন্যাসটি কার্ল মার্ক্সের তিন কন্যার কনিষ্ঠতম ইলিনর সম্পর্কে। যদিও সমগ্র উপন্যাসটির পটভূমি উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সমাজবাদ, এবং তদানীন্তন কারখানা ও খনির শ্রমিকশ্রেণী, কিন্তু কখনো কখনো তা ইলিনরের ব্যক্তিগত আবেগে উজ্জ্বল। সম্ভবত সে কারণেই গ্রন্থকার উপন্যাসটির অবর-শিরোনামা হিসেবে যোগ করেছেন : 'একটি রোমান্স'। কার্ল মার্ক্স-কন্যা ইলিনরই টুসি। এবং মার্ক্স মনে করতেন, তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ইলিনর কালে কালে তাঁর আদর্শ ও ভবিষ্যৎ বাণী কার্যকর করবেন। টুসির মধ্যেই মার্ক্স তাঁর নিজের চিত্রটি দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি একবার লিখেওছিলেন : 'টুসি হলাম আমি।'

উপন্যাসটি দীর্ঘ, এবং টুসির আত্মহত্যার দিন থেকে তার পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীর এক রাজনৈতিক উপাখ্যান। এর প্রধান উপাদান ব্রিটিশ সমাজবাদের পথিকৃৎ কের হার্ডি, কানিংহ্যাম-গ্রাহাম, উইলিয়ম মরিস, জীম বার্নস এবং অন্যান্যদের আদর্শের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম। এরই পাশাপাশি ইলিনরের জীবন। যতদিন সে জীবিত ছিল, মার্ক্সের প্রতি তার শ্রদ্ধা, পিতার লেখা সম্পর্কে তার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সবকিছু ছাড়িয়ে পিতার প্রতি কর্তব্য-বোধ টুসিকে নিজের 'ব্যক্তিগত জীবন' থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এমনকি এ সময় কোনো পুরুষের সঙ্গে তার কোনো স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মার্ক্সের স্ত্রী-বিয়োগের পর টুসির একমাত্র কাজ ছিল, মার্ক্সের সেবা করা, নানা কথা বলে পাওনাদার ঠেকানো। মার্ক্সের গবেষণায় সাহায্য করা।

১৮৬৯ সালে মার্ক্স পরিবারের ইংলন্ড বাস যেন এক দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের তাগিদে ঘটেছিল। টুসির তখন কাজছিল, 'to pay bills, meet creditors, face bailiffs, find food and clothing from out of empty pockets, and even begging from strangers to persuade the printers to distribute pamphlets of Karl's.' মার্ক্সের বয়স তখন একান্ন। আর ইলিনরের মাত্র চোদ্দ। কিন্তু এই অপরিণত বয়স সত্ত্বেও, তখন থেকেই তার উপর মার্ক্সকে আড়াল করে রাখার দায়িত্ব। মনমথশায়ারের নিউপোর্টে ব্রীজপোর্ট আর্মসে তাঁরা তখন থাকতেন। মার্ক্সকে তখন প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে তাঁর আলোচনার তথ্য সংগ্রহ করতে ঘুরে বেড়াতে হত। কাজের জন্য যে স্থানটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন, সেখানে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ছিল ভয়ঙ্কর। খবরের কাগজের কাটিং এবং নোটবই সর্বস্ব করে মার্ক্সকে সেইসব অঞ্চলের শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক সময়ে সেই সমস্ত তথ্যানুসন্ধানে ইলিনরও হতেন মার্ক্স-এর সঙ্গী।

Karl said, 'wait and watch.'

A group of tired women in oiled and patched cotton smocks stopped at the kiosk by the foreman's hut beside the gateway. They waited patiently in the damp wind for the foreman's bountyman to raise his latch, and pay the dags due to each.

Only the relentless rain which spattered bracken and broken stones along the mud lane relieved the silence in the middle of the evening. Eleanor pulled her cape closer, shivered once, and leaned more closely against her father's shoulder.

'Who are we waiting for?' she asked.

'You will see.'

আর যখন বাড়িতে। তখনও টুসির দায়িত্বের শেষ নেই।

'If the manager comes to the door,' Karl added, 'speak to him in German—or in French—not in English. To the English a mad foreigner exudes a kind of honesty.'

মার্ক্সের প্রতি টুসির এই গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তাকে মার্ক্সের সব রকম কাজে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা শুধু যে তাদের ঘনিষ্ঠ করেছিল, তাই নয়, তাদের মধ্যে এক আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কও স্থাপন করেছিল। মার্ক্সের খ্যাতি ও বুদ্ধিজীবি মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা স্বভাবতই টুসির মনে এই শ্রদ্ধার আসন তৈরি করেছিল। টুসির জন্মের প্রায় দশ বছর আগে মার্ক্সের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। অতএব জন্ম থেকে পণ্ডিত মার্ক্স টুসিকে বিশ্বাসে, ভরসায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

কিন্তু মার্ক্সের এই নির্ভরতা টুসির সব সময় তেমন পছন্দ ছিল না। বিশেষ করে টুসি অপছন্দ করত মার্ক্সের সাহায্যকারী এবং গৃহকর্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয়েছে পিতার এই সর্বগ্রাসী আশ্রয় থেকে মুক্তি পেতে। টুসিই একদা বলেছেন 'It is not enough to have Karl as father, it is too much!'

মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর টুসি এই মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু সমগ্র ইওরোপ জুড়ে তখন তার পরিচয় মার্ক্সেরই প্রতীকস্বরূপ। মৃত্যুর পরও মার্ক্সের প্রতিষ্ঠার দায় তাকে বহন করতে হয়েছিল। হয়ত এই প্রতিষ্ঠার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতেই ইলিনর এডওয়ার্ড অ্যাভলিঙ-এর প্রেমে পড়ল।

টুসির জীবনে এবার অ্যাভলিঙ-এর প্রবেশ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পণ্ডিত এবং সমাজবাদী বুদ্ধিজীবি অ্যাভলিঙর-এর ছিল টুসিরই কথায় 'extreme charm despite his sad faced ugliness.' কিন্তু তাঁর কোনো নীতিবোধ ছিল না। টুসিকে তিনি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। টুসি ও অ্যাভলিঙ পনেরো বছর একসঙ্গে ছিলেন, কিন্তু কখনো বিয়ে করেন নি। পরন্তু টুসি তাঁর 'মিসট্রেস' ছাড়া আর কোনো সম্মানে উন্নীত হতে পারে নি। আর অ্যাভলিঙও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝামেলা কখনো নেন নি। অ্যাভলিঙ একদিকে যেমন ছিলেন বিবেচনাহীন, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠুর। তাঁর রিপু তাঁর বিবেককে সব সময়েই পরাস্ত করেছে। তিনি সমাজবাদীদের তহবিল তছরূপ করেন। শুধু তাই নয়, টুসির মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত দুষ্কৃতির, যা যে-কোনো মানুষকেই কলঙ্কময় করে তোলে, এক নির্বিরোধ প্রশ্রয় চেয়েছিলেন। তাই টুসিকে কালে কালে অ্যাভলিঙ আফিঙে আসক্ত করলেন। এই আসক্তি থেকে টুসি কখনো মুক্তি পায় নি। টুসি তার সমাজবাদী বান্ধবীদের অ্যাভলিঙ-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। যার সুযোগের ব্যবহার করতে অ্যাভলিঙ কখনো অনীহা প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। শুধু সহবাস নয়, বহুক্ষেত্রে এই সকল মহিলারা তাঁর 'ব্ল্যাকমেলেরও' শিকার হয়েছেন। টুসির সাহায্যে অ্যাভলিঙ দ্রুত সমাজবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে স্থিত হন। এবং একথা ভাবার কারণ আছে যে টুসির কারণেই বহুবার দলের তহবিল তছরূপ করা সত্ত্বেও অ্যাভলিঙ সম্পর্কে দল থেকে কোনো রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

যে-স্বাধীনতা ছিল টুসির পরম প্রার্থিত, অর্থাৎ পিতার সর্বগ্রাসী বন্ধন থেকে মুক্তি তা কিন্তু কখনই তার জীবনে আসে নি। পিতার পর অ্যাভলিঙ। বস্তুত এডওয়ার্ডের

প্রভাবও তার উপর এত প্রবল ছিল যে, সব সময়েই টুসি তাঁকে সমর্থন করেছে। তাঁর অপরাধ চাপা দিতে সচেষ্ট ছিল। এমনকি পত্নী-বিয়োগের পর এডওয়ার্ড যখন লন্ডনের অভিনেত্রী লিলিয়ন রিচার্ডসনকে বিবাহ করলেন, তখনও টুসি তাঁকে ক্ষমা করল। এমনকি যখন টুসি বুঝতে পারল যে এডওয়ার্ডের জীবনে সে বোঝাস্বরূপ, তখন তাঁরই প্ররোচনায় বিষপানে আত্মহত্যা করল। টুসির যা কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাও সে এডওয়ার্ড অ্যাভলিঙকেই দিয়ে যায়। অবশ্য টুসির মৃত্যুর চার মাস পর অ্যাভলিঙও হৃদ্‌রোগে মারা যান।

ইংরেজী সাহিত্যে ইতিহাস অথবা জীবনী আশ্রয়ী উপন্যাস বিরল নয়, বরঞ্চ বলা যায় এধরনের এমন অনেক উপন্যাস আছে যেগুলি বহুকাল যাবৎ পাঠক সাধারণের কাছে সমাদৃত। এই উপন্যাসগুলি কেবলই ঐতিহাসিক ঘটনায় বিচিত্র নয়, সাহিত্যগুণেও চিহ্নিত। আলোচ্য উপন্যাসটি এই পর্যায়ে এক বিশিষ্ট সংযোজন। ইংরেজ নাট্যকার-ঔপন্যাসিক মাইকেল হেস্টিংস সাধারণত সমাজের চোখে যাঁরা নিগৃহীত অথবা পতিত, তাঁদের সম্পর্কেই লিখতে পছন্দ করেন। তাঁর অতি সাম্প্রতিক একটি নাটকের বিষয়বস্তু হারভে অসওয়াল্ড। সম্ভবত সেই একই মানসিকতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। হয়ত টুসি, মার্ক্স-এর সব থেকে প্রিয় কন্যা, যে অতি অল্প বয়সেই পার্থিব নিয়মগুলির অতি কাছাকাছি এসেছিল এই কারণেই লেখকের মনে নাটকীয়তা বোধের সৃষ্টি করেছিল। কারণ, টুসি যে শুধুমাত্র অকাল-পরিণত ছিল তাই নয়, অত্যন্ত অল্প বয়সেই সে "মাদাম বোভারি"র তর্জমা করে।

টুসির জীবনে, অথবা তদানীন্তন ইংলন্ডে যে নাটকীয়তার অভাব ছিল তা নয়, কিন্তু উপন্যাসটি সার্থক হতে পারেনি এই কারণেই যে হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল ইংলন্ডের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক পটভূমিতে অপরিচিত টুসি মার্ক্সের সচিত্র আলেখ্য পরিবেষণ। আর যখনই তিনি টুসির মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই তিনি সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বাইরের জীবনকেই তিনি দেখেছেন। জীবনের গভীরতা তাঁর মনে আলোড়ন আনতে পারে নি। হেস্টিংস যেন পুরো উপন্যাসটি ইংলন্ড প্রবাসী দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থায় বিপর্যস্ত টুসির বাইরের জীবনকেই ধরতে চেয়েছেন। যার জীবনে অনেক গৌরবের সঞ্চয়—তার সমাপ্তি এই তরল রোমান্সে ভাবলে আশ্চর্য লাগে!

প্রসঙ্গত বলা উচিত, উপন্যাসে সন্নিবেশিত বহু ঘটনা স্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। এবং বহু ঘটনার সংযোগ উপন্যাসের নাটকীয়তার প্রয়োজনেই ঘটেছে।

আবার কোনো কোনো অংশে মৌলিক কালনির্দেশে ভুল আছে। যেমন, সরকারীভাবে নির্দিষ্ট তারিখের বহু বছর আগে মার্ক্স-পরিচারিকা হেলেন ডেমুথ মার্ক্সের বাড়ি ছেড়ে রিজেন্ট পার্কে এঙ্গেলসের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। উইলিয়ম মরিসের বিখ্যাত সেই আবেগ-ময় বক্তৃতা ফ্যারিংটন স্ট্রিটের দপ্তরগুলিতেই একমাত্র প্রদত্ত হয়নি, অন্যান্য অনেক সমাবেশে তিনি এই একই বক্তৃতা করেছিলেন। এছাড়া, কেমস্‌কট প্রেসে এমন কোনো জ্ঞাত হিসেব নেই যা থেকে এডওয়ার্ড অ্যাভলিঙের প্রতারণা লুকানো যায়।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

সজনে নির্জনে আমি—অরুণাভ দাশগুপ্ত। কবিপত্র। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।
ভুল সুকোমল—সুকোমল রায়চৌধুরী। সত্তরের কবিতা। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে তরুণতর কবি, যাঁরা সত্তরের কবি বলে চিহ্নিত, তাঁদের অনেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক রীতি নির্মাণের পরিশ্রম ক্রমশই শরীরী হয়ে উঠছে। শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব নিজস্ব উপলব্ধির সংগত ও স্বাভাবিক মুক্তির মাধ্যম আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ। ভাষাশিল্পীর পক্ষে নিজের একান্ত একটি বাচনভঙ্গি তাকে বহুর মধ্যে বিশেষিত হবার মর্যাদা দেয়। অরুণাভ দাশগুপ্ত কথা বলেন সরাসরি। কবিতার বক্রবাচনরীতি যদিও ক্রমশ তার আলংকারিক অর্থ হারাচ্ছে তথাপি, মানি—কবিতা কখনো কখনো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থ পেতে চায়, আর তা পেতে হলে সাংকেতিকতার আশ্রয় কবিকে নিতেই হবে। অরুণাভ আভিধানিক অর্থে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির শর্ত যেমন মানেন তেমনি পারিপার্শ্বিক ঘটমান সত্যের উপর শিল্পের ভিত প্রতিষ্ঠা করতে বসে সর্বাধুনিক অনাবরণ অলংকারহীন ভাষা ব্যবহারের রীতি গ্রহণে দুঃসাহসী হ'য়ে পড়েন। এ কারণে তাঁর সঙ্গে পাঠকের অনুভবের সংক্রমণ চলে প্রথম পাঠের সময় থেকেই, দূরে কণ্ঠ স্থাপন করেও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে অরুণাভ দাশগুপ্ত কথা বলেন এটাই তাঁর বাচনভঙ্গি, এই তাঁর চরিত্র

শালিখের বাসার মতন/দুনৌকোয় পা রাখার উদ্ভট কৌশলে/
ভাবছেন সম্ভব বুঝি ভুল স্বর্গে বেঁচে বর্তে থাকা!

কবি বহমান সময়ের তাৎক্ষণিক অনভূতিগুলিকে কবিতার বিষয় করেন, অথচ মনে হয় না তিনি সাময়িকতার সরব ভাষ্যকার। বিষয়কে সমসময় থেকে ছেঁকে নিয়ে পরিচয়হীন আবহমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন বলেই তাঁর কবিতা সময় ও সময়হীনতার দোলাচলে লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ।

অন্যদিকে সুকোমল রায়চৌধুরী কখনোই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেন না, যতটুকু ইঙ্গিতে বলা চলে ততটুকুই তিনি বলতে চান, ফলে অরুণাভর একটি কবিতাতেই চলমান পৃথিবী যে স্পষ্ট শরীর পায় সুকোমল সেখানে সতর্কভাবে কানের কাছে শব্দকে দুলিয়ে দেন, সেই ধ্বনি অস্পষ্ট, দূরশ্রুত কোনো প্রতিধ্বনি যেনবা শ্রুত হয়, ফলত প্রতিদিনের জীবনের স্পর্শে উষ্ণ মলিন শব্দ বা শব্দখণ্ড তিনি সজ্ঞানে এড়িয়ে যেতে চান। "ভুল সুকোমল" নামটিও তাৎপর্য পেয়েছে: কবির মধ্যে এতোদিনের অর্জিত মূল্যবোধ কোনো চরম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে বিপর্যস্ত। চান নতুন মূল্যবোধে উত্তরণ। "ভুল সুকোমল" বইটির কবিতাগুলি সেই উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে আগ্রহী। সুকোমল রায়চৌধুরীর সন্ধান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরে, তাই স্বগতভাষণ অনেক সময়ই অশরীরী। তিনি ভূমি ছুঁয়ে চলতে চান না। অস্পষ্ট ধূসর জগতে ভ্রাম্যমাণ এক সত্তার নানা প্রশ্ন আর উত্তর তাঁর কবিতা। 'আমি'-কে ঘিরে তাঁর পৃথিবী, সমস্যাও 'আমি'-কে নিয়ে, তাই তাৎক্ষণিক অনুভূতি যে শরীর পায় তার মধ্যেও দ্বন্দ্বক্ষত প্রশ্ন : আমার শরীর ছুঁয়ে অন্ধ এই মাটি/এ কোন পৃথিবী নিবিড়তা ছিঁড়ে ফেলে/আবার নিবিড় হতে চায়।'

পবিত্র মুখোপাধ্যায়